
অনীশ দেব
ষাট মিনিট
তেইশ ঘণ্টা

নায়ক জিশান।
রিয়্যালিটি শো। কিল গেম!
মৃত্যু ঝুলছে সূক্ষ্ম সুতোয়!...



অসহ্য টেনশন আর
রুদ্ধশ্বাস রহস্যের মিশেলে
বাংলাসাহিত্যের দীর্ঘতম
ফিউচারিস্টিক থ্রিলার।

'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট'
উপন্যাসের দ্বিতীয়
এবং শেষ পর্ব।

ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা

অনীশ দেব

ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা



পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

SHAT MINIT TEISH GHONTA
by
Anish Deb

ISBN 978-81-8374-265-8

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুদীপ্ত দত্ত

মূল্য
২৫০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail patrabharati@gmail.com
visit us at www.facebook.com/ Patra Bharati
website www.bookspatrabharati.com
Price ₹ 250.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

গান-বাংলার অনন্য গানওলা

নচিকেতা-কে

লেখকের অন্যান্য বই

তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট
ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
ভয়পাতাল
হিমশীতল
আমি পিশাচ
মার্ডার ডট কম
দুঃখী রাজকুমার
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু
সহজ কথায় রোবট
সহজ কথায় ইন্টারনেট
সহজ কথায় টেলিভিশন
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
বিজ্ঞানের হরেকরকম
ভৌতিক অলৌকিক
অন্তরে পাপ ছিল
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
সেরা কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
বিশ্বের সেরা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩ (সম্পাদিত)
রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প (সম্পাদিত)

'ধরা যাক, জঙ্গলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বাঘ এবং একজন মানুষ। মানুষটির হাতে রাইফেল থাকলেও এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, বাঘ হচ্ছে শিকার, আর মানুষ হচ্ছে শিকারি। ব্যাপারটা উলটোও হতে পারে।'

'থিয়োরি অফ গেম ঃ হান্টার অ্যান্ড দ্য হান্টেড'

লেখক **জেম্‌স ডি. প্যাটারসন**

প্রকাশক **ফিউচার টেন্স**, প্রকাশকাল **২৩১১**

এক মিনিট—আপনাকে বলছি!

২০০৪ সালে 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার পুজো সংখ্যার পাতায় শুরু হয়েছিল 'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট'। প্রথম পর্ব প্রকাশের পর যা-যা হয়েছিল সে সবই আপনারা জানেন। 'তেইশ ঘণ্টা যাট মিনিট' বইয়ের শুরুতে তার ফিরিস্তি দিয়েছি। তথ্যের জন্য শুধু এটুকু আবার জানাই যে, 'কিশোর ভারতী'-র পরপর চারটি পুজো সংখ্যায় উপন্যাসটির চারটি পর্ব প্রকাশিত হয়—তারপর পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে লেখাটি ২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ২০০৯-এর সেপ্টেম্বরে প্রথম খণ্ডে ইতি টানি। এবং সম্পাদকের পরিকল্পনা মতো ২০১০-এর জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী পর্যায়ের প্রকাশ শুরু হয়। তখন লেখাটির নাম দিই 'ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা'। ঊনচল্লিশ কিস্তিতে সেই লেখাটি শেষ হয়ে এখন বইয়ের চেহারায় আপনার হাতে। নায়ক জিশানকে নিয়ে লেখা আমার 'তেইশ ঘণ্টা যাট মিনিট' ফিউচারিস্টিক থ্রিলারের এইখানেই ইতি।

উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড যখন পত্রিকার পাতায় পর্বে-পর্বে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন আমি পাঠক ও সম্পাদকের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম যে, এই একটি লেখা আমি মনের মতো করে শেষ করতে চাই। আমার আবেদনে দু-পক্ষই আন্তরিক সাড়া দিয়েছেন। এ ছাড়া 'কিশোর ভারতী'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় বহু পাঠক উৎসাহ দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। অনেকে ফোন করেছেন, কেউ-বা ই-মেলে মতামত জানিয়েছেন। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বছর দেড়েক আগে জনৈক বয়স্ক প্রাজ্ঞ পাঠক সাক্ষাতে আমাকে উপন্যাসটি শেষ করে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। সম্পাদকের দপ্তরে বসে মোটামুটি যে-কথাগুলো তিনি বলেছিলেন সেগুলো এইরকম ঃ 'এবারে ওটা শেষ করে দিন। আর টানার দরকার নেই।' সেই সময়ে হাসি পেলেও সৌজন্যের খাতিরে হাসি চেপে রেখেছিলাম। লেখা যে ঘুড়ি নয়, ইচ্ছেমতো 'টানা' বা 'ছাড়া' যায় না, সে-কথা ওই প্রাজ্ঞ মানুষটিকে শেখাতে আমার সৌজন্যে বেধেছিল। সুতরাং, এই কথাটাই বলতে

চাই যে, দু-খণ্ডের এই উপন্যাসটি আমি স্বাধীনভাবে লিখেছি—সবসময় সরস্বতীর 'চাকর' হয়ে থেকেছি। তাই এর সমস্ত ভুল-ত্রুটি-ব্যর্থতার দায় পুরোপুরি আমার।

আর একজন উৎসাহী পাঠকের কথা খুব বলতে ইচ্ছে করছে। তিনি সোনারপুরের দেবসেনা নন্দী। উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশের সময় তিনি নিয়মিত ফোন কিংবা এস.এম.এস. করে ওঁর কৌতূহল এবং ভালো লাগা প্রকাশ করেছেন। দেবসেনা এবং আরও অন্যান্য পাঠকের উৎসাহ আমাকে প্রতি মুহূর্তে ভেতর থেকে ভালো, এবং আরও ভালো, লিখতে চাওয়ার শক্তি জুগিয়েছে।

গত মে মাসে শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমাকে নার্সিং হোমে ভরতি হতে হয়, দুরূহ অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তখন শরীর আর মন খুবই ভেঙে পড়েছিল। দু-মাস লেখালিখি পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হয়েছিল। উপন্যাসটা কীভাবে শেষ করব সেই দুশ্চিন্তায় আর শরীরের যন্ত্রণায় রাতের ঘুম উবে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও পাঠকদের পাশে পেয়েছি। আর পেয়েছি একইসঙ্গে বন্ধু এবং 'কিশোর ভারতী'-র সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। সেই কারণেই উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছে এবং বই হয়ে বেরোচ্ছে। এটা যে আমার পক্ষে কী তৃপ্তির আর আনন্দের সেটা বলে বোঝাতে পারব না।

সব শেষে বলি একজনের কথা—আমার স্ত্রী শর্মিলা। একজন মৃতপ্রায় মানুষকে ডানা দিয়ে আগলে প্রতিটি মুহূর্তে যত্ন নিয়ে কীভাবে তিলতিল করে 'বাঁচিয়ে' তুলতে হয় সেটা ও দেখিয়েছে। ওকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনও মানে হয় না। ইতি—

ডিসেম্বর ২০১৩

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০ ০০৯



জিপিসির গেস্টহাউস থেকে নীচে নেমে এল জিশান। তিনজন গার্ডের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে গেল একটা কিউ-মোবাইলের দিকে।

গাড়িতে একজন পাইলট স্টিয়ারিং-এর সামনে বসেছিল। তার পাশে জিশানকে বসিয়ে একজন গার্ড জিশানের বাঁ-পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর বাকি দুজন পিছনে। ওরা সবাই গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ির চারটে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

জিপিসি-র ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরিয়ে কিউ-মোবাইল ছুটে চলল। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের ইলেকট্রনিক প্যানেলের দিকে তাকাল জিশান। ডিজিটাল ঘড়িতে দুটো দশ। তার পাশেই বসানো ছোট টিভির পরদায় রক ব্যান্ডের লাইভ শো দেখানো হচ্ছে।

গন্তব্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়ার পর জিশান বিল্ডিংটাকে চিনতে পারল ঃ সিন্ডিকেট হেডকোয়ার্টার। এত রাতেও বহুতল বিল্ডিংটার নানান ফ্লোরে আলো জ্বলছে। আগেই জিশান শুনেছিল, এখানে প্রায় সব অফিসেই নাইট শিফ্‌টে কাজ হয়।

গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর দিকে এগোল ওরা।

রাতের বাতাস কেটে শিসের শব্দ শুনতে পেল জিশান। মাথা তুলে ওপরে তাকাল।

দুটো শুটার বাঁক নিয়ে ছুটে গেল আকাশে। বোধহয় রাতে ওরা নিউ সিটির আকাশে টহল দেয়। নজরদারির কাজ করে। হয়তো ওই শুটার থেকেই কোনও টহলদার গার্ড জিশানের নাইট সাফারির কথা জানতে পেরেছে—তারপর শ্রীধর পাট্টাকে খবর দিয়েছে।

বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকে পড়তেই শীতাতপ পরিবেশে উষ্ণতা বেশ কয়েক ডিগ্রি নেমে গেল। অথচ গ্রানাইট, কাচ, প্লাস্টিক আর স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি আধুনিকতম সব ঘর আর বারান্দার নকশা। অথচ চারপাশে তাকালে কেমন যেন নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ভাব।

জিশান লক্ষ করল, করিডরে লোক চলাচল দিনের তুলনায় বেশ কম। তবে যে-ক'জন গার্ডকে নজরে পড়ল তারা সকলেই একইরকম স্মার্ট এবং ওদের কোমরে ঝোলানো শকার একইরকম সক্রিয়।

প্রথমে ভার্টিকাল এলিভেটর। তারপর হরাইজন্টাল এলিভেটর। তাতে

ওঠার পর একজন গার্ড ডিজিটাল প্যানেলে কো-অর্ডিনেট পাঞ্চ করল। এক্স-ওয়াই স্থানাঙ্ক পাওয়ামাত্রই মসৃণ এলিভেটর নিঃশব্দে গন্তব্যে ছুটে চলল।

জিশান কোনও কথা বলছিল না। গার্ড তিনজনও চুপচাপ। ঠিক যেন কারও মৃত্যুশোকে নীরবতা পালন চলছে। বোধহয় শোকের ঘটনার আগেই স্মরণসভা শুরু হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত জিশানকে যেখানে নিয়ে আসা হল বেশ বড় মাপের একটা দরজার সামনে। গার্ড তিনজন দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ইশারায় জিশানকে ভেতরে ঢুকতে বলল।

কপালে-যা-থাকে-থাক ভেবে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল জিশান।

একটা বিশাল হলঘর। ঘরের একপ্রান্তে অদ্ভুত জ্যামিতিক চেহারার একটা কনফারেন্স টেবিল। তাকে ঘিরে পাঁচটা চেয়ার।

একটা চেয়ারে বসে আছেন অবশ্যই শ্রীধর পাট্টা। পরনে ধবধবে সাদা পোশাক। সোনালি বোতাম। বুকপকেটের ওপরে জ্বলজ্বলে নীল হলোগ্রাম।

এই রাত আড়াইটের সময়েও মানুষটার শরীর চাবুকের মতো টান-টান, গিরগিটির মতো সজাগ।

জিশানকে দেখামাত্রই উঠে দাঁড়ালেন শ্রীধর। ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'ওয়েলকাম, জিশান—ওয়েলকাম...।'

জিশান মানুষটার দিকে একবার তাকাল শুধু—কোনও কথা বলল না। লোকটার ফরসা মসৃণ মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সাদা মার্বেল পাথরে খোদাই করা এক কুৎসিত ভাস্কর্য।

শ্রীধরের দুপাশের দুটো চেয়ারে বসেছিল দুজন পুরুষ। ডানদিকে যে বসেছিল তার বয়েস পঞ্চাশ-টঞ্চাশ গোছের হবে। তামাটে রং, মাথায় টাক, চোখে চশমা, ভাঙা চোয়াল, থুতনিতে সামান্য দাড়ি।

আর শ্রীধর পাট্টার বাঁ-দিকের লোকটির বয়েস প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। মাঝারি রং, অসম্ভব রোগা, মাথার সাদা চুলগুলো এলোমেলো—দেখে মনে হয় চিরুনির সঙ্গে ওদের বহুকাল দেখা নেই। লম্বা খাড়া নাক, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, নাকের নীচে পাতলা সাদা গোঁফ।

দুজন মানুষকে দুরকম দেখতে হলেও ওদের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পেল জিশান ঃ দুজনের চোখেই ঘুম-ঘুম ভাব।

হঠাৎই হাততালি দিলেন শ্রীধর—পরপর দুবার। হাসলেন। ছড়া কেটে বললেন, 'এসো, জিশান—গুড বয়/করো এদের সঙ্গে পরিচয়।'

হাততালির শব্দেই শ্রীধরের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল জিশান। শ্রীধর টাকমাথা লোকটির দিকে হাতের ইশারা করে বললেন, 'গণপত আচারিয়া। আমাদের সিন্ডিকেটের দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট। গ্রেট ইনভেন্টর। তবে...' এবার বাঁ-

দিকের মানুষটার দিকে ইশারা করে ঃ 'ইনি হলেন আমাদের এক নম্বর সায়েন্টিস্ট। মনসুখ চক্রপাণি। গ্রেট, গ্রেটার, গ্রেটেস্ট ইনভেন্টর। নিউ সিটির বিজ্ঞানদেবতা।

'এই দুজনের কাছে, জিশান, সবরকম কোশ্চেনের আনসার রয়েছে। তাই ডক্টর আচারিয়াকে আমি ''কোশ্চেন'' বলে ডাকি, আর প্রফেসর চক্রপাণির আমি নাম দিয়েছি ''আনসার''। ওঁরা দুজন যদি একজোট হন তা হলে সব কোশ্চেনেরই আনসার পাওয়া যায়। তাই সংক্ষেপে ওঁদের আমি ''কিউ'' আর ''এ'' বলে ডাকি...।'

কয়েক সেকেন্ড থামলেন শ্রীধর। তারপর একটা লম্বা শ্বাস টেনে বললেন, 'যে-ফেনোমেনাল ফাইটারের কথা আপনাদের বলছিলাম ডক্টরস্—এই সেই জিশান পালচৌধুরী...।'

চশমার কাচের পিছন থেকে দু-জোড়া চোখ জিশানকে দেখতে লাগল। সে-চোখে খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা বিস্ময়।

কিউ উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, বললেন, 'হাই, জিশান।'

জিশান ডানহাতটা খানিকটা তুলল শুধু—কোনও কথা বলল না।

এ একবার হাই তুললেন। তারপর বসে-বসেই বললেন, 'নাইস টু মিট য়ু—।'

জিশান আবার হাত তুলল, হাসল। বলল, 'থ্যাংক্স। হাউ ডু য়ু ডু?'

পকেট থেকে একটা ফোন বের করলেন শ্রীধর। চেহারা দেখে জিশানের মনে হল বস্তুটা স্যাটেলাইট ভিডিয়োফোন। সেটা অন করে শ্রীধর চাপা গলায় কথা বললেন। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অপেক্ষার একমিনিটও বোধহয় পুরোপুরি কাটেনি, হলঘরের অন্যপ্রান্তে একটা দরজা খুলে গেল। কয়েকজন লোক ঘরে ঢুকল। সঙ্গে চারজন গার্ড। হাতে শকার—আত্মরক্ষা কিংবা আক্রমণের জন্য তৈরি।

যাদের জিশান 'লোক' বলে ভাবছিল তারা যে প্রায় সকলেই ওর চেনা সেটা ও বুঝতে পারল একটু দেরিতে। কারণ, তাদের চোখ-মুখ নানান জায়গায় ফুলে আছে, কোথাও-কোথাও রক্ত জমাট বেঁধে আছে, কারও-বা ভুরুর কাছে কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

রক্তের দাগ-টাগ থাকা সত্ত্বেও জিশান প্রথমে সেই অফিসারকে চিনতে পারল। কাল রাতে সিকিওরিটি কন্ট্রোল রুমে অল-গ্লাস কিউবিক্লের ভেতরে আর্ক কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে যে বসেছিল। মাথায় তার কাঁচাপাকা চুল। কাল রাতে যে-চেহারাটা জিশানের বেশ লম্বা-চওড়া বলে মনে হয়েছিল এখন আর ততটা লম্বা-চওড়া বলে মনে হল না। শ্রীধর পাট্টার অত্যাচার মানুষটাকে একইসঙ্গে অনেক খাটো, অনেক ভঙ্গুর, আর অনেক নমনীয় করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়জন আনমোল। জিশানের কাল রাতের মেকাপম্যান। ওর ভুরুর কাছে অনেকটা জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। তাই জিশানের ওকে চিনতে একটু বেশি সময় লেগেছে।

আনমোলের চোখে শূন্য দৃষ্টি। স্থিরভাবে ঘরের একটা আলোর ফিক্সচারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তৃতীয়জনকে চিনতে পারার পরই একটা জোরাল ধাক্কা খেল। পান্ডা। ওর ঠোঁটের বাঁ-দিকটা ফুলে আছে। কালচে হয়ে রক্ত জমে আছে। ডানচোখটার অবস্থাও একইরকম। ফুলে উঠে চোখটা প্রায় বুজে গেছে। চোখের ওপরটা আর পাশটা নীল হয়ে আছে।

মুখে এতরকম 'কারুকাজ' থাকা সত্ত্বেও পান্ডাকে জিশানের চিনতে ততটা সময় লাগেনি। কারণ, মানুষটা চঞ্চলভাবে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। জিশানকে লক্ষ করামাত্রই ও জিশানের দিকে অনেকক্ষণ স্থির নজরে তাকিয়ে থেকেছে। তারপর ঠোঁট জোর করে টেনে লম্বা করে সামান্য হাসি ফুটিয়ে তোলারও চেষ্টা করেছে।

আশ্চর্য মানুষ বটে! সামনে খোদ শ্রীধর পাট্টা হাজির—তবুও কোনও ভয়ডর নেই।

ওরা তিনজন ছাড়াও একজন আহত যুবক ওদের সঙ্গে ছিল। জিশান তাকে চিনতে পারল না।

হঠাৎই পান্ডা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

সঙ্গে-সঙ্গে দুজন গার্ড ঝুঁকে পড়ে ওকে ঝটকা মেরে টেনে তুলল। আবার দাঁড় করিয়ে দিল।

পান্ডা দাঁড়িয়ে রইল বটে, কিন্তু ওর দেহটা সামান্য নড়তে লাগল।

অন্য সময় হলে জিশান ভাবত পান্ডা নেশা করেছে। কিন্তু এখন ওর মনে হল, পিস ফোর্সের গার্ডরা পান্ডাকে অসম্ভব মারধোর করেছে। তাই ও ঠিকভাবে দাঁড়াতেও পারছে না।

'জিশান—!' হঠাৎই চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন শ্রীধর পাট্টা।

ডাকটা শোনামাত্রই গার্ডরা কেমন যেন অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে চলে গেল। কিন্তু জিশান শুধু স্লো মোশানে চোখ ফেরাল টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মার্শালের দিকে।

'জিশান, কাল রাতে তুমি ক্যাম্পাস ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলে, তাই না?'

প্রশ্নটা শুনে জিশানের হঠাৎই মনে হল, শ্রীধর এখনও এই প্রশ্নটার সুনিশ্চিত উত্তর পাননি। এই চারজন মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে শ্রীধর যদি এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতেন তা হলে জিশানকে আর এই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতেন না। সুতরাং জিশান বুঝতে পারল ওর উত্তর কী

হওয়া উচিত।

একইসঙ্গে ও ভেবে দেখল, শ্রীধর কতটা খবর পেয়েছেন বা পাননি তার ওপরে ওর উত্তরটা নির্ভর করছে না। ও যদি বলে, হ্যাঁ, ও কাল রাতে জিপিসি ছেড়ে বেরিয়েছিল তা হলে আনমোল, পান্ডাদের ওপরে টরচার আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। বরং উলটো উত্তরটাই সঠিক উত্তব ঃ না, ও ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরোয়নি। শ্রীধরের নলেজ বেসের স্টেটাসের সঙ্গে এই উত্তরটার নড়চড় হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।

জিশান জবাব দিল, 'না, আমি ক্যাম্পাস থেকে বেরোইনি।'

ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে মিহি গলায় হেসে উঠলেন শ্রীধর। তারপর মুখ নামিয়ে তাকালেন জিশানের দিকে। ভুরু উঁচিয়ে ব্যঙ্গের সুরে জিগ্যেস করলেন, 'তাই? বেরোওনি? লক্ষ্মীছেলে হয়ে ছিলে? ঘুমু-ঘুমু করছিলে?'

জিশান চুপ করে রইল। ভাবতে চেষ্টা করল, এরপর শ্রীধর কোন পদক্ষেপ নেবেন।

শ্রীধর পাট্টা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। ঘাড় ঘুরিয়ে জিশানের দিকে একবার দেখলেন, তারপর তাকালেন পান্ডাদের দিকে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, 'এই চারটে লক্ষ্মীছাড়া জানোয়ারও একই কথা বলছে। অথচ এদের একজনের ছবি ই-ল্যান্ডের ক্লোজড সার্কিট টিভির ফুটেজে ধরা পড়েছে। তা ছাড়া কাল রাতে গেস্টহাউস বিল্ডিং-এর চারটে সারভেইল্যান্স জোন কী কারণে যেন সাডেনলি ডি-অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। আপনারা কী বলেন, এ এবং কিউ?' মনসুখ চক্রপাণি আর গণপত আচারিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে শেষ প্রশ্নটা করলেন শ্রীধর পাট্টা।

ওঁরা দুজনে একইসঙ্গে বলে উঠলেন, 'অফ কোর্স গোলমেলে—সাসপিশাস।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন শ্রীধর। পান্ডাদের দিকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। জিশানের দিকে একবার ফিরে তাকালেন। তারপর আবার এগোলেন। একেবারে পান্ডার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবং কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই পান্ডার গালে সপাটে এক থাপ্পড় কষালেন।

বিকট শব্দ হল। পান্ডা ছিটকে পড়ে গেল মার্বেলের মেঝেতে। কিন্তু ওর মুখ থেকে কোনও যন্ত্রণার শব্দ বেরোল না।

শ্রীধরের হাতে বোধহয় রক্ত-টক্ত লেগে গিয়েছিল। তাই সামনে দাঁড়ানো একজন গার্ডের য়ুনিফর্মে হাতটা ঘষে-ঘষে মুছলেন। বললেন, 'এক্ষুনি গিয়ে য়ুনিফর্মটা পালটে নাও—।'

সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন করে গার্ড চলে গেল।

পান্ডা তখনও মেঝেতে পড়ে ছিল। গালে আলতো করে হাত বোলাচ্ছিল।

আর ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে ছিল শ্রীধরের দিকে। শুধু শ্রীধরেরই দিকে।

শ্রীধর সেই ঠান্ডা দৃষ্টি সহ্য করতে পারলেন না। একটা নোংরা গালাগাল দিয়ে বুটের এক লাথি কষিয়ে দিলেন পান্ডার পাঁজরে।

সংঘর্ষের শব্দ হল। পান্ডার শরীরটা ভাঁজ খেয়ে গেল আঘাতে। কিন্তু না—এত সত্ত্বেও ওর মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোল না। কুঁকড়ে যাওয়া শরীরটাকে খানিকটা সোজা করে ও আবার তাকিয়ে রইল শ্রীধরের দিকে।

সেই অভিব্যক্তিহীন ঠান্ডা দৃষ্টির সামনে পড়লে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। জিশান দেখল, শ্রীধর পাট্রা চোখ সরিয়ে নিলেন পান্ডার দিক থেকে।

এই ছোটখাটো দুর্বল মাতাল মানুষটার কী অবিচল নিঃশব্দ প্রতিরোধ! ওর দৃষ্টিতে জিশান যেন একইসঙ্গে দেখতে পেল ঘৃণা আর প্রতিবাদ।

সত্যি, জিশানকে ওরা কীভাবে আগলে রেখেছে! দু-হাতের তালুর আড়ালে নিশ্চিন্তে স্থির হয়ে থাকা জ্বলন্ত প্রদীপের শিখার মতো। হাত দুটো আঘাতে-আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেও তাদের আড়ালে প্রদীপের শিখা অবিচল, অমলিন।

মনে-মনে পান্ডাদের সেলাম জানাল জিশান। মানুষগুলো এত সয়েছে ওর জন্য! এত!

শ্রীধর পকেট থেকে ছোট্ট শিশি বের করলেন। ওপরদিকে মুখ তুলে হাঁ করলেন। তারপর শিশি থেকে তিন ফোঁটা তরল মুখের ভেতর ঢেলে দিলেন।

জোরে-জোরে শ্বাস টানলেন শ্রীধর। জিভের ডগাটা দু-ঠোঁটের ফাঁকে চট করে এপাশ-ওপাশ নাড়লেন। তারপর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নতুন তেজে ফিরে এলেন জিশানের কাছে।

'জিশান, তুমি সত্যি কথা বলছ কি না সেটার জন্যে আমি একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট করব। এই এক্সপেরিমেন্টটা কিউ অ্যান্ড এ-র ডিজাইন। মানে, ওই...' হাত তুলে দুই বিজ্ঞানীর দিকে দেখালেন শ্রীধর ঃ '...আচারিয়া আর চক্রপাণির ইনভেনশান। এই এক্সপেরিমেন্টটার মজা হচ্ছে এতে তোমার কোনও ফিজিক্যাল পেইন হবে না। য়ু ওন্ট বি হার্ট। য়ু উইল রিমেইন ইন গুড হেলথ—অ্যান্ড ইন ওয়ান পিস। কিন্তু...নাঃ, থাক—বলব না। সে তুমি দেখতেই পাবে। এই ''কিন্তু''টাই এক্সপেরিমেন্ট। নাউ গেট রেডি অ্যান্ড বি স্টেডি...।' মোলায়েম হেসে কথা শেষ করলেন শ্রীধর পাট্রা।

তারপরই চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তাকালেন পান্ডাদের দিকে। একজন গার্ডকে ইশারা করে বললেন, 'ওদের নিয়ে যাও—যার-যার ডিউটি করার জন্যে ছেড়ে দাও। আর ওদের ওপর নজরদারি বাড়িয়ে দাও। আমি তোমার বসকে ক্লিয়ারেন্স কোড জানিয়ে দিচ্ছি...।'

পকেট থেকে আবার স্যাটেলাইট ভিডিয়োফোন বের করলেন। অন করে

কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। তারপর গার্ডদের দিকে ইশারা করে মাথা নাড়তেই ওরা পান্ডা, আনমোলদের রুক্ষভাবে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল।

জিশান লক্ষ করল, ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পান্ডা জিশানের চোখে তাকিয়ে রইল।

বিজ্ঞানী দুজন জিশানের কাছাকাছি এগিয়ে এলেন। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কীসব আলোচনা করতে লাগলেন।

শ্রীধর ফোনে আবার কথা বলছিলেন। সংক্ষিপ্ত এবং তীক্ষ্ণ উচ্চারণে কাউকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। নির্দেশ দেওয়া শেষ হওয়ার মিনিট তিন-চারেকেরই মধ্যেই ঘরে ছ'জন গার্ড ব্যস্তভাবে ঢুকে পড়ল। তাদের পিছন-পিছন চারজন লোক—তারা একটা বড়সড় ভারী মেটাল টপ কাঠের টেবিলকে শূন্যে ভাসিয়ে বয়ে নিয়ে আসছে।

টেবিলটা ঘরের একপ্রান্তে মাঝামাঝি রাখা হল। টেবিল থেকে ঘরের তিনটে দেওয়ালেরই দূরত্ব অন্তত দশফুট।

চারজন টেবিল-বাহক ঘর ছেড়ে চলে গেল। ছ'জন গার্ড টেবিলটাকে অর্ধচন্দ্রের ঢঙে ঘিরে দাঁড়াল। কোমর থেকে শকার খুলে তরোয়ালের মতো উঁচিয়ে ধরল।

জিশানের মনে হচ্ছিল, কোনও একটা নাটকের শোয়ের জন্য স্টেজ তৈরি করা হচ্ছে, তার ওপরে প্রপ্‌স সাজানো হচ্ছে। শুধু কুশীলবদের স্টেজে ঢুকে পড়াটাই বাকি।

এ এবং কিউ তখন নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের জটিল কোনও বিষয় নিয়ে হাত-মুখ-চোখ নেড়ে গভীর আলোচনা করছেন। এবং মাঝে-মাঝেই হাই তুলছেন।

শ্রীধর পাট্টা ওঁর বাঁ-হাতের নখ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, 'জিশান, এবার তোমাকে টি-শার্টটা খুলে ফেলতে হবে।'

জিশান চমকে উঠে শ্রীধরের দিকে তাকাল। এ কী বলছেন শ্রীধর? গায়ের জামা খুলে ফেলতে হবে?

শ্রীধর হাসলেন, ছন্দবাণীতে বললেন, 'খোলো, খোলো। এবার তোমার শো হবে সোলো—।'

শ্রীধর যে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন সেটা বোঝা গেল ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে। কারণ জিশানকে লক্ষ্য করে শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় তিনি ডানহাতের দু-আঙুলে টুসকি দেওয়ার চটাচট শব্দ করলেন।

জিশান অবাক চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে পোলো নেক টি-শার্টটা খুলতে শুরু করল।

শ্রীধর এবার বিজ্ঞানী দুজনের দিকে তাকালেন। ভুরু উঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনারা দুজন কি তৈরি?'

'ইয়েস, স্যার।' চটপট জবাব দিলেন চক্রপাণি। আচারিয়ার দিকে তাকালেন। এবং ঘুম তাড়াতে আঙুল দিয়ে দু-চোখ রগড়ে নিলেন।

আচারিয়া সাদা-কালো চেকশার্ট পরেছিলেন। সঙ্গে চকোলেট রঙের ঢোলা ট্রাউজার্স। তারই পকেটে ব্যস্তভাবে হাত ঢোকাতে-ঢোকাতে বললেন, 'হ্যাঁ, স্যার, আমরা তৈরি—।'

জিশানের খারাপ লাগল। বাবার কথা মনে পড়ল। শ্রীধর পাট্টার মতে নিউ সিটির এক নম্বর এবং দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট যথাক্রমে একনম্বর এবং দু-নম্বর চাকরের মতো আচরণ করছে! শিক্ষা-দীক্ষা বিজ্ঞান এঁদের মধ্যে মর্যাদাবোধ তৈরি করতে পারেনি।

গণপত আচারিয়া পকেট থেকে একটা কৌটো বের করে নিলেন। তারপর সেটা উঁচিয়ে ধরে শ্রীধরকে দেখালেন। জিশানও সেটা দেখল।

দুই কি আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের কৌটো। উচ্চতায় ইঞ্চি চারেক হবে। কৌটোর ভেতরে চকচকে অথচ স্বচ্ছ একটা তরল। আলো পড়ে ধাতুর মতো ঝিকমিক করছে। অথচ পারদ নয়—তার তুলনায় ঘনত্ব অনেক কম। কোনও তরলের এরকম রং জিশান আগে কখনও দেখেনি।

ওর টি-শার্ট খোলা হয়ে গিয়েছিল। সেটা মেঝেতে ফেলে দিল। খালি গায়ে দাঁড়িয়ে শীতাতপের প্রভাবে ওর শীত করতে লাগল।

জিশান অপেক্ষা করতে লাগল। শ্রীধরের এর পরের নির্দেশ কী হবে কে জানে! ওর কর্ডের প্যান্টটার ভাগ্যেও কি টি-শার্টের পরিণতি লেখা আছে?

●

সেটা বোঝা গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই।

শ্রীধর পাট্টা জিশানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জিশানের শরীর পরখ করছিলেন। ফরসা, সুঠাম দেহ। বুকের মাঝখানটা সামান্য লোমশ। কিন্তু তার জন্য উদ্ধত পেশিগুলো দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে, এ-দেহ অনেক লড়াই দেবে।

শ্রীধরের মনে-মনে নেওয়া 'পরীক্ষা'য় জিশান বোধহয়ে পাশ করল। কারণ, শ্রীধর ছোট্ট করে সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন এবং হাসলেন।

তারপরই বললেন, 'এবার কর্ডের প্যান্টের পালা। খোলো, জিশান!' বারদুয়েক শ্বাস নিয়ে বিপ্লবের জিগির দেওয়ার ঢঙে বললেন, 'কর্ডের প্যান্ট, দূর হঠো!'

জিশান মনে-মনে নিজেকে বলল, 'ধৈর্য হারালে চলবে না। শান্ত হও। শান্ত থাকো। এখনও ধৈর্য হারানোর সময় আসেনি। ধৈর্য তুমি তখনই হারাবে

যখন প্রতিপক্ষকে অনেক-অনেক লড়াই দিতে পারবে...।'

জিশান মুখের ভাব সংযত রেখে প্যান্টের বোতামে হাত দিল। তখনই লক্ষ করল, চক্রপাণি পকেট থেকে একজোড়া হালকা নীল রঙের গ্লাভ্‌স বের করে নিলেন। স্বচ্ছ। রাবার লেটেক্স-এর তৈরি। জিশানের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে গ্লাভ্‌স পরে নিতে লাগলেন। দুবার হাই তুললেন।

জিশানের ভেতরে হেনস্থার ঘৃণা অসংখ্য বুদ্বুদ হয়ে উথলে উঠতে লাগল। কিন্তু ও চোয়াল শক্ত করে প্যান্টের বোতাম খুলতে লাগল।

শ্রীধর ডানহাত শূন্যে তুলে ম্যাজিশিয়ানদের মতো একটা ইশারা করলেন। বোঝা গেল ইশারাটা টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডদের জন্য। ওদের চারজন পলকে গতিশীল হল। এগিয়ে আসতে লাগল জিশানের দিকে।

বাকি দুজন গার্ড টেবিলের গায়ে লাগানো লুকোনো কোনও বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে চারটে স্টেইনলেস স্টিলের ব্যান্ড টেবিলের মেটাল টপ ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল। ব্যান্ডগুলো দেখতে ওলটানো 'ইউ' অক্ষরের মতো।

জিশান কর্ডের প্যান্টটা খুলে মেঝেতে ছুড়ে দিল। খানিকটা অবাক চোখে টেবিলের চারটে স্টিল ব্যান্ডকে দেখতে লাগল। ওর শরীরের সঙ্গে এই বিশেষ টেবিলটার সম্পর্ক ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

জিশানের জাঙ্গিয়া পরা লম্বা দেহটার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন শ্রীধর। দেখলেন এ এবং কিউ-র দিকে। এ তখন গ্লাভ্‌স পরে তৈরি। তৈরি জিশানকে ঘিরে থাকা চারজন গার্ডও।

শ্রীধর হাসলেন। চাপা গলায় বললেন, 'স্টার্ট অপারেশান—।'

সঙ্গে-সঙ্গে চারজন গার্ড একরকম ছিটকে চলে এল জিশানের কাছে। নিমেষের মধ্যে দুজন ওর হাত চেপে ধরল। আর বাকি দুজন মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়ে ওর পা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল।

জিশান চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। গার্ডদের বাঁধন ছাড়ানোর এতটুকুও চেষ্টা করল না। প্রথমত, ও দেখতে চাইছিল ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। দ্বিতীয়ত, ও গার্ডদের কোমরে ঝোলানো শকারগুলোর কথা ভোলেনি।

দু-হাতের কবজিতে এবং দু-পায়ের গোড়ালির গাঁটের ঠিক ওপরে জিশান গার্ডদের মুঠোর চাপ অনুভব করছিল। ও তাকিয়ে ছিল এ আর কিউ-র দিকে। দেখল, কিউ-র হাতের ঝিকিমিকি তরলের স্বচ্ছ কৌটোটা চালান হয়ে গেল এ-র গ্লাভ্‌স পরা হাতে। এ কৌটোটা শূন্যে উঁচিয়ে ধরে চোখ সরু করে কী যেন পরখ করতে লাগলেন। কৌটোর তরলটা মাঝে-মাঝে নাড়ছিলেন, এবং আপনমনেই বিড়বিড় করে কীসব বলছিলেন।

শ্রীধর পাট্রা কোমরে দু-হাত রেখে ঠোঁটে সামান্য তেরছা হাসি ফুটিয়ে জিশানকে দেখছিলেন। এ-র দিকে নজর ফিরিয়ে মিহি অথচ রুক্ষ গলায় বললেন,

'সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করুন—।'

এ চমকে শ্রীধরের দিকে তাকালেন। শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'করছি, স্যার, করছি—।'

এ কৌটোটা হাতে করে কিউ-কে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন জিশানের ঠিক পিছনে। জিশান ওঁদের আর দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টাও করল না।

কৌটোর ঢাকনা খুললেন এ। কৌটো কাত করে খানিকটা তরল গ্লাভ্‌স পরা হাতে ঢেলে নিলেন। কৌটো আর ঢাকনা কিউ-র হাতে ধরিয়ে দিলেন। তারপর হাতের তরল তেল মাখানোর মতো করে জিশানের পিঠে মেখে দিতে লাগলেন।

জিশান অবাক হলেও চুপ করে রইল। পিঠে মাখিয়ে দেওয়া তেলটা যে বেশ ঠান্ডা সেটা অনুভবে টের পেল।

ঘরে কোনও শব্দ নেই। শুধু জিশানের নগ্ন পিঠে দস্তানা পরা একটা হাতের তেল মাখানোর চাপড়ের শব্দ।

শ্রীধর পাট্টা পাথরের মূর্তির মতো স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন আর কোনও কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

জিশানের ঘাড়, পিঠ, কোমরের পিছনে জাঙ্গিয়ার সীমারেখা পর্যন্ত তেল মাখানো হয়ে গিয়েছিল। তাই এ থামলেন। তাকালেন পাশে দাঁড়ানো কিউ-র দিকে।

ওঁদের মধ্যে নীরবে কী কথা হল। কিউ তরলের কৌটো এবং ঢাকনা এ-র হাতে তুলে দিলেন। তারপর নিজের পকেট থেকে একজোড়া নীলচে গ্লাভ্‌স বের করে হাতে পরে নিলেন। এ-র কাছ থেকে তরল ঢেলে নিলেন হাতে। এবং মেঝেতে উবু হয়ে বসে জিশানের পায়ের পিছনদিকটায় মাখাতে লাগলেন।

তেল মাখানোর সুবিধের জন্য জিশানের পা ধরে থাকা দুজন গার্ড তাদের হাতের বাঁধন সরিয়ে নিল।

জিশানের অস্বস্তি হচ্ছিল। একজন নামি বিজ্ঞানী, সিন্ডিকেটের দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট, ওর পায়ে এভাবে 'তেল' মাখাচ্ছেন। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে হল গণপত আচারিয়া দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট নয়, 'দু-নম্বরি' সায়েন্টিস্ট। সেইজন্যই শ্রীধর পাট্টার পায়ে উনি তেল মাখান—দিন-রাত। জিশানের পা শ্রীধরের চেয়ে এমন কিছু খারাপ নয়! সুতরাং জিশান কেন অস্বস্তি পাবে?

কিন্তু মনে-মনে যতই যুক্তি খাড়া করুক না কেন, জিশান কিছুতেই পুরোপুরি সহজ হতে পারছিল না।

তরল মাখানোর কাজ শেষ হলে কিউ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এ আর কিউ জিশানের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গেলেন। তারপর ওঁরা তাকালেন

শ্রীধর পাট্টার দিকে। যে-দৃষ্টির অর্থ, আমাদের কাজ শেষ।

'থ্যাংক য়ু—' বললেন শ্রীধর এবং আঙুলে তুড়ি মেরে গার্ডদের ইশারা করলেন।

চারজন গার্ডের একজন জিশানের খুব কাছে এসে ছোট্ট করে বলল, 'ওই টেবিলটায় গিয়ে শুয়ে পড়ো...' তারপরই ফিসফিস করে বলল, 'প্লিজ...।'

জিশান চমকে চোখ ফেরাল গার্ডের চোখে। ও কি ভুল শুনছে? লোকটা বলছে, 'প্লিজ...!'

গার্ডের চোখে একচিলতে 'বন্ধু'র ছোঁয়া। তার সঙ্গে সামান্য শ্রদ্ধাও কি টের পাওয়া যাচ্ছে না?

জিশান একইরকম দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। তারপর চটপট পা ফেলে বাধ্য ছেলের মতো বিশাল টেবিলটার ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তখনই ও লক্ষ করল, এ এবং কিউ ঘন-ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

চারজন গার্ড টেবিলের চারদিক থেকে এগিয়ে এল। কী এক কায়দায় চারটে স্টিল ব্যান্ড জিশানের হাতে-পায়ে এঁটে দিল। জিশান লক্ষ করল, ওই চারজন গার্ডও কখন যেন এ এবং কিউ-র মতো হাতে লেটেক্স-এর দস্তানা পরে নিয়েছে।

জিশান বন্দি অবস্থায় ইংরেজি 'এক্স' অক্ষরের মতো চিত হয়ে পড়ে রইল টেবিলে। ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। সিলিং-এর ধপধপে সাদা কারুকাজ দেখতে লাগল। উজ্জ্বল আলোর আধুনিক জরিপ করতে লাগল।

এইসব শৌখিন ঘর আর তার আধুনিক সরঞ্জাম ওল্ড সিটির অভাবী মানুষগুলোর কল্পনার বাইরে। বস্তির ওই ঘরে মিনি ছোট্ট শানুকে নিয়ে কী কষ্টেই না দিন কাটাচ্ছে! মিনিকে ও গত সপ্তাহেই ওর প্রাইজ মানি থেকে চল্লিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছে। সিন্ডিকেট টাকা পাঠানোর সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু...

সঙ্গে-সঙ্গে মনোহর সিং-এর কথা মনে পড়ল। হাসিখুশি সরল লোকটা এই দুনিয়ায় একা ছিল। না কোই আগে, না কোই পিছে/উপর আস্‌মা, ধরতী নীচে। এখানে এসে জিশান, খোকন ওদের সঙ্গে লোকটার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আর হয়ে গেল বলেই জিশানরা এখন মনে-মনে এত কষ্ট পাচ্ছে। ওই গর্তের ভেতরে শেষ নিশ্বাস ফেলার সময় মনোহরেরও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে।

জিশান নানান চিন্তায় বিভোর ছিল। হঠাৎই খেয়াল করল, এ আর কিউ দস্তানা পরা হাতে ওর বুকে তেল মাখাচ্ছেন।

কিন্তু কেন?

এই তেলের কী এমন গুণ? এই তেল কী এমন শাস্তি দিতে পারে? শ্রীধর বলছেন, এই শাস্তিতে কোনও ব্যথা লাগবে না, জিশানের কেটে-ছড়ে যাবে না, 'য়ু উইল রিমেইন ইন গুড হেল্‌থ—অ্যান্ড ইন ওয়ান পিস।' তা

হলে শাস্তিটা হবে কেমন করে?

জিশান অবাক হয়ে এইসব ভাবছিল আর দুই বিজ্ঞানী জিশানের বুকে, হাতে, পায়ে তেল মাখাচ্ছিলেন।

শ্রীধর কৌতুকের চোখে ব্যাপারস্যাপার লক্ষ করছিলেন। দুটো হাত বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে রেখে টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিশানের অবাক ভাবটা বেশ আন্তরিকভাবে উপভোগ করছিলেন।

তেল মাখানো শেষ হয়ে গেল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। তেলের কৌটোটা দস্তানা পরা একজন গার্ডের হাতে ধরা ছিল। সেটা চেয়ে নিলেন আচারিয়া। তারপর তিনি আর চক্রপাণি জিশানের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেন। আচারিয়া শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের কাজ শেষ, স্যার...।'

'গুড। গুড—' বিজ্ঞানী দুজনের দিকে দু-পা এগিয়ে এলেন শ্রীধর। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে আচারিয়ার দিকে নজর ফেরালেন। চোখ নাচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'সিনেমা শুরু হতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

তেলের কৌটো পকেটে রেখে আচারিয়া টাকে আলতো করে হাত বোলালেন। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে বললেন, 'বড়জোর দশ মিনিট...।'

'আর য়ু শিয়োর?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন।

'অফ কোর্স উই আর...।' উত্তরটা দিলেন মনসুখ চক্রপাণি।

শ্রীধর ছোট্ট করে 'হুঁ' শব্দ করলেন। তারপর এদিক-ওদিক পায়চারি করতে শুরু করলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন গভীর কোনও চিন্তায় ডুবে আছেন।

কিউ এবং এ ওঁদের চেয়ারের কাছে ফিরে গেলেন, বসে পড়লেন।

চক্রপাণি চশমাটা চোখ থেকে খুলে ফেললেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার কাচ ঘষে-ঘষে মুছতে লাগলেন। এবং পরপর তিনবার হাই তুললেন।

আচারিয়া চক্রপাণির হাই তোলা দেখছিলেন এবং নিজের হাই ওঠার ঝোঁকটা প্রাণপণে চাপতে চেষ্টা করছিলেন।

হাই তুলতে-তুলতে মিহি জড়ানো গলায় এ কিউ-কে বললেন, 'সাবজেক্টের রিঅ্যাকশানগুলো নোট করে নিন। সলিউশানটার ইমপ্রুভমেন্টে কাজে লাগবে।'

'য়ু আর রাইট।' বলে কিউ জামার বুকপকেট থেকে ছোট নোটবই আর পেন বের করে তৈরি হয়ে বসলেন।

সময় খুব ধীরে-ধীরে কাটছিল। ঘরে কোনও শব্দ নেই। শুধু বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের ধকধক শব্দটা জিশানের কানে ঘড়ির কাঁটার শব্দ বলে মনে হচ্ছিল। গণপত আচারিয়ার 'দশ মিনিট' কথাটা জিশান শুনতে পেয়েছিল। তাই

ও ধৈর্য ধরে সময়ের এক-একটা স্তর ডিঙোতে লাগল।

সাড়ে ন' মিনিটের মতো সময় পেরোতেই শ্রীধর পাড়া জিশানের টেবিলের কাছে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলেন। চিত হয়ে থাকা অসহায় জিশানের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হেসে বললেন, 'সিনেমাটা আমি ভালো করে পুরোটা দেখতে চাই। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিস ইভ্‌ন আ সিঙ্গল মোমেন্ট অফ দ্য শো—।'

জিশান কোনও উত্তর দিল না। শুধু স্থির চোখে শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ জ্বালা করছিল। ক্লান্তিতে হাই উঠতে চাইছিল।

কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটা হঠাৎ করেই শুরু হল।

জিশানের মনে হল, অণু-পরমাণু মাপের সূক্ষ্ম পিঁপড়ে—অসংখ্য পিঁপড়ে —ওকে সূক্ষ্ম কামড়ের হুল ফোটাতে শুরু করেছে। বলতে গেলে হালকা চুলকুনির মতো হয়ে ব্যাপারটা শুরু হল।

প্রথম-প্রথম জিশানের আরাম লাগছিল, কিন্তু দশ-পনেরো সেকেন্ড পার হতেই চিড়বিড়ে চুলকুনি জিশানকে অস্থির করে তুলল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও দাঁতে দাঁত চেপে ওই অদ্ভুত চুলকুনি সহ্য করতে লাগল।

ব্যাপারটা ক্রমেই তীব্রতায় বাড়তে লাগল। মিষ্টি এবং তীব্র চুলকুনি। তাতে কোনও জ্বালা নেই, কোনও যন্ত্রণা নেই। কিন্তু জায়গাটা চুলকোতে না পারার কষ্ট জিশানকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। ওর হাত-পা শক্ত বাঁধনে বাঁধা জেনেও ও হাত-পায়ের বাঁধন ছাড়াতে চাইল। তাতে যা হওয়ার তাই হল। স্টিল ব্যান্ডের সঙ্গে ঘষটানিতে ওর কবজি এবং গোড়ালির গাঁট ছড়ে যেতে লাগল।

শ্রীধর পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জিশানের দশাবিপর্যয় লক্ষ করছিলেন আর মুচকি-মুচকি হাসছিলেন।

জিশানের দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে শূন্যে উঠছিল আর শব্দ করে মসৃণ টেবিলে আছড়ে পড়ছিল। একইসঙ্গে ও মাথা ঝাঁকাচ্ছিল এপাশ-ওপাশ। আর ওর হাতের আঙুলগুলো বারবার বাতাস আঁকড়ে ধরছিল। মনে হচ্ছিল, ও বাতাসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, আপ্রাণ বাঁচতে চেষ্টা করছে।

জিশান পাগলের মতো ছটফট করছিল বটে কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও আর্ত শব্দ করতে চাইছিল না। কারণ, শ্রীধর পাড়ার সামনে এই প্রায়-উলঙ্গ অবস্থায় অসহায়ভাবে চিৎকার করাটা প্রায় প্রাণভিক্ষার কাতর অনুনয়ের মতো শোনাতে পারে। সেটা জিশান কিছুতেই করতে চায় না। তাই ও প্রাণপণে আত্মসম্মান রক্ষার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চাপা গোঙানির মতো একটা শব্দ জিশানের গলার ভেতর থেকে উথলে উঠছিল।

বিছুটিপাতা গায়ে ঘষলে কীরকম চুলকোয় জিশান জানে না। কিন্তু ও

নিশ্চিতভাবে বলতে পারে, এই ঝিকিমিকি তরলের ক্ষমতা বিছুটিপাতার চেয়েও অনেক বেশি। কারণ জিশানের সর্ব অঙ্গে চুলকুনির এমনই ফুলঝুরি ছুটছিল যে, ওর মস্তিষ্ক ঠিক-ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিল না।

তবুও জিশান মিনি আর শানুর কথা ভাবতে লাগল।

শ্রীধর পাট্টা ওকে জিগ্যেস করলেন, 'বাবু জিশান, কাল রাতে তুমি জিপিসির বাইরে বেরিয়েছিলে?'

যে-চিৎকার জিশান এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে চেপে রেখেছিল সেটাই শ্রীধরের প্রশ্নের উত্তর হয়ে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতো ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল ঃ 'না! না! না! না! না!'

শ্রীধর চওড়া হাসলেন ঃ 'তুমি তা হলে কাল রাতে তোমার কোয়ার্টার ছেড়ে বেরোওনি?'

আবার ছিটকে বেরোল সেই লাভাস্রোত ঃ 'না-না-না-না-না!'

জিশান পান্ডার কথা ভাবছিল। ওর সেই অভিব্যক্তিহীন ঠান্ডা দৃষ্টি। যে-দৃষ্টিতে স্থির প্রতিজ্ঞা ঝিলিক মারছিল। অথচ ওর শরীর তখন অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত।

জিশান হিমশীতল চোখে শ্রীধরের দিকে তাকাল। মনে-মনে ভাবল, ও যেন বেরিয়ে এসেছে নিজের দেহের বাইরে। শূন্যে ভেসে বেড়াতে-বেড়াতে ও তাকিয়ে দেখছে নিজের ছটফটানো শরীরের দিকে। দেখছে শ্রীধরের অহঙ্কার। ওঁর ক্ষমতা আর প্রভুত্ব মেশানো বেপরোয়া অভিব্যক্তি।

নিজের অনুভূতির সুইচ অফ করে দিল জিশান। অন্তত অফ করে দিতে চেষ্টা করল। মনে-মনে ভাবল, আর কতক্ষণ এই অমানুষিক অবস্থা চলবে কে জানে!

দূরের টেবিলে বসে গণপত আচারিয়া জিশানের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন আর নোট নিচ্ছিলেন। মাঝে-মাঝে চক্রপাণির সঙ্গে চাপা গলায় কীসব আলোচনা করছিলেন।

চক্রপাণি হঠাৎই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অ্যামেজিং এনডিয়োর‍্যান্স! আর কেউ এতটা সহ্য করতে পারত না...।'

আচারিয়া বললেন, 'তা হলে কি আমাদের কেমিক্যালটা ততটা স্ট্রং হয়নি? কিন্তু আমরা নরম্যাল কোনও মানুষকে যে-অ্যামাউন্টের কেমিক্যাল অ্যাপ্লাই করে রেজাল্ট পাই জিশানকে তার অ্যাপ্রক্সিমেটলি থ্রি টাইম্স অ্যাপ্লাই করেছিলাম। তাতেও তো দেখছি...।'

'এখন এসব ডিসকাশন থাক—' আচারিয়াকে থামিয়ে দিলেন চক্রপাণি। চাপা গলায় বললেন, 'মার্শাল এসব কথা শুনলে প্রবলেম হতে পারে। বরং আমরা এই কনক্লুশানই জানাব যে, জিশান পালচৌধুরী নরম্যাল মানুষ নয়—

ওর এনডিয়োর‌্যান্স ফ্যাক্টর অ্যাবনরম্যালি হাই। জিশান ইজ অ্যান একসেপ্‌শান...।'

চক্রপাণির কথায় সায় দিয়ে আচারিয়া চুপ করে গেলেন। তারপর কবজির ঘড়ির দিকে তাকালেন। ছোট্ট করে বললেন, 'টাইম ইজ আপ—।'

এ-কথা বলার দশ-বারো সেকেন্ডের মধ্যেই জিশানের চুলকুনি কমতে লাগল। ও চোখ বুজে হাঁপাতে লাগল। ওর বুক ওঠা-নামা করতে লাগল। হাপরের শব্দ বেরোতে লাগল মুখ দিয়ে।

শ্রীধর পাট্টার মুখের সূর্যোদয়ের মুচকি হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। তার বদলে সূর্যাস্ত নেমে আসছিল। হিমশীতল ইস্পাতের প্রলেপ ছড়িয়ে পড়ছিল মুখের ওপরে।

হারতে শ্রীধরের ভালো লাগে না। কিন্তু নিতান্তই যদি হারতে হয় তা হলে পরমুহূর্ত থেকেই পরের লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতেও জানেন তিনি।

সুতরাং শ্রীধর চোয়াল শক্ত করলেন। দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডদের দিকে ইশারা করলেন। বললেন জিশানের বাঁধন খুলে দিতে। তারপর ধীরে-ধীরে পা ফেলে আচারিয়া আর চক্রপাণির টেবিলের কাছে ফিরে গেলেন।

স্টিল ব্যান্ডের বাঁধন খুলে যেতেই জিশান টেবিলে উঠে বসল। মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁপাতে লাগল। ওর শরীরে সামান্য জ্বালা-জ্বালা ভাব চিড়বিড় করছিল। ও কবজির ছড়ে যাওয়া জায়গার জ্বালা কমাতে কবজি দুটো কয়েকবার চেপে-চেপে ধরল, হাত বোলাল পায়ের গোড়ালির গাঁটের কাছটায়। হাত বুলিয়ে আর হাত চেপে শুশ্রূষা করতে চাইল। তারপর পাছায় ভর দিয়ে শরীরটাকে নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল। লক্ষ করল, ওর ফরসা শরীর বেশ লালচে হয়ে গেছে।

জিশান শ্রীধরকে দেখছিল। লোকটা বোধহয় স্যাডিস্ট প্রকৃতির। কিন্তু আজ জিশান ওঁকে জেতার তৃপ্তি দেয়নি। লোকটার দিকে তাকিয়ে জিশানের ঘেন্নায় থুতু ফেলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ও তা করল না। বরং ঠোঁটের কোণে একচিলতে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে শ্রীধরকে দেখতে লাগল। যেন বলতে চাইল, 'তুমি কতদূর যেতে চাও? আমি তার চেয়েও বেশি দূর যাওয়ার ক্ষমতা রাখি।'

শ্রীধরের চোখে চোখ রেখে মেঝেতে পড়ে থাকা প্যান্ট আর টি-শার্টের কাছে গেল জিশান। শ্রীধরের দিকে তাকিয়েই ধীরে-ধীরে পোশাক পরে নিল। তারপর শ্রীধরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঠোঁটে সেই হাসির ছোঁয়া।

শ্রীধরের জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো জিশানের হাসি দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত, জিশানকে চড়-থাপ্পড় মেরে হেনস্থা করে প্রতিশোধ নিত। কিন্তু শ্রীধর আশ্চর্য ধাতুতে গড়া।

জিশানের কাছে এগিয়ে এসে ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন। ওর সঙ্গে

হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'থ্যাংক য়ু ফর ইয়োর নাইস কোঅপারেশান। য়ু মে লিভ নাউ—।'

জিশান ঠোঁটের হাসিটা আরও একটু ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'য়ু আর ওয়েলকাম...।'

শ্রীধর দুজন গার্ডকে ইশারা করলেন। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে জিশানের দুপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা জিশানকে এসকর্ট করে জিপিসি-র কোয়ার্টারে পৌঁছে দেবে।

এতক্ষণ পর ঘুমের টান আর ক্লান্তিতে জিশান একটা হাই তুলল।

●

সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলিং কাজটা বড় সহজ নয়। কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে ট্রাই-ডাইম হলোগ্রাম ইমেজগুলো দেখতে-দেখতে এই কথাটাই বারবার রঙ্গপ্রকাশের মনে হচ্ছিল।

নিউ সিটিতে জিশান পাল চৌধুরী আসার পর থেকে ওর যত ভিডিয়ো ফটো আর হলোগ্রাম ইমেজ তোলা হয়েছে তার সবটাই একটা ট্রাই-ডাইম মাইক্রোসিডি-তে রাইট করে সুপারগেম্স্ কর্পোরেশন রঙ্গপ্রকাশকে দিয়েছে। রঙ্গ প্রকাশের কাজ হল সেই ভিডিয়ো খুঁটিয়ে দেখে জিশান পাল চৌধুরীর একটা সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করা।

ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস নিউ সিটির বিখ্যাত সাইকোঅ্যানালিস্ট। নিউ সিটির 'সাইকোঅ্যানালিসিস সেন্টার'-এর চিফ সাইকোলজিস্ট। নিউ সিটির সিস্টেমের বিরুদ্ধে যারা সরাসরি কিংবা আড়ালে আওয়াজ তোলে তাদের সাইকোপ্রোব করাটা রঙ্গপ্রকাশের প্রধান কাজের তালিকার মধ্যে পড়ে। সিন্ডিকেটের 'ক্রাইম কন্ট্রোল' ডিভিশন প্রায়ই রঙ্গপ্রকাশের সাহায্য চায়। এবং রঙ্গপ্রকাশ সাহায্য করেও থাকেন।

গত দু-সপ্তাহ ধরে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলিং-এর কাজে ব্যস্ত তিনি। কম্পিউটারের পরদায় ওর ছবি বারবার দেখছেন। দেখছেন টু-ডাইমেনশন্যাল এবং হলোগ্রাম ভিডিয়ো ইমেজ। ভিডিয়ো ক্লিপগুলো কখনও 'নরম্যাল' স্পিডে দেখছেন, কখন আবার 'স্লো' কিংবা 'ভেরি স্লো' মোডে দেখছেন। ইচ্ছেমতো কোনও ফ্রেমকে 'ক্লোজ-আপ' মোডে দেখছেন কিংবা বেশ কয়েক গুণ ম্যাগনিফাই করে জিশানের চোখের কোণের ভাঁজ অথবা রোমকূপ পর্যন্ত পরখ করে নিচ্ছেন। আর সেই ভিডিয়োর মিছিল থেকে দরকার মতো ছবি ক্লিপ করে নতুন-নতুন ফাইলে স্টোর করে নিচ্ছেন।

তারপর সেই ফাইলের ছবি ও কথা আবার স্টাডি করছেন এবং কখনও-

কখনও প্রিন্ট-আউট বের করছেন।

এইসব তথ্যের সঙ্গে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেচনা কাজে লাগিয়ে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলের রিপোর্ট তৈরি করছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। রিপোর্ট শেষ হলেই সেটা 'কনফিডেনশিয়াল' খামে ভরে তুলে দিতে হবে শ্রীধর পাট্টার হাতে। ওটা কিল গেমের প্রোমোশনাল ভিডিয়ো ট্রেলার-এ ব্যবহার করা হবে। কিংবা হয়তো আরও কোনও কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে—সেটা একমাত্র শ্রীধর পাট্টাই ভালো করে জানেন।

ক্লান্তিতে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল রঙ্গপ্রকাশের। অথচ দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছিল না। দুশ্চিন্তার পেন্ডুলামটা মাথার ভেতরে দুলছিল। আর শব্দ হচ্ছিল, 'ঢং-ঢং।' সেই শব্দ রঙ্গপ্রকাশ ছাড়া আর কেউ শুনতে পাচ্ছিল না।

দুশ্চিন্তার কারণটা এখনও স্ত্রীকে খুলে বলেননি। আর ছেলে সিমানকে বলার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না! যেহেতু আজ, এই মুহূর্তে, যে-সংকটের মুখোমুখি রঙ্গপ্রকাশ দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার উৎসে রয়েছে সিমান।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। দু-চোখ বুজে মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিলেন। একটা বড় শ্বাস ছাড়লেন ঃ 'আ-আ-আঃ!'

ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস নিউ সিটির কদরদান বিজ্ঞানী। ডক্টর মনসুখ চক্রপাণি আর ডক্টর গণপত আচারিয়া তাঁদের আবিষ্কার এবং গবেষণার জন্য শ্রীধর পাট্টার খুব প্রিয় ঠিকই, কিন্তু ডক্টর বিশ্বাসও শ্রীধরের কাছে কম প্রয়োজনীয় নয়। তার কারণ, রঙ্গপ্রকাশের কাজের ধরনটা একটু অন্যরকম।

চক্রপাণি এবং আচারিয়া যেসব গবেষণা করেন বা আবিষ্কার করেন তার দরকার বাইরের পার্থিব জগতের জন্য। সেগুলো চোখে দেখা যায়। তার ফল পাওয়া যায় হাতেনাতে—অন্তত এখন না হলেও ভবিষ্যতে। তাই ব্যাপারটা প্রচারের আলোয় চলে আসে চটপট।

রঙ্গপ্রকাশের কাজ অন্তঃসলিলা। মানুষের মন নিয়ে ওঁর কাজ। বেশিরভাগ সময়েই ওঁকে কোনও মানুষের ফটোগ্রাফ দেখে কিংবা ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে তার মানসিক গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিতে হয়। সেইসব মতামত থেকে শ্রীধর পাট্টা, সিন্ডিকেট, কিংবা সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন অতীতে বহুবার লাভবান হয়েছে। কিন্তু তাতে বাইরে কোনও হইচই হয়নি। শুধু শ্রীধর পাট্টা বা সিন্ডিকেট রঙ্গপ্রকাশকে বাহবা দিয়েছে। তার সঙ্গে আর্থিক পুরস্কারও জুটে গেছে কপালে। কিন্তু প্রচারের আলোর বৃত্তে ঢুকতে পারেননি। কারণ, ওঁর কাজের ধরনটাই গোপন—একান্ত গোপন।

এসব ছাড়া রঙ্গপ্রকাশ নিয়মিতভাবে আরও একটা দায়িত্ব পালন করেন ঃ তিনি শ্রীধর পাট্টার পার্সোনাল থেরাপিস্ট। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে তিনি কোনও পেশেন্টের সঙ্গে সরাসরি ইন্টারঅ্যাক্ট করে সাইকিয়াট্রিস্টের প্রথাগত ভূমিকা

নেন। এবং এই কাজটা করেন অত্যন্ত গোপনে। ডাক্তার এবং পেশেন্ট ছাড়া আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি এই নিয়মিত থেরাপির কথা জানে না। আর-কেউ যে জানবে না, সেটাই শ্রীধরের নির্দেশ—সুতরাং সেটাই 'আলটিমেট কোড অফ কনডাক্ট'।

রঙ্গপ্রকাশের এই বিশেষ দায়িত্বটা বলতে গেলে একধরনের গোপন সম্মান। শ্রীধরের মনের অলিগলির খোঁজখবর শ্রীধরের চেয়ে অনেক বেশি জানেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধর পাট্রাকে তিনি ভেতর-বাইরে দেখতে পান। আর দেখতে পান বলেই ওঁকে ভয় পান। অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি ভয় পান।

কিন্তু এখন সিমানের তৈরি করা দুশ্চিন্তা ওঁকে শ্রীধরের ভয় ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন বলতে গেলে সিমানই ঠিক করে দেবে ওঁদের আগামীদিনের জীবন কীরকম হবে।

অদ্ভুত এক বেদনায় রঙ্গপ্রকাশের চোখে জল এসে গেল। চোখ বুজে থাকা অবস্থাতেই কষ্টটা অনুভব করতে লাগলেন। মনের জোরে সেটাকে কমাতে চাইলেন। একটু পরে ভিজে চোখ খুলে সামনের খোলা জানলার দিকে তাকালেন।

জানলায় ফোটোক্রোমিক ন্যানোপলিমার প্লেট লাগানো। কিন্তু জানলার দিকে তাকিয়ে সেটার অস্তিত্ব বোঝার কোনও উপায় নেই। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই প্রকৃতিকে ছোঁয়া যাবে। অথচ বাইরের সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা জীবাণু জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে আসতে পারবে না। অর্থাৎ, রঙ্গপ্রকাশ ও তাঁর পরিবার সুরক্ষিত।

কিন্তু সত্যিই কি সুরক্ষিত?

খোলা জানলায় অতিস্বচ্ছ ন্যানোপলিমার প্লেট অদৃশ্য মায়া তৈরি করেছে। সেই মায়ার ঘেরাটোপে বসে নিজেকে সুরক্ষিত ভাবছেন রঙ্গপ্রকাশ।

বাড়িতে এখন কেউ নেই। স্ত্রী পর্ণমালা মিটিং-এ গেছে। নিউ সিটির ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কাউন্সিলের ও সেক্রেটারি। আজ নতুন একটা ইমপোর্ট পলিসি নিয়ে সাংঘাতিক জরুরি একটা মিটিং আছে। মিটিং শেষ হতে সময় লাগবে।

ছেলে সিমানও বাড়িতে নেই এখন। রোজ বিকেলে যেমন বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেরোয় তেমনই বেরিয়েছে। রাত বারোটার আগে ও ফিরবে না। আঠেরো বছর বয়েসেই সিমান জীবনের 'আসল' মানে জেনে গেছে ঃ জীবন মানে ফুর্তি আর বাজি। অর্থাৎ, ই-ল্যান্ডে গিয়ে ফুর্তি করো, আর বিভিন্ন গেমে বেপরোয়া বাজি ধরো।

ওরা কেউ বাড়িতে নেই। তাই রঙ্গপ্রকাশ প্রাণ খুলে কাঁদতে পারছিলেন।

নিউ সিটির বৈভবের জীবনটা ধীরে-ধীরে এরকম ফাঁপা হয়ে যাক তিনি কখনও চাননি। অথচ...।

রঙ্গপ্রকাশের কম্পিউটার-রুমটা মাপে বিশাল।

তিরিশ বাই কুড়ি মাপের ঘরটা আধুনিক পেশাদার অফিসের মতো করে সাজানো। ঘরে পাশাপাশি তিনটে টেবিলে তিনটে প্লাজ্মা কম্পিউটার। তিনটে মেশিনই রঙ্গপ্রকাশ একা ব্যবহার করেন। এ ছাড়া রয়েছে একটা বড় অফিস-টেব্‌ল। তাতে নানান কাগজপত্র, ট্রাই-ডাইম মাইক্রোসিডি, পেন, বই, মোবাইল ফোন এলোমেলোভাবে ছড়ানো। এই ছন্নছাড়া টেবিলটা দেখে বোঝা যায় যে, রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস বিজ্ঞানী। যদিও পর্ণমালা এবং সিমানের ধারণা, সাইকিয়াট্রিস্টকে ঠিক বিজ্ঞানী বলা যায় না।

ওদের কথা শুনে রঙ্গপ্রকাশ মনে-মনে হাসেন। ওঁর মনে পড়ে যায় কয়েকশো বছর আগের একজন বিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কথা। যাঁর হাতে মনোবিজ্ঞান সঠিক চেহারা পেয়েছিল, একটা দিশা খুঁজে পেয়েছিল। ফ্রয়েড বলেছিলেন, 'অনেকেরই ধারণা সাইকোলজি বিষয়টা তাঁরা বেশ ভালোই বোঝেন—কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই একটা করে মনের মালিক।'

রঙ্গপ্রকাশ জানেন, মনের ওপর মালিকানা থাকলেই তাকে বোঝা যায় এমনটা কখনওই নয়। তাই যদি হত তা হলে শ্রীধর পাত্রা মোটেই রঙ্গপ্রকাশের কাছে নিয়মিত 'সিটিং' দিতেন না।

চোখের জল মুছে রঙ্গপ্রকাশ ঘরটাকে জরিপ করতে শুরু করলেন। ভাবতে চাইলেন, তিনি যেন এক অচেনা আগন্তুক—হঠাৎ করে এই ঘরটায় এসে পড়েছেন এবং অপরিচিতের চোখে ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখছেন।

ঘরের সব ফার্নিচারই সেমি-ট্রান্সপারেন্ট—গ্লাস পার্টিক্‌ল ইম্‌প্রেগনেটেড পলিমারের তৈরি। ফলে বাইরে থেকে আসা বিকেলের আলো আর ঘরের সাদা আলো মিলেমিশে ঢুকে পড়ছে ফার্নিচারের অন্দরমহলের আনাচেকানাচে। ছোট-বড় নানান মাপের আলোর টুকরো দিয়ে এক রহস্যময় নকশা তৈরি করেছে।

ঘরে পাশাপাশি দাঁড় করানো চারটে সুদৃশ্য বুককেস। তাতে সাইকোলজির প্রচুর বই আর মাইক্রোসিডির বাক্স ঠাসা। ডানদিকের দেওয়ালে ফোটো-অ্যাকটিভেটেড একটা জায়ান্ট সাইজের প্লেট টিভি। টিভির মুখোমুখি আর-এক দেওয়াল ঘেঁষে একটা সুন্দর ছাঁদের লম্বা সোফা। তার গদি-বালিশ সবই স্বচ্ছ পলিমারের আবরণে বন্দি রঙিন বাতাস দিয়ে তৈরি। ওই আবরণের ভেতরে বিভিন্ন রঙের স্রোত অত্যন্ত ধীরে খুশিমতো ভেসে বেড়াচ্ছে। রঙ্গপ্রকাশ জানেন, ইমপোর্টেড এই জিনিসগুলোতে ডায়ানামিক ডেনসিটি গ্র্যাডিয়েন্ট আর স্ট্যাটিক চার্জ টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘরের ভেতরে একটা হালকা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। বিজ্ঞানীর মুড ঠিক করার জন্য এই রুম ফ্রেশনারের ব্যবস্থা। এ ছাড়া খুব নীচু গ্রামে হালকা মিউজিক বাজছিল। ভালো করে খেয়াল করলে তবেই সেই মিউজিকের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীর ক্রিয়েটিভিটিকে উসকে দেওয়ার এই ব্যবস্থা রঙ্গ

প্রকাশের খুব পজিটিভ বলে মনে হয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে সবই কেমন নেগেটিভ লাগছিল।

জানলার বাইরে তাকিয়ে, রঙ্গপ্রকাশ দেখছিলেন লতানে গাছ। গাছে ছোট-ছোট বর্ণালি ফুল। দূরে, রাস্তার ওপারে, সুন্দর ছোট-বড় বাড়ি। সব বাড়িরই চেহারায় আকর্ষণীয় জ্যামিতি। শুধু চোখে দেখেই বোঝা যায়, নিউ সিটির আর্কিটেক্চার কত আধুনিক।

আধুনিক এই শহর ছেড়ে যেতে চান না তিনি। কিন্তু হয়তো যেতে হবে। কারণ, আজ সকালেই ইন্টারঅ্যাকটিভ প্লেট টিভিতে সিন্ডিকেটের ওয়ার্নিং পেয়েছেন।

এই ওয়ার্নিং-এর পিছনে কে আছে তিনি জানেন—শ্রীধর পাত্রা। কিন্তু শ্রীধরকে ঠিক দায়ী করা যায় না। কারণ, নিউ সিটির বরাবরের নিয়ম এটাই। ই-আই—মানে, ইকনমিক ইনডেক্সই এখানে প্রথম—এবং শেষ কথা।

ওয়ার্নিং-টা যে আসতে চলেছে মাসখানেক আগে থেকেই সেটা অনুমান করতে পেরেছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। এবং আজ সকালে সেটা এসে গেছে।

ওয়ার্নিং-টার কথা পর্ণমালাকে এখনও বলেননি। সিমানকেও নয়।

এই ওয়ার্নিং পাওয়ার পর সিন্ডিকেট মাত্র তিনমাস সময় দেয়। সেই তিনমাসে ই-আই-টাকে 'ক্রিটিক্যাল ভ্যালু'র ওপরে নিয়ে আসতে হয়। যদি সেটা সম্ভব না হয়, তা হলে 'বাই-বাই নিউ সিটি'।

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। এত বছর ধরে নিউ সিটির মনোরম বিলাসী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে তারপর হঠাৎ করে এক্সপাল্শান! ত্যাজ্যপুত্রের মতো রঙ্গপ্রকাশরা হয়ে যাবেন 'ত্যাজ্য-নাগরিক'। ওঁদের গিয়ে থাকতে হবে ওই জঘন্য ক্লেদাক্ত হিংস্র ওল্ড সিটিতে!

টিভিতে ওল্ড সিটির চেহারা দেখে আর নানান খবর দেখে শিউরে ওঠেন রঙ্গপ্রকাশ। আইন-শৃঙ্খলার কোনও বালাই নেই—

সর্বত্র 'ফ্রি ফর অল'। সেখানে রঙ্গপ্রকাশরা বাঁচবেন কেমন করে!

হিংস্রতা অবশ্য নিউ সিটিতেও আছে—'শৃঙ্খলাবদ্ধ' হিংস্রতা। অভিনব সব মরণখেলা। সেগুলোকে ব্যবহার করে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকার ব্যাবসা। এইসব 'খেলা'-র লাইভ টেলিকাস্ট রাইট গোটা পৃথিবী জুড়ে বিক্রি করে সিন্ডিকেট। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেটিং আর বিজ্ঞাপনের রমরমা বাজার।

না, এই 'শৃঙ্খলাবদ্ধ' হিংস্রতাও রঙ্গপ্রকাশ পছন্দ করেন না। একটুও না। শুধুমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার সবরকম আধুনিক সুযোগ এখানে আছে বলে তিনি এখনও নিউ সিটি ছেড়ে যাননি।

তা ছাড়া যাবেনই বা কোথায়? ওই ওল্ড সিটিতে? যেখানে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ আক্রান্ত?

'আর এখানে যে মনুষ্যত্ব আক্রান্ত!' রঙ্গপ্রকাশের বুকের নিউক্লিয়াস থেকে চিৎকার করে কে যেন বলে উঠল। বুকের ভেতরের ওই অজানা-অচেনা লোকটা প্রায়ই এরকম পাগলের মতো চিৎকার করে। সে-চিৎকার রঙ্গপ্রকাশ শুধু একা শুনতে পান। পর্ণমালা বা সিমান শুনতে পায় না।

কিন্তু এখন? এখন তো ওয়ার্নিং এসে গেছে। তিনটে মাস রঙ্গপ্রকাশকে প্রাণপণে লড়তে হবে। ই-আই-কে আপগ্রেড করতে হবে—'ক্রিটিক্যাল ভ্যালু'র ওপরে যেতে হবে।

না, এখন পর্ণমালাকে ব্যাপারটা জানাবেন না। জানালে হয়তো পর্ণমালা পাগল হয়ে যাবে। সিমানের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তার চেয়ে বরং আরও সাত-দশদিন যাক—তারপর...।

হঠাৎই মাথা ঝাঁকিয়ে দুশ্চিন্তার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কম্পিউটারের টাচ-স্ক্রিনে আঙুল ছুঁইয়ে মেশিন শাট-ডাউন করে দিলেন।

হালকা ব্যায়ামের ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়াচাড়া দিলেন রঙ্গপ্রকাশ। কপালে হাত বোলালেন কয়েকবার। আবার মাথা ঝাঁকালেন এপাশ-ওপাশ।

যন্ত্রণা। যন্ত্রণা। জ্বালা। জ্বালা।

ঘরের মধ্যে এলোমেলো হাঁটতে লাগলেন।

আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

হিরের মতো ঝকঝকে আয়নায় এ কাকে দেখছেন! ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস? নিউ সিটিতে যিনি অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির 'দেবতা'!

ছোট-ছোট করে ছাটা কাঁচাপাকা চুল। ভাঙা গাল। কপালে বলিরেখা। চশমার পলিমার লেন্সের পিছনে নিষ্প্রভ দুটি চোখ। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

সব মিলিয়ে হতাশায় উদভ্রান্ত একজন মানুষ।

অথচ গতকালই ওঁর গাল দুটো এতটা ভাঙা মনে হয়নি। কপালে বলিরেখার সংখ্যা আরও কম ছিল। চোখের মণি ছিল উজ্জ্বল। সেখান থেকে আত্মবিশ্বাসের জ্যোতি বেরোচ্ছিল।

কী করবেন এখন? কী করা উচিত?

প্রশ্ন দুটোর উত্তর ভেবে ওঠার আগেই টেবিলে পড়ে থাকা মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল বুকের ভেতরে।

শ্রীধর পাট্টা। একমাত্র শ্রীধর ফোন করলেই রঙ্গপ্রকাশের ফোন এই বিশেষ সুরে বেজে ওঠে। এই মিউজিকটা তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য প্রজাপতির ডানা নাড়ার শব্দ দিয়ে। শব্দগুলোকে একহাজার গুণ অ্যামপ্লিফাই করে একটার সঙ্গে আর-একটা মিশিয়ে ডিজিটাল প্রসেসিং করে ফিলটার করে তৈরি হয়েছে এই

কপিরাইট রিং টোন। নিউ সিটির হাতে গোনা কয়েকজন শৌখিন মানুষ এই রিং টোন ব্যবহার করে। তার মধ্যে রঙ্গপ্রকাশ একজন।

অফিস-টেব্‌লের কাছে এগিয়ে গেলেন। মোবাইল ফোন হাতে তুলে নিলেন। বুকের ভেতরে একটা গুমগুম শব্দ শুরু হয়ে গেল।

'হ্যালো—।'

'মার্শাল স্পিকিং—।'

'ইয়েস, স্যার।' গলার স্বরটা যাতে কেঁপে না যায় তার জন্য বেশ সতর্ক হয়ে কথাগুলো বললেন।

'ডক্টর বিশ্বাস, আই নিড য়ু। ইমার্জেন্সি। আপনি একবার আমার বাড়িতে চলে আসুন। আজ বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমার সিকিওরিটি কোড হল ফোর ওয়ান জিরো জিরো টু এ-সি-এক্স। আজ সিটিং-এর পর জরুরি কথা আছে। জিশান পাল চৌধুরীর প্রোফাইল নিয়ে আর আপনার ই-আই নিয়ে।' একটু থামলেন শ্রীধর। তারপর ঃ 'আপনাকে ক'টা নাগাদ আমি এক্সপেক্ট করব, ডক্টর?'

কানে ফোন ধরে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন রঙ্গপ্রকাশ। সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখান থেকে শ্রীধরের বাড়ি একঘণ্টার ড্রাইভ। আর সিকিওরিটির ঝামেলা পেরোতে আরও দশমিনিট। সুতরাং...।

'আমি পৌনে সাতটার মধ্যে রিচ করে যাব, স্যার।'

'ও.কে. দেন। সামনে এলে কথা হবে।'

ফোন কেটে গেল।

শ্রীধরের দেওয়া সিকিওরিটি কোডটা শোনামাত্রই মনে গেঁথে নিয়েছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। এখন সেটা মোবাইলে স্টোর করে নিলেন।

শ্রীধরের রেসিডেনশিয়াল কমপ্লেক্সে ঢোকার জন্য আজ বিকেলে পাঁচ ঘণ্টার জন্য এই সিকিওরিটি কোডটা অ্যাকটিভেট করা আছে। শ্রীধর নিজের সুবিধেমতো এই কোডটা পালটে দেন। ওঁর বাড়ির কমপ্লেক্সের মেইন গেটে ভিজিটরের জন্য সিকিওরিটি কোড প্যানেল রয়েছে। ওই প্যানেলে সংখ্যা এবং ইংরেজি হরফের বোতাম রয়েছে। সিকিওরিটি কোড জানা থাকলে তবেই সঠিক বোতাম টিপে কমপ্লেক্সের মেইন গেট পেরোনো সম্ভব। তারপর রয়েছে সিকিওরিটি চেকের আরও দুটো স্তর। প্রথম স্তরে চারজন আর্মড গার্ড অতিথিকে সার্চ করে। সার্চ করে তারা সন্তুষ্ট হলে তবেই অতিথি যেতে পারবেন দ্বিতীয় স্তরে। সেখানে কোনও মানুষ নেই। একটা অদ্ভুত চেহারার গেটের মধ্যে দিয়ে অতিথিকে হেঁটে যেতে হয়। হেঁটে যাওয়ার সময় একটা সফ্‌ট এক্স রে স্ক্যানার অ্যাকটিভেটেড হয়। স্ক্যানারের আউটপুট কম্পিউটারে প্রসেস করে ডিজিটাল উত্তর বেরোযঃ 'হ্যাঁ', অথবা 'না'। তার ওপর নির্ভর করে অতিথির চোখের

সামনে ডিজিটাল প্যানেলে সবুজ রঙে ফুটে ওঠে ঃ 'প্লিজ এন্টার।' অথবা, উজ্জ্বল লাল আলোয় ফুটে ওঠে ঃ 'ফর ইয়োর সেফটি, ডু নট এন্টার।'

এই নির্দেশ পালন না করলে অতিথির বিপদ। সিকিওরিটি ইউনিট রুমে অ্যালার্ম বেজে উঠবে আর তার ঠিক এক মিনিট পর হাই এনার্জি পার্টিক্‌ল রেডিয়েশান অতিথিকে ঝাঁঝরা করে দেবে।

অর্থাৎ শ্রীধর পাট্রা না চাইলে ওঁর সঙ্গে কারও দেখা করার উপায় নেই।

মোবাইল ফোন পকেটে রেখে দেওয়ার পরেও বেশ কয়েক মিনিট ধরে নিজের বুকের ধুকপুকুনি শুনতে পেলেন রঙ্গপ্রকাশ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু একটা ভাবতে চাইছিলেন কিন্তু কিছুতেই ভাবনার পরম্পরা সঠিকভাবে সাজাতে পারছিলেন না।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিলেন। একটা লম্বা শ্বাস ফেলে কম্পিউটারের কাছে এগিয়ে গেলেন। টেবিল থেকে একটা গোলাপি প্লাস্টিক ফোল্ডার তুলে নিয়ে জিশানের কয়েকটা কালার প্রিন্ট-আউট তার মধ্যে ভরে নিলেন। প্রিন্টারের পাশে এলোমেলোভাবে খসড়া রিপোর্টের কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়ে ছিল। সেগুলোও ফোল্ডারে ঢুকিয়ে নিলেন। শ্রীধরের সঙ্গে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল নিয়ে আলোচনার সময় এই ফটো আর রিপোর্টের পাতাগুলো কাজে লাগতে পারে।

ফোল্ডারটা হাতে নিয়ে কম্পিউটার-রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর মিনি অটোমেটিক এলিভেটরে চড়ে নীচে নেমে এলেন। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সদর দরজাটা সফ্‌টওয়্যার লক করে দিলেন। পর্ণমালা আর সিমান দুজনেই আনলক করার কোডটা জানে। তাই বাড়িতে খুশিমতো ঢুকতে ওদের কোনও অসুবিধে হবে না।

বাইরের লনের পাশে রঙ্গপ্রকাশের জি-মোবাইল দাঁড়িয়ে ছিল। নিউ সিটিতে সিভিলিয়ানরা বেশিরভাগই এই লাল রঙের জি-মোবাইল ব্যবহার করে। এই গাড়ির যারা মালিক তাদের সিটিজেন কোড নম্বরই হল গাড়ির নম্বর। তবে তার সঙ্গে একটা ইংরেজি 'সি' হরফ যোগ করা আছে।

পকেট থেকে সিটিজেন্'স আই-ডি স্মার্ট কার্ড বের করলেন। গাড়ির কাছে গিয়ে দরজার স্লটে কার্ডটা ঢুকিয়ে সোয়াইপ করলেন।

গাড়ির দরজা খুলে গেল।

ড্রাইভিং সিটে বসলেন রঙ্গপ্রকাশ। সুইচ অন করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ড্যাশবোর্ডের ব্যাক-লাইটেড এল-সি-ডি প্যানেলে নিউ সিটির ম্যাপ ফুটে উঠল। অ্যাকটিভেটেড হয়ে গেল 'সারফেস নেভিগেটর' সফ্‌টওয়্যার।

ম্যাপে নিজের বাড়ির লোকেশানে আঙুল ছোঁয়ালেন। তারপর শ্রীধর পাট্রার বাড়ির জায়গায় তর্জনি রাখলেন। মানচিত্রে দুটো নীল রঙের বিন্দু দপদপ

করতে লাগল—সোর্স আর ডেস্টিনেশান। তখন মুখে বললেন, 'শর্টেস্ট রুট'। অডিয়ো অ্যাকটিভেটেড সিস্টেম চোখের পলকে রঙিন মানচিত্রের ওপরে একটা লাল রঙের রেখা এঁকে দুটো নীল বিন্দুকে জুড়ে দিল।

গাড়ি স্টার্ট করতেই অটোমেটিক নেভিগেটর গাড়ি চালানোর দায়িত্ব নিয়ে নিল। রঙ্গপ্রকাশ অলসভাবে বসে গাড়ির জানলা দিয়ে ওঁর পছন্দের শহরটাকে দেখতে লাগলেন।

ওঁর বুকের শব্দটা এখন আগের চেয়ে অনেক কমে এসেছে।

●

গাড়ি যে নিউ সিটির রাস্তা ধরে ঘণ্টায় সত্তর কিলোমিটার বেগে ছুটছিল সেটা রঙ্গপ্রকাশ বুঝতে পারছিলেন না। কারণ, তিনি চোখ বুজেছিলেন।

গাড়ির স্বয়ংক্রিয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রঙ্গপ্রকাশের 'কমফোর্ট কোশেন্ট' অনুযায়ী নির্ভুলভাবে কাজ করছিল। রঙ্গপ্রকাশের শরীর প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে সেই শীতল আরামটুকু ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিচ্ছিল। পিছনদিকে ছুটে চলে যাওয়া রাজপথ, মেটাল ফ্লাইওভার, হাইরাইজ স্ট্রাকচার, আধুনিক বাড়ি-ঘর—কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। আর 'জিরো গ্র্যাডিয়েন্ট' রাস্তার মসৃণ গঠন ওঁকে কোনও সূক্ষ্ম ঝাঁকুনিও টের পেতে দিচ্ছিল না। অবশ্য এর পিছনে জি-মোবাইল-এর আধুনিক প্রযুক্তিরও অবদান ছিল।

রঙ্গপ্রকাশ ধীরে-ধীরে শান্ত হচ্ছিলেন। বুকের বাড়তি শব্দের ঢেউ এখন প্রায় মিলিয়ে গেছে। টেনশান কমাতে শরীর আর মনকে মনে-মনে শূন্যে ভাসিয়ে দিলেন। চোখ মেলে জি-মোবাইল-এর জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন।

একটু আগের বিকেলটা এখন হামাগুড়ি দিয়ে সন্ধের ঘেরাটোপে ঢুকে পড়ছে। পশ্চিমের আকাশে লাল-হলুদ আর কমলা রঙের খেলা। সূর্য চলে যাচ্ছে—কাল সকালে ফিরে আসার জন্য।

এই সূর্য দেখা যাচ্ছে ওল্ড সিটি থেকেও। ভাবলেন রঙ্গপ্রকাশ। এমনকী ওই যে সিলুয়েট পাখির মিছিল কমলা রঙের পটভূমিতে 'স্লো মোশান'-এ উড়ে যাচ্ছে, সেটাও হয়তো দেখা যাচ্ছে ওল্ড সিটি থেকে।

রাস্তার দুপাশে সুন্দর সারিতে লাগানো রয়েছে বিশাল উচ্চতার বিদেশি পাতাবাহার গাছ। তার বড়-বড় পাতায় যেন রামধনু-রঙের ছোপ। জি-মোবাইল-এর ভেতর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন, সেই রঙিন পাতাগুলো বাতাসে উড়ছে।

তৃপ্তির দৃষ্টিতে এসব দেখতে-দেখতে কোথা থেকে যেন চোখে জল এসে গেল। যে সুন্দর সে স্বর্গেও সুন্দর, নরকেও সুন্দর। এই ডুবে যাওয়া সূর্যের

আলো এই মুহূর্তে ওল্ড সিটিকেও ছুঁয়ে আছে। ওই পাখির দল অনায়াসে উড়ে চলে যেতে পারে নিউ সিটির সীমানা ছাড়িয়ে। পিস ফোর্সের সমস্ত প্রতিরোধ সেখানে অকেজো। ওই যে গাছের পাতা নিয়ে খেলা করছে যে-অস্থির বাতাস, তাকেও কেউ রুখতে পারবে না। শুধু মানুষেরই সীমানা ডিঙোনোর কোনও অধিকার নেই।

হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছলেন রঙ্গপ্রকাশ। বন্ধ গাড়ির ভেতরে থেকেও তীব্র শিসের শব্দ শুনতে পেলেন। চোখ তুললেন আকাশের দিকে। চারটে ইস্পাতের পাখি উড়ে যাচ্ছে। চারটে শুটার। ওদের নজরদারির কাজে ক্ষান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। জিয়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশান সিস্টেমের অতি আধুনিক সফ্‌টওয়্যার এ-কাজে ওদের সাহায্য করছে।

সারফেস নেভিগেটরের পরদার দিকে তাকালেন। জি-মোবাইল গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গেছে।

আর সাত সেকেন্ডের মধ্যেই ওঁর পেশেন্টের রেসিডেনশিয়াল কমপ্লেক্সে পৌঁছে গেলেন রঙ্গপ্রকাশ। টের পেলেন বুকের ভেতরের শব্দটা আবার শুরু হয়ে গেছে।

সন্ধে নেমেছে। কমপ্লেক্সের মেইন গেটের বাইরে অসংখ্য আলোর বন্যা। সেই আলো গায়ে মেখে দুজন সিকিওরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে ছিল। রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাসকে চিনতে পারলেও তাদের ভাবলেশহীন মুখের চেহারা পালটাল না। রঙ্গপ্রকাশ আগে বহুবার এখানে 'অতিথি' হয়ে এসেছেন—তাই নিয়মকানুন সব জানেন। তা সত্ত্বেও একজন গার্ড ইশারায় ওঁকে কার পার্কিং জোনটা দেখাল। ততক্ষণে রঙ্গপ্রকাশ পার্কিং জোন লক্ষ্য করে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেছেন।

পার্কিং জোনটা ইস্পাতের তৈরি। সেখানে গাড়ির মাপে অনেকগুলো আয়তক্ষেত্র পাশাপাশি আঁকা। দূরের এরকমই একটি আয়তাকার স্লটে হালকা মেরুন রঙের একটা কিউ-মোবাইল দাঁড়িয়ে আছে। রঙ্গপ্রকাশ ওঁর গাড়িটা একটা স্লটে দাঁড় করালেন। গাড়ি থেকে নেমে সরে আসার পরই দেখলেন গাড়িটা যেখানে পার্ক করেছেন সেই আয়তাকার অংশটা ধীরে-ধীরে নীচে নামতে শুরু করল। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে প্রায় ফুটখানেক নীচে নামার পর অংশটা স্থির হল।

এই হাইড্রলিক সিকিওরিটি সিস্টেম রঙ্গপ্রকাশের খুব চেনা। এখন ওঁর গাড়িটা ফুটখানেক গভীর গর্তের মধ্যে বন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে করলেই রঙ্গপ্রকাশ খুশিমতো গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে পারবেন না। যখন এখানকার সিকিওরিটি সিস্টেম ওঁকে চলে যাওয়ার ছাড়পত্র দেবে তখনই ওঁর গাড়ির চাকা আবার ধীরে-ধীরে গ্রাউন্ড লেভেলে উঠে আসবে।

যে-মানুষ যত ভয় পায় তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তত বেশি। শ্রীধর পাত্রা

আসলে একজন ভিতু মানুষ। প্রাণভয়ে সবসময় কাঁটা হয়ে আছেন। আর ভয় পান বলেই, নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে, অন্যকে আক্রমণ করতে ভালোবাসেন।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ শ্রীধরের কমপ্লেক্সের মেইন গেটের কাছে পৌঁছে গেলেন। সিকিওরিটি কোড প্যানেলে আঙুল ছুঁইয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন। মোবাইলের বোতাম টিপে-টিপে ওপেন করলেন নির্দিষ্ট উইন্ডো। সেখানে স্টোর করা কারেন্ট সিকিওরিটি কোডটা দেখা গেল। সেটা সিকিউরিটি কোড প্যানেলে পাঞ্চ করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা মেটাল প্লেট পাশে সরে গিয়ে গেট খুলে গেল। দু-ফুট চওড়া একটা পথ তৈরি হল—যার ভেতর দিয়ে মাত্র একজন মানুষ যেতে পারে।

প্রথম নিরাপত্তার স্তর পেরিয়ে রঙ্গপ্রকাশ ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তিনি জানেন, এই পথের দুপাশের দেওয়ালে লাগানো রয়েছে অপটিক্যাল ডিভাইস। ক'জন মানুষ গেট পেরিয়ে ঢুকল এই যন্ত্র তার হিসেব রাখে। যেহেতু এখন একজন ঢোকার কথা তাই রঙ্গপ্রকাশ অপটিক্যাল সেন্সরের নজরদারি পেরোতেই মেইন গেটের মেটাল প্লেট 'ক্র্যাক' শব্দ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জায়গামতো ফিরে গিয়ে এঁটে গেল।

এরপর নিয়মমাফিক নিরাপত্তার আরও দুটো স্তর পেরোলেন। শ্রীধর পাট্টার পার্সোনাল থেরাপিস্ট বলে আলাদা কোনও খ্যাতির নেই।

একসময় রঙ্গপ্রকাশ পৌঁছে গেলেন বাড়ির সদর দরজায়।

ভারী কাঠের দরজায় রঙিন কাচ আর কাঠখোদাইয়ের কারুকাজ।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। পৌনে সাতটা বাজতে মোটামুটি দেড়মিনিট বাকি। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে শ্রীধরের নম্বর ডায়াল করলেন।

একবার রিং হওয়ার পরই দরজা খুলে গেল। চোখে পড়ল একটা হলঘর। একটা লুকোনো স্পিকারে শ্রীধরের সংক্ষিপ্ত আবাহন শোনা গেল ঃ 'ওয়েলকাম, ডক্টর।'

রঙ্গপ্রকাশের সামনে কেউ নেই। কেউ ওঁকে রিসিভ করতে আসেনি।

এতে রঙ্গপ্রকাশ মোটেই অবাক হলেন না। কারণ, এই অপরূপ সুন্দর, হাইলি অটোমেটেড এবং ল্যাভিশ্‌লি ফারনিশড্‌ তিনতলা বাড়িটায় শ্রীধর পাট্রা সম্পূর্ণ একা থাকেন। নিরাপত্তার কারণেই কাউকে তিনি বিশ্বাস করেন না।

খুবই স্বাভাবিক। কারণ, শ্রীধরের মধ্যে তিনি সোশিয়োপ্যাথিক ডিসঅর্ডার ছাড়াও প্যারানয়েড পারসোনালিটির হদিস পেয়েছেন। প্যারানয়েড পারসোনালিটির মানুষ হাইপারসেনসিটিভ আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়।

রঙ্গপ্রকাশ হলঘরে ঢুকতেই ওঁর পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হওয়ার শব্দের ফাঁপা প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

হলঘরের মাঝখান থেকে একটা স্টেইনলেস স্টিলের সিঁড়ি অদ্ভুত ছন্দে পাক খেয়ে উঠে গেছে দোতলায়। তারপর পাকের ব্যাসার্ধ বাড়িয়ে সেটা ঘরের দেওয়ালে সেঁটে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যালকনি তৈরি করে ফেলেছে। ঘরের উজ্জ্বল সাদা আলোয় সিঁড়ি আর ব্যালকনি ঝকঝক করছে।

সেই ব্যালকনির এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীধর পাট্টা। গায়ে ফুলহাতা কালো টি-শার্ট আর পায়ে কালো প্যান্ট। দেখে মনে হচ্ছে, টানটান ঋজু ভঙ্গিতে একটা কালো পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীধর চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারণ, তিনি জানেন, রঙ্গপ্রকাশকে কোনওরকম নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে হলঘরের কার্পেটের ওপরে পা ফেলে এগোলেন ডক্টর। কার্পেটের ডিজাইনটা নিউ সিটির রঙিন ম্যাপ। এই কার্পেট বিদেশ থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি। এবং এই কার্পেট মাত্র একপিসই তৈরি করা হয়েছে।

হলঘরের দেওয়ালে আট-দশটা হলোগ্রাম পেইন্টিং। গত পাঁচশো বছরের নামি শিল্পীদের বিখ্যাত সব পেইন্টিং-এর হলোগ্রাফিক রিপ্রোডাকশন। তার মধ্যে ভ্যান গঘ, সালভাদোর দালি, রবীন্দ্রনাথ, বিকাশ ভট্টাচার্য, মকবুল ফিদা হুসেনও রয়েছেন।

ছবি-টবি সব সাজিয়েছেন বটে, কিন্তু শিল্পী এবং শিল্পের খোঁজ শ্রীধর কতটা রাখেন সন্দেহ আছে।

এ-কথা ভাবতে ভাবতে স্টেইনলেস স্টিলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধর একইভাবে দাঁড়িয়ে ওঁকে লক্ষ করতে লাগলেন।

রঙ্গপ্রকাশ যখন শ্রীধরের খুব কাছাকাছি চলে এলেন তখন শ্রীধর কথা বললেন, 'চলুন—কনফারেন্স রুম ওয়ানে গিয়ে বসি।' এবং সেদিক লক্ষ্য করে হাঁটা দিলেন।

শ্রীধরের বাড়িতে তিনটে কনফারেন্স রুম আছে। তাদের নম্বর ওয়ান, টু এবং থ্রি। রুম নম্বর ওয়ানটা মাপে সবচেয়ে ছোট। বড়জোর পাঁচজন মানুষ সেখানে বসে আলোচনা করতে পারে। দু-নম্বর ঘরটা পনেরোজনের জন্য। আর শেষ কনফারেন্স রুমটায় তিরিশজন বসতে পারে।

শ্রীধরের বাড়ির সমস্ত দরজা এবং জানলার কাচগুলো আসলে মামুলি কাচ নয়—ফোটোক্রোমিক ন্যানোপলিমার প্লেট। ওগুলো স্বচ্ছ তো বটেই, তার ওপর শ্যাটারপ্রুফ এবং বুলেটপ্রুফ। যদি কোনও স্নাইপার বহুদূরের কোনও হাইরাইজ বিল্ডিং থেকে হাই পাওয়ার টেলিস্কোপিক রাইফেল কিংবা অটো-কনভার্জিং রকেট লঞ্চার থেকে শ্রীধরের বাড়ির জানলা লক্ষ্য করে ফায়ার করে তবে সে ভীষণ হতাশ হবে।

আক্রমণকারীদের হতাশ করাই শ্রীধর পাট্টার একমাত্র মিশন।

কনফারেন্স রুম ওয়ানের কাচের দরজা ঠেলে ওঁরা দুজনে ঢুকে পড়লেন।

ঘরটা ঠান্ডা। সেন্ট্রাল এসি সিস্টেম নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে।

ঘরের ডানদিকে কনফারেন্স টেবিল, আর পাঁচটা মোটর অপারেটেড আরামের গদি-আঁটা চেয়ার। চেয়ারগুলোর পায়ায় চাকা লাগানো। আর, ডানদিকের হাতলে ছোট কন্ট্রোল প্যানেল। প্যানেলের বোতাম টিপে চেয়ারগুলোকে খুশিমতো চালানো যায়।

ঘরের বাঁ-দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বেঁটেখাটো চেহারার ডোমেস্টিক রোবট। তার মাথাটা বেঢপ, হাত-পাগুলো দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও বেশ মোটাসোটা, মজবুত। রোবটটার বুকের কাছটায় একটা চৌকো গর্ত—সেটা কালো কাচে ঢাকা। রঙ্গপ্রকাশ জানেন, ওটা রিমোট অ্যাক্টিভেশানের রিসেপ্‌টর। তার পাশেই দুটো সবুজ আলো—একটা স্থিরভাবে জ্বলছে, অন্যটা দপদপ করছে।

ডোমেস্টিক রোবটটার পাশেই দাঁড় করানো রয়েছে তিনটে অল-গ্লাস ভেন্ডিং মেশিন। তাদের প্রথমটায় কফি, দ্বিতীয়টায় বিভারেজ আর তৃতীয়টায় স্ন্যাক্স সার্ভ করার ব্যবস্থা রয়েছে। দরকার পড়লে কনফারেন্সে আমন্ত্রিত অতিথিদের এই ডোমেস্টিক রোবটই কফি, বিভারেজ এবং স্ন্যাক্স সার্ভ করে।

ঘরের সবচেয়ে দূর-প্রান্তে গাঢ় বাদামি রঙের দুটো সোফা। তাদের গালফোলা গদির রকমসকম দেখেই বোঝা যায় ওগুলো বসার পক্ষে অতিরিক্ত আরামের। বাদামি সোফা দুটির মাঝখানে একটা কালচে বাদামি রঙের কফি টেব্‌ল। তার কাঠের পালিশ অক্ষত রাখার জন্য সিরামিক ল্যাকারের কোটিং দেওয়া রয়েছে।

টেবিলের ওপরে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার খোলা। তার পরদায় শ্রীধর পাত্রার মুখের ছবি। শ্রীধরের ল্যাপটপের স্ক্রিনসেভার হিসেবে এর চেয়ে ভালো ছবি আর কী হতে পারে!

শ্রীধর ডক্টরকে ইশারা করলেন। তারপর দুটো সোফায় বসে পড়লেন দুজনে।

বড় করে একটা শ্বাস ছাড়লেন শ্রীধর। রঙ্গপ্রকাশকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

'কী নেবেন বলুন, ডক্টর? হট, না কোল্ড?'

রঙ্গপ্রকাশ ল্যাপটপের স্ক্রিনসেভারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শ্রীধরের মধ্যে যে সামান্য মেগালোম্যানিয়ার লক্ষণ তিনি টের পেয়েছেন, বোধহয় সেটার কথাই ভাবছিলেন।

শ্রীধরের প্রশ্নে চমকে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'কুকিজ। আর সফ্‌ট ড্রিংক।'

শ্রীধর পকেট থেকে ছোট্ট একটা রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করলেন। পটাপট কয়েকটা বোতাম টিপলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ডোমেস্টিক রোবট সচল হল। ওটার পেটের কাছ থেকে একটা মেটাল ট্রে বেরিয়ে এল বাইরে। রোবটটা ভেন্ডিং মেশিনের কাছে গিয়ে বোতাম টিপল। মেশিন থেকে সফ্‌ট ড্রিংক আর কুকিজ বেরিয়ে এল। রোবটটা সেগুলো ওর ট্রেতে সাজিয়ে নিল। তারপর কোমরের কাছে দুটো লুকোনো চেম্বারের দরজা খুলে দুটো ক্রিস্টালের গ্লাস বের করল। সফ্‌ট ড্রিংকের বোতলের পাশে রাখল।

এবার রোবটটা ওর পায়ের চাকা গড়িয়ে কফি-টেব্‌লের কাছে এল। নিখুঁত দক্ষতায় টেবিলে ওগুলো নামিয়ে সফ্‌ট ড্রিংক অর কুকিজ সার্ভ করল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। শুধু দপদপ করা সবুজ আলোটা জানিয়ে দিতে লাগল যে, ও এখনও অ্যাকটিভ।

'শেভ করেননি কেন?'

শ্রীধরের আচমকা প্রশ্নে রঙ্গপ্রকাশ কেমন হকচকিয়ে গেলেন। নিজের অজান্তেই গালে হাত চলে গেল। খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে আঙুল বোলালেন। বললেন, 'এমনি...।'

শ্রীধর কুকিজ তুলে মুখে দিলেন। সফ্‌ট ড্রিংক সিপ করলেন। রঙ্গপ্রকাশকে স্থিরচোখে জরিপ করতে-করতে বললেন, 'ও. কে., ডক্টর। আপনার টেনশান নিয়ে পরে কথা বলব।' সোফায় হেলান দিয়ে শরীরটাকে ডুবিয়ে দিলেন ঃ 'আগে আমার টেনশান নিয়ে কথা হোক...।'

রঙ্গপ্রকাশ নড়েচড়ে বসলেন। কুকিজ তুলে কামড় বসালেন। সফ্‌ট ড্রিংকের গ্লাসে চুমুক দিলেন। ঝাঁঝটা নাকে জ্বালা ধরাল। কিন্তু মিষ্টি তরলের ঠান্ডা ছোঁয়ায় কেমন যেন এক প্রশান্তি খুঁজে পেলেন। দু-হাতে মুখ মুছলেন। ইকনমিক ইনডেক্স নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিউ সিটির একজন নাগরিককে পিছনে ঠেলে দিয়ে সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাসকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। গলায় পেশাদারি গাম্ভীর্য এনে প্রশ্ন করলেন, 'এখন কেমন আছেন?'

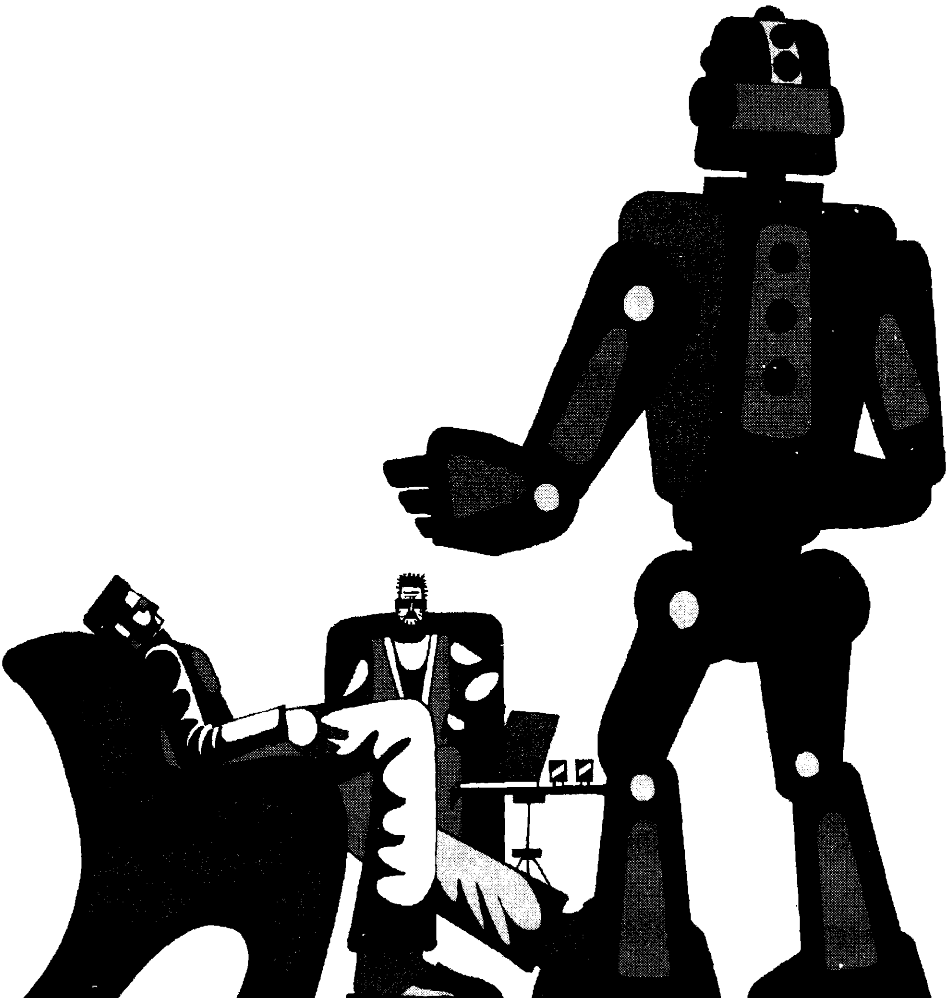
'ভালো না।' ঠোঁট টিপে বললেন শ্রীধর। ফরসা মুখে অপ্রসন্ন ভাঁজ ফেললেন ঃ 'কতকগুলো স্বপ্ন বড় ঝামেলা করছে।'

'স্বপ্ন?' অবাক হলেন রঙ্গপ্রকাশ।

'হ্যাঁ, স্বপ্ন—' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চোখ বুজে ধীরে-ধীরে বললেন, 'এমনিতে স্বপ্নগুলো হয়তো তেমন খারাপ কিছু নয়...কিন্তু আমার কাছে ওগুলো সিম্প্‌লি নাইটমেয়ার—দুঃস্বপ্ন।'

'কেন? কী দেখেছেন স্বপ্নে?' ভুরুতে ভাঁজ ফেললেন ডক্টর।

'যেমন, একটা মরুভূমি। চারিদিকে শুধু হলদে বালি আর বালি। সেই



বালি থেকে তাপ উঠছে। আমার পা পুড়ে যাচ্ছে...কিন্তু আমি হেঁটে চলেছি। ঢেউখেলানো বালির পাহাড় একের পর এক ডিঙিয়ে চলেছি—অথচ বালির শেষ নেই। বাতাসে বালির কণা উড়ছে—চোখে-মুখে এসে লাগছে। মনে হচ্ছে ওগুলো আগুনের কণা...।'

শ্রীধর চোখ বুজে কথা বলছিলেন। খুব ধীরে এক-একটা শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করছিলেন।

রঙ্গপ্রকাশ বেশ বুঝতে পারছিলেন স্বপ্নের প্রতীক কী বলতে চাইছে, কীসের ইশারা করছে। দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মৃত্যু, জাতিদাঙ্গা, সম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি।

সোফায় শরীর এলিয়ে চোখ বুজে বসে থাকা এই নিষ্ঠুর মানুষটা এতদিন ধরে শুধু ভয় আর ক্ষয় বিক্রি করে চলেছে। এবার কি ওর সেগুলো কেনার পালা? স্বপ্নটা কি সে-কথাই জানাতে চাইছে?

কিন্তু সেসব তো শ্রীধরকে বলা যাবে না। কারণ, সেই ভয় আর ক্ষয়।

তাই উত্তরটাকে মনে-মনে সাজিয়ে নিয়ে বারকয়েক রিহার্সাল দিয়ে তারপর ডক্টর বললেন, 'এর অর্থ হচ্ছে, আপনি একা। একজন সেলফ্‌মেড ম্যান। আর...আপনার সামনে লড়াই—।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

শ্রীধর পাট্টা চোখ খুললেন। কুকিজ আর সফ্‌ট ড্রিংক চলতে লাগল।

একসময় রঙ্গপ্রকাশ জিগ্যেস করলেন, 'আর কী স্বপ্ন দেখেন আপনি?'

চোখ বুজলেন শ্রীধর। আলতো করে বললেন, 'আয়নার স্বপ্ন দেখি। আয়নায় আমার...আমার মুখ দেখতে পাই...।'

●

'স্পষ্ট দেখতে পান?'

'হ্যাঁ...' সফ্‌ট ড্রিংক সিপ করলেন শ্রীধর ঃ 'প্রায় স্পষ্টই বলা যায়, আয়নার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার মুখে চাকা-চাকা দাগ। অনেকটা জলবসন্তের গুটির মতো। আর আয়নায় আমার মুখের পেছনটা গাঢ় অন্ধকার। আমি খুব চেষ্টা করেও অন্ধকারের মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অথচ...অথচ আমার মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে, অন্ধকারটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে...।'

রঙ্গপ্রকাশ বুঝতে পারছিলেন। এই স্বপ্নের ব্যাপারটা যদি শ্রীধর ঠিকঠাক বলে থাকেন তা হলে এই স্বপ্নের অর্থ একটাই ঃ শ্রীধর খুব শিগগিরই রূঢ় এবং কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। শ্রীধরের দিক থেকে দেখলে সেই বাস্তব কুৎসিত—তাই ওঁর মুখে জলবসন্তের গুটির চাকা-চাকা দাগ। আর ওই

যে অন্ধকার, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে—সেটা হল অজানা আশঙ্কা, ভয়।

কিন্তু শ্রীধর পাট্টাকে এর কতটুকু বলা যায়?

কিংবা আদৌ কি বলা যায়?

এই লোকটা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কত মানুষের যে মৃত্যুর কারণ হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। অথচ লোকটার মধ্যে অপরাধবোধও নেই।

তার কারণ ওর অপরিণত বিবেক। সাইকোলজির ভাষায় যাকে বলে 'আন্ডারডেভেলাপ্ড কনশান্স'। সোজা কথায় শ্রীধর পাট্টা একজন 'মরাল মোরন'। এই ধরনের অ্যান্টিসোশাল পারসোনালিটির মানুষরা মুখে সবসময় মূল্যবোধের কথা বলে, কিন্তু বিবেক অপরিণত হওয়ায় মূল্যবোধের বোধটাই থাকে না। এদের বুদ্ধি ক্ষুরধার, কিন্তু বিবেক ভোঁতা।

এখন সেইরকম একটা মানুষের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। ফরসা তেলতেলে মুখ। মুখে কেমন একটা বাচ্চা-বাচ্চা ভাব।

অনেকক্ষণ চুপ করে রয়েছেন। এবার কিছু একটা বলা দরকার।

এ-কথা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীধর বলে উঠলেন, 'ডক্টর, কিছু বুঝতে পারলেন?'

ঘোর থেকে জেগে উঠলেন রঙ্গপ্রকাশ। টেবিল থেকে কুকিজ তুলে নিয়ে মুখে দিলেন, সফ্‌ট ড্রিংকের গ্লাসে চুমুক দিয়ে লম্বা শ্বাস টেনে বললেন, 'স্যার, আপনার...আপনার সামনে যে-লড়াই...সেই লড়াইটা খুব মসৃণ হবে না। তাই আপনার মুখের রিফ্লেকশানে ওইরকম...চাকা-চাকা দাগ।' মাথা ঝুঁকিয়ে বসলেন। ঘাড়ে একবার হাত বোলালেন। তারপর শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে আলতো করে যোগ করলেন, 'আক্রমণ যেটা আসবে...মানে, শত্রুর দিক থেকে...সেটা হবে আনএক্সপেক্টেড। মানে, আপনি আগে থেকে গেস করতে পারবেন না। সেইজন্যেই ওরকম অন্ধকার দেখেছেন...নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে...জীবন্ত অন্ধকার।'

কে হতে পারে সেই অপ্রত্যাশিত শত্রু? কে হতে পারে সেই জীবন্ত অন্ধকার?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নিজের অজান্তেই শ্রীধর পাট্টার কপালে ভাঁজ পড়েছিল। রঙ্গপ্রকাশ সেই দুশ্চিন্তাটাকেই যেন আরও তীব্র করতে প্রশ্ন করলেন, 'এমন কোনও শত্রুর কথা কি আপনি ভাবতে পারছেন, স্যার? যাকে এখনও শত্রু বলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—অথচ যে আনএক্সপেক্টেড দিক থেকে সাডেন্‌লি অ্যাটাক করতে পারে?'

সফ্‌ট ড্রিংকে চুমুক দিয়ে মেঝের দিকে তাকালেন শ্রীধর। কয়েক সেকেন্ড মাথা ঝুঁকিয়ে থেকে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ।

'না, এরকম এনিমি হিসেবে কাউকে এখন আইডেনটিফাই করতে পারছি না...।'

সোফা এবং নিজের শরীরের মাঝে খাড়া করে দাঁড় করানো গোলাপি ফোল্ডারটার দিকে রঙ্গপ্রকাশের চোখ গেল। জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল নিয়ে শ্রীধরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে সেসব কথা শুরু করার আগে থেরাপির 'কিউ অ্যান্ড এ' সেশানটা সেরে নেওয়া যাক।

একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন ডক্টর। তারপর বললেন, 'যা-যা বললেন সে ছাড়া আর কোনও স্বপ্ন কি দেখেন আপনি?'

'নাঃ, শুধু ওইগুলোই। ঘুরেফিরে ওই স্বপ্নগুলোই আসে—তবে তার ডিটেইলের একটু-আধটু রকমফের হয়।'

'তা হলে কোয়েশ্চেন-আন্সার সেশান শুরু করি, স্যার?'

'হ্যাঁ—করুন।'

কথাটা বলেই সোফায় শরীর এলিয়ে দিলেন শ্রীধর। সেই অবস্থাতেই পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করে দেওয়ালের একটা কালো ফাইবার প্লেটের দিকে তাক করে বোতাম টিপলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওয়াল মাউন্টেড একটা অডিয়ো সিস্টেম 'রেকর্ডিং অ্যাক্টিভ' হয়ে গেল।

রঙ্গপ্রকাশের সঙ্গে প্রতিটি সাইকোথেরাপি সেশান রেকর্ড করে নেন শ্রীধর। সেই রেকর্ডিং-এ দিন এবং সময় বসিয়ে নেয় অডিয়ো সিস্টেম নিজেই। রেকর্ড করা সেশানের একটা কপি একটা মাইক্রোসিডিতে করে রঙ্গপ্রকাশকে দিয়ে দেন। ফলে ডক্টর এবং ক্লায়েন্ট দুজনেই থেরাপির প্রগ্রেস সম্পর্কে পুরোপুরি আপডেটেড থাকেন। প্রয়োজনে কখনও সেগুলো নিয়ে নিজেরা আলোচনাও করতে পারেন।

পকেট থেকে ছোট একটা নোটবই আর পেন বের করে নিলেন ডক্টর। কারণ, সেশানের মাঝে-মাঝে কোনও-কোনও পয়েন্ট নোট করে নেওয়ার দরকার হয়। এই নোটগুলো ওঁর নিজের। এগুলো শ্রীধর পাট্টার জন্য নয়।

ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিলেন রঙ্গপ্রকাশ। তারপর আচমকা শুরু করলেন।

'ছোটবেলাতে আপনি ফিরে যেতে চান?'

'না—না।'

শ্রীধর চোখ বুজে ফেলেছিলেন। বোধহয় তীক্ষ্ণ মনঃসংযোগ তৈরি করতে চাইছিলেন। ওঁকে দেখে রঙ্গপ্রকাশের মনে এক বিচিত্র ভাব জেগে উঠল। তীব্র প্রতিশোধকামী যে-নিষ্ঠুর মানুষটাকে তিনি জেনে এসেছেন এখন তাকে দেখে অসহায় ঘুমন্ত শিশু বলে মনে হচ্ছে।

'ছোটবেলায় ফিরতে চান না কেন? অনেকেরই তো ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে...।'

'না, আমার ছোটবেলায় ফিরতে ইচ্ছে করে না।'

'ছোটবেলায় সবাই ফিরে যেতে চায় সিকিওরিটির জন্যে। কারণ, তখন চারপাশে বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন—সব গুরুজনেরা থাকেন। তাঁরা ছোটবেলার নিরাপত্তার জোগান দেন। দে প্রোভাইড দ্য সেফ্‌টি ওয়াল্‌স...।'

'না, আমি ফিরব না। আমার কোনও সেফ্‌টি ওয়াল ছিল না।'

'তা হলে কী ছিল?'

'কিছুই ছিল না। কেউ ছিল না। শুধু আমি ছিলাম। একা। একেবারে একা।'

'একা থাকতে আপনার ভয় করত না?'

'না। ফিয়ার ওয়জ মাই ওনলি রিলেটিভ। ওনলি ফ্রেন্ড...।'

নোটবইতে কয়েকটা পয়েন্ট টুকে নিলেন রঙ্গপ্রকাশ। অদ্ভুত মন্তব্য। 'ফিয়ার ওয়জ মাই ওনলি রিলেটিভ। ওনলি ফ্রেন্ড...।' ভয় আমার একমাত্র আত্মীয়। একমাত্র বন্ধু...।

'ভয় কীভাবে আপনার আত্মীয় হল? বন্ধু হল?'

'আমার চারপাশে ভয় ছিল। ভয় আমাকে ঘিরে থাকত। মাঝে-মাঝে মনে হত, ইট ওয়জ মাই সেফ্‌টি ওয়াল।'

'আপনি কি তাড়াতাড়ি বড় হতে চাইতেন? মনে হত, এই দুনিয়ার সঙ্গে ঠিকঠাক মোকাবিলা করার জন্যে আপনার তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠা দরকার?'

'হ্যাঁ—মনে হত। মাঝে-মাঝে মনে হত।'

'আপনার তো বন্ধু ছিল না বললেন—তাই তো?'

'হ্যাঁ—।'

'কোনও শত্রু ছিল?'

'প্রচুর। আমার মনে হত, আমার চারপাশে শত্রু। কিলবিল করছে। ওদের আমি ঘেন্না করি। আই ডেসপাইজ দেম।'

'কারা সেই শত্রু? দু-একজনের নাম বলতে পারেন?'

'নাম? নাম কী বলব! সবাই শত্রু। দ্য হোল সোসাইটি ওয়জ মাই এনিমি—।'

শ্রীধরের উত্তর শুনতে-শুনতে নোট নিলেন ডক্টর। সোসাইটির প্রতি অ্যাপ্যাথি। সমাজ নাপসন্দ্‌। সেই থেকেই হয়তো সমাজকে দখল করে শাসন করার ইচ্ছেটা অবচেতনে দানা বেঁধেছে। এখন নিউ সিটিতে তিনি যেটা করছেন। শাসন। অতিশাসন। অপশাসন।

'সবাই কেন শত্রু হবে?' কোমল গলায় বললেন ডক্টর। তারপর কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ছোটবেলায় কে আপনাকে দেখাশোনা করত?'

শ্রীধরের যে বাবা-মা ছিল না সেটা আগের নানান থেরাপি সেশান থেকে রঙ্গপ্রকাশ জানেন। কিন্তু বাবা-মায়ের বদলে কারা ওঁকে ছোটবেলাটায় মানুষ

করেছেন সেটা এখনও জানা যায়নি। শ্রীধর সবসময় প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন। আজ আবার কথায়-কথায় সেই একই প্রশ্ন এসে গেছে।

শ্রীধর চোখ বুজে ছিলেন। ওঁর ফরসা মুখে অপ্রসন্নতার কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন, 'দেখাশোনা কেউ করত না। জ্ঞান হয়ে থেকেই দেখেছি আমি সবার ফাইফরমাশ খাটছি। আমাকে যে-সে শাসন করছে—চড়-থাপ্পড় মারছে—গায়ে থুতু দিচ্ছে।'

'বাবা-মায়ের খোঁজ করেননি কখনও?'

'প্রথম-প্রথম একে-তাকে জিগ্যেস করতাম...পরে আর করিনি।'

'কেন, করেননি কেন?'

'যারা ইচ্ছে করে লুকিয়ে পড়ে তাদের কখনও খুঁজে পাওয়া যায়! আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার মা-বাবা আমাকে ফেলে পালিয়ে গেছে—লুকিয়ে পড়েছে—আর কখনও আমার সামনে আসবে না বলে...।'

'বাবা-মাকে কাছে পাওয়ার জন্যে মন টানত না? কষ্ট হত না...কান্না পেত না?'

'প্রথম-প্রথম মন টানত। আমার বয়েসি বাচ্চা-কাচ্চাগুলো রাস্তার ধারের নোংরা ঝুপড়িতে থাকত। দু-বেলা ঠিকমতো খেতে পেত না। খাবারের খোঁজে আবর্জনা ঘাঁটত। কিন্তু ওদের দেখতাম বাবা-মায়ের সঙ্গে খেলা করছে, হাসছে—কী আনন্দে আছে। তখন আমার কষ্ট হত, কান্না পেত। তারপর...তারপর...রাগ হত। অসহ্য রাগ। সবার বাবা-মায়ের জন্যে আমার ঘেন্না হত।'

নোট নিতে-নিতে মুখ তুললেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধরের দিকে তাকালেন। ওঁর মুখে একটা লালচে আভা। আর তার সঙ্গে ঘৃণা আর উত্তেজনার ছাপ।

'হ্যাঁ—বুঝতে পারছি। কিন্তু...একটা কথা বলুন তো। ছোটবেলায় যেখানে আপনি থাকতেন—মানে, ওল্ড সিটিতে—সেখানে আপনার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?'

'না, না, না-না-না!' শ্রীধরের ঠোঁট চিরে হিসহিস শব্দে 'না'-এর স্রোতটা বেরিয়ে এল। মুখের লালচে আভা আরও গাঢ় হল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন ডক্টর। শ্রীধরের উত্তেজনার পারদকে খানিকটা নেমে আসার সময় দিলেন। তারপর ঃ 'ওল্ড সিটিকে আপনার ভালো লাগে না?'

'ভালো লাগবে?' অবাক সুরে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন ঃ 'কেন, ভালো লাগবে কেন?'

'আপনার জন্মভূমি—তাই...।'

'জন্মভূমি মাই ফুট। আই হেট ওল্ড সিটি। ওল্ড সিটিকে আমি ঘেন্না করি। ওই নোংরা, অসুস্থ, ক্লেদাক্ত শহরটা আমাকে কী দিয়েছে? কিছুই না!

কিচ্ছু না! ওই শহরটাকে আমি হাতের মুঠোয় পিষে গুঁড়ো করে ফেলতে চাই। আই ওয়ন্ট টু অ্যানিহিলেট দ্যাট রট্‌ন হেল অ্যালংউইথ অল দ্য স্কাম ইন ইট।'

শ্রীধর বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিলেন। ওঁর ঠোঁট নড়ছিল। নিঃশব্দে কিছু একটা বিড়বিড় করছিলেন।

নোটবইয়ের পাতায় রঙ্গপ্রকাশের পেন ব্যস্তভাবে চলছিল। একইসঙ্গে ওঁর মনের ভেতরে শ্রীধর পাট্রার মনস্তাত্বিক মূল্যায়নও চলছিল। সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি হচ্ছিল।

ওল্ড সিটির প্রতি শ্রীধরের এই একরোখা ঘৃণার জন্যই কি সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের নানান হাই রিস্‌ক গেম্‌সের প্রতিযোগী জোগাড় করা হয় শুধুমাত্র ওল্ড সিটি থেকে? এই কারণেই কি বড়লোক বানানোর লোভ দেখিয়ে ওল্ড সিটির গরিব 'ছোটলোক'গুলোকে দোজখের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়?

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শ্রীধরের পরিচয়হীনতার ক্ষোভ। সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে সুস্থ সমাজের প্রতি ওঁর আক্রোশ।

শ্রীধর পাট্রার মনের গঠনের মানচিত্র যেন অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত একজন অতিমাত্রায় সংবেদনশীল মানুষ। ওঁর মধ্যে রয়েছে গোঁয়ার্তুমি, হিংসা, অসার আত্মগর্ব। এ ধরনের মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই কোনও গুরুত্ব দেয় না, আর নিজের ভুল বা ব্যর্থতার জন্য সবসময় অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপায়। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে অপরিণত বিবেক আর অপরিণত অপরাধবোধ।

সব মিলিয়ে একটা জটিল প্যারানয়েড পারসোনালিটি।

'ওল্ড সিটি আপনি ছেড়ে এলেন কেমন করে?' নোট নেওয়া শেষ করে প্রশ্নটা করলেন রঙ্গপ্রকাশ।

'সেটা এক আশ্চর্য ঘটনা।' চোখ বুজেই ঠোঁটে হাসলেন শ্রীধর। তারপর এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন স্লো মোশানে একটা সিনেমা দেখছেন এবং অস্ফুট স্বরে ধীরে-ধীরে সেটার বর্ণনা করছেন।

'আমার দাদা বলধর পাট্রা আমাকে ওল্ড সিটিতে হঠাৎই খুঁজে পায়। আমার গলার একটা চেন দেখে চিনতে পারে। আমার খুব ছোটবেলায় এই নিউ সিটিতে পিস ফোর্সের একটা বিদ্রোহ হয়েছিল। শুনেছি তখন আমার বয়েস ছিল নাকি এক বছর দু-মাস। সেই বিদ্রোহের সময় পিস ফোর্সের ছ'জন বিদ্রোহী অফিসার আমাকে কিডন্যাপ করে শুটারে চেপে ওল্ড সিটিতে পালিয়ে যায়। ওরা দাদাকে থ্রেট করে—বলে যে, কাউকে এই কিডন্যাপিং-এর কথা জানালে ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে। পরে দাদা মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে সবক'টা বিদ্রোহীকে খুঁজে বের করে গুনে-গুনে খতম করে। কিন্তু আমাকে আর খুঁজে

পায়নি। পেয়েছে তার অনেক বছর পরে—প্রায় তেরো বছর পরে। তখন দাদার কাছেই সব কথা শুনেছি—।'

এই গল্পটা শ্রীধর তৈরি করেননি—করেছিলেন বলধর পাত্রা। গল্পটা বানানো হলেও এর মধ্যে পিস ফোর্সের বিদ্রোহের অংশটা সত্যি। এই গল্পটা দীর্ঘদিন ধরে সবাইকে বলে-বলে ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, শ্রীধর নিজেও গল্পটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

কিন্তু গল্পটার মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। এবং সেই ফাঁকের দিকে তাক করেই পরের প্রশ্নটা করলেন রঙ্গপ্রকাশ।

'বলধর পাত্রার তো বাবা-মায়ের পরিচয় ছিল। তা হলে আপনি নিজেকে পরিচয়হীন বলছেন কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শ্রীধর জবাব দিলেন, 'যখন একটা শিশুর বাবা-মা-কে ভীষণ প্রয়োজন তখন যদি তাদের না পায় তা হলে সে কোন বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়ে উঠবে? আমার এক বছর দু-মাস বয়েস থেকে প্রায় চোদ্দো বছর বয়েস পর্যন্ত আমি আবর্জনার মতো বড় হয়ে উঠলাম। বাবা-মা-কে সচেতনভাবে কখনও চোখেই দেখলাম না। তাঁরা শুধু হলোগ্রামের ছবি হয়ে আমার কাছে বেঁচে রইল। তা হলে আমার মনে হবে না কি যে, আমার মা-বাবা বলে কেউ ছিল না! আই অ্যাম আ ব্লাডি অরফ্যান!'

এই ব্যাখ্যাটা শ্রীধর পাত্রা বহুবছর আগেই তৈরি করেছেন। প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। যেমন এখন ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাসের থেরাপির সময় ব্যবহার করছেন।

শ্রীধর ব্যাখ্যা দিলেও সাইকোঅ্যানালিস্ট রঙ্গপ্রকাশ তার মধ্যে একটু-আধটু ফাঁকফোকর দেখতে পাচ্ছিলেন। আসলে সাইকোথেরাপি সেশানের সময় ডক্টর এবং পেশেন্ট দুজনকেই কমিটেড হতে হয়। পেশেন্ট যখন নিজের সমস্যার কথা ডক্টরকে বলবে তখন তাকে সৎ হতে হবে—কোনও মিথ্যে কথা বললে চলবে না। আর থেরাপিস্টকেও হতে হবে অবজেক্টিভ, প্রফেশনাল, সাপোর্টিভ—আর, সেশানের সব কথাই তাঁকে গোপন রাখতে হবে।

শ্রীধর পাত্রার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ লক্ষ করে রঙ্গপ্রকাশের মনে হচ্ছিল, শ্রীধর ওঁর সততার শর্ত পুরোপুরি পূরণ করতে পারছেন না।

ঘড়ির দিকে তাকালেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে। থেরাপি সেশান এখানেই শেষ করা যাক। তাই টেপ-রেকর্ডারকে শোনানোর জন্য বললেন, 'এন্ড অফ থেরাপি সেশান। থ্যাংক য়ু, স্যার।'

কথাগুলো শুনলেন শ্রীধরও। কিন্তু তিনি শুনতে পেয়েছেন বলে বোঝা যাচ্ছিল না। একইরকমভাবে চোখ বুজে শরীর এলিয়ে শুয়ে আছেন। শুধু বুকটা ওঠা-নামা করছে।

নোটবই আর পেন পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন রঙ্গপ্রকাশ। একটা লম্বা শ্বাস ছাড়লেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের উষ্ণতা বোধহয় অনেকটা কমে গিয়ে থাকবে। কারণ, এখন বেশ শীত-শীত করছিল।

হঠাৎই ডক্টরকে চমকে দিয়ে স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো ছিটকে সোজা হয়ে বসলেন শ্রীধর। চোখ খুললেন। ডক্টরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ওয়েল, ডক্টর, হোয়াট ডু য়ু থিংক?'

গোলাপি প্লাস্টিকের ফোল্ডারটা কোলের ওপর তুলে নিয়েছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। সেটা নাড়াচাড়া করছিলেন। শ্রীধরের প্রশ্নের উত্তরে আলতো করে বললেন, 'আই থিংক ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, স্যার। আরও কয়েকটা সেশানের পর আমি হয়তো আপনাকে কিছু মেডিসিন নেওয়ার কথা বলব। তার আগে আমাকে একজন সাইকোফার্মাকোলজিস্টের সঙ্গে ডিসকাস করতে হবে...।'

'যত খুশি ডিসকাস করুন—শুধু মনে রাখবেন, আমার নাম যেন কোনওভাবেই মেন্‌শান্‌ড না হয়। যদি হয় তা হলে আই অ্যাম গোয়িং টু বি ইয়োর লাস্ট পেশেন্ট, ডক্টর...।'

শেষ কথাটায় রঙ্গপ্রকাশের গায়ে কাঁটা দিল। ফোল্ডারের ওপরে ওঁর হাতের আঙুল অকারণেই দ্রুত নড়াচড়া করতে লাগল। প্রাণপণে তিনি স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

শ্রীধর দু-হাত শূন্যে তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়ামের ভঙ্গি তে হাত দুটো কয়েকবার পাশে ছড়ালেন, ওপর-নীচ করলেন।

রঙ্গপ্রকাশ হাতের ফোল্ডারটা খুললেন। আলতো করে বললেন, 'স্যার, এবার জিশান পালচৌধুরীর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল নিয়ে একটু কথা বলতে পারি?'

'হ্যাঁ—পারেন।' অনুমতি দিলেন শ্রীধর এবং রঙ্গপ্রকাশের দিকে ঝুঁকে বসলেন।

হ্যাঁ, জিশান পালচৌধুরীর ভেতরটা তিনি এবার বুঝতে চান।

●

থেরাপি সেশান শেষ হওয়ার পর রঙ্গপ্রকাশের বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মনে হল, এতক্ষণ ধরে ওঁর যেন দম-বন্ধ-করা অবস্থা চলছিল—এবং এই প্রথম স্বাধীনভাবে শ্বাস নিতে পারছেন।

'স্যার, আগে এগুলো একবার দেখে নিন। এতে সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল সম্পর্কে বেশ কিছু ইম্‌পরট্যান্ট নোট্‌স আছে আর রেলিভ্যান্ট কয়েকটা ফোটোগ্রাফ আছে।' কথাগুলো বলে খোলা ফোল্ডরটা শ্রীধর পাট্টার

দিকে এগিয়ে দিলেন।

শ্রীধর ফোল্ডারটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পাতার পর পাতা ওলটাতে লাগলেন। ফোটোগ্রাফগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

রঙ্গপ্রকাশ দেখছিলেন শ্রীধরের কপালে ভাঁজ তৈরি হয়েছে। পাতলা ঠোঁট মাঝে-মাঝে নিঃশব্দে নড়ছে। শ্রীধরের মনের মেশিনে জিশান পালচৌধুরীর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলের মূল্যায়ন তৈরি হচ্ছে।

সৎ। স্পষ্ট। মানবিক মূল্যবোধের দুর্বলতায় আচ্ছন্ন। বড় সহজে বন্ধুত্ব তৈরির চেষ্টা করে। শত্রুকেও বন্ধু বলে ভাবতে চায়।

জিশান সম্পর্কে এই কথাগুলোই শ্রীধর ভাবছিলেন।

কিন্তু ছেলেটার মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে। আছে পোটেনশিয়াল এনার্জি। জাব্বার সঙ্গে পিট ফাইটের সময় সেই পোটেনশিয়াল এনার্জিকে শ্রীধর কাইনেটিক এনার্জিতে বদলে যেতে দেখেছেন। তা ছাড়া এই ধরনের মানুষ পেশাদার নয় বলেই মূল্যবোধের হাতিয়ার নিয়ে মরিয়া হয়ে উঠতে পারে।

শ্রীধর ভাবছিলেন। শুধু ভাবছিলেন।

জিশানের কিল গেম-এর তারিখ এবার ঠিক করতে হবে। এবং জেলখানা থেকে তিনজন কিলার—না, না...সুপারকিলার—কিংবা সুপারি কিলারও বলা যেতে পরে—তিনজন মারাত্মক খুনিকে বেছে নিয়ে আসতে হবে—চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। তারপর গেম সিটিতে চব্বিশ ঘণ্টার কিল গেম। সেই খেলার লাইভ টেলিকাস্ট দেখতে-দেখতে সবার বন্ধ হয়ে আসবে দম। এবং জিশান খতম।

আপনমনে মাথা নাড়লেন শ্রীধর। সুপারহিরোকে শেষ করতে সুপারকিলারই দরকার। সুতরাং এই 'খুনি' বাছাইয়ের কাজে এবার শ্রীধর নিজেই যাবেন। জেলে যতজন মারাত্মক খুনি আছে তাদের সকলের 'কারিকিউলাম ভিটা' খুঁটিয়ে পরখ করে দেখবেন—বারবার। তারপর বেছে নেবেন তিনজনকে। যারা শয়তানিতে শয়তানকেও হারাতে পারে।

জিশানের একটা ফোটোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন শ্রীধর। মনে হচ্ছিল এই জোয়ান ছেলেটা এক-একটা খেলায় কোয়ালিফাই করে ধীরে-ধীরে যেন কিল গেম-এর দিকে নয়—শ্রীধরের দিকে এগোচ্ছে। শ্রীধর পাট্টাকে নিঃশব্দে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

নাঃ, জিশান কিছুতেই কিল গেম-এ জিততে পারে না। যদি জেতেও, তা সত্ত্বেও ওকে হারতেই হবে। শ্রীধর সে-ব্যবস্থা অবশ্যই করে রাখবেন। কারণ, জিশানকে জিততে দেওয়া যাবে না। জিশান যদি জেতে তা হলে সেটা হবে নিউ সিটির স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।

শ্রীধরের চোয়াল শক্ত হল। ঠোঁট টিপলেন। ছোট্ট করে মাথা দোলালেন। তারপর জিশানের মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন—যেন ওর



সঙ্গে কথা বলছেন।

রঙ্গপ্রকাশ চুপ করে বসে নিজের পেশেন্টকে লক্ষ করছিলেন। ও জানে না ওর অপরাধবোধ অপরিণত, বিবেকেরও একই দশা। জানে না, ও একজন প্যারানয়েড পারসোনালিটির মানুষ, 'মরাল মোরন'। ও নিজে যে-পথে চলার কথা ভাবে সেটাই ওর কাছে একমাত্র সঠিক পথ।

শ্রীধরের পকেটের স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল। শুটারের শিসের শব্দ, আর তার সঙ্গে মিশে আছে যুদ্ধ ঘোষণার ঝংকার তোলা ব্যান্ড। এই কপিরাইট রিং টোন শুধুমাত্র শ্রীধর পাট্টার জন্য তৈরি।

হাতের ফোল্ডার শব্দ করে বন্ধ করলেন শ্রীধর। রঙ্গপ্রকাশের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করুন। আমাকে এর একটা সফ্‌ট কপি মাইক্রোসিডিতে করে দেবেন—আর তার সঙ্গে একটা হার্ড কপি। একটা কথা মনে রাখবেন ঃ আপনার অ্যাসেসমেন্ট যেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়। ওতে যেন কোনওরকম ঝাপসা মন্তব্য না থাকে। মানে সায়েন্টিফিক জারগন দিয়ে পাশ কাটাতে চেষ্টা করবেন না...।'

ফোল্ডারটা ফেরত পেলেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধরের ফোন তখনও বাজছিল।

উঠে দাঁড়ালেন। ফোন বের করে কানে দিলেন। বাঁ-গালে আঙুলের ডগা ঘষলেন কয়েকবার।

রঙ্গপ্রকাশও সঙ্গে-সঙ্গে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'হ্যালো—।' শ্রীধর ঠান্ডা গলায় বললেন।

'মার্শাল, স্যার—' ওপাশ থেকে সিকিওরিটি চিফের গলা ভেসে এল ঃ 'আপনাকে ডিসটার্ব করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু এইমাত্র আমার দুই সাবর্ডিনেট স্টাফ ভীষণ ইম্‌পরট্যান্ট খবর নিয়ে এসেছে...।'

'শুনছি...' নিরুত্তাপ গলায় বললেন শ্রীধর। কারণ, সহজে উত্তেজিত হওয়া শ্রীধরের স্বভাব নয়। তা ছাড়া ওঁর সিকিওরিটি স্টাফ প্রায়ই নানান গোপন খবর ওঁর কাছে পৌঁছে দেয়। যেহেতু কোনও সঠিক খবর পৌঁছে দিলে ভালোরকম ক্যাশ প্রাইজের ব্যবস্থা আছে, এবং খবরের গুরুত্ব বুঝে প্রোমোশনও দ্রুত হয়ে যেতে পারে, সেহেতু খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য সিকিওরিটি টিমের মধ্যে এক অদ্ভুত অদৃশ্য প্রতিযোগিতা আছে। শ্রীধর সেটা ভালো করেই জানেন এবং এই প্রতিযোগিতার মনোভাবটা তিনি জিইয়ে রাখতে চান। কারণ, প্রতিযোগিতা থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসে। আর সেখান থেকেই আসে অবিশ্বাস। পরস্পরের প্রতি।

এই অবিশ্বাসের সম্পর্কটা শ্রীধর জিইয়ে রাখতে চান। তাতে ওদের ওপরে শাসনের নিয়ন্ত্রণটা সহজে কায়েম করা যায়। আর ওদের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের ছিদ্র পথে শ্রীধর অনেক গোপন খবর পান—পরস্পরবিরোধী গোপন

খবর। সেইসব খবরকণিকা থেকে তোলমোল করে শ্রীধর ছেঁকে বের করে নেন নির্যাসটুকু। তারপর নিজস্ব ঢঙে প্রতিরোধী ব্যবস্থা নেন।

'স্যার, ওদের আপনার কাছে নিয়ে আসছি। ওদের কোড নম্বর হল...' সিকিওরিটি চিফ সেই দুজন সিকিওরিটি স্টাফের কোড নম্বর বললেন।

রঙ্গপ্রকাশ দেখলেন শ্রীধর কোড নম্বরগুলো শুধু শুনে নিলেন—কোথাও টুকে নিলেন না। না, ভুল হল। বরং বলা ভালো, শ্রীধর পাট্রা নম্বরগুলো ওঁর মাথায় টুকে নিলেন। সত্যি, অমানুষ এই মানুষটার আশ্চর্য মেমোরি! প্রাচীন যুগ হলে শ্রীধরকে অনায়াসে 'শ্রুতিধর' বলা যেত।

'ঠিক আছে, ওদের নিয়ে আসুন। আমি আপনার আর ওদের কোড নম্বর পাঞ্চ করে ইন্‌টারনাল সিকিওরিটি ক্লিয়ারেন্স থ্রু করে রাখছি...।'

কথা বলা শেষ করে স্যাটেলাইট ফোনটা চোখের সামনে ধরলেন। সিকিওরিটি চিফ আর তার দুজন স্টাফের কোড নম্বর তিনটে দ্রুত পাঞ্চ করলেন। তারপর আরও কয়েকটা বোতাম টিপে দিলেন পরপর।

স্যাটেলাইট ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে আড়চোখে রঙ্গপ্রকাশের দিকে তাকালেন ঃ 'ডক্টর, প্লিজ একটু ওয়েট করুন। পাশের ঘরে গিয়ে আমি একটা ইমার্জেন্সি ব্যাপার চট করে সেরে আসছি। এসে আপনার ই. আই. নিয়ে কথা বলছি। এক্সকিউজ মি...।'

শ্রীধর চলে গেলেন। রঙ্গপ্রকাশ ওঁর চলে যাওয়া দেখলেন।

ওঁর পা ফেলার ঢং থেকে আত্মবিশ্বাসের বিকিরণ টের পেলেন ডক্টর। অবাক হয়ে ভাবলেন, মানুষটা কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছে! ওল্ড সিটির আবর্জনায় তেরো বছর কাটিয়ে শ্রীধর হয়তো দাঁত-নখের লড়াইটা শিখেছেন, কিন্তু লেখাপড়া?

উত্তরটা শ্রীধরের নানান থেরাপি সেশান থেকেই পেয়েছেন রঙ্গপ্রকাশ। বলধর পাট্রা 'হারানো' ছোট ভাইকে খুঁজে পাওয়ার পর দশবছর ধরে তাকে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়েছেন—নানান বিষয়ে। তার মধ্যে প্রধান ছিল ইংরেজি শেখা আর ম্যানার্স শেখা। এ দুটো শেখার জন্য শ্রীধরকে দু-বছর ক্যালিফোর্নিয়ায় রেখেছিলেন বলধর। সেখানে ওঁর জন্য স্পেশাল প্রাইভেট কোচিং-এর ব্যবস্থা ছিল।

তারপর এল জাপানের পালা। কিক বক্সিং আর সামুরাই সোর্ড। এই দুটো বিষয়ে শ্রীধরের আগ্রহ আর দক্ষতা বলরাম পাট্রাকে অবাক করেছিল। তিন বছর ট্রেনিং-এর পর শ্রীধর যেখানে পৌঁছেছিলেন একজন প্রতিভাবান শিক্ষার্থী সাধারণত দশ বছরে সেখানে পৌঁছোতে পারে।

জাপান থেকে ফেরার পর বাড়িতে থেকেই শ্রীধর লেখাপড়া শিখেছেন আর শরীরচর্চা করে গেছেন। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন লড়াইয়ে শ্রীধর নাম

দিয়েছেন। ওঁর সাকসেস রেট ছিল নাইন্‌টি ওয়ান পারসেন্ট।

বলরাম লক্ষ করেছিলেন, শ্রীধরের মধ্যে একটা সহজাত পশু-প্রবৃত্তি রয়েছে। সেটা হল, প্রতিপক্ষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা, খতম করা। এই অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট-ই শ্রীধরের মেজর অ্যাসেট।

শ্রীধরের লেখাপড়ার প্রায় পুরোটাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে শেখা, অথবা বিদেশ থেকে আনা কাস্টম-বিল্ট মাইক্রোসিডি কম্পিউটারে চালিয়ে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। সবকিছু শেখার ব্যাপারে ওঁর অসাধারণ মেমোরি ওঁকে দুর্দান্তভাবে সাহায্য করেছে। এবং সেই সময়ে শ্রীধর যতগুলো অন-লাইন টেস্ট দিয়েছেন তার সবগুলোতেই দারুণ রেজাল্ট করেছেন।

শ্রীধরকে নিয়ে বলরাম পাট্টা খুব গর্ব অনুভব করতেন। একটা সময়ের পরে তিনি শ্রীধরকে সত্যি-সত্যি নিজের ভাই বলে ভাবতে শুরু করেন। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ওঁর এই ভাবনা অটুট ছিল।

রঙ্গপ্রকাশ ছোট-ছোট পা ফেলে পায়চারি করছিলেন। কী এক কৌতূহলে তিনি কনফারেন্স রুম ওয়ানের কাচের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

স্বচ্ছ দরজা ভেদ করে রঙ্গপ্রকাশের দৃষ্টি দূরে পৌঁছে গেল।

একটা কাচের ঘর দেখতে পাচ্ছিলেন। সেই ঘরের দরজায় হলোগ্রাম দিয়ে রঙিন ডিজাইন করে লেখা রয়েছে 'ভিজিটর'।

ঘরের ভেতরে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রীধর। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, একটা চাপা অস্থিরতা ওঁর ভেতরে কাজ করছে। শরীরের ওজনটা বারবার এক পা থেকে আর-এক পায়ে নিচ্ছেন, থেকে-থেকেই তাকাচ্ছেন স্টেইনলেস স্টিলের প্যাঁচানো সিঁড়ির দিকে।

একটু পরেই কালো য়ুনিফর্ম পরা তিনজন লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। কাচের দেওয়ালে পেরিয়ে শ্রীধর পাট্টাকে দেখতে পেল। সুতরাং লক্ষ্য স্থির করে তিনজনে দম দেওয়া খেলনা পুতুলের মতো 'ভিজিটর' লেখা ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল।

শ্রীধর কাছে পৌঁছে ওরা মিলিটারি কায়দায় স্যালুট ঠুকল।

শ্রীধর একচিলতে হেসে ওদের অভিবাদন ফিরিয়ে দিলেন।

তিনজনের মধ্যে যার বয়েস একটু বেশি সে-ই বোধহয় সিকিওরিটি চিফ—কারণ, তার য়ুনিফর্মের বুকের কাছে লাল ও নীল রঙের দুটো কাপড়ের স্ট্রিপ, আর তার ওপরে চারটে করে মেটাল স্টার।

বছর চল্লিশের মানুষটার লম্বাটে মুখ যেন তামাটে পাথরে খোদাই করা। চোখ দুটো ছোট-ছোট। দু-গাল এমন বসে গেছে যে, হঠাৎ করে প্রেত বলে মনে হয়।

মাথার টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে চিফ বলল, 'স্যার, এই যে—এরা দুজন—

কুশিয়া চতুর্বেদী আর নন্দরাম সরখেল। ওরা একটা টেররিস্ট গ্রুপের কিছু টপ সিক্রেট ইনফরমেশান লাকিলি জানতে পেরেছে।... সেই...সেই ইয়েগুলো আপনাকে জানাতে চায়। ফার্স্ট হ্যান্ড...।'

শ্রীধর কুশিয়া আর নন্দরামকে দেখলেন। শুধু দেখলেন না, ঠান্ডা দৃষ্টিতে মেপেও নিলেন। বয়েস খুব বেশি হলে চব্বিশ কি পঁচিশ। দুজনেরই মুখে একটা 'খোকা-খোকা' ভাব। নিষ্পাপ চোখ, তেলতেলে মুখ, চওড়া গোঁফ।

সব মিলিয়ে মুখ দুটোয় বেশ মিল আছে।

বেশ কয়েক সেকেন্ড পর শ্রীধর চিফের দিকে তাকলেন। তারপর হাতের ইশারায় চিফকে ডিসমিস করে দিলেন, বললেন, 'আপনি এবার আসতে পারেন...।'

ঘরের এক কোণে একটা বড় সোফা রাখা ছিল। সেটার দিকে ইশারা করে কুশিয়া আর নন্দরামকে বসতে বললেন শ্রীধর। ওরা বাধ্য ছাত্রের মতো 'স্যার'-এর কথা শুনল। সোফার কাছে গিয়ে পাশাপাশি বসে পড়ল দুজনে।

নিউ সিটির টেররিস্ট গ্রুপ সত্যিই বেশ চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীধরের খুব ছোটবেলায় পিস ফোর্সের যে-বিদ্রোহ হয়েছিল বলরাম পাট্রা তার আগুন নেভাতে পেরেছিলেন। বলরাম জানতেন, যদি একটা মানুষের জীবনযাপনের সব আরাম তাকে উপহার দেওয়া যায় তা হলে সে আর বিদ্রোহ করবে না। তাই নিউ সিটির মানুষের রোজকার জীবনের যা-যা বস্তুতান্ত্রিক চাহিদা, যদি নিখুঁতভাবে তার নিয়মিত জোগান দেওয়া যায়, তা হলে কারও আর কোনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকবে না।

সেই পথই ধরেছিলেন বলরাম। পিস ফোর্সের গার্ডদের কোনও অভাব রাখেননি, কিন্তু একইসঙ্গে তাদের ওপরে গোপন নজরদারির তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু বলরাম পাট্রা আগুন নেভালেও ছাই থেকে গিয়েছিল। আর সেই ছাইয়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিল আগুনের কিছু কণা। সেই কণা থেকেই মাঝে-মাঝে জ্বলে উঠত নতুন আগুন। ছোটখাটো অসন্তোষ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ।

কেন এই অসন্তোষ, বিদ্রোহ, তা বলরাম বুঝতে পারতেন না। তার কারণ, বস্তুতান্ত্রিক চাহিদার বাইরেও যে মানুষের চাহিদা থাকে সেটা তিনি বোঝেননি। তাই শিকারির গুলিতে একটা পাখির মৃত্যু হলে অন্য একজন মানুষ কেন দুঃখ পাবে সেটা বলরাম বুঝতেন না। বুঝতে পারতেন না, কয়েকটা প্রজাপতি আগুনের আঁচে পুড়ে মরলে কেন মানুষ কষ্ট পাবে। সবসময় ভাবতেন, না, এর কোনও লজিক নেই। তেমনই ভাবতেন সুপারগেম্স কর্পোরেশনের ডিজাইন করা মনোহারী সব খেলায় কোনও পার্টিসিপ্যান্ট আহত কিংবা নিহত হলে নিউ সিটির কেউ কেন দুঃখ পাবে। অচেনা, অজানা, অনাত্মীয় কোনও মানুষ মারা

গেলেও কারও দুঃখ পাওয়া উচিত নয়। এইসব ইল্‌লজিক্যাল ব্যাপারের কোনও মানে হয় না।

বলরাম পাট্রা নিজেকে যথেষ্ট লজিক্যাল মানুষ বলে মনে করতেন। তাই ওঁর যান্ত্রিক লজিকের কাঠামো দিয়ে এইসব 'আলতু-ফালতু' ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন—কিন্তু পারতেন না।

শ্রীধর পাট্রাকে বলরাম নিজের জেরক্স কপি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেটা করতে গিয়ে দেখেছিলেন, শ্রীধর যেন আগে থেকেই বলরামের জুতোয় পা গলিয়ে বসে আছেন।

সুতরাং বলরামের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। নিজের হাতে তিনি বলতে গেলে দ্বিতীয় বলরাম পাট্রা তৈরি করে গিয়েছিলেন। নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, ভাবনা—সবই তিনি শ্রীধরের মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

তবে শ্রীধর কিন্তু দ্বিতীয় বলরাম হননি। বরং বলরামকে বেশ কয়েকগুণ ছাপিয়ে গিয়েছেন। বলরাম পাট্রা যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে এই 'বেশ কয়েক গুণ' বলরামকে দেখে খুশি হতেন। এবং, এটা মনে রাখতে হবে, বলরাম পাট্রাকে খুশি করা বেশ শক্ত কাজ ছিল।

বলরাম যেভাবে ছোটখাটো বিদ্রোহ বা বিক্ষোভগুলোর মোকাবিলা করতেন, শ্রীধরও একইভাবে সেগুলো নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তিনি নিউ সিটির বাসিন্দাদের এটা বোঝাতে চেয়েছেন এইসব বিদ্রোহীরা আসলে টেররিস্ট, সন্ত্রাসবাদী। এরা অকারণে নির্বিচারে নিরীহ মানুষকে খুন করে। সেটা বোঝাতে গিয়ে শ্রীধর পাট্রা বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষকে গোপনে কোতল করে তার দায় বিদ্রোহীদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তা ছাড়া সারা শহর জুড়ে গোপন নজরদারির কাজ আরও ব্যাপক, আরও শক্তিশালী করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও...।

শ্রীধর চুপচাপ দাঁড়িয়ে কুশিয়া আর নন্দরামকে লক্ষ করছিলেন। তারই মধ্যে কখন যেন স্যাটেলাইট ফোনটা পকেট থেকে বের করে আবার হাতে তুলে নিয়েছেন।

একটু অপেক্ষা করার পর শ্রীধর বললেন, 'কী বলবে বলো...।'

কুশিয়া তখন বলতে শুরু করল, 'স্যার...মার্শাল, স্যার...কী হয়েছে বলছি।' কয়েকবার ঢোক গিলল কুশিয়া। তারপর ঃ 'মার্শাল, স্যার, ডি, জি আর এম জোনে টেররিস্ট গ্রুপের বেশ কয়েকজন লোক আছে। ওদের কাছে আর্মসও আছে। আমি আর নন্দরাম...' নন্দরামের দিকে তাকাল কুশিয়া ঃ 'গতকাল ওই তিনটে জোনে সিক্রেট প্যাট্রলে ছিলাম। ঘুরতে-ঘুরতে আমরা এম জোনের টুয়েল্‌ভ কমা সেভেন্টি এইট কো-অর্ডিনেটে যাই। সেখানে একটা শপিং মলে ঢুকি। আমরা...আমরা ফুড প্লাজায় একটা টেবিলে বসে...আমরা খাবারের অর্ডার দেব বলে ভাবছিলাম। তখন পাশের টেবিলে বসা দুজন লোকের কথা আমাদের

কানে এল...।' নন্দরামের দিকে তাকিয়ে কুশিয়া বলল, 'এবার তুমি বলো...।'

নন্দরাম সোফায় বসার পর থেকেই উসখুস করছিল। এখন একটু নড়েচড়ে বসে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'স্যার, ওদের কথার পয়েন্ট্সগুলো আমি লিখে এনেছি। কয়েকটা ফোন নাম্বারও টুকেছি। ডি আর জি জোনে ওদের কনট্যাক্ট আছে। এই দেখুন...' বলে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল নন্দরাম।

তার পরের ঘটনাগুলো শ্রীধর যেন স্লো মোশানে দেখতে পেলেন।

নন্দরাম ওর পকেট থেকে পয়েন্ট্স লেখা কাগজ বের করার বদলে একটা ০.২২ ক্যালিবারের হ্যান্ডগান বের করে নিয়েছে, এবং লেসার পয়েন্টার লাগানো ছোট্ট পিস্তলটা ধীরে-ধীরে উঁচিয়ে ধরছে শ্রীধরের দিকে।

'ওয়ালথার টি-পি-এইচ স্টেইনলেস' ডাব্‌ল অ্যাকশন হ্যান্ডগান। ম্যাট ফিনিশ স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। ওজন মাত্র ৩৯৫ গ্রাম। ছ'রাউন্ড গুলি ছোড়া যায়। পিস্তলের হাতলটা কালো রঙের সিনথেটিক মেটিরিয়াল।

চেহারায় ছোটখাটো কিন্তু বেশ কাজের এই হ্যান্ডগান দিব্যি প্যান্টের পকেটে এঁটে যায়।

কুশিয়াও কিন্তু বসে ছিল না। নন্দরামকে অনুকরণ করে সে-ও একটা ওয়ালথার টি-পি-এইচ স্টেইনলেস পকেট থেকে বের করে নিয়েছে এবং সেটা তাক করছে শ্রীধরের দিকে।

'আমরাই সেই টেররিস্ট, মার্শাল, স্যার—।' কুশিয়া দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় বলল।

●

এরকম সংকটের মুহূর্ত শ্রীধর পাট্টার জীবনে অনেক এসেছে। তিনি যখন চোদ্দো বছরের পিলটু তখন থেকেই। সুতরাং শ্রীধরকে কেউ চমকে দিতে পারে না, ওঁর কাছে 'অপ্রত্যাশিত' বলে কিছু নেই। আসলে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হওয়াটা যে কত বড় 'যোগ্যতা' শ্রীধর পাট্টা তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

নন্দরাম এবং কুশিয়া যতই সিকিওরিটি ফোর্সের সদস্য হোক ওরা কখনওই শ্রীধর পাট্টার কাছে সন্দেহের ওপরে ছিল না—বরং বলা যায়, সন্দেহের অনেকটা নীচে। আসলে শ্রীধরের কাছে—একমাত্র তিনি নিজে ছাড়া—আর কেউই সন্দেহের ওপরে নয়।

সুতরাং ভাবলেশহীন শ্রীধর নিজস্ব অভিনব পদ্ধতিতে এই 'গেরিলা' আক্রমণের জন্য তৈরি ছিলেন। আর সেইজন্যই স্যাটেলাইট ফোনটা তিনি হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। নন্দরাম পকেট থেকে হ্যান্ডগান বের করে নেওয়ামাত্রই

তিনি স্যাটেলাইট ফোনের একটি বিশেষ বোতাম টিপেছেন এবং তৎক্ষণাৎ একটা জোরালো ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড স্বচ্ছ দেওয়ালের মতো নন্দরামদের কাছ থেকে শ্রীধর পাট্রাকে আলাদা করে দিয়েছে।

নন্দরাম ফায়ার করেছিল। তার কয়েক লহমা পরে কুশিয়াও। কিন্তু ফোর্স ফিল্ডের শিল্ড হাইস্পিড মেটাল বুলেটগুলোকে রুখে দিল। ওদের কাইনেটিক এনার্জি বদলে গেল থার্মাল এনার্জিতে। হাই টেম্পারেচারে ওগুলো প্লাজমা হয়ে গেল। সেই প্লাজমাকে ফোর্স ফিল্ড ট্র্যাপ করে নিল।

নন্দরাম আর কুশিয়া ফায়ার করেই যাচ্ছিল। ফোর্স ফিল্ড যেহেতু চোখে দেখা যায় না তাই ব্যাপারটা যে ঠিক কী হচ্ছে সেটা ওরা ঠাহর করতে পারছিল না। শুধু দেখছিল, ভাবলেশহীন পাথরের মুখ নিয়ে শ্রীধর পাট্রা একইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং মরা মাছের চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে 'বিপ্লব' অথবা 'বিদ্রোহ' শেষ হলে নন্দরাম আর কুশিয়া হকচকিয়ে গেল। শয়তানটা এখনও দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আঁচড়হীন।

এরপর উত্তেজনা এবং বিদ্রোহের জোশ বিদ্রোহীদের দিয়ে যা করিয়ে থাকে নন্দরাম আর কুশিয়াও তাই করল।

হ্যান্ডগান উদ্যত হাতুড়ির মতো বাগিয়ে ধরে ওরা ক্ষিপ্তের মতো ছুটে এল শ্রীধরের দিকে।

এই ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সঙ্গে শ্রীধর ভীষণ পরিচিত। তাই চমকানোর কোনও প্রশ্নই উঠল না। শুধু হাতের মুঠোয় ধরা স্যাটেলাইট ফোনের বোতাম টিপে ফোর্স ফিল্ডের ইনটেন্‌সিটি কমিয়ে 'স্টানিং' লেভেলে নিয়ে এলেন। ফলে নন্দরাম-কুশিয়া ফিল্ডের দেওয়াল ছোঁওয়ামাত্রই শক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে, তার চেয়ে বেশি কিছু হবে না।

এবং তাই হল। দুটো জোয়ান শরীর লুটিয়ে পড়ল 'ভিজিটর' রুমের মার্বেল পাথরের মেঝেতে। ওরা এখন কমপক্ষে দু-ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকবে।

এবার শ্রীধর একচিলতে হাসলেন। ফোনের বোতাম টিপে ফোর্স ফিল্ডকে ডি-অ্যাক্‌টিভেট করে দিলেন।

এই লোকদুটোকে জ্যান্ত রাখাটা খুব জরুরি। কারণ, ওদের কাছে থেকে সিক্রেট টেররিস্ট গ্রুপগুলো সম্পর্কে অনেক খবর পাওয়া যাবে। ফল পিষে যেভাবে ফলের রস বের করা হয় ঠিক সেইভাবে খবরগুলো ওদের ব্রেন থেকে বের করে নেওয়া হবে। তারপর ছিবড়ে ফেলে দেওয়া হবে নেক্রোসিটির কবরস্থানে।

এ ছাড়া আরও কিছু কাজ বাকি।

এই দুটো ছেলে—নন্দরাম আর কুশিয়া—গত সাতদিনে যেসব লোকের

সঙ্গে সরাসরি কিংবা ফোনে যোগাযোগ করেছে তাদের তুলে নিয়ে আসতে হবে। এবং টপ লেভেল সিকিওরিটি গ্রিলিং দিতে হবে। এই সন্দেহভাজনদের তালিকায় যদি কোনও সিকিওরিটি স্টাফ থাকে তা হলে তারও কোনও রেহাই নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শ্রীধর। এই শৌখিন বাড়িটার একটা সিক্রেট বলধর পাত্রা জানতেন—আর ওঁর কাছ থেকে জেনেছেন শ্রীধর পাত্রা। এ ছাড়া আর কেউ সেই গোপন খবরটা জানে না। সেটা হল, এই বাড়ির আনাচেকানাচে সাড়ে সাতষট্টি রকম মডার্ন অটোমেটেড সিকিওরিটির ব্যবস্থা করা আছে। সেগুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশদ আলোচনা করে একটা টেকনিক্যাল বই লিখলে 'মডার্ন সিকিওরিটি সিস্টেম'-এর আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্স প্রায় কাভার্ড হয়ে যাবে। সুতরাং নন্দরাম ও কুশিয়া জাতীয় এলিমেন্টরা যে নাস্তানাবুদ হবে এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তা ছাড়া 'ভিজিটর' রুমে গোপন সিকিওরিটির ব্যবস্থাটা একটু বেশি কড়া—লেভেল ফাইভ। এই লেভেল ফাইভ সিকিওরিটি আর আছে শ্রীধরের বেডরুমে।

মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে সিকিওরিটি চিফের সঙ্গে কথা বললেন শ্রীধর।

'ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান। দুটো সেন্সলেস বডিকে ইন্টারোগেশান প্রসেস-এ পাঠাতে হবে। এ ছাড়া হ্যান্ড্রেড পারসেন্ট ফিজিক্যাল আর সাইকোলজিক্যাল স্ক্যানিং করতে হবে। ছিয়ানব্বই ঘণ্টার মধ্যে আমার ফুল অ্যান্ড ফাইনাল রিপোর্ট চাই। আন্ডারস্টুড?'

'পারফেক্টলি আন্ডারস্টুড, মার্শাল, স্যার...।'

ফোন কেটে দিলেন শ্রীধর। কাচের দেওয়াল ভেদ করে কনফারেন্স রুম নাম্বার ওয়ানের দিকে নজর চলে গেল ওঁর। ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস এদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। বোধহয় এই ঘরে ঘটে যাওয়া রোমাঞ্চকর 'সিনেমা'টা পুরোটাই দমবন্ধ করে দেখেছেন। অবশ্য দেখেও সবকিছু ঠিকঠাক বুঝতে পারেননি। যেহেতু ফোর্স ফিল্ড আর প্লাজমার ব্যাপারটা চোখে দেখা যায় না।

একমিনিটের মধ্যেই দুটো ম্যাগনেটিক মেটাল স্ট্রেচার নিয়ে চারজন ইউনিফর্ম পরা গার্ড চলে এল। সঙ্গে সিকিওরিটি চিফ।

গার্ডদের হাতে গাঢ় সবুজ চাদরের মতো দুটো মোটা কাপড় ছিল। সেগুলো দিয়ে ওরা অজ্ঞান নন্দরাম আর কুশিয়াকে কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত জড়িয়ে দিল। ওদের হাতজোড়া চাদরের মধ্যে বন্দি হয়ে গেল। চাদরে জ্যাকেটের মতো জিপ টানার ব্যবস্থা ছিল। গার্ডরা সেটা টেনে আটকে দিল। তারপর ওদের স্ট্রেচারে শুইয়ে দিয়ে স্ট্রেচারের লুকোনো ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেট অ্যাক্টিভেট করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সবুজ চাদরের ভেতরে লাগানো লোহার পাত চুম্বকের টানে স্ট্রেচারের

সঙ্গে আটকে গেল। এখন কারও সাহায্য ছাড়া নন্দরাম আর কুশিয়া স্ট্রেচার ছেড়ে পালাতে পারবে না।

স্ট্রেচার দুটো নিয়ে ওরা পাঁচজন চলে যেতেই স্যাটেলাইট ফোন পকেটে ঢোকালেন শ্রীধর। তারপর হাততালি দিয়ে হাত ঝাড়লেন। বেরিয়ে এলেন 'ভিজিটর' রুম ছেড়ে।

এবার রঙ্গপ্রকাশের সঙ্গে ওঁর ইকনমিক ইনডেক্স নিয়ে কথা বলতে হবে।

কনফারেন্স রুম নাম্বার ওয়ানে শ্রীধর পাট্রা যখন এসে ঢুকলেন, তখন ওঁকে দেখে রঙ্গপ্রকাশের মনে হল এতক্ষণ 'ভিজিটর' রুমে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো শ্রীধরের জীবনে যেন ঘটেনি—তিনি এতটাই স্বাভাবিক।

শ্রীধরও রঙ্গপ্রকাশকে দেখছিলেন। দেখে বুঝতে চাইছিলেন, শ্রীধরের শত্রু প্রতিরোধের অদ্ভুত পদ্ধতির লাইভ ডেমনস্ট্রেশান রঙ্গপ্রকাশ ঠিকঠাক দেখেছেন কি না।

রঙ্গপ্রকাশ যে সেটা দেখেছেন সেটা ওঁর মুখচোখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলেন শ্রীধর। কিন্তু সামান্য হেসে অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে বললেন, 'আসুন, ডক্টর—বসুন। আমাদের বাকি আলোচনাটুকু সেরে নিই। ওই যে, ইকনমিক ইনডেক্স...।'

আবার মুখোমুখি বসলেন দুজনে।

'ইকনমিক ইনডেক্সটাকে আপগ্রেড করার ব্যাপারে আপনি কিছু ভাবছেন?' গায়ের কালো টি-শার্ট থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে শ্রীধর পাট্রা জিগ্যেস করলেন।

রঙ্গপ্রকাশ কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করলেন। বোধহয় সঠিক উত্তর খুঁজতে চাইছিলেন। তারপর বললেন, 'ভেবেছি...তবে ডেফিনিট পথ কিছু খুঁজে পাইনি। ভাবছি...ভাবছি কারও কাছে লোন নেব...।'

'যদি তাই মনে হয় তা হলে নিন।' ভুরু উঁচিয়ে বললেন শ্রীধর, 'কিন্তু দেখবেন, আপনাকে লোন দিতে গিয়ে তার ই-আই-টা যেন ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে না চলে যায়।'

ক্রিটিক্যাল ভ্যালু। কী সুন্দর কথা! সব জিনিসেরই বোধহয় একটা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থাকে। জীবনেরও। ভাবলেন ডক্টর।

যেমন শ্রীধরের মতে জিশানের দাম ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে। না, ভুল ভেবেছেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধরের কাছে বোধহয় সবার জীবনের দামই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে। শুধু নিজের জীবনটা ছাড়া।

'না, স্যার।' শ্রীধরের মন্তব্যের জবাব দিলেন, 'সেটা আমি খেয়াল রাখব...।'

খেয়াল রাখবেন বটে, কিন্তু রঙ্গপ্রকাশ টাকা ধার নেবেন কার কাছে?

মনে-মনে বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের তালিকার ওপরে অনুসন্ধানী নজর বুলিয়ে নিলেন।

নাঃ, সেরকম কেউ নেই। এমনকী শ্বশুরবাড়ির কথাও ভাবলেন। সেখানেও সমাধান অমিল। কারণ, পর্ণমালাদের বাড়ির অবস্থা এমন যে, রঙ্গ প্রকাশকে ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর ওপরে তুলতে গেলে ওদের ইকনমিক ইনডেক্স ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে চলে যাবে।

এ ছাড়া, কারও কাছ থেকে লোন পেলেও রঙ্গপ্রকাশের আরও একটা সমস্যা রয়েছে। সিমানের যা লাইফস্টাইল তাতে লোন নেওয়া টাকা উড়িয়ে দিতে ও খুব বেশি সময় নেবে না। ই-ল্যান্ড আর কম্‌পিটিশানের গেমগুলোই ওর দফারফা করে দেবে।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। আর মাত্র তিন মাস সময়। মানে নব্বই দিন। তার মধ্যে আজ একটা দিন পার হয়ে গেল। বাকি থাকবে উননব্বই দিন। তার মধ্যে যা হোক কিছু একটা করতে হবে।

শ্রীধর যেন ডক্টরের হিসেবটা মনে-মনে পড়ে ফেললেন। বললেন, 'আজকের দিনটা বাদ দিলে আর মাত্র উননব্বই দিন...। কাউন্ট ডাউনটা খেয়াল রাখবেন, ডক্টর...।'

আচ্ছা, শ্রীধরকে কি সিমানের কথা বলা যায়? বলা যায় উড়নচণ্ডী নেশাতুর ছেলের কথা? ওঁর কথা শুনে শ্রীধর হাসবেন না তো?

'একটা কথা বলব, স্যার?'

'কী কথা?' ভুরু কুঁচকে তাকালেন শ্রীধর ঃ 'বলুন...।'

শ্রীধর জানেন, রঙ্গপ্রকাশ কখনওই নিজের জন্য কোনও সুবিধে চান না। শ্রীধরের পার্সোনাল থেরাপিস্ট হওয়ার সুবাদে তিনি শ্রীধরের অনেক কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে অনেক সুযোগ চাওয়ারও সুযোগ পেয়েছেন—কিন্তু চাননি।

মানুষটার জন্যে শ্রীধরের করুণা হল। আত্মসম্মান আর আত্মমর্যাদা বড় জ্বালা! সবসময় অন্তরে-অন্তরে জ্বালিয়ে মারে। দেখি মানুষটা কী বলতে চায়। ভাবলেন শ্রীধর। যদি কোনও সুযোগ চায় বা টাকা ধার চায় তা হলে শ্রীধর এককথায় দিয়ে দেবেন। আজ কেন যেন ডক্টর বিশ্বাসের প্রতি শ্রীধরের দাক্ষিণ্যের একটা ঝোঁক চেপেছে।

'আমার ছেলেকে ফেরানো যায় না?' রঙ্গপ্রকাশের গলাটা সর্বহারার মতো শোনাল।

শ্রীধর পাট্টা কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। প্রশ্নটার অর্থ ওঁকে পাশ কাটিয়ে গেল।

'ফেরানো মানে?'

'ফেরানো মানে...' রঙ্গপ্রকাশ মরিয়া হয়ে বলতে শুরু করলেন। কার সামনে তিনি কী বলছেন সেটা ভুলে গেলেন ঃ 'সিমান...মানে, আমার ছেলে...ও...ও খুব বাজে রাস্তায় চলে গেছে। ও নেশা করে। সুপারগেম্‌স কর্পোরেনের কম্‌পিটিটিভ গেমসগুলোয় পাগলের মতো বাজি ধরে। ওকে...ওকে দেখে মনে হয়...মনে হয়...ওটাই জীবন। এসব ছাড়া জীবনে আর কিছু নেই। ওর...ওর নেশার খিদে মেটাতে গিয়ে আমার সমস্ত সেভিংস তলানিতে এসে ঠেকেছে। আমার ই. আই. ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে গেছে।' দু-হাতে মাথা আঁকড়ে ধরলেন রঙ্গপ্রকাশ। কান্নার দমক ছিটকে বেরোতে চাইল গলা দিয়ে। ওঁর চোয়াল দুটো ব্যথা করছিল, চোখ জ্বালা করছিল। কান্না চেপে কোনওরকমে বললেন, 'স্যার, বিশ্বাস করুন...আমাদের তিনজনের জীবনটাই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে গেছে। সিমানকে যদি ফেরাতে পারি তবেই আমি আর পর্ণমালা সবচেয়ে বেশি খুশি হব। বুঝব, আমাদের তিনজনের লাইফ ইনডেক্স ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর ওপরে উঠেছে। সেই জীবনগুলোকে নিয়ে বাঁচা যায়।' মাথা থেকে হাত সরালেন রঙ্গপ্রকাশ। সজল চোখে শ্রীধরের দিকে তাকালেন। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে আচমকা আবেগে শ্রীধরের হাত দুটো চেপে ধরলেন ঃ 'স্যার, প্লিজ হেল্প করুন। আমার...আমার ছেলেটাকে ফেরানোর পথ বলুন। ওকে বাঁচান। প্লিজ, স্যার...।'

রঙ্গপ্রকাশ কান্নাকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। ভেঙেচুরে গেলেন।

শ্রীধর পাট্টা দুঃখী মানুষটার হাত থেকে নিজের হাত দুটো আলতো করে ছাড়িয়ে নিলেন। খানিকটা অবাক চোখে নিউ সিটির সাইকো অ্যানালিসিস সেন্টারের চিফ সাইকোলজিস্টকে দেখতে লাগলেন। সন্তানের ভালোর জন্য পিতার আকুলিবিকুলির মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে চাইছিলেন। কিন্তু ঠিকঠাক পারছিলেন না। কারণ, শ্রীধর পাট্টা সংসারে একাকী। 'বাবা' ডাকের মর্মস্পর্শিতা কিংবা অন্তর্ভেদী শক্তি—দুটোর কোনওটাই শ্রীধরের জানা নেই। তাই নিথর নয়নে অসহায় মানুষটার দু-গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের রেখার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শ্রীধর বললেন, 'ডক্টর, আই ফিল ফর য়ু। কিন্তু আপনি তো জানেন গেম শো হচ্ছে নিউ সিটির এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড। বিনোদনকে আমরা যে-লেভেলে নিয়ে গেছি সেটা আর কোনও সিটি পারেনি। আমাদের শহরের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ ডিরেক্ট্‌লি কিংবা ইনডিরেক্ট্‌লি এইসব মাইন্ডব্লোয়িং গেম্‌সের সঙ্গে জড়িত। আমাদের শহরের স্ট্রং ইকনমি এইসব গেম্‌সের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি কি জানেন, পৃথিবীর কত শহর এই একটা কারণে আমাদের কীরকম ঈর্ষা করে! আমরাই দুনিয়ার এক নম্বর, ডক্টর বিশ্বাস, এক নম্বর! আর সেই একনম্বর শহরের নাগরিক আপনি—অন্তত এখনও। য়ু শুড ফিল প্রাউড অ্যাবাউট ইট...।'

শ্রীধর থামলেন। ওঁর মুখ-চোখে লালচে আভা। আর তার সঙ্গে গর্বের ছটা।

'কিন্তু আমার...আমার ছেলেটা?'

পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করলেন শ্রীধর। শূন্যে মুখ উঁচিয়ে শিশি থেকে দু-ফোঁটা তরল জিভে ঢাললেন। টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে চটাস-চটাস শব্দ করলেন দুবার। মাথাটা দুপাশে ঝাঁকালেন। ঘন-ঘন শ্বাস ফেললেন কয়েকবার। তারপর হাঁটুতে ছোট্ট চাপড় মেরে বললেন, 'কন্ট্রোল। কন্ট্রোলই হচ্ছে আসল। ভালো থাকার পাসওয়ার্ড। যে-কোনও ধরনের এক্সাসাইটমেন্টই একটা নেশার মতো। সেটা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তবে সেটাকে স্ট্রং রেসিস্ট্যান্স দিয়ে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে হয়...।'

শ্রীধর আরও অনেক কথা বলছিলেন, কিন্তু তার একটি বর্ণও রঙ্গপ্রকাশের কানে ঢুকছিল না। মনে হচ্ছিল, শ্রীধর কোনও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের বই পড়ে শোনাচ্ছেন।

রঙ্গপ্রকাশের অন্তরে একটা হাহাকার ঢেউ তুলল। শ্রীধর কেতাবি জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন আর ওঁর প্রাণের ছেলেটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। মাপে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

এরপর যদি সিমানকে আর দেখতে না পাওয়া যায়!

এ-কথা ভাবামাত্রই রঙ্গপ্রকাশের শরীরে একটা শিরশিরে অনুভূতি খেলে গেল। গায়ে কাঁটা দিল।

রঙ্গপ্রকাশ বুঝলেন, শ্রীধর পাট্টার কাছে বিনোদন এবং বৈভব হল দুই 'শ্রদ্ধেয়' দেবতা। আর হিংসা এবং নিষ্ঠুরতা তাঁদের বাহন।

একজন অসহায় আশঙ্কিত চুরমার পিতা বসে-বসে ভাবতে লাগলেন, কী করে তাঁর একমাত্র ছেলেকে সঠিক পথে ফেরানো যায়।

●

ঘরের বাইরে গ্লো-সাইন দিয়ে লেখা 'জয় রুম'। শুধু আনন্দের জন্য তৈরি ঘর।

ঘরের দেওয়ালগুলো সব কাচের তৈরি। কিন্তু সাধারণ কাচের নয়—আয়না-কাচ। ঘরের ভেতর থেকে বাইরের সবকিছু আবছাভাবে দেখা গেলেও বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না—মনে হয় যেন আয়না।

বিশাল ঘরটার ভেতরে নানান রঙের ধোঁয়া উড়ে বেড়াচ্ছিল। সুতোর তৈরি সাপের মতো সূক্ষ্ম ধোঁয়ার রেখাগুলো দেখে মনে হয় যেন কেউ শূন্যে স্বপ্নের জাল বিছিয়ে দিয়েছে।

ঠিক স্বপ্ন না হলেও এই ধোঁয়া স্বপ্ন তৈরি করে। কারণ, নানান ধরনের ড্রাগ থেকে তৈরি এই নেশার ধোঁয়ায় ঘণ্টাখানেক কাটালে মাথা ঝিমঝিম করে, শরীরটা পাখির মতো হালকা মনে হয়। সচেতন মন আড়ালে চলে গিয়ে অবচেতন মন তখন রাজত্ব শুরু করে। সে তখন দু-কাঁধে দুটো সুন্দর ডানা লাগিয়ে দেয়। তারপর আচমকা এক উড়ান দিয়ে আশ্চর্য সব স্বপ্নের জগতে বেড়াতে নিয়ে যায়। ভাসতে থাকা শরীর আর ভাসতে থাকা মন তখন অপরূপ আনন্দের স্বাদ নিয়ে বেড়ায়।

সিমান সেই আনন্দের জগতেই ভেসে বেড়াচ্ছিল।

'জয় রুম'-এ হালকা মিউজিক বাজছিল। আর সেই তালে-তালে ঘরের চার দেওয়ালে আলোয় আঁকা চঞ্চল ঝরনার ছবি রং পালটাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল পূর্ণিমার রাতে অপরূপ এক জঙ্গলের মাঝে ঝরনা ঘেরা কোনও প্রাকৃতিক উদ্যানে সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তিমিত মিউজিকের ফাঁকে-ফাঁকে ঝরনার কলরোল শোনা যাচ্ছিল। আর ঘরের ঠিক মাঝখানে এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এলোমেলো ছন্দে শরীরে ঝাঁকুনি তুলছিল।

ওদের বয়েস সতেরো কি আঠেরো থেকে উনিশ-কুড়ির মধ্যে। পরনে আধুনিক রঙিন পোশাক। জিন্স, স্লিভলেস, ক্যাপ্রি, কার্গো, হলটার, ভেস্ট, আরও কতরকম। হাতে-পায়ে, পিঠে কিংবা গলায়-গালে অনেকেরই ফ্লুওরেসেন্ট ট্যাটু আঁকা। কারও-কারও ট্যাটু লেসার হলোগ্রাম দিয়ে তৈরি। প্রযুক্তির কী এক কৌশলে সেগুলো শরীরের চামড়ায় একেবারে জড়িয়ে গেছে।

'জয় রুম'-টা মাপে বিশাল। কমপক্ষে তিরিশ ফুট বাই পঞ্চাশ ফুট। তারই ঠিক মাঝখানটায় মিউজিক, আলো আর নাচের ব্যাপারটা চলছিল। সেখানে রঙিন ছায়া মাখা শরীর নিয়ে সিমান নাচছিল, আর ওপরদিকে নাক উঁচিয়ে ধরে বড়-বড় শ্বাস টানছিল। তাতে ওর নেশাটা আরও গাঢ় হচ্ছিল।

'জয় রুম'-এর মেঝেতে কৃত্রিম ঘাসের গালিচা পাতা। তার রং আর ধরন এমন যে, আসল ঘাসও হার মানবে। নাচতে-নাচতে তরুণ-তরুণীদের কেউ-কেউ—অথবা, কিশোর-কিশোরীদের কেউ কেউ—সেই ঘাসের মেঝেতে শুয়ে পড়ছিল। আবার একটু পরেই শরীর ভাঁজ করে ঝটকা মেরে উঠে পড়ছিল। তারপর নাচছিল।

হঠাৎই মিউজিক স্তিমিত হল। লুকোনো কোনও স্পিকার থেকে একটি মেয়ের মিষ্টি গলা শোনা গেল। গলাটা একইসঙ্গে মিষ্টি এবং নেশাতুর।

'ফোক্স, নাউ উই স্টপ ডান্স অ্যান্ড মিউজিক। নাচ আর বাজনা এবার শেষ। শুরু হবে হলোগ্রাম ফাইট গেম। তোমাদের হট ফেবারিট শো...।'

ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে খুশির হল্লা শোনা গেল। ছায়া-ছায়া মানুষগুলো 'জয় রুম'-এর মাঝখান থেকে সরে গেল দেওয়ালের দিকে। ফলে মাঝখানটায় বেশ

খানিকটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়ে গেল।

তারপর মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। রঙিন ধোঁয়ার সুতোগুলোর বেশিরভাগটাই কোনও লুকোনো সাকশান ফ্যান যেন মুহূর্তে গিলে নিল। এবং সেগুলো মিলিয়ে যেতেই ঘরের মেঝেতে দুটো আলোকিত শরীর জন্ম নিল।

লেসার দিয়ে তৈরি দুটো হলোগ্রাম শরীর। একটা লাল, অন্যটা নীল। দুটো শরীরই চাপ-চাপ পেশি দিয়ে তৈরি। ওদের পরনে শুধু ধপধপে সাদা দুটো জাঙ্গিয়া।

শরীর দুটোর মাঝে চার-পাঁচ হাতের দূরত্ব। ওরা লড়াইয়ের ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রয়েছে।

স্কিন টাইট কালো পোশাক পরা আট-দশজন লোক 'জয় রুম'-এ ঢুকে পড়ল। ওদের বুকে 'জয় রুম'-এর ফ্লুওরেসেন্ট লোগো জ্বলজ্বল করছে। ওরা ইলেকট্রনিক প্যানেল বসানো চারটে কাউন্টার মূর্তি দুটোকে ঘিরে বসিয়ে দিল। ফলে লড়াকু দুজন যোদ্ধার জন্য একটি চৌকোনা এরিনা তৈরি হয়ে গেল। ঘরের হুল্লোড় করা ছেলেমেয়েগুলো ইলেকট্রনিক প্যানেলের কাছে ভিড় করে এসে দাঁড়াল।

এখুনি হলোগ্রাম ফাইট গেম শুরু হবে। শুরু হবে লাল আর নীলের লড়াই। র‍্যান্ডমাইজ করা সফ্‌টওয়্যার যোদ্ধা দুজনকে পরিচালনা করবে। দাবার চালের মতো লড়াইয়ের ছোট-ছোট চাল অ্যাক্টিভেট করবে। তবে কখন কোন চাল অ্যাক্টিভেটেড হবে কেউ বলতে পারবে না। তার কারণ র‍্যান্ডমাইজেশান।

কিন্তু এর পরেও একটা মজা আছে।

লড়াই দেখতে-দেখতে যে-কোনও দর্শক কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপে লড়াইয়ের কোনও একটা মুভ অ্যাক্টিভেট করতে পারে। এর ফলে সফ্‌টওয়্যার জেনারেটেড র‍্যান্ডম সিকোয়েন্সের ধরন বদলে যেতে পারে। এবং তখন লড়াইটা হয়ে উঠবে আরও আনপ্রেডিক্টেব্‌ল।

স্বাভাবিকভাবেই এই হলোগ্রাম যোদ্ধা দুজন কখনও ক্লান্ত হয় না। তবে ওরা হাঁপায়, ওদের শরীরে ঘাম দেখা দেয়। স্পেশাল টেকনিক দিয়ে এগুলো ডিজাইন করা হয়েছে ফাইট গেমটাকে রিয়েলিস্টিক করার জন্য।

এই লড়াই চলবে ঠিক এক ঘণ্টা। তাতে যে-হলোগ্রাম ফাইটার পয়েন্টে জিতবে তার শরীরটা এরিনার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যজন শুয়ে পড়বে মেঝেতে। উইনারের হয়ে যারা ইলেকট্রনিক প্যানেলে বোতাম টিপে লড়াইয়ের মুভ অ্যাক্টিভেট করেছে তাদের প্রাইজ দেওয়া হবে। তাদের চিনে নেওয়া হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অটো-ম্যাচ টেকনিকের মাধ্যমে।

এ ছাড়া এই দুজন ফাইটারকে নিয়ে বাজি ধরায় কোনও বাধা নেই।

হলোগ্রাম ফাইট গেম শুরু হল। তার সঙ্গে মানানসই সাউন্ড এফেক্ট।

সঙ্গে-সঙ্গে নেশাতুর মানুষগুলো হাত-পা ছুড়ে চিৎকার শুরু করল।

'রেড! রেড!'

'ব্লু! ব্লু!'

একইসঙ্গে দর্শকদের অনেকেই কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপে 'রেড' আর 'ব্লু'-র জন্য লড়াইয়ের নানানরকম মুভ অ্যাক্টিভেট করছিল। আর কালো পোশাক পরা লোকগুলোর কাছে গিয়ে টাকা দিয়ে বাজি ধরছিল।

সিমানও চুপ করে ছিল না। উত্তেজনা আর আগ্রহ নিয়ে যুযুধান ফাইটার দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর থেকে থেকেই উল্লাসের চিৎকার করে কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপছিল। ওর চোখে হলোগ্রাম ফাইটারদের লাল-নীল ছায়া চঞ্চলভাবে নড়ছিল।

সিমানকে দেখে মনে হচ্ছিল, এই লড়াইটাই ওর একমাত্র পৃথিবী। একটু আগেই ও 'রেড' ফাইটার জিতবে বলে আট হাজার টাকা বাজি ধরেছে। যদি ও জেতে তা হলে হাতে-হাতে পাবে ষোলো হাজার টাকা। তাতে আরও কিছুদিন আনন্দ আর ফুর্তি করা যাবে। বাবার কাছ থেকে ইদানীং হাতখরচের টাকা পেতে একটু অসুবিধে হচ্ছে।

এ-কথাটা মনে হতেই সিমানের মধ্যে একটা বিরক্তির ভাব উথলে উঠল।

লড়াই ক্রমে ভয়ংকর হয়ে উঠতে লাগল। যোদ্ধা দুজন হলোগ্রাম ইমেজ হলে হবে কী, ওদের শরীর রক্ত-মাংসের শরীরের মতোই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল। হাতে-কপালে কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। মুখ দিয়ে যন্ত্রণার 'উঃ! আঃ!' শব্দও বেরোচ্ছিল।

ঘরের প্রায় সিলিং-এর কাছাকাছি শূন্যে ভেসে আছে একটা হলোগ্রাম স্কোরবোর্ড। তাতে ডিজিটাল হরফে নীল এবং লাল রঙে যথাক্রমে ব্লু এবং রেড-এর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে। লড়াইয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পয়েন্ট বাড়ছে—কখনও লালের, কখনও নীলের।

সবকিছু মানুষের মতো হলেও হলোগ্রাম ফাইটাররা লড়াই করছিল অতিমানবের মতো। এমন সব মার কিংবা মারপ্যাঁচ ব্যবহার করছিল যা একমাত্র সিনেমার স্পেশাল এফেক্টের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব। ওদের লড়াইয়ের অভিনব মুভগুলো দেখতে-দেখতে দর্শকের দল উত্তেজনায় চিৎকার করছিল।

এসবের মধ্যে হঠাৎ করেই একটা গন্ডগোল শুরু হল।

কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টেপার দখল নিয়ে সিমানের সঙ্গে একটা মেয়ের ঝামেলা লাগল।

মেয়েটার চুলগুলো ছোট, খাড়া-খাড়া। চোখে সবুজ রঙের ফ্লুওরেসেন্ট কাজল। নাকে আর গলায় দুটো সোনার রিং। কপালে চকচকে কী একটা গুঁড়ো



মাখা। তার কণাগুলো জোনাকির মতো ঝিকমিক করছে।

মেয়েটার গায়ে স্লিভলেস শর্ট জ্যাকেট। পায়ে লেদার স্ল্যাক্স, তার ওপরে মেটাল বাটন। ডানহাতে একটা ফানি চকোলেট স্টিক। সেটা মাঝে-মাঝে চুষছে।

ফানি চকোলেট স্টিকটা ঠিক নেশার জিনিস নয়। তবে এটার একটা বিশেষ গুণ আছে। অন্য কোনও কিছু থেকে একবার নেশা হলে ফানি চকোলেট স্টিক সেই নেশার ঝোঁককে বহুক্ষণ ধরে রাখতে সাহায্য করে।

মেয়েটা সিমানকে একটা ধাক্কা মেরে জড়ানো গলায় বলল, 'য়ু স্কাম! ওই কন্ট্রোল প্যানেলের বাট্‌নগুলো তোমার পার্সোনাল প্রপার্টি নয়। লেট মি প্রেস সাম...।'

সিমান রুখে দাঁড়াল কিন্তু মেয়েটার গায়ে হাত তুলল না। নেশা জড়ানো গলায় বলল, 'বোতাম টেপাটাও একটা কম্পিটিশান, সিসি। লড়াই করে জায়গা করে নিয়ে তোমাকে বোতাম টিপতে হবে...।'

'থ্যাংক্‌স ফর দ্য অ্যাডভাইস। আমি ব্লু-র ওপরে এক লক্ষ টাকা বেট করেছি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট ব্লু টু উইন। সো আই ওয়ান্ট দ্য উইনিং মুভস, ও.কে.? উড য়ু প্লিজ গেট লস্ট, ডিউড?'

'হু দ্য হেল আর য়ু?' মেয়েটার মুখের কাছে হিংস্র মুখ নিয়ে এল সিমান। ওর থুতনিতে একচিলতে দাড়ি। গালে একটা ছোট্ট লাল ফুল—লেসার ট্যাটু।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সিমান ঃ 'এখানে তোমাকে নতুন মনে হচ্ছে। য়ু ডোন্ট নো দ্য রুল্‌স। কাম ব্যাক হোয়েন য়ু গ্রো আপ, বিচ!'

সিমান কথাগুলো উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটা নোংরা গালিগালাজ করে উঠল এবং সিমানের গালে সপাটে এক চড় কষাল।

সিমান প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই একটা পালটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল মেয়েটার গালে। মেয়েটার হাত থেকে ফানি চকোলেট স্টিকটা পড়ে গেল।

তারপর যেটা শুরু হল সেটা কিল-চড়-লাথি-ঘুসির বিচিত্র লড়াই। কোনও পুরুষ এবং মহিলার এরকম অসভ্য লড়াই কল্পনা করাও কঠিন।

হলোগ্রাম ফাইটারদের অক্লান্ত লড়াই চলছিল। তাদের ঘিরে দর্শকদের হইহুল্লোড়ও চলছিল। কিন্তু তারই মধ্যে দশ-বারোজন সিমান এবং মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং বিনাপয়সার মজা দেখতে লাগল।

হঠাৎই ওদের কেউ বাজি ধরার ব্যাপারটা শুরু করল। সঙ্গে-সঙ্গে ওরা নিজেদের মধ্যে বাজি ধরতে লাগল। কেউ সিমানকে জেতার জন্য চিয়ার আপ করতে লাগল। আর কেউ মেয়েটাকে।

কিন্তু কেউই ওদের লড়াইটা থামাতে এগিয়ে এল না। বিশৃংখল উল্লাসে

'জয় রুম' তখন কাঁপছে।

সিমান আর মেয়েটির শরীর অক্ষত ছিল না। আঁচড়-কামড়ের চিহ্ন থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে ওদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা তুচ্ছ কারণে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লড়াই করছিল।

হঠাৎই একটি ছেলে 'স্টপ দ্য ফাইট! স্টপ ইট!' বলে চিৎকার করে উঠল। আরও একটি মেয়ে ছেলেটির সঙ্গে গলা মেলাল। ওরা দুজনে ভিড়ের বৃত্ত ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল, আর একইসঙ্গে 'ওদের থামাও! ওদের থামাও!' বলে চিৎকার করে চলল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন ছেলেটাকে লক্ষ্য করে গালাগাল ছুড়ে দিল। এবং তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ঘুসি।

ছেলেটা ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা একটা অভদ্র ধাক্কা ওর পড়ে যাওয়াটা রুখে দিল। আর তারপরই অন্য এক অ্যাঙ্গেল থেকে কেউ ওকে লক্ষ্য করে আর-একটা ঘুসি চালাল।

তারপর ব্যাপারটা চলতেই থাকল। এবং শেষ পর্যন্ত ছেলেটা পড়ে গেল।

ছেলেটির প্রতিবাদী সঙ্গী মেয়েটিও রেহাই পায়নি। ওর কপালেও একইসঙ্গে কিছু খুচরো চড়-থাপ্পড় জুটেছে। ওর একটা চোখ ফুলে গেছে. নাকের পাশে কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। ও কোনওরকমে ভিড়ের বৃত্তের বাইরে পালিয়ে আরও হেনস্থা থেকে বেঁচেছে।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে, সিমান আর ওই মেয়েটির মারপিট যেন একটা মজাদার সাসপেন্স সিনেমা। দু-একজন 'পাগল' ছাড়া কেউই চায় না সিনেমাটা মাঝপথে বন্ধ হোক।

কিন্তু সিনেমাটা একটু পরেই শেষ হল। শেষ করল মেয়েটাই। ও কখন যেন একটা মেটাল কি-রিং বের করে সিমানের গালে বসিয়ে টেনে দিয়েছে।

সিমানের গাল ফাঁক না হয়ে গেলেও ক্ষতটা যে মোটামুটি গভীর সেটা রক্তের ধারা এবং সিমানের যন্ত্রণার চিৎকার শুনে বোঝা গেল।

সিমান ভয়ে ছিটকে পিছিয়ে গেল। একটা হাত আহত গালে চেপে ধরল। চোখে খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা অপমান। আর তার সঙ্গে যন্ত্রণার অশ্রুজল।

সিমানের মুখটা দেখে মায়া হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু জনতার আচরণ দেখে মায়া ব্যাপারটা ওদের মধ্যে আদৌ আছে বলে মনে হল না।

হলোগ্রাম ফাইটার ব্লু এবং রেড তখনও লড়ছিল। হলোগ্রাম স্কোরবোর্ডের হিসেবে ব্লু তখন অনেক এগিয়ে আছে। কিন্তু স্কোর ওলটপালট হয়ে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

সিমানকে স্রেফ ভুলে গিয়ে ছেলেমেয়ের দল আবার হলোগ্রাম ফাইটের উত্তেজনায় ডুবে গেল।

সিমানের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে যাওয়া মেয়েটা অন্য সকলের সঙ্গে মিলেমিশে হাসাহাসি করছিল। আর পকেট থেকে একটা হিলিং স্প্রে বের করে নিজের শরীরের ক্ষতের ওপরে স্প্রে করছিল। তখন একটা ছেলে একটা সবুজ রঙের ফানি চকোলেট স্টিক মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিল। মেয়েটা ওকে হেসে 'থ্যাংকস' জানাল, চকোলেট স্টিকটা চুষতে লাগল।

হলোগ্রাম ফাইট যতই শেষের দিকে এগোতে লাগল চিৎকার আর উত্তেজনার মিটার ততই চড়তে লাগল। সিমান ভিড়ের চক্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আহত নজরে লড়াই দেখছিল আর শরীরের কেটে-ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো মেরামত করার চেষ্টা করছিল। ওর বুকের ভেতরে টিপটিপ করে শব্দ হচ্ছিল। কে জিতবে? রেড, না ব্লু? ওর বাজি ধরা আট হাজার টাকা শেষ পর্যন্ত...।

হলোগ্রাম ফাইট শেষ হতেই চিৎকারের ফোয়ারা ছুটল। তার সঙ্গে তীব্র শিসের আওয়াজ, পশু-পাখির নকল ডাক।

যারা বাজিতে জিতেছে তারা পাগলের মতো হাত তুলে লাফাতে লাগল। আর যারা হেরেছে তাদের চিৎকার, লম্ফঝম্প সব স্তিমিত হয়ে গেল।

রেড ফাইটার শুয়ে পড়েছে মেঝেতে। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ব্লু ফাইটার বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাত তুলে নাড়ছে, এরিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়েই সিমান ভেঙে পড়ল। কাঁদতে শুরু করল। তারপর ওই অবস্থাতেই বসে পড়ল নকল ঘাসের মেঝেতে।

আট হাজার টাকা গেল! এখন তো সম্বল বলতে কিছুই প্রায় নেই! কাল যখন নেশার টানে মনটা আকুলিবিকুলি করবে তখন কী করবে ও? 'জয় রুম'-এর এন্ট্রি ফি কোথা থেকে পাবে? টাকা চেয়ে বাবার কাছ থেকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আর মা? মা তো ওর সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনও কথাই বলে না!

তা হলে?

আগামীকালের নেশার তেষ্টার কষ্ট সিমান যেন এখন থেকেই টের পেতে শুরু করল। ওর গলা শুকিয়ে এল। বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপ তৈরি হল। আর একইসঙ্গে দু-চোখে জলের ধারা বইতে লাগল।

কিছুক্ষণ একইভাবে বসে থাকার পর সিমান চোখ মুছল। নাক টানল কয়েকবার। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল।

না, হাল ছাড়লে চলবে না। ওর কাছে সামান্য যা কিছু টাকা আছে সেটাকেই পুঁজি করে আগামীকালের সন্ধেটা শুরু করতে হবে। যদি ও কয়েকটা ছোট-ছোট বাজি জিততে পারে তা হলেই আর চিন্তা নেই।

কিন্তু ভাগ্য ওকে সাহায্য করবে তো? ও পারবে তো জিততে?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে ভাঙাচোরা সিমান 'জয় রুম' থেকে বেরিয়ে এল।

●

গেম পার্টিসিপ্যান্ট্স্ ক্যাম্পাসের জীবন জিশানের অসহ্যরকম একঘেয়ে লাগছিল। সারাটা দিন ধরে শুধু অ্যানালগ জিম, ডিজিটাল জিমের ট্রেনিং, নানান আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ট্রেনিং, ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, অ্যাথলেটিক অপারেশান্স, কিল গেম সিমুলেটর-এ ট্রেনিং আর সাইকোলজিক্যাল সেশান। এরই ফাঁকে বিকেলে দেড় ঘণ্টার ব্রেক। তখন জিশান আর অন্য পার্টিসিপ্যান্ট্স্রা নানান খেলাধুলো আর আড্ডা-গল্পে মেতে ওঠে।

আড্ডা মারার সময় বা গল্প করার সময় জিশান অবাক হয়ে খেয়াল করে ও হাসছে, আর অন্যান্য প্রতিযোগীও তার ব্যতিক্রম নয়। ওদের কেউ-কেউ বেশ জোরে-জোরে হেসে উঠছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাচ্ছে, কোন পরিস্থিতির মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের মাথার ওপরে ঠিক কী ধরনের এবং কতটা ধারালো খাঁড়া ঝুলছে।

পিট ফাইটের পর একমাস সাতদিন পার হয়ে গেছে। জিশান আরও একমাস সাতদিন এগিয়ে গেছে কিল গেমের দিকে। ওর এটা ভালো লাগছিল। কারণ, মিনি আর শানুর সঙ্গে ওর দেখা হবে কি হবে না তার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে চলেছে। এবং তার পরই ওর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে শান্তিপূর্ণ জীবন। মিনি-শানুর কাছে ফিরে যেতে পারলে যেমন ওর শান্তি, তেমনই ফিরে যেতে না পারলেও যেখানে ও যাবে সেখানে চিরপ্রশান্তি।

ঘুমের ঘোরে এসব কথা ভাবছিল জিশান। তখনই অটোমেটিক প্লেট টিভি থেকে মিষ্টি মেয়েটার মিষ্টি গলা শুনতে পেল ও।

'জিশান! জিশান—ওঠো। ভোর হয়েছে...।'

জিশান চোখ খুলল। একটা হাই তুলে উঠে বসল বিছানায়।

প্লেট টিভি 'অন' হয়ে গেছে। তার রঙিন 'পরদানশিন' মেয়েটি মুখে সুন্দর হাসি ফুটিয়ে জিশানকে ডাকছে।

আশ্চর্য! জিশানের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেয়ে বলল, 'গুড মর্নিং। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নাও। মার্শাল স্যার ঠিক সাতটায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। ওই ইমার্জেন্সি স্পেশাল মিটিং-এর পর তোমার অ্যানালগ জিমের শিডিউল শুরু হবে...।'

জিশান বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল। ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিট।

মেয়েটা মনে হল সরাসরি জিশানের দিকে তাকিয়ে আছে। এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন জিশানের ভিডিয়ো ইমেজ ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

অসম্ভব কিছু নয়। লুকোনো ক্যামেরা আর আধুনিক প্রযুক্তি যদি হাতে হাত মেলায় তা হলে ব্যাপারটা জলের মতো সহজ।

জিশান মেয়েটির চোখে চোখ রেখে সামান্য জড়ানো গলায় বলল, 'ও.কে.—থ্যাংক য়ু। আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি...।'

টিভির পরদার আলো দপ করে নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্লেট টিভি অফ হয়ে গেছে।

জিশান তৈরি হতে শুরু করল। আর একইসঙ্গে ভাবতে লাগল, শ্রীধর পাট্টা আবার কেন ডেকে পাঠিয়েছেন।

জিপিসির বাইরে বেরোনোর জন্য ওকে শাস্তি দিতে ডেকেছিলেন শ্রীধর। চুলকুনি অস্ত্র দিয়ে অভিনব শাস্তি। কিন্তু তারপর তো চার দিন পার হয়ে গেছে! এর মধ্যে তো জিশান কোনওরকম গোলমাল করেনি! বরং ভালো ছেলের মতো নিয়ম করে রোজকার রুটিন মেনে চলেছে।

তা হলে?

প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া গেল শ্রীধর পাট্টার অফিসে গিয়ে।

সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর একুশতলায় শ্রীধরের অফিস। এই ভোর সাতটাতেও অফিসটার চরিত্র সকাল এগারোটার মতন।

অফিসঘরে জিশানকে ঢুকিয়ে দিয়ে পিস ফোর্সের 'বোবা' গার্ডরা চলে গেল। আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে পা দিয়েই জিশান বিমূর্ত সৌন্দর্যের ধাক্কা খেল।

এত সুন্দর করেও একটা অফিসঘর সাজানো যেতে পারে!

ও হতবাক হয়ে ঐশ্বর্যময় অফিসঘরটাকে দেখছিল। ঘরের ডানপাশে একটা ফুলের বাগান। ফুটপাঁচেক চওড়া—গোল রিং-এর মতো। একটা স্বচ্ছ স্ফটিকের স্তম্ভকে ঘিরে খুব ধীরে ধীরে চক্রের মতো ঘুরছে।

বাগানে ছোট-ছোট ফুলের গাছ—তাতে রঙিন ফুল। এরকম সুন্দর প্রজাপতির মতো ফুল জিশান জীবনে দেখেনি।

বাগানের ঠিক ওপরে উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ফ্যান টেইল্ড লাভ-বার্ড। অন্তত জিশানের দেখে তাই মনে হল।

পাখিগুলো কিচকিচ করে ডাকাডাকি করছে, বাগানের ওপরে একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে উড়ছে—এখানে-ওখানে বসছে, কিন্তু কোনও অদৃশ্য মন্ত্রবলে যেদিকে-সেদিকে উড়ে চলে যাচ্ছে না।

এমনটা ভাবার কারণ, কোনও জাল কিংবা খাঁচাজাতীয় বস্তু জিশানের



চোখে পড়ছে না।

বাগানের উলটোদিকের দেওয়ালে ঝরনার জল গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। আলো পড়ে চিকচিক করছে। তার সঙ্গে জলের মৃদু কলকল শব্দ। এই ঝরনাকে পটভূমিতে রেখে অদ্ভুত স্টাইলে সাজানো রয়েছে আটটা বড় মাপের টিভির পরদা। তাতে নিউ সিটির কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দেখা যাচ্ছে।

ঘরের সিলিংটা অনেকটা ওলটানো কড়াইয়ের মতো। তাতে নীল আর সাদা ধোঁয়ার ছায়া আকাশের আভাস তৈরি করেছে। তার মধ্যে ছোট-ছোট হলদে আলোর ফুটকি জ্বলজ্বল করছে। যেন অসংখ্য তারা ঘরের আলোর জোগান দিচ্ছে।

ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র স্বচ্ছ পলিমারের তৈরি। তার মধ্যে হালকা নীলরঙের আভা জ্যান্ত সাপের মতো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

এরকমই একটা বিশাল টেবিলের ওপারে পাথরের মূর্তির মতো বসে রয়েছেন শ্রীধর পাত্রা। ওঁর উলটোদিকে ছ'টা চেয়ার। তার মধ্যে চারটে চেয়ার খালি—ডান-দিকের শেষ দুটো চেয়ারে বসে রয়েছেন দুজন হোমরাচোমরা বয়স্ক মানুষ। ওঁদের ফিটফাট পোশাক আর বয়স্ক চেহারা দেখেই জিশান ওদের হোমরাচোমরা বলে আন্দাজ করেছে।

দুজনেরই মাথায় টাক। চোখে চশমা। চর্বি ঠাসা গাল ঝুলে পড়েছে। মুখের চামড়ায় অনেক ভাঁজ।

শ্রীধরের টেবিলের সব জিনিস বেশ সুন্দর করে সাজানো। পেন, স্যাটেলাইট ফোন, রাইটিং প্যাড, মিনারেল ওয়াটারের সিপার ইত্যাদি এমনভাব সাজানো যেন কেউ ওগুলো বিক্রির জন্য দোকান সাজিয়ে বসেছে।

টেবিলের ডানদিকে একটা আর্ক কম্পিউটার মনিটর। তার কিবোর্ডের ওপরে শ্রীধরের ডানহাতের আঙুল নড়ছিল। জিশানকে দেখে আঙুল থামল। শ্বেতপাথরের মুখে সামান্য হাসি ফুটল।

'এসো, জিশান—এসো। বোসো—।' শ্রীধর উষ্ণ আহ্বান জানালেন।

জিশান টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। বসে থাকা দুই প্রৌঢ়ের সঙ্গে একটা চেয়ারের তফাত রেখে বসে পড়ল।

বসে পড়ার পরেও জিশান লাভ-বার্ডগুলোর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। ওদের ওড়াউড়ি দেখছিল। আর অদৃশ্য খাঁচাটার রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছিল।

সেটা লক্ষ করে শ্রীধর বললেন, 'ওগুলো ফ্যান টেইল্ড লাভ-বার্ড। জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। ওদের জোড়ের একটা মারা গেলে অন্যটাও দু-চারদিনের মধ্যে দুঃখে মারা যায়।'

জিশান একটু হাসল, মাথা নাড়ল ঃ 'জানি। আমি ওদের খাঁচাটা দেখার চেষ্টা করছি।'

শ্রীধর শব্দ করে হাসলেন। জিশানের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'দেখতে পাবে না। কারণ, খাঁচাটা ইনভিজিব্‌ল। ওটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে তৈরি। পাখিগুলো একটা স্ফিরিক্যাল ফোর্স ফিল্ডের ক্যাভিটির মধ্যে আছে। এলাকার বাইরে গেলেই ওরা স্ট্রং ফিল্ডটা সেন্স করতে পারে। তখনই চট করে কমফোর্টেব্‌ল জোনে ফিরে আসে।' স্বচ্ছ টেবিলে আঙুলের ডগা ঠুকলেন শ্রীধর ঃ 'এই অদৃশ্য খাঁচা আমাদের সায়েন্টিস্টদের আবিষ্কার। দারুণ, না?'

'হুঁ, দারুণ—।' জিশান বলল।

কিন্তু জিশানের কথা ছাপিয়ে দুই প্রৌঢ়ের সম্মিলিত গলা শোনা গেল, 'একসিলেন্ট, স্যার, একসিলেন্ট। আপনার ইনভেন্টিভ পাওয়ার রিয়েলি একস্ট্রর্ডিনারি—।'

জিশান চাটুকার দুজনের দিকে একবার তাকাল।

জিশান না হয় এই অদ্ভুত খাঁচা প্রথম দেখছে, কিন্তু এঁরা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা নতুন দেখছেন না! তা হলে এই চাটূক্তির মানে কী? 'চাটুকার' শব্দটা কী 'চাটা' থেকে তৈরি হয়েছে?

মনসুখ চক্রপাণি আর গণপত আচারিয়ার কথা মনে পড়ে গেল জিশানের। নিউ সিটির একনম্বর এবং দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট; শ্রীধর পাট্টার পা চাটার ব্যাপারেও ওঁরা একনম্বর এবং দু-নম্বর।

এই প্রৌঢ় দুজন কি তা হলে তিননম্বর এবং চারনম্বর?

বাবার একটা কথা মনে পড়ে গেল জিশানের।

'বিজ্ঞানীদের কেউ-কেউ শাসকদের পা চাটতে পারে—কিন্তু জেনে রাখিস জিশু, বিজ্ঞান কখনও কারও পা চাটে না—।'

জিশান পাশে বসে থাকা লোকদুটোর দিকে ঘৃণার চোখে তাকাল। তারপর শ্রীধর পাট্টার চোখে চোখ রেখে জিগ্যেস করল, 'বলুন, আমাকে কেন ডেকেছেন?'

'শরীর কেমন আছে?' মোলায়েম গলায় পালটা প্রশ্ন করলেন শ্রীধর।

জিশান ভীষণ অবাক হল। ওর শরীরের খবর নিচ্ছেন শ্রীধর। ঠিকাদার যেমন মাটি-কাটা শ্রমিকের শরীরের খবর জানতে চায়, সেরকম? নতুন কী 'মাটি-কাটা'র কাজ রয়েছে জিশানের জন্য?

'ভালো।' ছোট্ট উত্তর দিল জিশান।

'গুড। একটু কফি খাও—।' বলে স্যাটেলাইট ফোন তুলে নিয়ে কাকে যেন ফোন করলেন। চারজনের জন্য কফি আর কুকিজ চেয়ে পাঠালেন।

তারপর ঃ 'জিশান, এবারে কাজের কথায় আসি। আমাদের কোর কমিটির মিটিং-এ কিল গেমের তারিখ মোটামুটিভাবে ঠিক হয়েছে সেকেন্ড সেপ্টেম্বর, রবিবার।'

জিশানের শরীরের ভেতরে বরফ-জলের স্রোত বয়ে গেল। অথচ এই স্রোতটা বয়ে যাওয়ার কথা ছিল না। যেহেতু গত তিনমাস ধরে সবই ওর জানা।

জিশান অবাক হল। 'ফাঁসি' হবে এটা নিশ্চিতভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও 'ফাঁসি'র তারিখটা শুনলে এরকম হয়? ড্যাশ, কমা, কোলন, সেমিকোলন যতই থাক না কেন ফুল স্টপের ওজনই আলাদা। কিল গেমের এই তারিখটা যেন সেই ফুল স্টপ।

জিশানের মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। চোখের সামনে শ্রীধর পাট্টার ছবিটা ঝাপসা হয়ে গেল। বরফ-জলের হিমশীতল স্রোতটা এখন শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে।

সেকেন্ড সেপ্টেম্বর। ফুল স্টপ।

'...দিনটা মোটামুটিভাবে ঠিক হয়েছে। এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফাইনাল হয়নি।' শ্রীধর তখনও কথা বলছিলেন।

জিশান বুঝতে পারছিল, শ্রীধরের কিছু কথা ও মিস করেছে—যেহেতু ওর মাথা ঠিকঠাক কাজ করছে না।

'...তবে দু-তারিখটায় যদি কোনও প্রবলেম হয় তা হলে আমরা নাইন্থ সেপ্টেম্বরে শিফ্ট করব। কারণ, দিনটা রোববার হওয়াটা খুব জরুরি। বুঝতেই পারছ—আমাদের অসংখ্য ভিউয়ার্স দরকার। তা ছাড়া স্পনসরদের কোটি-কোটি টাকার ব্যাপার। আর তুমি যদি জিতে যাও—' হাসলেন শ্রীধর : 'তা হলে একশো কোটি টাকার প্রাইজ মানি তো আছেই!'

জিশান সম্মোহিতের মতো চুপচাপ বসে ছিল। শ্রীধরের কথা শুনছিল। কিন্তু ও এখনও বুঝে উঠতে পারছিল না শ্রীধর পাট্টা কেন ওকে সাতসকালে ওঁর অফিসে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই ও অপেক্ষা করছিল।

'জিশান—' চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলেন শ্রীধর : 'আমরা এবার কিল গেমের প্রোমোশনাল পাবলিসিটি শুরু করতে চাই। তুমি হয়তো টিভিতে দেখেছ তোমার কিছু-কিছু ভিডিয়ো ক্লিপিংস আমরা নানারকম প্রোডাক্টের অ্যাডে ব্যবহার করছি। কিন্তু এবার আমরা ফুল সুইং-এ ক্যাম্পেন শুরু করতে চাইছি। অর্থাৎ, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে তোমাকে আমরা ব্যবহার করব—অবশ্য তার জন্যে তুমি পয়সা পাবে। এ ছাড়া কিল গেমের পাবলিসিটিতেও তোমাকে ভাগ নিতে হবে।

'তুমি হয়তো জানো না, আমাদের কিল গেমের যে-লাইভ টেলিকাস্ট আমরা করি তার ভিউয়ার্সের সংখ্যা বিলিয়ন্স-এ হিসেব করতে হয়। টিভি আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই এক্সাইটিং গেম একেবারে জ্যান্ত হয়ে ঢুকে পড়ে সবার ঘরে। সুতরাং, তুমি রাতারাতি একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিগার হয়ে যাবে। একবার ভাবো তো! কোথায় তুমি ওল্ড সিটিতে একটা কেন্নোর মতো ধুঁকে মরছিলে...সেখান থেকে একেবারে ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রিটি! তুমি ভাবতেই পারছ না..।'

শ্রীধরের কথা শেষ হওয়ার আগেই জিশান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ঃ 'যদি আপনার আর কোনও কাজের কথা না থাকে তা হলে আমি এবার যাব—।'

শ্রীধর পাট্টা ভুরু উঁচিয়ে সামান্য কৌতুকের চোখে জিশানের দিকে তাকালেন। তারিফের গলায় বললেন, 'দিস ইজ হোয়াট আই লাইক অ্যাবাউট য়ু। জোশ। তেজ। অথচ কুল ব্রেইন। এই ফ্যাকাল্‌টিগুলো তোমাকে নানান গেমে জিততে হেল্‌প করেছে—' চেয়ারে হেলান দিয়ে শরীরটাকে দোলাতে লাগলেন ঃ 'বোসো, বাবু জিশান। শোনো আমার প্ল্যান...।' এবার হাত দিয়ে জিশানকে বসতে ইশারা করলেন ঃ 'বোসো, বোসো...।'

জিশান বসে পড়ল আবার। তবে ওর মুখের বিরক্ত ভাবটা গোপন রইল না।

'কেন তোমাকে এত কথা বলছি শোনো—' ছোট বাচ্চাকে বোঝানোর মতো করে বলতে শুরু করলেন শ্রীধর, 'কিল গেমের মোটামুটিভাবে একমাস আটদিন বাকি। এই সময়টা আমরা ইন্‌টেন্‌সিভ প্রোমোশনাল ক্যাম্পেন করতে চাই। আমরা ফুল সুইং-এ যে-ক্যাম্পেন শুরু করতে চলেছি তাতে সবসময় তোমাকে দরকার হবে। ফলে তোমাকে নিউ সিটির হরেক জায়গায় নানান প্রোগ্রামে যেতে হবে। তোমার ওপরে নজরদারির জন্য সর্বক্ষণ দু-চারজন গার্ডকে মোতায়েন রাখাটা আনইকনমিক এবং ইরিটেটিং। তা ছাড়া ব্যাপারটা নিউ সিটির সিটিজেনদের চোখে ভালোও ঠেকবে না। বরং তুমি যদি স্বাধীনভাবে সব জায়গায় যেতে পারো, সব প্রোগ্রাম, অ্যাড ক্যাম্পেন অ্যাটেন্ড করতে পারো সেটা অনেক বেটার। মানুষ দেখবে স্বাধীন জিশান পালচৌধুরী নিউ সিটির যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্যাট উইল বি গ্রেট, তাই না?'

জিশানের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন শ্রীধর পাট্টা।

য়ুনিফর্ম পরা একজন লোক ট্রলি নিয়ে ঢুকল ঘরে। স্বচ্ছ কাপ-প্লেটে রাখা কফি আর কুকিজ সাজিয়ে দিল চারজনের সামনে। শ্রীধর ইশারায় সবাইকে কফি নিতে অনুরোধ করলেন। ওরা কাপে চুমুক দিতে শুরু করল।

কফির স্বাদটা তেতো লাগল জিশানের। ও একটা কুকিজ তুলে নিয়ে কামড় বসাল।

স্বাধীনতা? এই নামের কোনও বস্তু হয় নাকি শ্রীধর পাট্টার রাজত্বে?

জিশান নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও দেখল, ওর পাশে বসা প্রৌঢ় দুজন অল্প-অল্প হাসছেন, শ্রীধরের কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ছেন।

'হ্যাঁ, জিশান, তোমাকে আমি ফ্রিডম দেব...' আবার কথা বলতে শুরু করলেন শ্রীধর, 'তবে অ্যাবসলিউট ফ্রিডম নয়—কন্ট্রোল্‌ড ফ্রিডম। মানে, তুমি

স্বাধীনভাবে যতই ঘোরাফেরা করো না কেন একটা প্রিঅ্যাসাইন্‌ড টাইমে তোমাকে জিপিসির গেস্টহাউসে ফিরে আসতেই হবে। রোজ। আর তুমি ফিরে আসবে নিজে-নিজে—কাউকে ধরে-বেঁধে নিয়ে আসতে হবে না। যেভাবে শুয়োর নিজে থেকে খোঁয়াড়ে ফিরে আসে। কী, তাই তো?' শেষের প্রশ্নটা করলেন প্রৌঢ় দুজনের দিকে তাকিয়ে।

প্রৌঢ় দুজন হেসে সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন।

জিশান একটু ধন্দে পড়ে গেল। কন্ট্রোল্‌ড ফ্রিডম জিনিসটা আবার কী?

শ্রীধর প্রৌঢ় দুজনের দিকে হাতের ইশারা করে বললেন, 'এরা হলেন আমাদের টেকনিক্যাল কমিটির চিফ আর আর্মামেন্ট ডিপার্টমেন্টের হেড। কন্ট্রোল্‌ড ফ্রিডমের বুদ্ধিটা ওঁরাই বের করেছেন। দারুণ বুদ্ধি, তাই না, জিশান? সারাটা দিন তুমি স্বাধীনভাবে খুশি মতো ঘুরে বেড়াবে, আর সময় হলেই নিজে-নিজে ফিরে আসবে, গুটিগুটি ঢুকে পড়বে খাঁচায়...।'

কথা শেষ করে হেসে উঠলেন শ্রীধর।

কীভাবে এটা সম্ভব? জিশান চিন্তার গোলকধাঁধায় ঘুরতে লাগল।

ঠিক তখনই ফ্যান টেইল্‌ড লাভ-বার্ডগুলো জোরে-জোরে ডেকে উঠল।

জিশান ভাবল, ওর জন্য হয়তো নতুন ধরনের কোনও ফোর্স ফিল্ডের ব্যবস্থা করেছেন শ্রীধর। ওই পাখিগুলোর মতো।

কিন্তু সেটা কী?

●

জিশান মনে-মনে কন্ট্রোল্‌ড ফ্রিডমের গূঢ় অর্থটা বুঝতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু রহস্যটা ভেদ করতে না পেরে তিনজন মানুষের মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। ওঁদের হাবভাব আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে রহস্যের সমাধানটা আঁচ করার নিঃশব্দ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

জিশানের মুখে একটা অসহায় বোকা-বোকা ভাব ফুটে উঠেছিল। শ্রীধর পাট্টার দিকে তাকিয়ে ও বুঝল শ্রীধর সেটা বেশ রসিয়ে উপভোগ করছেন।

জিশান আর ভাবতে পারছিল না। হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করল। অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই শ্রীধরের কথা শুনতে পেল ও।

'আমিই জিশানকে ব্যাপারটা খুলে বলছি। যদি টেকনিক্যাল কোনও পয়েন্ট আমি মিস করি তা হলে সেটা আপনারা—প্লিজ—জুড়ে দেবেন...।'

জিশান মুখ তুলল।

শ্রীধর সরাসরি ওর দিকে তাকালেন। ঠোঁটে একচিলতে হাসির ছোঁয়া।

ওঁর ঠিক পিছনেই বিশাল জানলা। ফটোক্রোমিক ন্যানোপলিমার প্লেট লাগানো। এই প্লেটের প্রতিসরাঙ্ক বাতাসের প্রতিসরাঙ্কের ভীষণ কাছাকাছি। ফলে প্লেটটা লাগানো আছে কি নেই সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। ভোরের নীল আকাশ। তার সঙ্গে হাইরাইজ কয়েকটা বাড়ির জ্যামিতি।

আকাশে খেয়ালি মুডে ভেসে বেড়ানো বাচ্চা-বাচ্চা মেঘ। আর কখনও-কখনও তাদের চিরে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ব্যস্ত শুটার।

ঝরনার জলের কলকল শব্দ কানে আসছিল, আর লাভ-বার্ডগুলোর কিচকিচ। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর শ্রীধর মুখ খুললেন।

'জিশান, আজ রাতে তোমাকে আর্মামেন্ট ডিপার্টমেন্টের ''রিমোট অপারেশান্স'' ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমার ওপরে প্রথমে ''গ্রিন টেস্ট'' করা হবে। যার পারপাস হল, তোমার শরীরের সুটেবিলিটি পরীক্ষা করা যে, তুমি কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম প্রোগ্রামটা নিতে পারবে কি না।'

' ''গ্রিন টেস্ট''-এ কোয়ালিফাই করে গেলে তারপর আসল অপারেশান। একটা পলিমার কোটেড সিলভার ক্যাপসুল...।'

শ্রীধর হঠাৎই থমকে গেলেন। চওড়া করে হেসে বললেন, 'নাঃ, থাক—আর কিছু বলব না। য়ু ফাইন্ড আউট ইয়োরসেল্ফ।' সামনে ঝুঁকে এলেন ঃ 'তুমি জানো, জিশান, লাইফ কেন এত ইন্টারেস্টিং?'

জিশান চুপ করে রইল। পাশের প্রৌঢ় দুজনও চুপচাপ। তবে একজনের চোয়াল নড়ছে। তিনি কিছু একটা চিবোচ্ছেন।

শ্রীধর টেবিলে আঙুলের টোকা মারলেন। ভুরু উঁচিয়ে জিশানের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'জিশান, লাইফ ইজ ইন্টারেস্টিং বিকজ...বিকজ ইট ইজ ফুল অফ সারপ্রাইজেস। আমাদের জীবনে অনেক লুকোনো চমক থাকে যেগুলো আমাদের বাঁচার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। তুমি আমাদের চেয়ে অনেক লাকি, কারণ, তোমার লাইফে চমকের সংখ্যা অনেক বেশি—অন্তত তুমি নিউ সিটিতে আমাদের হাতে এসে পড়ার পর। আমি এই একটা চমক তোমার জন্যে বাঁচিয়ে রাখলাম। আজ রাতে...দশটার সময়...তুমি যখন ''রিমোট অপারেশান্স'' ল্যাবে যাবে তখনই জানতে পারবে, ''কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম''-এর রহস্য। সো, য়ু মে লিভ নাউ। তোমার এখন ছুটি...।'

শ্রীধর আচমকা ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মিটিং শেষের ইঙ্গিত।

জিশানও উঠে দাঁড়াল। একইসঙ্গে প্রৌঢ় দুজনও।

শ্রীধর জিশানের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রৌঢ় দুজনকে বললেন, 'তা হলে

রাত দশটায় জিশান আপনাদের চার্জে যাচ্ছে...।'

দুজনের মধ্যে একজন প্রৌঢ় বললেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না, স্যার—আমরা তৈরি আছি।'

শ্রীধর ছোট্ট করে হাসলেন। এই নিউ সিটিতে সবসময় তৈরি থাকাটাই দস্তুর।

●

চারজন সিকিওরিটি গার্ড জিশানকে 'রিমোট অপারেশান্‌স' ল্যাবে পৌঁছে দিল।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল জিশান। কাঁটায়-কাঁটায় সওয়া দশটা।

দরজার সামনে দাঁড়িয়েই গোটা ল্যাবটা প্রায় দেখা যাচ্ছিল। তার কারণ, চারদিকে শুধু কাচ আর কাচ। দরজা থেকে শুরু করে ল্যাবের সব দেওয়ালই কাচের। তার কোথাও-কোথাও স্টেইনলেস স্টিলের ফিটিংস আর কোথাও বা রঙিন পলিমার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে আর্মামেন্ট ডিপার্টমেন্টের হেড জিশানের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্‌টিভ টারমিনালে কথা বলেছেন। 'রিমোট অপারেশান্‌স' ল্যাবের নানান টেস্ট আর ল্যাবের কাজকর্ম নিয়ে জিশানকে একটা ওপর-ওপর ব্রিফিং দিয়েছেন।

ওঁর কাছ থেকেই জিশান জেনেছে, এই ল্যাবের বিভিন্ন সাব-ল্যাবের চার্জে যাঁরা-যাঁরা আছেন তাঁরা ইচ্ছেমতো নিজের-নিজের অংশের কাচের দেওয়ালগুলোকে স্বচ্ছ কিংবা অস্বচ্ছ করতে পারেন। অর্থাৎ একটা স্বচ্ছ কাচকে অস্বচ্ছ করতে চাইলে ন্যানোঅপটিক্‌স প্রযুক্তির জোরে চোখের পলকে সেই কাচটাকে সুপার-পোলারাইজ্‌ড করে দেওয়া হয়। ব্যস, কাজ শেষ।

প্রযুক্তির এই অভিনব 'ম্যাজিক'গুলো শেষ পর্যন্ত মানুষের ভালোর জন্য ব্যবহার করা হলে কত ভালো হত!

জিশানের বুকে ছোট্ট অথচ তীব্র একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠল।

ঢোকামাত্রই জিশানকে ল্যাবের টিম টেকওভার করল।

ওকে প্রথমে পাঠানো হল স্টেরিলাইজিং স্ক্যানারের মধ্যে দিয়ে। তারপর কাচের গোলকধাঁধার ভেতরে এ-পথ সে-পথ দিয়ে হেঁটে অনেক ঘোরপ্যাঁচের পর ওকে তারা নিয়ে গেল একটা ল্যাবে।

ল্যাবের দরজায় লাগানো এল. সি. ডি. প্যানেলে লেখা 'ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাব'।

দরজা দিয়ে ঢুকেই বিশাল বড় মাপের একটা কাচের ঘর। ঘরের

ডানদিকের দেওয়ালে একটা সুন্দর মসৃণ কন্ট্রোল প্যানেল। তার ওপরে বেশ কয়েকটা সি. আর. টি. স্ক্রিন আর ডিজিটাল মিটার লাগানো। তাতে নানান গ্রাফ আর সংখ্যা নাচানাচি করছে।

প্যানেল থেকে হাত তিনেক দূরে একটা লম্বা টেবিলে তিনটে লার্জ স্ক্রিন আর্ক কম্পিউটার। সেগুলোর সামনে বসে দুজন অপারেটর।

বাঁ-দিকে একটা ছোট কন্ট্রোল প্যানেল আর তার সামনে একটা বড় মাপের অদ্ভুত চেয়ার।

অদ্ভুত এই কারণে যে, চেয়ারটা দেখতে অনেকটা ডেন্টিস্টের চেয়ারের মতো হলেও আসলে তার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি। চেয়ারটার হাতলের কাছে বেশ কিছু জটিল যন্ত্রপাতি। পায়ের কাছেও কতরকম কনট্র্যাপ্শন আর অ্যাটাচমেন্ট।

সব দেখেশুনে জিশানের মনে হল, চেয়ারটা যেন কোনও ধর্মীয় পবিত্র বস্তু, কোনও 'জাগ্রত' দেবতার সিংহাসন—আর নানান মানুষ তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায় ঢিলের বদলে নানান যন্ত্রপাতির টুকরো চেয়ারটার গায়ে বেঁধে দিয়ে গেছে।

চেয়ারের ঠিক পাশটিতে কাঠ-কাঠ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল একজন ভীষণ রোগা তরুণী। পরনে হলুদ চুড়িদার, তার ওপরে বাদামি রঙের লেস দিয়ে বোনা একঝাঁক গোলাপ। গলায় একটা হলুদ ওড়না সাপের মতো প্যাঁচানো।

জিশান মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বয়েস কত হবে? খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। ওর রিমিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

মেয়েটির রং কেমন যেন ফ্যাকাসে ধরনের ফরসা। বেশ রোগা হলেও লম্বা। ছোট্ট মুখ—অনেকটা পুতুলের মতো। চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়। প্রজাপতির কোমল ডানার মতো নাকের দুপাশে মেলে আছে।

রিমিয়া খুব স্বপ্ন দেখত। আর এই মেয়ের চোখ দুটো স্বপ্নের মতো—এবং স্বপ্ন দেখানোর মতো।

ওর গলায় বাদামি ক্রিস্টালের একটা মালা। চোখের জলের মতো চিকচিক করছে। আর বাঁ-হাতের অনামিকায় একটা চিকন আংটি।

মেয়েটি এত চুপচাপ স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে যে, জিশান ওকে প্রায় পুতুল বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। ঠিক তখনই মেয়েটি জিগ্যেস করল, 'তুমি জিশান তো?'

প্রশ্নের সপ্রতিভ ঢঙে জিশান অবাক হয়ে গেল। বহুদিনের চেনা মানুষ এইভাবে প্রশ্ন করে। ওর একটু অস্বস্তি হল, কারণ, ল্যাব টিমের তিনজন মানুষ ঠিক এই মুহূর্তে জিশানের পিছনে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে। আর কম্পিউটারের সামনে দুজন।

জিশান সহজভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল, 'হ্যাঁ, আমি জিশান—।'

'আমি ডক্টর সুধাসুন্দরী...না, না, হেসো না—' হাত তুলে ইশারা করল মেয়েটি ঃ 'আমি জানি আমি সুন্দরী নই, কিন্তু কী করব, এটা আমার সত্যিকারের নাম...বাবা-মা দিয়েছিল।'

জিশান বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মেয়েটি যে সুন্দরী নয় সেটা ওকে কে বলল? জিশানের তো পুতুলটিকে যথেষ্ট সুন্দর বলে মনে হচ্ছিল।

একে তো নামটা বেশ অদ্ভুত, পুরোনো-পুরোনো। তার ওপর অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে কী আজব আন্তরিক কথাবার্তার ঢং! নিউ সিটিতে এটা নতুন।

'শোনো, জিশান—এখন যে-কাজটা আমি করব সেটা আমার খুব অপছন্দের। কিন্তু করতে হবে—' ঠোঁট ওলটাল ঃ 'কাজ তো কাজ!'

জিশান ওর পিছনে রোবটের মতো দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনের দিকে একবার তাকাল। 'রিমোট অপারেশান্স' ল্যাবে ঢোকা ইস্তক এই তিনজন ওর সঙ্গে ছায়ার মতো জুড়ে গেছে।

দু-এক সেকেন্ডের দ্বিধা কাটিয়ে জিশান জিগ্যেস করে ফেলল, 'কী কাজ?'

হাসল সুধাসুন্দরী ঃ 'তোমাকে ম্যাজিক শট দেওয়ার কাজ।'

'ম্যাজিক শট?' কপালে উঠল জিশানের ভুরু।

'হ্যাঁ—স্পেশাল ইনজেকশান।'

কথা বলতে-বলতে সুধা ডানদিকের কন্ট্রোল প্যানেলটার কাছে চলে গিয়েছিল। ব্যস্তভাবে কয়েকটা বোতাম টিপল। দুটো মিটারের রিডিং খুঁটিয়ে দেখল। তারপর জিশানের দিকে ফিরে তাকিয়ে হাতে হাত ঘষল।

'ও.কে., জিশান, আই অ্যাম রেডি। আই হোপ য়ু আর—।'

জিশান লক্ষ করল ওর ইংরেজি কথা বলার ঢং অনেকটা যেন সাহেবি ধাঁচের। ছোট্ট করে বলল, 'আপনি রেডি হলেই আমি রেডি।'

'চমৎকার। তা হলে ওই চেয়ারটায় শুয়ে পড়ো—।'

জিশান ল্যাবের চারপাশে তাকাল। তাকিয়েই অবাক হল। কখন যেন চারটে দেওয়ালের কাচ ঘোলাটে হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে-সঙ্গে ল্যাবের যে-উজ্জ্বল আলোগুলো এতক্ষণ তীব্র কর্কশ মনে হচ্ছিল সেগুলো যেন অনেকটা মোলায়েম হয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বিশাল চেয়ারটার কাছে চলে গেল জিশান। ওটাতে বসে পড়ল, নাকি শুয়ে পড়ল? উঁহু, ব্যাপারটা বসা এবং শোয়ার ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়াল।

'গুড বয়।' সুধাসুন্দরী ওর কাছে এগিয়ে এল ঃ 'অ্যান্ড স্টে কুল



লাইক আ গুড বয়।'

জিশান চেয়ারে শুয়ে সুধাকে দেখছিল।

ওই রোগা ফরসা পুতুল-পুতুল মেয়েটার 'পুতুল-পুতুল' ব্যাপারটা স্রেফ ওপরের চেহারাতেই শেষ। ওর ভেতরে রয়েছে দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাসে ঠাসা একজন ডক্টর।

জিশান অবাক হচ্ছিল। এই মেয়েটা শ্রীধরের রাজত্বে এসে পড়ল কেমন করে?

জিশানের তিনজন সঙ্গী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। বোকা-বোকা নজরে এদিক-ওদিক দেখছিল। ওদের কাজটাই বোধহয় জিশানের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকা।

আচমকা ওদের দিকে ডানহাত উঁচিয়ে কয়েকটা চুটকি দিল সুধা। মিষ্টি গলায় বলল, 'আপনাদের এখন ল্যাবের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করার সময় এসে গেছে। দিস ইজ দ্য রুল অফ মাই ল্যাব।'

তিনজনের মধ্যে দুজন তক্ষুনি ল্যাবের দরজার দিকে রওনা হওয়ার ঝোঁক নিল, কিন্তু একজন একটু ইতস্তত করতে লাগল।

সেই লোকটা আমতা-আমতা করে বলল, 'আমাদের বস বলেছেন জিশান পাল চৌধুরীর সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে। ওকে এক মুহূর্তের জন্যেও ছেড়ে না যেতে...।'

সুধাসুন্দরী ঠান্ডা গলায় বলল, 'কে তোমার বস জানি না, তবে হি ইজ ইয়োর বস আউটসাইড মাই ল্যাব। অ্যান্ড সো অল হিজ অর্ডার্স সিম্প্লি স্টপ আউটসাইড মাই ড্যাম ল্যাব ডোর। নিউ সিটির সবার সব অর্ডার আমার ল্যাবের দরজা পর্যন্ত এসে থেমে যায়—ভেতরে ঢুকতে পারে না...।'

কথা বলতে-বলতে সুধা কম্পিউটার-টেবিলের ওপর থেকে একটা সেল ফোন তুলে নিল। তাতে অটো ডায়াল করে ও-প্রান্তের কথা শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

জিশান লক্ষ করল সুধার কপালে ভাঁজ, আয়ত চোখে বিরক্তি।

প্রতিবাদী লোকটা তখনও বলছিল, 'ডক্টর, প্লিজ, ভুল বুঝবেন না। আমাদের জিশানের সঙ্গে-সঙ্গে থাকার জন্যে স্ট্রং ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। আমরা...।'

'মার্শাল স্যার, সুধাসুন্দরী বলছি। ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাব থেকে—।'

জিশান অবাক হয়ে গেল। সুধা সরাসরি শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে ফোনে কথা বলছে! ওর হাত এত লম্বা যে, শ্রীধরকে এককথায় ফোন করতে পারে?

শ্রীধরের গলা শোনা গেল, 'ইয়েস, সুধা। বলো তোমার জন্যে কী করতে পারি।'

শ্রীধরের কথা শুনতে পাওয়ামাত্রই জিশান বুঝল ঘরের সবাইকে ও-

প্রান্তের কথা শোনানোর জন্য সুধা ওর মোবাইল ফোনের স্পিকার অন করে দিয়েছে।

'আমি এখন জিশান পাল চৌধুরীর ওপরে ''গ্রিন টেস্ট'' শুরু করতে চলেছি। এসব টেস্ট কিংবা অপারেশানের সময়—আপনি তো জানেন—আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজন ছাড়া আর কোনও লোকের প্রেজেন্স পছন্দ করি না। কিন্তু এখানে একজন রয়েছে—জিশানের এসকর্ট—সে বলছে কোনও অবস্থাতেই জিশানকে ছেড়ে যাবে না। ওর ওপরে নাকি অর্ডার আছে—' সুধা ফোনে কথা বলছিল আর এসকর্ট তিনজনের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। মাঝে-মাঝে জিশানের দিকেও। ওদের একজন জিশানের চেয়ারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, আর বাকি দুজন ল্যাবের দরজার কাছে—অনেকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

একটু থেমে সুধাসুন্দরী বলল, 'আপনি আমাকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে ডিসিশান দেবেন, স্যার। না হলে আমি ইলেভেন্‌থ সেকেন্ডে আমার রেজিগনেশান আপনাকে ই-মেলে সাবমিট করে দেব। বিকজ আমার ল্যাবে সায়েন্স ছাড়া আর কারও হুকুমে আমি চলি না।'

জিশান শুধু অবাক নয়, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। ও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে এইভাবে কথা বলা যায়।

ও একদৃষ্টে বিজ্ঞানী মেয়েটাকে দেখছিল।

শ্রীধর পাট্টার শান্ত গলা শোনা গেল ঃ 'সুধা, তুমি ফোনটা প্লিজ ওই এসকর্টকে দাও—।'

সুধা জিশানের চেয়ারটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। প্রতিবাদী কর্মনিষ্ঠ এসকর্টটির হাতে নিজের ফোনটা তুলে দিল—কিন্তু একটাও কথা বলল না।

লোকটা ফোনটা কানে দিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে শ্রীধরের শান্ত গলা শোনা গেল ঃ 'তোমার নামটা কি জানতে পারি?'

লোকটার মুখ অনেকক্ষণ আগেই ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছিল, এখন সেটা প্রায় ব্লটিং পেপারের কাছাকাছি। আর ওর শুকনো মুখে ভয়ের সিলমোহর।

কাঁপা গলায় ও বলল, 'আ-আমার নাম বি-বিকাশ সাহা, স্যার।'

'চমৎকার।' বললেন শ্রীধর, 'বিকাশ সাহা, তুমি এই মুহূর্তে ডক্টরের হাতে সেল ফোনটা ফেরত দিয়ে ল্যাব থেকে তোমার সাঙ্গপাঙ্গ কাচিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাও—।'

'ও.কে., স্যার। ইয়েস, স্যার।' বিকাশের গলা এবং শরীর কাঁপছে।

'যদি ঘর থেকে বেরোতে তোমার পাঁচ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগে তা হলে আমি তোমার সুইচ পার্মানেন্ট্‌লি অফ করে দেব।'

'খট' করে লাইন কেটে দেওয়ার শব্দ হল। বিকাশ কাঁপা হাতে ফোনটা

সুধাকে ফেরত দিল। এবং প্রায় আলোর গতিতে ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেল।

ওর দুজন সাথী ওর আগেই ল্যাবের বাইরে চলে গেছে।

সুধাসুন্দরী ওর মোবাইল ফোনটা অফ করে কম্পিউটার-টেবিলে রেখে দিল। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন মুখের ভাব করে জিশানের চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'জিশান, প্রথমে তোমার ''গ্রিন টেস্ট'' হবে। সেই টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ হলে তবেই ম্যাজিক শট—মানে, ম্যাজিক ইনজেকশান...।'

জিশান একটা হাত তুলে বলল, 'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান—আগে আপনাকে কনগ্র্যাট্স জানাই—তারপর ওসব টেস্ট-ফেস্ট হবে।'

'কেন?' সুধার ফরসা কপালে ভাঁজ পড়ল।

'যেভাবে আপনি মার্শালের সঙ্গে কথা বললেন...ওই ফোর্স, ওই কনফিডেন্স...ভাবা যায় না। নাঃ, ডক্টর, আপনাকে সেলাম জানাই।'

জিশানের ভেতরে-ভেতরে একটা সত্যিকারের ঢেউ উথালপাথাল করছিল। আনন্দের ঢেউ। নিউ সিটিতে এরকম দৃপ্ত সাহসী মানুষ আর ক'জন আছে কে জানে!

সুধা জিশানের চোখে চোখ রেখে তাকাল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'জিশান, দুটো কথা। এক, তুমি আমার সঙ্গে ''আপনি-আপনি'' করে কথা বলবে না। ''তুমি''-টা ''আপনি''-র চেয়ে অনেক বেটার, অনেক সুন্দর।' সুধা এবার আঙুল তুলে ইশারায় দুই দেখাল ঃ 'আর দু-নম্বর কথা হল, ওই ফোর্স, কনফিডেন্স এটসেট্রা...। আমি এখানে চাকরি করি, জিশান—কিন্তু তাই বলে এঁদের চাকর নই। আমি শুধু বিজ্ঞানের চাকর—আর কারও নয়।'

সুধাসুন্দরীর মুখে অদ্ভুত এক আলো দেখতে পেল জিশান।

●

সুধাসুন্দরী কথা বলছিল, আর একইসঙ্গে ব্যস্ত হাতে কাজ করছিল। কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে গিয়ে কতকগুলো মিটার রিডিং দেখল, একটা ছোট মাপের পুশবাট্ন প্যানেলে আঙুলের ডগা দিয়ে চটপট কয়েকটা বোতাম টিপল।

সঙ্গে-সঙ্গে দরজার কাছ থেকে একটা 'ক্লিক' শব্দ শোনা গেল আর দরজার কাচটা অস্বচ্ছ হয়ে গেল।

জিশানের কাছে এল সুধাসুন্দরী ঃ 'দরজাটা লক করে দিলাম। এবার তোমার ডানহাতটা চেয়ারের হাতলের ওপরে রাখো। হাতের চেটো ওপর দিকে—।'

জিশান কথা শুনল।

'স্যামি! চিকি!' আর্ক কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট

দুজনের দিকে ইশারা করে বলল সুধা, 'পেশেন্টকে গ্রিন টেস্টের জন্যে রেডি করো—।'

পেশেন্ট! জিশান এখন তা হলে পেশেন্ট? অন্তত সুধার চোখে।

জিশান অপেক্ষা করতে লাগল। অপেক্ষা করতে লাগল সুধাও।

চিকি আর স্যামি কম্পিউটার ছেড়ে উঠে এল। ছিপছিপে চেহারার দুজন স্মার্ট যুবক। একজনের চোখের দৃষ্টিতে কৌতূহল মাখানো, আর-একজনের চোখ একেবারে নির্লিপ্ত, ঠান্ডা।

ঠান্ডা চোখের যুবকটি চটপট জিশানের কাছে এল। জিশানের দুটো হাত চেয়ারের হাতলের সঙ্গে ফাইবারের স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর সে উবু হয়ে বসে পড়ল জিশানের পায়ের কাছে। গোড়ালির গাঁটের ঠিক ওপরটায় শক্ত করে স্ট্র্যাপ বেঁধে দিল।

জিশান অবাক হয়ে সুধার দিকে তাকাল।

হাসল সুধা। বলল, 'সেফ্‌টি, জিশান। কারণ এখন যে-টেস্টটা করব তাতে তোমাকে একটা স্পেশাল মেডিসিন ইনজেক্ট করতে হবে। যদি তাতে তোমার কোনও রিয়্যাকশন না হয় তা হলে ওয়েল অ্যান্ড গুড। কোনও প্রবলেম নেই। কিন্তু...' জিশানের কাছে এগিয়ে এল সুধাসুন্দরী ঃ 'কিন্তু যদি রিয়্যাকশন হয় তা হলে...তা হলে তোমার ঝামেলা হবে। ঠিক দশ সেকেন্ড তোমার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হবে। তখন তুমি পাগলের মতো হাত-পা ছুড়তেও পারো। তাই এই স্ট্র্যাপ। সেফ্‌টি।' আবার হাসল ও।

'আর যদি কোনও রিয়্যাকশন না হয়, তা হলে?'

'তা হলে তুমি গ্রিন টেস্টে পাশ। দশ মিনিট পরেই তোমাকে ম্যাজিক শট দেওয়া যাবে।'

দ্বিতীয় লোকটি একটা অদ্ভুত ট্রে নিয়ে এসে দাঁড়াল সুধাসুন্দরীর সামনে। ট্রে-তে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মোড়কে একটা খুব সরু ইনজেকশন সিরিঞ্জ। একজোড়া হালকা নীল রঙের রাবার লেটেক্স-এর গ্লাভ্‌স। একটা ছোট্ট ওষুধের শিশি। শিশিতে গাঢ় সবুজ রঙের একটা তরল। আর তার পাশে ছোট্ট গোলাপি সাবানের মতো দেখতে একটা কী যেন।

এতক্ষণে 'গ্রিন টেস্ট' নামের মানে বুঝতে পারল জিশান।

সুধাসুন্দরী কাজ শুরু করল রোবটের মতো যান্ত্রিক দক্ষতায়। লেটেক্স গ্লাভ্‌স পরে নিয়ে ইনজেক্‌শনের সিরিঞ্জটা বের করে নিল। ভায়ালে ছুঁচ ফুটিয়ে সবুজ তরলের প্রায় সবটাই টেনে নিল সিরিঞ্জে। ট্রে থেকে গোলাপি টুকরোটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল জিশানের ওপরে।

টুকরোটা জিশানের 'চিত' করা ডানহাতের শিরার ওপরে ঘষতে-ঘষতে সুধাসুন্দরী বলল, 'এটা সলিড স্টেরিলাইজার। আর সিরিঞ্জটার স্পেশালিটি হল,

এটার ছুঁচটা ভীষণ শক্ত অথচ সরু—এত সরু যে, তুমি টেরই পাবে না এটা তোমার শিরায় ঢুকছে।'

'আর এই সবুজ লিকুইডটা?' জিশান জিগ্যেস করল।

'ওটা একটা স্ট্রেঞ্জ কম্পাউন্ড...' হাসল সুধা ঃ 'আমার আবিষ্কার...।'

'আপনার...মানে, তোমার আবিষ্কার? সত্যি?'

'হ্যাঁ—এতে অবাক হওয়ার কী আছে? জানো, বায়োকেমিস্ট্রির ফিল্ডে আমার তেতাল্লিশটা পেটেন্ট আছে!'

'পেটেন্ট?' অবাক হয়ে সুধার দিকে তাকাল জিশান ঃ 'সেটা আবার কী?'

'সোজা কথায় বোঝাতে গেলে, আমার তেতাল্লিশটা আবিষ্কার আছে। সেই আবিষ্কারগুলোর মালিকানা রেজিস্ট্রি করার নামই হল পেটেন্ট...।' সিরিঞ্জের তীক্ষ্ণ ডগাটা জিশানের হাতের শিরায় ছুঁইয়ে সুধাসুন্দরী বলল, 'রেডি, স্টেডি, গো—!'

এবং সবুজ তরলটা জিশানের শিরায় ঢুকিয়ে দিয়ে তৎপরভাবে দু-পা পিছিয়ে দাঁড়াল। জিশানের চোখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। বোধহয় মনে-মনে এক-দুই গুনে দশ সেকেন্ড পার করছিল। আর ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজন কন্ট্রোল প্যানেলের ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল।

জিশান কোনও যন্ত্রণা টের পাচ্ছিল না। ও স্বাভাবিক গলায় সুধাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি তা হলে খুব নামকরা সায়েন্টিস্ট?'

'কে জানে!' ঠোঁট ওলটাল ঃ 'লোকে তো বলে।'

অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজন সুধাকে লক্ষ করে হাতের ইশারা করল। যার অর্থ হল, দশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে।

'তুমি গ্রিন টেস্টে পাশ করে গেছ, জিশান। য়ু আর নাউ এলিজিব্ল ফর গেটিং দ্য ম্যাজিক শট।' হঠাৎই জিশানের মাথায় হাত দিয়ে ওর চুল ঘেঁটে দিল সুধাসুন্দরী। যেমন করে গুরুজনরা বাচ্চাদের আদর করে, অনেকটা সেইরকম।

'আমার হাত-পা কি এখনও বাঁধা থাকবে?' চোখের ইশারায় হাত-পায়ের স্ট্র্যাপগুলো দেখাল জিশান।

'না, না, এক্ষুনি ওগুলো খুলে দিচ্ছি। চিকি—।'

চিকি যন্ত্রের মতো কাজ করতে শুরু করল।

'এই দশটা মিনিট আমরা কীভাবে কাটাব?' প্রশ্নটা করে জিশান সুধাসুন্দরীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

সুধাসুন্দরী ইনজেক্শনের সিরিঞ্জটা স্যামির ট্রে-তে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ম্যাজিক শট প্রিপেয়ার করো—।' তারপর জিশানের দিকে তাকাল ঃ 'এখন

আর ন'মিনিট বাকি আছে। এই সময়টা তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি—ম্যাজিক শট নিয়ে।'

'তাই? আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে—কী এই ম্যাজিক শট। এই ইনজেক্‌শন নিলে কীভাবে কন্ট্রোল্‌ড ফ্রিডম পাওয়া যায়...।'

'বলছি—' বলে সুধাসুন্দরী স্যামির দিকে তাকিয়ে কয়েকটা টেকনিক্যাল ইনস্ট্রাক্‌শন দিল। তারপর তাকাল জিশানের দিকে ঃ 'ছোট্ট একটা পলিমার কোটেড সিলভার ক্যাপসুল তোমার কানের নীচে আমি ইনজেক্ট করে দেব। সেই মোমেন্টটাই হল টাইম জিরো। তারপর থেকে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর তোমার ভীষণ জল তেষ্টা পাবে। ভয়ঙ্কর জল তেষ্টা। ডিমনিক থার্স্ট। তুমি কল্পনা করতে পারবে না এমন তেষ্টা।'

'তেষ্টা পেলে জল খাব—সিম্প্‌ল।' জিশান হালকাভাবে বলল।

'উঁহু, ওটাই তো মজা! যত খুশি জল তুমি খাও না কেন, ওই তেষ্টা কিছুতেই কমবে না। কিছুতেই না।'

'তা হলে?'

হাসল সুধা। বলল, 'চব্বিশ-ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে আমার কাছে—এই ল্যাবে। আমি রিমোট অপারেশানে সিলভার ক্যাপসুলটাকে নেক্সট টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স-এর জন্যে রিচার্জ করে দেব। তখন তুমি আবার স্বাধীন—ইচ্ছেমতো নিউ সিটির যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারো—চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে।' একটু থামল সুধা। স্যামির দিকে একপলক তাকিয়ে আবার চোখ ফেরাল জিশানের দিকে ঃ 'আই হোপ নাউ য়ু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ কন্ট্রোল্‌ড ফ্রিডম—।'

'জিশান মাথা নাড়ল ওপর-নীচে। হ্যাঁ, এবার ও ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

স্যামি একটা অদ্ভুত ধরনের পিস্তল আর একটুকরো সলিড স্টেরিলাইজার ট্রে-তে সাজিয়ে সুধাসুন্দরীর কাছে নিয়ে এল।

জিশানের ডানদিকের কানের নীচে স্টেরিলাইজার ঘষল সুধা। তারপর ট্রে থেকে অদ্ভুত ধরনের পিস্তলটা তুলে নিল।

জিশান লক্ষ করল, পিস্তলের নলটা অস্বাভাবিক মোটা, কালো রঙের। গুলির চেম্বারের গায়ে একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে উইন্ডো। সেখানে কতকগুলো সংখ্যা দেখা যাচ্ছে।

সুধাসুন্দরী পিস্তলের নলটা জিশানের ডান কানের নীচে চেপে ধরল।

'সরি, জিশান। এটা না করে আমার উপায় নেই।'

জিশানের ভেতরে কোনও প্রতিরোধ তৈরি হল না। ওর একটা মাংসপেশিও প্রতিরোধের প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় শক্ত হল না। বরং মনে হল,

আপাতভাবে 'স্বাধীন' হয়ে নিউ সিটিতে ঘুরে বেড়ানো যাবে, এটাই বা কম কী!

'রেডি, স্টেডি, গো—।' বলে পিস্তলের ট্রিগার টিপল সুধা।

ছোট্ট চাপা শব্দ হল। এবং জিশানের মনে হল একটা অন্ধকার কুয়োর ভেতরে ও পড়ে যাচ্ছে। পরিভাষায় যাকে বলে 'ফ্রি ফল'।

ও পড়ছে তো পড়ছেই। পেটের ভেতরটা কেমন অদ্ভুতরকম খালি লাগছে।

কিন্তু একফোঁটাও যন্ত্রণা নেই।

বহুদূর থেকে একটা ফাঁপা নলের মধ্যে দিয়ে সুধাসুন্দরীর প্রতিধ্বনিময় গলা ভেসে এল, 'স্টেডি, জিশান, স্টেডি—।'

হঠাৎই চোখের সামনে আলো ফুটে উঠল। চারপাশটা আবার স্বাভাবিক। 'ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাব'-কে আবার আগের চেহারায় দেখতে পেল জিশান। ওই তো সুধাসুন্দরী! ওই তো স্যামি আর চিকি!

সুধা হাসছিল ঃ 'উঠে দাঁড়াও, জিশান। এখন নিউ সিটির কোথাও তোমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। এনজয় ইয়োর ফ্রিডম...।'

'থ্যাংক্‌স—' বলে জিশান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ডান কানের নীচে গলার পাশটায় হাত দিল। একটা মসৃণ চাকতি হাতে ঠেকল ওর। কেউ যেন একটা টিপ কপালের বদলে ওই জায়গাটায় শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে একটু ব্যথা টের পেল ও।

'ওটা পোস্ট অপ্‌স পলিমার সিল। ক্যাপসুলটা শরীরে ঢোকার জন্যে সামান্য যেটুকু ড্যামেজ হয়েছে সেটা আমি সিলিং গান দিয়ে সিল করে দিয়েছি। তখন তুমি ব্ল্যাক আউট স্টেটে ছিলে। তিন ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

জিশান ল্যাবের ভেতরে কয়েক পা পায়চারি করল। না, শরীর কোনও অসুবিধের কথা জানান দিচ্ছে না। সমস্ত পেশি জিশানের নিয়ন্ত্রণেই আছে।

'আমি কি তা হলে এখন যেতে পারি?' জানতে চাইল জিশান।

'হ্যাঁ—পারো।' সুধাসুন্দরী বলল, 'কিন্তু কাল তোমাকে রাত ন'টার সময় আমার এই ল্যাবে ফিরে আসতে হবে। যদিও এখন সময়...' কন্ট্রোল প্যানেলের ঘড়ির দিকে তাকাল ঃ '...রাত প্রায় এগারোটা, আমি সেফসাইডে থাকার জন্যে তোমাকে দু-ঘণ্টা আগে আসতে বলছি এবং সেই সময়টাই ফিক্স করেছি। তখন আমি তোমার কন্ট্রোল্‌ড ফ্রিডম আবার পরদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত রিচার্জ করে দেব। ইনিশিয়াল শটের সময় ওই ক্যাপসুলটা যে-রেফারেন্স টাইম ওর মেমোরিতে স্টোর করে সেই টাইমটার আর নড়চড় হয় না। সো—' হাতে হাত ঘষল সুধা। ভোরবেলা ফোটা ফুলের মতো প্রশান্ত আয়ত চোখ মেলে

জিশানকে দেখল ঃ 'টুমরো ইভনিং, নাইন ও' ক্লক। তোমার সঙ্গে রোজ এই ল্যাবে আমার দেখা হবে—।'

'হ্যাঁ—কিল গেমের আগের রাত পর্যন্ত।'

এ-কথায় সুধা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'স্যামি তোমাকে সঙ্গে করে এখন নিয়ে যাবে। যা-যা ফরম্যালিটি আছে সেগুলো সেরে নেবে—।'

'ফরম্যালিটি?' জিশানের ভুরু কুঁচকে গেল।

'হ্যাঁ—ফরম্যালিটি।' মাথা নেড়ে বলল সুধাসুন্দরী, 'রিমোট অপারেশান্‌স ল্যাবে যাওয়া-আসার জন্যে তোমাকে একটা স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। প্রতিদিন রাত পৌনে ন'টা থেকে সওয়া ন'টার মধ্যে তুমি ওই কার্ড সোয়াইপ করে আমার এই ল্যাবে ঢুকে পড়তে পারবে।'

'তা ছাড়া তোমাকে একটা সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। মানে, ''কন্ট্রোলড্‌ ফ্রিডম সিটিজেন'' কার্ড। নিউ সিটিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় নানা জায়গায় এই স্মার্ট কার্ডটা তোমার কাজে লাগবে। আর তোমাকে একটা পার্সোনাল গাড়িও দেওয়া হবে। তবে ওটা মার্শালের ব্যাপার। উনি ঠিক সময়ে ওটার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

হঠাৎই জিশানের দিকে এগিয়ে এল সুধা। হাতটা বাড়িয়ে দিল। বলল, 'তোমার হিরোইক্‌স আমি টিভিতে দেখেছি। য়ু আর অ'সাম। লাস্ট পাঁচ বছরে তোমার মতো কেউ আসেনি। মনে হচ্ছে, তুমি মার্শালের হিসেব ওলটাতে পারবে। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট ইন কিল গেম—।'

'থ্যাংক্‌স—' বলে সুধার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা মুঠোয় নিল জিশান। হ্যান্ডশেক করল।

স্যামি জিশানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিশান কী ভেবে ওকে বলল, 'আপনি একটু ল্যাবের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান—আমি আসছি।'

চিকি তখন ওর কাজের টেবিলে চলে গেছে। ওর আর্ক কম্পিউটারের সামনে বসে পড়েছে।

জিশান চিকির দিকে একবার তাকাল। আন্দাজ করতে চেষ্টা করল, ও সুধাকে নীচু গলায় কোনও কথা বললে সেটা চিকি শুনতে পাবে কি না।

জিশান সুধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করব?'

'কী কথা?'

প্রায় ফিসফিস করে জিশান বলল, 'একটা ব্যাপার ভীষণ তাজ্জব লাগছে। তোমার মতো সুপার লেভেলের একজন সায়েন্টিস্ট শ্রীধর পাট্টার তৈরি নরকে বসে কী করছে—।'

সুধাসুন্দরীর মুখের উজ্জ্বল ভাবটা মিলিয়ে গেল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল ও। বোধহয় ভাবতে লাগল।

একটু পরে ও বলল, 'কাল তো তুমি আসছ। কাল বলব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঃ 'সত্যিই তো! এই নরকে আমার থাকার কথা নয়...।'

●

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়ার পর গেস্টহাউসের ঘর ছেড়ে বাইরে এল জিশান। আজ ওর স্বাধীনতার প্রথম দিন।

সকাল সাতটার সময় অটোমেটিক প্লেট টিভি থেকে মিষ্টি গলার মেয়েটি জিশানের ঘুম ভাঙিয়েছে। তারপর ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে।

'গুড মর্নিং, জিশান।'

'গুড মর্নিং—' জিশানও পালটা বলল। ইন্টারঅ্যাক্টিভ টিভিতে সে-কথা শুনতে পেল মেয়েটি।

দু-আঙুল তুলে জয়ের 'ভি' সংকেত দেখাল মেয়েটি ঃ 'স্বাধীনতা জিন্দাবাদ!' তারপর হাসল।

'থ্যাংক্স।'

'এখন কয়েকটা জরুরি কথা সেরে নিলে তোমার আপত্তি আছে?'

'না, বলো—।'

'আমাদের মার্শাল তোমার জন্যে একটা অটোমোবিল অ্যালট করেছেন। সেই গাড়িটা নীচের পার্কিং লটে এখন দাঁড়িয়ে আছে। তুমি আমাদের এই হাই-টেক গাড়ি প্রথম-প্রথম চালাতে পারবে না। তাই গাড়িতে একজন ড্রাইভার রয়েছে। এ ছাড়া তুমি গাড়িতে একটা প্যাকেট পাবে। তাতে জেনারেল প্যাকেট রেডিয়ো সারভিস আর গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম অ্যাক্টিভেট করা একটা স্যাটেলাইট ফোন রয়েছে—নিউ সিটিতে তুমি যতদিন আছ ফোনটা ততদিন তুমি ইউজ করবে। এ ছাড়া নিউ সিটি সম্পর্কে নানান তথ্য জানার জন্যে রয়েছে কয়েকটা ডিভিডি। গাড়ির ডিভিডি প্লেয়ারে তুমি ইচ্ছেমতো ওগুলো চালিয়ে দেখতে পারো—।'

'নিউ সিটির কোথায় আমি যেতে পারব, আর কোথায় পারব না, তার কোনও ইনস্ট্রাক্শন রয়েছে?' জিশান জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ, ওই প্যাকেটে রয়েছে তোমার সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ড। সিটির যে-যে জায়গায় তুমি বন্ধ দরজা পাবে সেখানে ঢোকার জন্যে তোমাকে এই সি. এফ. সি. কার্ডটা সোয়াইপ করতে হবে। তাতে দরজা যদি খুলে যায় তা হলে তুমি অ্যালাউড—আর না খুললে, নয়।

'শোনো। ড্রাইভার ছেলেটির নাম গুনাজি। ভীষণ ব্রাইট বয়। ও তোমাকে সবরকমভাবে গাইড করবে, আর সব ব্যাপারে হেল্প করবে। বলতে গেলে ও তোমার লিভিং স্মার্ট কার্ড। ও.কে.?'

জিশান বলল, 'ও.কে.।'

'এনি ফারদার কোশ্চেন?'

জিশান ভেবে দেখল, ওর মনে এই মুহূর্তে আর কোনও প্রশ্ন নেই। তাই ও বলল, 'থ্যাংক য়ু। নো কোশ্চেন।'

হাসল মেয়েটি ঃ 'গুড। তা হলে শেষ জরুরি কথাটা এবার বলি। টাকা। রাস্তায় বেরোলে তোমার কিছু খরচ হতে পারে। অনেকগুলো কমপিটিশানে জিতে তোমার এখন অনেক টাকা। সেই টাকা থেকে তুমি অনায়াসে খরচ করতে পারো। ওই সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ডই তোমার এটিএম কার্ড। তুমি নিউ সিটির যে-কোনও এটিএম কিয়োস্কে ওই কার্ড সোয়াইপ করে টাকা তুলতে পারো। তোমার এটিএম পিন গুনাজি তোমাকে বলে দেবে। হি ইজ আ ভেরি স্মার্ট বয়।' হাত নাড়ল মেয়েটি, বলল, 'বাই, জিশান—।'

'বাই—।'

ইন্টারঅ্যাক্টিভ টিভি অফ হয়ে গেল।

এখন, ব্রেকফাস্টের পর, জিশান ঘরের দরজা টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়েছে। পরনে ব্লু জিন্স, কালো রঙের টি-শার্ট, কোমরে সরু কালো বেল্ট। বেল্টের সঙ্গে আটকানো একটা পাউচে মাইক্রোভিডিয়োফোনটা ঢুকিয়ে নিয়েছে। নিউ সিটিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় মিনির সঙ্গে কথা বলতে চায় ও। শহরটা দেখতে কেমন তার একটা ধারাবিবরণী দিতে চায়।

গেস্টহাউস ছেড়ে নীচে নেমে পায়ে-পায়ে ফোয়ারার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জিশান। ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে ওর ফকিরচাঁদের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল ওর হতভাগ্য ভাইয়ের কথা। নেক্রোসিটির কথা।

এদিক-ওদিক চোখ ফেরাল জিশান। এখন কী করে ও গুনাজিকে খুঁজে পাবে? ওর গাড়িটাই বা কোথায়?

হঠাৎই দেখল, মেন গেটের দিক থেকে অত্যন্ত রোগা লম্বা একটা ছেলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ফরসা, খোকা-খোকা চেহারা। গোঁফের রেখা সদ্য গজিয়েছে। মাথার চুল সোনালি রঙে রাঙানো এবং হেয়ার জেলের দৌলতে বেশ খাড়া-খাড়া হয়ে আছে।

জিশানের কাছে এসে একগাল হাসল ছেলেটা। বিচিত্র ঢঙে সেলাম ঠুকে বলল, 'স্যার, আমার নাম গুনাজি। ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে একটা গাড়ি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আপনার সঙ্গে সবসময় থাকব আমি। প্রচুর সার্ভিস দেব—।'

জিশান অবাক হয়ে ছেলেটাকে দেখতে লাগল।

গুনাজির বয়েস বড়জোর উনিশ কি কুড়ি। টগবগে। চাবুকের মতো। মুখ থেকে কম বয়েসের ছটা বেরোচ্ছে।

কিন্তু ছেলেটা জিশানকে হঠাৎ সেলাম ঠুকল কেন? আর 'স্যার'ই বা বলছে কেন?

এই ব্যাপারগুলো জিশান মোটেই পছন্দ করে না। তাই গুনাজিকে বলল 'গুনাজি, তুমি আমার ড্রাইভার নয়—আমার মাস্টারমশাই। আমাকে তুমি গাড়ি চালানো শেখাবে। আর একইসঙ্গে তুমি আমার গাইড, আমার বন্ধু। তুমি আমাকে "স্যার" বলবে না, আর ওইরকম বোকা-বোকা সেলামও ঠুকবে না—।'

জিশানের কথায় ছেলেটা একটু দমে গেল যেন। তারপর বলল, 'আপনার মতো করে কেউ কখনও বলেনি—সেই ষোলো বছর বয়েস থেকে গাড়ি চালাচ্ছি—।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ঃ 'তবে আপনাকে সেলাম ঠুকেছি অন্য কারণে।'

'কী?'

'আপনার সমস্ত গেম আমি টিভিতে দেখেছি। আপনি এককথায় সুপার। আপনার মতন কাউকে দেখিনি। তা ছাড়া পিট ফাইটের সময় আপনি লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত মাথা ঠান্ডা রেখেছিলেন। পাবলিক হাজারটা ওসকানি দেওয়া সত্ত্বেও আপনি জাব্বাকে মেরে ফেলেননি—ছেড়ে দিয়েছেন। সেলামটা সেইজন্যে—।'

জিশান ছেলেটাকে দেখতে লাগল। ও তখনও কথা বলছিল।

'আসলে আমাদের এই শহরটা থেকে দয়া, মায়া, ক্ষমা—এসব উঠে গেছে। তাই টিভিতে অনেকদিন পর সেটা দেখে খুব ভালো লেগেছিল। আমার কখনও যদি আপনাকে সেলাম করার ইচ্ছে হয় সেটা কিন্তু স্যার বারণ করবেন না।'

'আবার স্যার?'

'সরি।' লাজুক হাসল গুনাজি। আঙুল তুলে বাইরের দিকে দেখাল ঃ 'চলুন, গাড়িটা ওইদিকে ডান সাইডে পার্ক করা আছে—।'

ওর সঙ্গে হাঁটা দিল জিশান। গুনাজির পাশাপাশি হাঁটতে ওর কেন জানি না ভালো লাগছিল।

ফোয়ারার জলে সকালের রোদ চিকচিক করছিল। অসংখ্য সোনার কুচি। জিশানের চোখ পলকের জন্য আটকে গেল।

তারপর আকাশের দিকে তাকাল। আজ অনেক বেশি নীল লাগছে। সেখানে বেশ কয়েকটা পাখি চোখে পড়ল। ডানা খেলিয়ে উড়ে যাচ্ছে।



জিশানের পাখি হতে ইচ্ছে করল। কন্ট্রোল্‌ড ফ্রিডম নয়—ওর টোটাল ফ্রিডম চাই। ওর একার জন্য নয়—সকলের জন্য।

জিশান একটা স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

ঠিক তখনই গুনাজি ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনার গায়ে খুব জোর, তাই না?'

জিশান ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'শুধু গায়ে নয়, গুনাজি—মনেও জোর চাই...।'

●

বাতাসে পাখির পালক যখন ভেসে যায় তখন যে-কোমলতার স্পর্শ অনুভব করা যায় জিশানের ঠিক তেমনটাই লাগছিল। গুনাজি যেন গাড়ি চালাচ্ছিল না, একটা তুলতুলে পালক ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল নিউ সিটির নিখুঁত পরিপাটি রাস্তায়।

চারপাশে তাকালেই ছবির মতো সব বাড়ি, ছবির মতো মসৃণ রাস্তাঘাট, পার্ক, গাছপালা, বাগান, লেক। ছবিটা সবমিলিয়ে খুবই সুন্দর, তবে এটা যে 'বাইরের' ছবি সেটা জিশানের মনে পড়ল। 'ভেতরের' ছবিটা দেখার জন্য জিশান চোখ বুজল—কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে রইল।

গুনাজি গাড়ি চালাচ্ছিল আর টগবগ করে কথা বলছিল। জিশানকে ওর স্যাটেলাইট ফোনটা দিয়ে তার নানান বোতামের ব্যবহার বুঝিয়ে দিচ্ছিল। কী করে ফোন করতে হয়, কী করে ফোন ধরতে হয়, কী করে জি. পি. আর. এস. আর. জি. পি. এস ব্যবহার করতে হয়—এইসব।

'তুমি এত কিছু শিখলে কী করে?' জিশান ওকে জিগ্যেস করল।

গাড়ির সামনের কাচে চোখ রেখে হাসল গুনাজি ঃ 'স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার স্বভাব। তা ছাড়া আমাদের নিউ সিটির "ডেটা কমিউনিকেশান সেন্টার"-এ আমি ছ'মাস ট্রেনিং নিয়েছি। আমি লাস্ট দেড় বছর ধরে সবাইকে স্যাটেলাইট ফোন অপারেট করা শেখাই আর সি থ্রু অটোমোবিল চালানো শেখাই। এই কাজটা আমার খুব ভালো লাগে...।'

যে-গাড়িটা গুনাজি জিশানের জন্য নিয়ে এসেছে সেটা ব্যাটারিতে চলে এবং সেটা সি থ্রু। অর্থাৎ, গোটা গাড়িটা স্বচ্ছ ফাইবারের তৈরি। তার ভেতরের বিভিন্ন পার্টস, মোটর, ক্লাচ, গিয়ার বক্স, ডিফারেনশিয়াল গিয়ার—সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গাড়ির ডিজাইন এরোডায়ানামিক এবং একইসঙ্গে আরগোনোমিক। ছুটে যাওয়া গাড়িটাকে যাতে দেখতে কারও অসুবিধে না হয় তার জন্য গাড়িকে ঘিরে ফাইবারের বডির ওপরে ছ'ইঞ্চি চওড়া ফ্লুওরোসেন্ট [illegible] রঙের উজ্জ্বল

পটি আঁকা আছে। এই নীল রং দিনে কিংবা রাতে নীল আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে।

গাড়িটাকে দেখেই জিশানের তাক লেগে গিয়েছিল। সে-কথা গুনাজিকে বলতেই ও বলল, 'এ-গাড়িটা ইমপোর্ট করা, স্যার...।'

'আবার "স্যার"?' জিশান বকুনির ঢঙে বলল।

'না, স্যার—মানে, দাদা। এটা ইমপোর্টেড গাড়ি। তবে কিউ মোবাইলের চেয়ে দামে সস্তা। এ-গাড়ি নিউ সিটিতে অনেক আছে।'

জিশান গাড়ির ভেতরটা অবাক হয়ে দেখছিল। অটো এয়ারকন্ডিশানিং সিস্টেম। অটো নেভিগেশান স্ক্রিন। স্মার্ট গিয়ার। ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল। আরও কত কী!

গুনাজি জীবন্ত 'ম্যানুয়াল' হয়ে জিশানকে সি থ্রু অটোমোবিল নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিল। ওর কথায় বোঝা যাচ্ছিল, এই গাড়ির কারিগরি নিয়ে ও অনেক সময় খরচ করেছে।

জিপিসি-র গেস্টহাউস থেকে গাড়ি ছাড়ার একটু পরেই জিশান গুনাজিকে বলেছে, 'গুনাজি, আজ কিন্তু আমি গাড়ি চালানো শিখব না। আজ তুমি নানান জায়গায় ঘুরে আমাকে শহরটা চেনাবে, কেমন?'

'যা বলবেন...।'

সেই কথামতো জিশানের গাড়ি শহরের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখনও শহরের পার্ক, কখনও লেক, কখনও অফিসপাড়া, কখনও বা সুপারগেম্‌স কর্পোরেশানের বিল্ডিং কিংবা সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টার।

শহরটা দেখতে-দেখতে জিশানের মনখারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কারণ, ওর ওল্ড সিটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওর শহরটা একমনে গড়িয়ে যাচ্ছে ক্ষয়ের দিকে।

গাড়ির কন্ট্রোলের দিকে নজর রেখেছিল গুনাজি। আর একইসঙ্গে জিশানের গাইডের কাজ করছিল। শহরের নানান জায়গা সম্পর্কে ও যতটুকু জানে সেটাই অন্তরঙ্গভাবে জিশানকে বলার চেষ্টা করছিল।

শহরের রাস্তাঘাটে পথচারী মানুষজন প্রায় চোখেই পড়ে না। শুধু গাড়ি আর গাড়ি। নানান মাপের, নানান রঙের, নানান ঢঙের। শহরটা যেন শুধু যন্ত্র দিয়ে ঠাসা—ভাবল জিশান। কিন্তু গাড়িগুলো সব ব্যাটারি ড্রিভেন হওয়ায় আকাশ বাতাস পরিষ্কার—দূষণের ছোঁয়া টের পাওয়া যায় না।

একটা ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে জিশানের গাড়ি ছুটছিল। নীচের দিকে তাকিয়ে জিশান হঠাৎই দেখতে পেল একটা সবুজ জঙ্গল। আকারে চৌকো। তার এক-একদিকের মাপ চারশো কি পাঁচশো মিটার হবে।

'নীচে ওটা কি, গুনাজি?'

'ওটা পাখির বাসা।'

'পাখির বাসা মানে?' অবাক হয়ে গুনাজির দিকে তাকাল জিশান।

জিশানের দিকে চোখ ফেরাল গুনাজি। হাসল ঃ 'বার্ড স্যাংচুয়ারি, দাদা। আমি শর্টে বলি পাখির বাসা—।'

জিশান হেসে ফেলল।

গুনাজি বলল, 'এ শহরে এরকম মোট দশটা স্যাংচুয়ারি আছে—শুধু পাখির জন্যে। ওই মিনি জঙ্গলগুলোয় পাখি ছাড়া আর কিছু নেই। যে-কেউ ইচ্ছে করলে টিকিট কেটে ওই জঙ্গলে ঢুকে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে পারে। তবে তার গায়ে মাইক্রো-ক্যামেরা ফিট করে দেওয়া হয়—যাতে পাখিদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে। পাখি ধরতে বা মারতে চেষ্টা করলে জঙ্গলের সিকিওরিটি গার্ডরা তাদের মনিটরে সেটা দেখতে পাবে। আর তখনই শাস্তি—।'

'কী টাইপের শাস্তি?' জিশান জানতে চাইল।

'এসব কেসে শাস্তি হচ্ছে ফাইন—মানে, টাকা। আর টাকার ফিগারটা এমন যে, তার ইকনমিক ইনডেক্স পড়ে যেতে পারে। মানে, বাই-বাই নিউ সিটি হয়ে যেতে পারে—।'

জানলা দিয়ে নীচে তাকাল জিশান। আরও একটা পাখির বাসা ওর চোখে পড়ল। শহরের মধ্যে দশ-দশটা পাখির অভয়ারণ্যের ব্যাপারটা ওর ভালো লাগল।

'গুনাজি, শহরের মধ্যে পাখি ছাড়া আর কিছুর স্যাংচুয়ারি নেই?'

'না, আর যা আছে সব শহরের বাইরে। নিউ সিটির মধ্যে শুধু পাখি। কারণ, আমাদের মার্শাল পাখি ভালোবাসেন...।'

জিশানের মনে পড়ে গেল শ্রীধরের অফিসের ফ্যানটেইল্ড লাভবার্ড্স-গুলোর কথা। আর একইসঙ্গে মনে পড়ল পাখিগুলোর 'কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম'-এর কথা।

কিন্তু এই অভয়ারণ্যের পাখিগুলোর স্বাধীনতায় শ্রীধর পাট্রা কোনওরকম খবরদারি করেননি।

শহরের নানান জায়গায় জিশান অনেক ফ্লাইওভার দেখতে পাচ্ছিল। বিশাল-বিশাল, রামধনুর মতো তাদের চেহারা। আর তাদের প্রত্যেকের গায়ে লাল, নীল, হলদের মতো উজ্জ্বল রং। আর সবক'টাই এক অলৌকিক উপায়ে কোনওরকম পিলার ছাড়াই শূন্যে ভেসে আছে।

এখন যদি একটা সত্যিকারের রামধনু ওঠে তা হলে দারুণ হয়। ভাবল জিশান।

শহরে ঘোরাঘুরির পথে গুনাজির গাড়ি এক ফ্লাইওভার ছেড়ে আর-এক ফ্লাইওভারে উঠছিল। জিশানের মনে হচ্ছিল, ও নানান পাহাড়ে উঠছে আর নামছে। আর সেই 'পাহাড়' থেকে দেখতে পাচ্ছে গাছপালা, হাই-রাইজ, উড়ে

যাওয়া পাখি আর শিস দিয়ে ছুটে যাওয়া শুটার।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়ার জন্য একটা ফুড মলের কাছে গাড়ি পার্ক করল গুনাজি।

প্রায় দশতলা উঁচু মল-বিল্ডিং। বাইরের চেহারা সুষম বহুভুজের মতো। পুরোটাই কাচে ঢাকা। আর বিল্ডিংটা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে খুব ধীরে-ধীরে ঘুরছে। বিল্ডিং-এর নানান তলায় বসে থাকা লোকজনকে আকাশের ছায়া-মাখা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

শহরের বৈভব আর কারিগরি দক্ষতা জিশানকে যেন আবার নতুন করে ধাক্কা দিল।

গাড়ি থেকে নামার আগে গুনাজি বলল, 'দাদা, সানগ্লাসটা চোখে দিয়ে নিন। আর এই ব্লু ক্যাপটা মাথায় পরে নিন—' গাড়ির পিছনের সিট থেকে একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে তার ভেতরে হাত ঢোকাল গুনাজি। একটা সানগ্লাস আর একটা নীল টুপি জিশানের হাতে দিয়ে বলল, 'আমার ওপরে এরকমই ইনস্ট্রাকশন আছে। এই সানগ্লাস আর টুপি না পরলে পাবলিক চট করে আপনাকে চিনে ফেলতে পারে। তখন ভিড়-টিড় জমে গিয়ে ঝামেলা হবে...।'

জিশান গুনাজির দেওয়া জিনিস দুটো চোখে আর মাথায় পরে নিল। তারপর গাড়ি থেকে নামল।

খাওয়াদাওয়া আর আরামে ঘণ্টাদেড়েক কেটে গেল। মাইক্রোভিডিয়োফোনে মিনির সঙ্গে কথা বলল জিশান। প্রতিদিনের বরাদ্দ দশমিনিট থেকে কিছু-কিছু করে সময় জমিয়ে জিশানের টকটাইম ব্যালান্স এখন এক ঘণ্টারও বেশি। ওর মনে হয়েছে, কিল গেমে যাওয়ার আগের কয়েকটা দিন মিনির সঙ্গে ওর অনেক বেশি সময় ধরে কথা বলতে ইচ্ছে করবে। তাই ও গত একমাস ধরেই এমভিপি-র সময় জমাচ্ছে।

গুনাজি আবার যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল তখন জিশান 'ছদ্মবেশ' খুলে রেখে মিনি আর শানুর ভাবনায় ডুবে আছে।

গাড়ি চালাতে-চালাতে গুনাজি বলল, 'দাদা, আমরা এবার সেন্ট্রাল লেকের দিকে যাচ্ছি। এটা শহরের খুব সুন্দর জায়গা। লেকটা মাপে এত বড় যে, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। আর সাহেবদের চোখের মতো নীল জল...।'

ওর তুলনার ঢঙে জিশান হেসে ফেলল। একইসঙ্গে ওল্ড সিটির মা আর ছেলের চিন্তার জাল ছিঁড়ে পলকে চলে এল সি থ্রু অটোমোবিলে। ও গুনাজির দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফেরাল সামনের দিকে। গাড়ির স্ক্র্যাচপ্রুফ স্বচ্ছ পলিমার উইন্ডশিল্ডটা এমন যে, আছে বলে চট করে বোঝা যায় না।

গাড়ি ছুটে চলল আরও চারমিনিট কি পাঁচমিনিট—তারপরই চোখ-

জুড়োনো একটা জায়গায় জিশানরা পৌঁছে গেল।

সীমাহীন একটা হ্রদ। তার জল সত্যিই সাহেবদের চোখের মতো নীল। যেদিকে তাকানো যায় শুধু নীল আর নীল। সেই নীলের বুক চিরে চওড়া কালো ফিতের মতো রাস্তা। রাস্তার দুপাশে হলদে রঙের পাম গাছের ঘন সারি, আর সেগুলোর কোল ঘেঁষে ধবধবে সাদা ছোট-ছোট কটেজ।

রাস্তা থেকে নেমে ঘাসে ছাওয়া জমির ওপরে গাড়ি থামাল গুনাজি। জিশান আবার রোদচশমা আর টুপি পরে নিল। তারপর ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে লেকের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল।

লেকের অন্তত একশো মিটার ওপর দিয়ে পাঁচটা রঙিন ফ্লাইওভার চলে গেছে। ওগুলো কী করে শূন্যে ঝুলে আছে জিশান ভেবে পেল না। নিউ সিটির প্রযুক্তিকে মনে-মনে সেলাম দিল জিশান।

সামনে তাকালে দেখা যায়, দূরে—বহুদূরে লেকের নীল জল ঝাপসা সবুজ এক পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে।

আর পিছনে, প্রায় সমান দূরে, চোখে পড়ছে হাই-রাইজের সারি।

'এই হল আমাদের সেন্ট্রাল লেক।' গুনাজি বলল, 'নিউ সিটির সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ টুরিস্ট স্পট। ওই যে কটেজগুলো দেখছেন—' আঙুল তুলে কটেজগুলো দেখাল ঃ 'ওগুলোর চার্জ এত ভয়ংকর যে, শুধুমাত্র নিউ সিটির ব্যাপক বড়লোকরাই ওখানে থাকতে পারে। আর এখানকার হিসেবে যারা গরিব, তারা এখানে গাড়ি নিয়ে আসে, একটু ঘোরে-ফেরে, নৌকো চড়ে লেকে রাইড নেয়—তারপর সন্ধে হলে চলে যায়...।'

চারপাশে তাকিয়ে অনেক মানুষজন দেখতে পেল জিশান। লেকের কিনারায় অলস পায়ে বেড়াচ্ছে। বড়দের পাশাপাশি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও রয়েছে।

এ ছাড়া লেকের নীল জলে সুন্দর ছাঁদের রঙিন নৌকো ভেসে রয়েছে। বেড়াতে আসা মানুষরা তাতে বসে আনন্দে হইচই করছে।

প্রাণ ভরে দৃশ্যগুলো দেখতে লাগল জিশান। সত্যি, পৃথিবীটা কী সুন্দর! কিল গেমে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত ও রোজ একবার করে এখানে আসবে। নিজেকে বারবার করে বিশ্বাস করাবে, পৃথিবী অপরূপ, অলৌকিক। নিউ সিটির যে-ভয়ংকর রূপ সেটা সাময়িক এবং লৌকিক।

সূর্যের দিকে তাকাল জিশান। বেলা সাড়ে তিনটের সূর্য খানিকটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। নীল লেকের জলে তার উজ্জ্বল ছায়া।

আরামের বাতাস বইছিল। হ্রদের জলে কাঁপন ধরিয়ে শিরা উঠছিল। জিশান চোখ বুজে দাঁড়িয়ে বাতাসটা শরীর শুষে নিতে চাইছিল। তখনই কয়েকটা পাখির শিস ওর কানে এল।

চোখ বুজে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যকে অনুভব করতে লাগল জিশান।

একটু পরে চোখ খুলে ও তাকাল গুনাজির দিকে ঃ 'গুনাজি, আমরা কি একটা বোট নিয়ে লেকে বেড়াতে পারি?'

'হ্যাঁ, দাদা—পারি।' হাসল ছেলেটা ঃ 'আপনার সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ডটা দিন—আমি সোয়াইপ করে আনছি...।'

কার্ডটা নিয়ে লেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা 'লেক কন্ট্রোল রুম'-এর দিকে চলে গেল গুনাজি। এবং ফিরে এল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। তারপর নীল রঙের একটা হাইটেক স্মার্ট বোট নিয়ে ওরা লেকের জলে ভেসে পড়ল।

বোটগুলোয় কোনও চালক নেই। সবটাই প্রি-প্রোগ্রাম্‌ড। ফলে চালানোর কোনও ব্যাপার নেই, স্টিয়ারিং ঘোরানোর কোনও ব্যাপার নেই। শুধু আরাম করে বসে থাকলেই হল। নৌকো নিজের মনে চলবে। তার অটোনেভিগেশান এমনই যে, কোনও একটা নৌকোর সঙ্গে আর-একটা নৌকোর কখনওই ধাক্কা লাগবে না। আর নির্দিষ্ট সময় পার হলেই নৌকো পাড়ের কাছে স্টার্টিং পয়েন্টে আবার ফিরে আসবে।

নীল জলের ওপরে জিশানদের নীল রঙের বোট ভেসে বেড়াচ্ছিল। জলের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে জল আর আকাশ মাখামাখি। তারই মাঝে ফ্লাইওভারগুলো কালো ছায়ার দাগ টেনে হ্রদের জলকে চিরে দিয়েছে।

হঠাৎই একটা সংঘর্ষের শব্দ শোনা গেল।

আওয়াজটা এসেছে ওপরদিক থেকে।

সঙ্গে-সঙ্গে জিশান আর গুনাজি মাথা তুলে তাকাল আকাশের দিকে। দেখল, ফ্লাইওভারের রেলিং ভেঙে একটা সি থ্রু অটোমোবিল ছিটকে গেছে শূন্যে। নীল আকাশের বুকে গাড়ির স্বচ্ছ ফাইবারের বডি সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। গাড়িটা শূন্যে লাট খেতে-খেতে নেমে আসছে নীচে।

লেকে ভেসে বেড়ানো বোটের যাত্রীরা চিৎকার করে উঠল। সে-চিৎকারে আতঙ্ক ছিল, কারণ প্রতিটি বোটই অটোনোভিগেশানে চলছে। শূন্যে বাতাস কেটে গাড়িটা যেভাবে নেমে আসছে তাতে ওটা যে-কোনও বোটের ওপরে এসে পড়তে পারে।

লেক কন্ট্রোল রুম থেকে বোধহয় কিছু একটা করল, কারণ, হঠাৎই সবক'টা নৌকো ছুটতে শুরু করল পাড়ের স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে।

আর তখনই গাড়িটা উল্কার মতো ধেয়ে এসে লেকের নীল জলে 'ঝপাস' শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল। পড়েই বেশ কয়েক হাত লাফিয়ে উঠল, তারপর আবার আছড়ে পড়ল।

লোকের জল বিস্ফোরণের স্প্লিন্টারের মতো চারিদিকে ছিটকে গেল। সেই

জলে নৌকোয় বসা অনেক লোকের জামাকাপড় ভিজে গেল। যাত্রীদের হইচই চিৎকার কিছুতেই থামছিল না। গাড়িটা যে কোনও নৌকার ওপরে আছড়ে পড়েনি তার জন্য লোকজনের সেই চিৎকারে আতঙ্কের চেয়ে এখন আনন্দের ছাপ ছিল অনেক বেশি।

গাড়ির মধ্যে একটা ছেলেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। পাগলের মতো বেরোনোর চেষ্টা করছে গাড়ি থেকে, কিন্তু গাড়ির দরজা কিছুতেই খুলছে না। বরং গাড়িটা ধীরে-ধীরে লেকের জলে ডুবে যাচ্ছে।

অতটা উঁচু থেকে গাড়িটা পড়ার পরেও ছেলেটা যে বেঁচে আছে সেটা জিশানকে অবাক করেছিল। সে-কথা গুনাজিকে বলতেই ও বলল, 'এখানকার সব গাড়িতেই অ্যান্টি-কলিশান এয়ারব্যাগ থাকে। হঠাৎ করে ছুটন্ত গাড়ি থেমে গেলে—মানে, কোনও কিছুতে ধাক্কা খেয়ে আচমকা গাড়ির স্পিড কমে গেল—ওই এয়ারব্যাগ 0.1 সেকেন্ডের মধ্যে ফুলে ওঠে আর ড্রাইভারের মাথাটা ঘিরে বসে যায়। ফলে ড্রাইভার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেঁচে যায়। আর ড্রাইভারের পাশে যে বসে সে-ও একইভাবে সেভ হয়ে যায়...।'

গাড়িটা তখনও ডোবেনি, আর ছেলেটাও গাড়ির ভেতরের দেওয়ালে কিল-ঘুসি মারছিল। বন্ধ গাড়ির ভেতর থেকে ওর চাপা চিৎকারও শোনা যাচ্ছিল।

জিশান বুঝতে পারছিল, এইভাবে ছেলেটা আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে না। তখন অ্যান্টি-কলিশান এয়ারব্যাগের ব্যাপারটাই মাঠে মারা যাবে। ব্যাগটা ওকে ইমপ্যাক্ট ইনজুরি থেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু লেকের জল তো ওকে রেহাই দেবে না!

চারপাশে খুব দ্রুত নজর চালিয়ে নিল জিশান।

অন্যান্য বোটের লোকজন এবার মজা দেখছে। বিনাপয়সার রোমাঞ্চকর শো। ওরা গাড়িটার খাবি খাওয়া দেখছে, ছেলেটার মরিয়া হাত-পা ছোড়াছুড়ি দেখছে আর নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে।

রাস্তায় পামগাছের সারির কাছে দাঁড়ানো লোকজনের অবস্থাও তাই।

জিশান আর দেরি করল না। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ছুড়ে দিল বোটের মেঝেতে। তারপর টুপিটাও। এবং ঝাঁপ দিল লেকের জলে।

আগের মজার সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ হওয়ায় দর্শকরা আবার উঁচু পরদায় হইহই করে উঠল।

জামা-প্যান্ট পরা অবস্থাতেই জিশান গাড়ি লক্ষ্য করে সাঁতার কাটতে লাগল। লম্বা-লম্বা হাত টেনে আধমিনিটের মধ্যেই ও গাড়িটার কাছে পৌঁছে গেল। ডুবন্ত গাড়ির বনেটের ওপরে উঠে ও সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু পারল না। কারণ, ইঞ্জিনের ভারে গাড়ির সামনের দিকটা ডুবে গিয়ে বনেটটা

ঢালু হয়ে গিয়েছিল।

টাল খেয়ে পড়ে যেতে-যেতেও জিশান ডানপায়ের এক প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে দিল গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের ওপরে। একটু পরেই আর-একবার।

গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল।

জিশান নীচু হয়ে ঝুঁকে হাত বাড়াল গাড়ির ভেতরে। পলকে আঁকড়ে ধরল ছেলেটার জামা। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে ওকে ভাঙা উইন্ডস্ক্রিনের ফাঁক দিয়ে টেনে নিল বাইরে।

ছেলেটা আতঙ্কে চোখ বুজে গোঙাচ্ছিল। জিশান ওকে টেনে নিয়ে ভেসে পড়ল জলে। তাড়াতাড়ি ডুবন্ত গাড়িটার কাছ থেকে সরে যেতে চাইল। কারণ, ডুবে যাওয়া গাড়ির জন্য জলে যে-ঘূর্ণি তৈরি হবে তাতে ও তলিয়ে যেতে চায় না।

ছেলেটা হাঁকপাঁক করছিল। ওর কপালের একপাশ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। জিশান ওর চুলের মুঠি ধরে সাঁতরে চলল পামগাছের সারির দিকে।

ততক্ষণে লোকজন ওকে চিনতে পেরে গেছে। ওদের শহরের রিয়েলিটি শো-র হিরো জিশান। তাই ওরা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

সব বোট তখন স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে গুনাজি 'দাদা! দাদা! চলে আসুন! আর-একটু! আর-একটু!' বলে চেঁচাচ্ছে। ওর আশপাশে আরও অনেক লোক হাত নাড়ছে।

জিশানের মনে হল, ও যেন একটা কমপিটিশানে নাম দিয়েছে। সেখানে ও প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ফিনিশ লাইন বা ওইরকম কোনও কিছুর দিকে এগোচ্ছে।

হঠাৎই লেক কন্ট্রোল রুম থেকে ছ'জন লোক ছুটে বেরিয়ে এল। ওদের গায়ে কালো সিল্কের জ্যাকেট। তার বুকে-পিঠে রুপোলি অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা ঃ 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট।' ওরা দুটো বোট নিয়ে চট করে পৌঁছে গেল জিশানের দুপাশে। অভ্যস্ত কৌশলে ওদের দুজনকে একটা বোটে তুলে নিল। তারপর বোট দুটো ছুটে চলল পাড়ের দিকে।

জিশানের ভেজা জামা-প্যান্ট থেকে জল ঝরে পড়ছিল। ও ছেলেটাকে দেখছিল। একটু আগে ছটফট করছিল, কিন্তু এখন নিস্তেজ হয়ে চুপচাপ মেঝেতে শুয়ে রয়েছে। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে। চোখ দুটো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

ছেলেটার বয়েস সতেরো কি আঠেরো। ওর থুতনিতে এক চিলতে দাড়ি। আর বাঁ-গালে একটা ছোট্ট লাল ফুল—লেসার ট্যাটু।

জিশান হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল ছেলেটার কাছে। ওর কপাল থেকে এখনও রক্ত পড়ছে। ওকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া দরকার।

ও ছেলেটার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। গালে আলতো করে দুটো চাপড় মারল ঃ 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? এই যে, শুনতে পাচ্ছ?'

ছেলেটার চোখ এবার জিশানকে দেখতে পেল যেন। কেমন একটা যন্ত্রণার গোঙানি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

জিশান আবার আলতো চড় মারল গালে। জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায়?'

ছেলেটার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কোনও কথা বেরোল না। ওর মুখ থেকে ঝিম ধরানো পেপারমিন্টের গন্ধ বেরোচ্ছিল। বোধহয় নেশা-টেশা করেছে।

জিশান ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটা জড়ানো গলায় অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, 'সিমান—।'

●

গুনাজির আঙুল সি থ্রু অটোমোবিলের কন্ট্রোল প্যানেলের ওপরে নড়াচড়া করছিল। জিশান পাশের সিটে বসে আড়চোখে ওর দক্ষতা লক্ষ করছিল। আর মনে-মনে ওর তারিফ করছিল। তুলতুলে পালকটাকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে গুনাজি।

একটু দুশ্চিন্তাও ভেসে বেড়াচ্ছিল জিশানের মনে। মাথা ঘুরিয়ে পিছনের সিটের দিকে একপলক তাকাল ও। নেশায় অচেতন সিমান শুয়ে আছে।

ওকে পাড়ে নিয়ে আসার পর 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট' গ্রুপের লোকেরা ওর তদারকি করেছে। ওর ভেজা জামাকাপড় পালটে দেওয়া হয়েছে। ইমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিট থেকে চিফ মেডিক এসেছেন, সিমানের ট্রিটমেন্ট করেছেন, ওকে একটা ইনজেকশানও দিয়েছেন—কিন্তু সিমানকে জাগানো যায়নি। অবশ্য ইনজেকশানটা ঘুমপাড়ানোর না নেশা থেকে জাগানোর সেটা জিশান জানে না।

'লেক কন্ট্রোল রুম'-এর কর্মীরা ব্যাপারটা পিস ফোর্সের লোকাল ইউনিটে জানিয়েছে। তারপর যখন ওরা বলল যে, ছেলেটির আইডেন্‌টিটি পাওয়া না গেলে ওকে কয়েকদিন পিস ফোর্সের হেফাজতে থাকতে হতে পারে, তখন জিশান আপত্তি করেছে। এবং ছেলেটির পরিচয় খোঁজার জন্য ওর ভেজা জামা-প্যান্টের পকেট হাতড়ে দেখার অনুমতি চেয়েছে।

জিশান এখন সকলের কাছে সুপারহিরো। তাই ওর কথায় 'লেক কন্ট্রোল রুম'-এর অফিসাররা রাজি হয়ে গেল। জিশান ঝুঁকে পড়ে সিমানের ভেজা জামাকাপড়ের নানান পকেটে তল্লাশি শুরু করল।

একটু পরেই একটা ম্যাগনেটিক কার্ড পাওয়া গেল ওর পকেট থেকে।

তাতে লেখা ঃ 'সিমান বিশ্বাস। বাবা রঙ্গপ্রকাশ। মা পর্ণমালা। বাড়ির স্থ্যনাঙ্ক ঃ জে—সেভেনটিন কমা ফরটি সিক্স।' এ ছাড়া রয়েছে ইমার্জেন্সি কনট্যাক্ট কোড।

অফিসারদের অনুমতি নিয়ে নেশায় অচল সিমানকে সি থ্রু অটোমোবিলের পিছনের সিটে তুলে নিয়েছে জিশান। তারপর ও আর গুনাজি সামনের সিটে বসেছে। এবং গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে।

জিশানের স্যাটেলাইট ফোন থেকে গুনাজি সিমানের ইমার্জেন্সি কনট্যাক্ট কোডে ডায়াল করেছে।

ওপাশে কেউ কথা বলতেই জিশানের হাতে ফোন তুলে দিয়েছে গুনাজি। বলেছে, 'দাদা, আপনি কথা বলুন—।'

'হ্যালো, জিশান বলছি—জিশান পালচৌধুরী...।'

'আমি ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস বলছি...।' কণ্ঠস্বর মসৃণ এবং স্থির রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা পুরোপুরি হল না। শব্দগুলোর উচ্চারণে আঁকাবাঁকা ঢেউ খেলে গেল।

এই সেই জিশান! যার সাইকোজিক্যাল প্রোফাইলিং নিয়ে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সময় কাটিয়েছেন রঙ্গপ্রকাশ!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেই জিশান! কারণ, নিউ সিটিতে জিশান পালচৌধুরী একজনই।

জিশান এবার ধীরে ধীরে সিমানের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা খুলে বলল। বলল যে, দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। 'লেক কন্ট্রোল রুম'-এ সিমানের যথাসাধ্য ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। এখন ও জিশানের সি থ্রু অটোমোবিলে শুয়ে রয়েছে—বিশ্রাম নিচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জিশান ওকে নিয়ে রঙ্গপ্রকাশের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।

রঙ্গপ্রকাশের মধ্যে মিশ্র অনুভূতি কাজ করতে লাগল। মনে হল, হঠাৎই একজন সেলিব্রিটি টিভির পরদা থেকে বেরিয়ে সরাসরি পা রেখেছে রঙ্গপ্রকাশের ঘরে।

রঙ্গপ্রকাশ কেমন একটা অলীক ঘোরের মধ্যে জিশানকে বারবার ধন্যবাদ জানালেন। তারপর বললেন, 'আপনি আসুন। আমরা আপনার আসার জন্যে ওয়েট করছি—।'

এক্‌জিট বোতাম টিপে ফোন রিসেট করল জিশান। ফোনটা গাড়ির সিটে রেখে দিল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর সিমানের দিকে একবার দেখল। ঘুমোচ্ছে।

গাড়ি চালাতে-চালাতে গুনাজি বলল, 'দাদা, আপনাকে এ-শহরের বহু লোক চেনে। ভালোও বাসে।'

সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে জিশান আনমনাভাবে বলল, 'হুঁ—।'

গাড়ির ড্যাশবোর্ডের প্যানেলে রঙিন নেভিগেশান ম্যাপ। সেখানে উজ্জ্বল লাল রেখায় সিমানের বাড়ির স্থানাঙ্কে পৌঁছোনোর পথ আঁকা রয়েছে। গুনাজি জানাল, সেখানে পৌঁছতে মোটামুটি ঘণ্টাখানেক লাগবে।

এখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। সূর্য হেলে পড়েছে। জিশানের মনে হল, ঠিক এই সূর্যটাই একইরকমভাবে দেখা যাচ্ছে ওল্ড সিটিতেও।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল জিশানের বুক থেকে।

একটু আগে অল্প খিদে পাচ্ছিল। এখন সেই খিদের বোধটা বড্ড জোরালো হয়ে উঠেছে। গুনাজিকে সে-কথাই বলল জিশান। তখন গুনাজি বলল, 'দাদা, আমারও একই অবস্থা। আমাকে পাঁচটা মিনিট টাইম দিন, একটা ফুড মলে গাড়ি লাগাচ্ছি—।'

পাঁচ মিনিট নয়—তার কম সময়েই একটা অদ্ভুত চেহারার ফুড মলের পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করাল গুনাজি।

ফুড মলটা একটা গাছের মতো শাখা-প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেইনলেস স্টিল আর কাচ দিয়ে তৈরি। তার ওপর রঙিন আলোর আভা এক অলৌকিক মায়া তৈরি করেছে। ছাই রঙের আকাশের পটভূমিতে এক বিমূর্ত চেহারার আলোকবৃক্ষ।

সিমানকে গাড়িতে রেখে ওরা দুজন নেমে দাঁড়াল।

সন্ধে হয়ে এসেছে। তাই সানগ্লাসটা আর চোখে দিল না জিশান। শুধু নীল টুপিটা মাথায় দিয়ে নিল।

গাড়ির পিছনের দরজা খুলে সিমানের ওপরে ঝুঁকে পড়ল জিশান। ওর কপালে হাত বুলিয়ে তাপ নিল। নাঃ, জ্বর-টর কিছু নেই।

গুনাজির দিকে তাকাল জিশান ঃ 'আমাদের বেশি দেরি করলে চলবে না। সিমানকে জলদি বাড়িতে পৌঁছতে হবে—।'

সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল গুনাজি।

'ওর জন্যে একটা হেল্‌থ ড্রিংক বা ওই টাইপের কিছু নিয়ে নিয়ো। যদি ঘুম থেকে উঠে কিছু খেতে টেতে চায়...।'

'এক লিটারের একটা সফট এনার্জি প্যাক নিয়ে নেব, দাদা।'

ফুড মলের যে-রেস্তোরাঁটায় গিয়ে ওরা ঢুকল সেটার নাম 'হেভেন্‌স কিচেন।' রেস্তরাঁর বিশাল বড় প্লেট টিভিতে তখন জিশানের পিট ফাইট দেখানো হচ্ছে। ঘাম-চকচকে শরীর নিয়ে জিশান জাব্বার সঙ্গে লড়ছে।

জিশান একটু অস্বস্তি পেল। মাথার টুপিটাকে টেনে কপালের ওপরে আরও খানিকটা নামিয়ে দিল।

গুনাজি চাপা গলায় বলল, 'দাদা, আপনার ফাইট দেখাচ্ছে।'

'হুঁ—।' বলে একটা খালি টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল জিশান। একটা

চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। গুনাজিও বসে পড়ল ওর পাশে।

স্বচ্ছ টেবিলে ফুটে ওঠা রঙিন ব্যকলাইটেড টাচস্ক্রিন মেনুর দিকে তাকাল গুনাজি। সেখানে হালকা স্ন্যাক্স আইটেমের ওপরে আঙুল ছুঁইয়ে অর্ডার দিল।

রেস্তরাঁটায় বেশ ভিড়। দু-তিনটে টেবিল ছাড়া সব টেবিলেই লোকজন রয়েছে। বেশিরভাগ খদ্দেরই পুরুষ, তবে কয়েকটা টেবিলে ফ্যামিলি চোখে পড়ছে।

প্রায় সকলেরই চোখ টিভির পরদার দিকে। লড়াই দেখতে-দেখতে অনেকে অনেকরকম মন্তব্য করছে। কেউ উত্তেজিতভাবে জিশানকে সাপোর্ট করছে, আর কেউ-বা জাব্বাকে। সব মিলিয়ে একটা চাপা গুঞ্জন আর হইচই।

জিশানের ভালো লাগছিল না। বারবার গাড়িতে রেখে আসা সিমানের কথা মনে পড়ছিল। কতক্ষণে ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে সে-কথাই ভাবছিল।

আশপাশের টেবিল থেকে টুকরো-টুকরো কথাবার্তা ছিটকে এসে ওর কানে ঢুকে পড়ছিল। হঠাৎই ও শুনতে পেল পাশের টেবিলে একজন বলছে, 'এই নিয়মটা বড্ড ফালতু যে, নিউ সিটির কোনও সিটিজেন এইসব কম্পিটিশানে নাম দিতে পারবে না—।'

জিশান তাকাল পাশের টেবিলটার দিকে।

তিনটে ছেলে বসে আছে সেখানে। হ্যামবার্গারে কামড় দিচ্ছে, চোখ প্লেট টিভির দিকে। ওদের সামনে তিনটে প্লেট আর তিনটে গ্লাস। গ্লাসে রঙিন তরল—সফ্ট এনার্জি ড্রিংক কিংবা হার্ড এনার্জি ড্রিংক হতে পারে।

তিনজনের চেহারা তিনরকম, কিন্তু বয়েস আর পোশাক অনেকটা একই রকমের।

একজনের মাথায় কদমছাঁট চুল। গোঁফ কামানো। থুতনিতে একটু দাড়ি—সিমানের মতন। আর কানে চকচকে কোনও ধাতুর মাকড়ি। ছেলেটা বসে থাকলেও লম্বা যে, সেটা বোঝা যায়।

দ্বিতীয়জনের মাথায় লম্বা কোঁকড়ানো চুল। বড় বড় চোখ। চোয়ালের দুপাশের হাড় উঁচু। নাকটা থ্যাবড়ানো। নাকের নীচে সরু গোঁফ।

তৃতীয়জনের চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। কপালের ঠিক মাঝখান বরাবর চুলের এলাকা চোখা হয়ে নেমে এসেছে—ইংরেজিতে যাকে 'উইডোজ পিক' বলে। গাল ভাঙা। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ডানচোখের ভুরুর ওপরে একটা মাকড়ি ঝকঝক করছে।

ওদের দিক থেকে ভেসে আসা প্রথম কথার টুকরোটা জিশানের কৌতূহল উসকে দিয়েছিল। কারণ, ওর ধারণা ছিল নিউ সিটির কোনও মানুষ সুপারগেম্স কর্পোরেশনের কোনও খেলায় নাম দিতে চায় না।

কোঁকড়া চুল তখন বলছে, 'ফালতু মানে? একেবারে ন্যাকাচৈতন নিয়ম। এটা সিন্ডিকেট বোঝে না যে, প্রাইজ মানির কড়কড়ে রোকড়া সব ওল্ড সিটিতে টপকে যাচ্ছে!'

কদমছাঁট চুল তখন বলল, 'ওই যে জিশান নামের ছেলেটা যে লড়ছে, ওকে পালিশ দেওয়া কি খুব একটা টাফ ব্যাপার? শালা ফালতু কিছু নোট এপার থেকে ওপারে চলে গেল। আর মাঝখান থেকে জিশান বড়লোক হয়ে গেল—।'

কথাগুলো গুনাজির কানেও যাচ্ছিল। ও জিশানের দিকে তাকাল। জিশান ইশারায় ওকে চুপচাপ থাকতে বলল। টুপিটা টেনে আরও খানিকটা সামনের দিকে নামাতে চাইল।

ওদের খাবার টেবিলে এসে গিয়েছিল। ও আর গুনজি মাথা নীচু করে খাওয়া শুরু করল।

চুল ব্যাকব্রাশ করা ছেলেটা বলল, 'দাঁড়া, কালই সিন্ডিকেটে একটা রিট্‌ন অ্যাপিল করছি। তাতে রিকোয়েস্ট করব, নিউ সিটির লোকজনও যেন সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের এই থ্রিলিং কমপিটিশানে নাম দিতে পারে—।'

'সিন্ডিকেট?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্নটা করে কদমছাঁট ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল ঃ 'সিন্ডিকেট মানে তো একপাল ইনটেলিজেন্ট বুরবাক—শুধু এই মার্শাল শ্রীধর পাট্রা ছাড়া। যাকগে, সে তুই চিঠি যা লেখার লেখ, কিন্তু বাইরের লোকজন এসে সব মালকড়ি নিয়ে কেটে পড়ছে এ-ব্যাপারটা আমার হেভি গায়ে লাগছে।'

কোঁকড়ানো চুল বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। ওর নজর লক্ষ্য করে সেদিকে তাকাল জিশান।

কয়েকটা টেবিল পরেই একটি ফ্যামিলির চারজন একটা টেবিলে খেতে বসেছে। তার মধ্যে একটি অল্পবয়েসি মেয়েও রয়েছে। বয়েস খুব বেশি হলে কুড়ি-একুশ। পরনে উজ্জ্বল হলদে স্লিভলেস টপ। আর কালো রঙের স্কিনটাইট বারমুডা স্ল্যাক্স। মাথার চুল বিচিত্র ভঙ্গিতে উঁচু করে বাঁধা। টানা-টানা রূপসী চোখ। কপালে লেসার হলোগ্রামের টিপ। গলায় গোলাপি পাথরের একটা মালা।

মেয়েটার সঙ্গে রয়েছে সম্ভবত ওরা মা-বাবা আর ভাই। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, হাসাহাসি করছিল।

কদমছাঁট চুল বাঁকা হাসি হেসে কোঁকড়া চুলের পিঠে একটা থাপ্পড় কষাল।

ব্যাকব্রাশ চুল মজা করে বলল, 'কী সার্ভে করছেন, স্যার?'

কোঁকড়ানো চুল ছেলেটা বন্ধুদের দিকে ফিরে চোখ টিপল ঃ 'গ্রেট স্টাফ। এখন ওর জিয়োগ্রাফি সার্ভে করছি। হিস্ট্রি পরে জানার চেষ্টা করব। আর, বস,

হিস্ট্রির পর আসবে আর্কিওলজি—।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই তিনজনে এমন নোংরা ভঙ্গিতে হাসল যে, কথার নোংরা ইঙ্গিতগুলো জিশানের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। ওর গা ঘিনঘিন করে উঠল। সেইসঙ্গে রাগও হল।

গুনাজি জিশানকে লক্ষ করছিল। জিশানের মনের অবস্থাটা বুঝতেও পারছিল। তাই ও টেবিলের ওপরে হাত বাড়িয়ে জিশানের বাঁ-হাতের পাতার ওপরে রাখল, চাপ দিল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'দাদা, প্লিজ—। এখানকার বেশিরভাগ ছেলেছোকরাই এই টাইপের...।'

ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

পাশের টেবিলের তিনটে ছেলেই নিজেদের চেয়ারগুলো ঘুরিয়ে সরাসরি মেয়েটার দিকে মুখ করে বসল এবং একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে লোভী কুকুরের মতো চেয়ে রইল। শুধু ওদের জিভগুলোই যা বাইরে বেরিয়ে লকলক করছিল না।

গুনাজি বলল, 'দাদা, চলুন, তাড়াতাড়ি খেয়ে আমরা চটপট বেরিয়ে যাই—।'

জিশান 'হুঁ' শব্দ করে খাওয়ায় মন দিল। কিন্তু মাঝে-মাঝেই ওর নজর ছেলে তিনটের অসভ্যতার দিকে চলে যাচ্ছিল।

টিভিতে জিশানের নানান গেম দেখানো হচ্ছিল কিন্তু সেদিকে ওই তিনজনের আর মন ছিল না।

মেয়েটিকেও লক্ষ করছিল জিশান। ও টিভির পরদার দিকে তাকাচ্ছিল, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, আর কখনও-কখনও অসভ্য ছেলে তিনটের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হচ্ছিল, অস্বস্তি পাচ্ছিল।

রেস্তরাঁর অন্যান্য খদ্দের ছেলে তিনটের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কিন্তু শুধু দেখছিলই—কিছু করছিল না।

মেয়েটি ওর মা-বাবাকে বোধহয় কিছু বলল। ওঁরা ছেলে তিনটের দিকে একবার তাকালেন। তারপর একটু যেন আচমকাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

টেবিলে ওঁদের আধখাওয়া প্লেট পড়ে রইল। ওঁরা ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রেস্তরাঁর দরজার দিকে এগোলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ছেলে তিনটেও উঠে দাঁড়াল।

এখন বোঝা গেল, কদমছাঁট চুল ছেলেটা শুধু যে মাথায় লম্বা তা নয়, চওড়াতেও বেশ মানানসই। ওর চোখ দুটো যেন কোটরে বসানো চকচকে মার্বেল—সবসময় এদিক-ওদিক নড়ছে।

ছেলেটার পরনে মেটালিক জিন্‌স। গায়ে একটা প্রিন্টেড পোলো নেক টি-শার্ট।

ওর দু-বন্ধুর টি-শার্টও একই ডিজাইনের—শুধু রং-টা আলাদা।

ছেলে তিনটে নির্লজ্জ বেপরোয়াভাবে মেয়েটার দিকে বাজে ইশারা করছিল। আর বেশ তাড়াহুড়ো করে রেস্তরাঁর দরজার দিকে এগোচ্ছিল।

জিশান খাওয়া থামিয়ে দিল। ছেলে তিনটের অভিসন্ধি বুঝতে চাইল।

কিন্তু তার জন্য জিশানকে বেশি মাথা ঘামাতে হল না, কারণ, তার আগেই দক্ষ নাচিয়ের তৎপরতায় কদমছাঁট চুল রেস্তরাঁর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে এবং মেয়েটির পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

আর ওর বাকি দুই সঙ্গী তখন মেয়েটির বাবা-মা-ভাইয়ের ঠিক পিছনে পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জিশান টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু গুনাজি ওর হাত চেপে ধরল। বলল, 'দাদা, আপনি ঝামেলায় জড়াবেন না। তা হলে মার্শাল খেপে যাবেন। এখানকার এটাই দস্তুর। সবাই চুপচাপ দেখে যায়, এড়িয়ে যায়। যা করার পিস ফোর্সের গার্ডরা করে। মেয়েটির সঙ্গে যারা আছে—মানে, ওর বাবা-মা—ওরা পিস ফোর্সের লোকাল ইউনিটে ফোন করে দিলেই গার্ডরা চলে আসবে...।'

জিশান গুনাজির দিকে অবাক চোখে তাকাল। জিগ্যেস করল, 'ততক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে এই মেয়েটির হেনস্থা দেখবে?'

'হ্যাঁ।' গুনাজি অনুনয় করে বলল, 'প্লিজ, দাদা, আমার কথাটা শুনুন। চলুন, আমরা বরং চলে যাই—।'

এ-কথায় জিশান কী ভাবল কে জানে! ও উঠে দাঁড়াল।

টেবিলের একপাশে কার্ড সোয়াইপ করার স্লট ছিল। সেই স্লটে জিশানের স্মার্ট কার্ডটা সোয়াইপ করে খাওয়ার বিল মেটাল গুনাজি। তারপর সিমানের জন্য নেওয়া সফ্‌ট এনার্জি প্যাকটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি রেস্তরাঁর দরজার দিকে পা বাড়াল।

কদমছাঁট চুল তখন মেয়েটিকে বলছে, 'তুমি খুব সুন্দর। আর আমি সুন্দর জিনিস পছন্দ করি—।'

মেয়েটি লোফার ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে বেরোতে গেল, কিন্তু ছেলেটা দ্রুত পাশে সরে গিয়ে ওর পথ আগলে দিল।

রেস্তরাঁর অনেকেই এখন টিভির পরদা থেকে চোখ সরিয়ে জ্যান্ত 'নাটক' দেখছে।

জিশান লক্ষ করল, মেয়েটির বাবা কিংবা মা সাহায্য চেয়ে চারপাশের লোকজনের দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। হয়তো ওঁরা জানেন, এইভাবে সাহায্য চেয়ে কোনও লাভ নেই।

মেয়েটি এবার বলল, 'সরুন। আমাকে যেতে দিন—।'



'তোমার সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে...।'

'আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।'

'তাই?' বলে জোরে হেসে উঠল অসভ্য কদমছাঁট।

জিশান আর গুনাজি ততক্ষণে রেস্তরাঁর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। গুনাজি কী এক অদ্ভুত কারণে জিশানের কবজি মুঠো করে ধরে রেখেছিল—যেমন করে ছোট বাচ্চা বাবার হাত ধরে রাখে। ওর ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি জিশান গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে।

জিশান কদমছাঁটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ, একটু সরুন—আমরা বাইরে বেরোব।'

গুনাজির বুকের ভেতরে তখন অকারণেই টিপটিপ শব্দ হচ্ছিল।

কদমছাঁট ছেলেটা তখনও মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। জিশানের কথায় ওর দিকে না তাকিয়েই ছেলেটা সামান্য সরে দাঁড়াল। জিশান আর গুনাজিকে পথ করে দিল। গুনাজি আগে, পিছনে জিশান। গুনাজির হাতে জিশানের হাত।

জিশান হঠাৎই থমকে দাঁড়াল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন—আপনারাও আসুন...।'

এ-কথায় মেয়েটি এক-পা এগোনোমাত্রই হাত বাড়িয়ে ওকে বাধা দিল কদমছাঁট। ওর দিক থেকে চোখ না সরিয়েই ঠান্ডা গলায় বলল, 'ও এখন যাবে না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি—।'

'কিন্তু ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না।'

জিশান এ-কথা বলামাত্রই গুনাজি ওর কবজিতে টান মারল। উত্তরে জিশান একটা ছোট মোচড়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে গুনাজির বুকের ভেতরে বিপদের পাগলাঘন্টি বাজতে শুরু করল।

কদমছাঁটের দুজন সঙ্গী এখন জিশানের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

জিশান ওদের দিকে একপলক দেখল। ওদের মুখে নেশাগ্রস্ত জঙ্গীভাব ফুটে উঠেছে।

এতক্ষণ পর কদমছাঁট চুলের মালিক জিশানের দিকে ভালো করে তাকাল। ঘেন্নায় নাক-মুখ কুঁচকে বলল, 'তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও। নইলে প্রবলেম আছে।'

'কীসের প্রবলেম?'

এ-কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেটা দরজার পাশের ধাতব দেওয়ালে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল।

দেওয়ালের পাত তুবড়ে গেল। দেওয়ালের সঙ্গে ঘুষির সংঘর্ষের শক্তি দরজার ফ্রেমের দিকে প্রবাহিত হয়ে দরজার কাচ ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল।

টিভির পরদার দিকে যারা তাকিয়েছিল তাদের নজর ঘুরে গেল দরজার

দিকে। চাপা গুঞ্জন শুরু হল। একজন মহিলার ভয়ের চিৎকার শোনা গেল।

জিশান দেখল, ওর সামনে দাঁড়ানো সুন্দরী মেয়েটির মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। কিন্তু ওর মা-বাবা আর ভাইয়ের চোখে আশঙ্কা ছায়া ফেলেছে।

জিশান কদমছাঁটের চোখের দিকে তাকাল। ধীরে-ধীরে বলল, 'দেওয়ালরা খুব ভালো। কখনও পালটা ঘুসি মারে না...।'

কথাটা বলেই জিশান মাথা থেকে নীল টুপিটা খুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল।

●

কদমছাঁট চুল অসভ্য ছেলেটা সঙ্গে-সঙ্গে জিশানকে চিনতে পারল। ওর চকচকে মার্বেল-চোখ ছিটকে গেল টিভির পরদার দিকে। তারপর জিশানের দিকে। হ্যাঁ, টিভির সুপারহিরোটাই ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ছেলেটার মনোযোগ এবার মেয়েটির দিক থেকে সরে গেল—পুরোপুরি চলে এল জিশানের দিকে। এ কী অপূর্ব সুযোগ ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে! বরাবর যা নিয়ে ওর সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তার সরাসরি সমাধান এই মুহূর্তে এসে গেছে হাতের মুঠোয়! একেই বলে কপাল!

কদমছাঁট চুল হেসে ফেলল। প্রথমে দাঁত-দেখানো নিঃশব্দ হাসি—তারপর শব্দ করে তাচ্ছিল্যের হাসি।

জিশান ছেলেটার হাসির অর্থ একটু-একটু বুঝতে পারছিল। ও মেঝেতে পড়ে থাকা কাচের টুকরোগুলোর দিকে তাকাল। রেস্তরাঁর ভেতরে যদি হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় তা হলে বাড়াবাড়িরকমের ভাঙচুর হতে পারে। তার চেয়ে রেস্তরাঁর দরজার বাইরে চলে যাওয়া ভালো।

সুন্দরী মেয়েটি জিশানের হাতের নাগালের মধ্যে ছিল। জিশান আচমকা ছোঁ মেরে ওর হাত খামচে ধরল। তারপর এক ঝটকায় ওকে টেনে নিল দরজার বাইরে। একইসঙ্গে চাপা গলায় বলল, 'শিগগিরই এখান থেকে চলে যাও—।'

মেয়েটির মুখে তখন বিহ্বল ভাব। সেটা চট করে কাটিয়ে উঠে ও ইশারায় মা-বাবাকে বাইরে আসতে বলল।

প্রতিক্রিয়া দেখাতে কদমছাঁট চুল কয়েক পলক সময় নিল। তারপর জিশান যা ভেবেছিল ও ঠিক তাই করল। সরাসরি তেড়ে এল জিশানের দিকে। পিছনে ওর দুই শাগরেদ।

রেস্তরাঁর বাইরে একটা বড়সড় লাউঞ্জ। লাউঞ্জে ব্যাক লাইটেড গ্রাফিক গ্লাসের সিলিং আর চারপাশে অনেক বড়-বড় চৌকো ক্রিস্টালের পিলার।

পিলারের গায়ে ফুটে উঠছে চলমান রঙিন ছবি—নানান জিনিসের রঙিন অডিয়োভিশুয়াল বিজ্ঞাপন। সেই রঙিন আলো জিশানের গায়ে পড়ছে। ওর মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, জিশান নিজেও একটা রঙিন বিজ্ঞাপন।

লাউঞ্জে যারা চলাফেরা করছিল তাদের দু-চারজন জিশানকে চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই ছেলেটা সত্যিই কিল গেমে কোয়ালিফাই করা, টিভিতে দেখা, জিশান পাল চৌধুরী কি না তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিল।

গুনাজি কখন যেন আবার জিশানের হাত ধরে ফেলেছিল, আলতো করে টান মারছিল। আসন্ন মারপিটের ব্যাপারটাকে ও এড়াতে চাইছিল। কিন্তু এড়ানো যে যাবে না মনে-মনে সেটাও বুঝতে পারছিল।

জিশানের তিন-চার হাতের মধ্যে এসে কদমছাঁট থামল। জিশানের চোখের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'কী সুপারহিরো, লাইভ টেলিকাস্ট ছাড়া রিয়েলিটি শো হবে নাকি?'

ওর শাগরেদ দুজন একে অপরের দিকে চোখ ঠারল। তারপর হেসে চেঁচিয়ে বলল, 'জিশান, তুমি জিতলে আমরা চাঁদা তুলে তোমাকে প্রাইজমানি দেব। মাইরি—কসম খেয়ে বলছি...।' নিজের টুটিতে আঙুল ছোঁয়াল একজন।

'জিশান' নামটা শোনামাত্রই গুঞ্জন উঠল লাউঞ্জে। জিশানদের ঘিরে ভিড়টা আরও গাঢ় হল। ভিড়ের বৃত্তের দ্বিতীয় কি তৃতীয় স্তরে মেয়েটি সপরিবারে দাঁড়িয়েছিল। চিবুক উঁচু করে জিশানকে স্পষ্ট করে দেখতে চেষ্টা করছিল। ওর মুখে উদ্বেগের ছোঁয়া।

কদমছাঁট ছেলেটা হাতের চার আঙুল নেড়ে জিশানকে কাছে আসার জন্য ওসকাচ্ছিল আর বলছিল, 'এসো, সুপারহিরো—দাদাগিরির প্রাইজমানি নেবে এসো। ওঃ, কাম অন—।'

ওর শাগরেদ দুজনের একজন—বোধহয় কোঁকড়া চুল—হিংস্র গলায় কদমছাঁটকে লক্ষ করে বলল, 'চামোন, মালটাকে গিলে খেয়ে নে!'

জিশান বুঝতে পারছিল, মেয়েটির ব্যাপারে হঠাৎ এভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়াটা ওর ঠিক হয়নি। কদমছাঁট চুল ছেলেটিকে ওর ঠান্ডা মাথায় বোঝানো উচিত ছিল। কারণ, অসভ্যতাকে অ-সভ্যতা দিয়ে রুখলে ব্যাপারটা শেষ হতে চায় না। নিউক্লিয়ার চেইন রিয়্যাকশনের মতো তার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ চলতেই থাকে। যেমন এখন চলছে।

তাই জিশান আচমকা গুনাজির মুঠো থেকে নিজের হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে জোড়হাত করে ফেলল। চামোনকে অনুরোধের গলায় বলল, 'ভাই, কিছু মনে করবেন না। আমাদের কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে—।'

'তাই?' চামোন ন্যাকা গলায় জিগ্যেস করল। তারপর ওরা তিনজনেই বস্তির নোংরা ভাষায় গালাগাল ছুড়ে দিল।

জিশান তাও হাল ছাড়ল না। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে ওদের শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল।

উত্তরে সমবেত জনতাকে রীতিমতো চমকে দিয়ে চামোন জিশানের রগে সপাটে এক ঘুসি বসিয়ে দিল।

পটকা ফাটার শব্দ হল। জিশানের বাঁ-কানে তালা লেগে গেল পলকে। একইসঙ্গে ও কাচ-চকচকে মার্বেলের মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

ও যাতে গায়ের ওপরে এসে না পড়ে সেজন্য ভিড়ের বৃত্ত চট করে সরে গেল পিছনে। চিৎকারের একটা ঢেউ উঠল লাউঞ্জে।

গুনাজি আর দেরি করল না। পকেট থেকে একটা স্যাটেলাইট ফোন বের করে বোতাম টিপতে শুরু করল। পিস ফোর্সের লোকাল ইউনিটে এখনই খবর দেওয়া দরকার।

জিশান ঘুসির আঘাতটা সামলে নিতে পারল। মাসের পর মাস ধরে নিউ সিটিতে ট্রেনিং নিয়ে ও লড়াই করতে যেমন শিখেছে, সহ্য করতেও তেমন শিখেছে। ওর রোজকার ওয়ার্কআউট রুটিনে এক কণাও ছন্দপতন হয়নি। তাই মেঝেতে দুবার পাক খেয়েই ওর শরীরটা আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছে।

চামোন তখন পরের আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।

ওদের ঘিরে মানুষের ভিড় আরও বেড়েছে। জিশানকে চিনতে পেরে অনেকেই অবাক হয়ে গুনগুন করে ওর নাম বলছে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

জিশান শান্ত গলায় চামোনকে বলল, 'ভাই, আমি মারপিট করতে চাই না। মারপিট আমার ভালো লাগে না। প্লিজ, কুল ডাউন। আমি...।'

উত্তরে চামোন ওর শরীরটা একপাশে হেলিয়ে জিশানকে লক্ষ করে জোরালো লাথি চালাল। জিশান কথা বলতে-বলতেই দু-হাত একজোট করে অনায়াসে লাথিটা রুখে দিল।

'প্লিজ, আমার কথা শুনুন...' জিশান বলতে লাগল, 'মাথা ঠান্ডা করুন। আপনারা রেস্তরাঁয় ফিরে যান। হাতজোড় করে বলছি, মারপিট আমি ভালোবাসি না। শুধু ওই মেয়েটিকে আপনারা ডিসটার্ব করছিলেন বলে...।'

জিশানের কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা লাথি এসে পড়ল ওর শরীরে। যেহেতু লাথিটা এসেছে ওর পিছন থেকে তাই জিশান এটা রুখতে পারল না। আবার ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

লাথিটা মেরেছিল চামোনের ব্যাকব্রাশ চুল বন্ধু। সে কখন যেন জিশানের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধুকে শাসিয়ে উঠেছে চামোন ঃ 'অ্যাই, কিছু করবি না। আমি একা। আমি একা—।'

এ-কথায় ব্যাকব্রাশ চুল দমে গেল। ওর মুখটা কাঁচুমাচু হয়ে গেল।

কথা বলতে-বলতে জিশানের হাত ধরল চামোন। ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। ওর দিকে তাকিয়ে ন্যাকাবোকা ভঙ্গিতে হাসল। বলল, 'আমি একা। তোমাকে আমি একা খতম করব, সুপারহিরো।'

গুনাজির খুব খারাপ লাগছিল। প্রথমটায় ওর মনে হয়েছিল জিশান বুঝি নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা মোকাবিলায় নেমে পড়তে চাইছে। কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলো দেখে ওর উলটোটাই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, না, জিশান মারপিট ভালোবাসে না।

জিশান খুব সময়মতো নিজেকে সামলে নিয়েছিল। এটা ঠিকই যে, চামোনের অসভ্য আচরণ ওর মেজাজ খারাপ করে দিয়েছিল। ও ভেবেছিল, চামোনদের উচিত শিক্ষা দেবে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওর মনে হয়েছে, সেটা ঠিক হবে না। হিংসা আর প্রতিহিংসা মানুষকে কখনও এগিয়ে দেয় না। তা ছাড়া ওর কন্ট্রোল্‌ড ফ্রিডমের কথা মনে পড়েছিল। হয়তো এখানে গন্ডগোল করলে কাল থেকে ওর গুনাজির সঙ্গে বেরোনো বন্ধ হয়ে যাবে। জিপিসি-র গেস্টহাউসেই দমবন্ধ করে মুখ গুঁজে থাকতে হবে। তারপর দেখতে-দেখতে এসে যাবে ২ সেপ্টেম্বর, রবিবার। জিশানের বাঁচা-মরার দিন। কিল গেম। হয়তো তিন তারিখ থেকে জিশান আর কিছুই দেখতে পাবে না। মিনিকে না, অর্কনিশানকেও না।

জিশান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অল্প-অল্প টলছিল, আর এসব কথা ভাবছিল।

চামোন জিশানের গালে অসম্ভব জোরালো একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল। জিশানের মুন্ডুটা এক ঝটকায় ষাট ডিগ্রি ঘুরে গেল। গাল ফেটে রক্ত বেরোতে শুরু করল।

জিশান যন্ত্রণার চিৎকার করে উঠেছিল, কিন্তু সেটা একটা ছোট্ট টুকরো মাত্র। চিৎকারের বাকিটা ও দাঁতে-দাঁত চেপে সহ্য করছিল। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় আক্ষেপের শব্দ বেরিয়ে এল জিশানদের ঘিরে থাকা দর্শকদের ঠোঁট চিরে।

জিশান চোখে ঝাপসা দেখছিল। চারপাশের বিজ্ঞাপনের মিউজিক আর দর্শকদের গুঞ্জন কেমন জড়িয়ে জট পাকিয়ে হিজিবিজি শোনাচ্ছিল। ও কেমন করে চামোনদের বোঝাবে, নিউ সিটির লড়াইয়ে ও সাধ করে আসেনি! ওকে ফাঁদে ফেলে এখানে আনা হয়েছে।

জিশানের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল পিস ফোর্সের মার্শাল শ্রীধর পাট্টার ওপরে। চামোনদের এইরকম বখে যাওয়া আচরণের জন্য ওই শয়তান লোকটাই দায়ী। ওই লোকটাই নিউ সিটির মানুষের কাছে ভ্যালু আর প্রাইস—এই দুটো শব্দের মানে একাকার করে দিয়েছে।

জিশানের রাগটা আবার উথলে উঠছিল। ও গুনাজির দিকে একবার তাকাল। তাকানোর ভঙ্গিতে বোধহয় অনুমতি চাওয়ার একটা নীরব আরজি ছিল। সেই করুণ রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে গুনাজির চোখে জল এসে গেল। ও কান্না চেপে ভাঙা গলায় বলল, 'দাদা, আর মার খেয়ো না। আমি পিস ফোর্সে খবর দিয়েছি। কিন্তু ওরা আসতে-আসতে তুমি...তুমি...শেষ হয়ে যাবে...।' কথা শেষ করতে-করতে কেঁদে ফেলল গুনাজি। আর ঠিক তখনই চামোনের পা গুনাজির পেট লক্ষ করে ধেয়ে এল।

সংঘর্ষের ভোঁতা শব্দ হল। একইসঙ্গে গুনাজির মুখ দিয়ে একটা বীভৎস 'ওঁক' শব্দ বেরিয়ে এল। গুনাজির হাত থেকে সিমানের জন্য কেনা এনার্জি ড্রিংকের প্যাকটা ছিটকে পড়ল। ওর রোগা লম্বা শরীরটা ভাঁজ হয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল দর্শকদের ঘাড়ে। একটা মেয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

জিশান যেন একটা শক খেল। ঝাপসা নজর স্পষ্ট হয়ে গেল পলকে। চটপট হাত-পা নেড়ে ও শরীরের ভেতরের একটা অদৃশ্য সুইচ অন করে দিল। শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের সুইচ।

জিশান সবে চামোনের দিকে এক পা এগিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। ফুড মলের দুজন সিকিওরিটি গার্ড গোলমালের খবর পেয়ে অকুস্থলে এসে হাজির হয়েছে। ওদের পরনে খাকি আর কালো রঙের নকশাদার ইউনিফর্ম। মাথায় কাপড়ের টুপি। হাতে লম্বাটে ওয়াকিটকি।

গার্ড দুজন চিৎকার করতে-করতে আসছিল আর মাঝে মাঝে ওয়াকিটকিতে কথা বলছিল।

ওরা ভিড়ের বৃত্ত ঠেলে-ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল। চামোন আর জিশানকে লক্ষ করে একজন বলল, 'অ্যাই এক্ষুনি হুজ্জুতি বন্ধ করো। যাও, বাইরে যাও!'

দ্বিতীয় গার্ড বলল, 'এখানে এসব লাফড়া চলবে না। এক্ষুনি পিস ফোর্সের কাছে হ্যান্ডওভার করে দেব...।'

এরপর যা হল সেটা জিশান কল্পনাও করেনি।

চামোন গার্ড দুজনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছিল। কিন্তু ওর দুজন দোস্ত সবাইকে চমকে দিয়ে গার্ড দুজনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কোঁকড়ানো লম্বা চুল ছেলেটা সাপের ছোবলের ক্ষিপ্রতায় একজন গার্ডের ওয়াকিটকি কেড়ে নিয়ে সেটা প্রবল শক্তিতে সেই গার্ডের ব্রহ্মতালুতে বসিয়ে দিল। গার্ডটা একটা 'আঁক' শব্দ করে স্রেফ খসে পড়ল মেঝেতে।

ভুরুতে মাকড়িওয়ালা ব্যাকব্রাশ চুল সরাসরি দ্বিতীয় গার্ডটার গলা টিপে ধরল দু-হাতে। এবং নিজের মাথা দিয়ে সাংঘাতিক এক ঢুঁ মারল।

গার্ডটার মাথা কাত হয়ে গেল একপাশে। তখন ব্যাকব্রাশ চুল ওকে এমন

হেলাফেলা করে ছুড়ে দিল যেন একটা ন্যাকড়ার পুতুল—তাও আবার জলে ভেজা।

গার্ড দুজনকে ডিঅ্যাক্টিভেট করার ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটে গেল যে, জমায়েত পাবলিক হইচই চিৎকার করারও সুযোগ পেল না। মুহূর্তের জন্য সবাই কেমন থম মেরে গেল।

কদমছাঁট চুল হঠাৎই শব্দ করে হাততালি দিয়ে উঠল। আর একইসঙ্গে একজোড়া বন্ধুকে লক্ষ করে বলে উঠল, 'শাবাশ! জিয়োঃ!'

উত্তরে ব্যাকব্রাশ চুল মাথা নেড়ে সিটি বাজাল তিনবার। তারপর গার্ড দুজনের নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় নোংরা খিস্তি করে উঠল।

চামোন বক্সারদের মতো লাফাতে-লাফাতে জিশানের কাছে এগিয়ে এল। তারপর প্রচণ্ড এক ঘুসি মারার জন্য ডানহাতটা মুঠো করে পিছিয়ে নিয়ে এল।

গুনাজি আর থাকতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, 'দাদা, এবার মারো! পালটা মারো!'

জিশান যেন হঠাৎই ঘুম থেকে জেগে উঠল। হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারল ওর গাঁধিগিরি ব্যর্থ হয়েছে। কারণ গাঁধিগিরি প্রয়োগ করা যায় মানুষের ওপরে—অমানুষের ওপরে নয়। তা ছাড়া যে-গুনাজি একটু আগে ওকে 'ঝামেলায়' জড়াতে বারণ করছিল সে-ই গুনাজিই এখন বলছে, 'দাদা, এবার মারো! পালটা মারো!'

জিশানের তাজ্জব লাগল। দুনিয়া কী দ্রুতই না রং পালটায়।

সুতরাং জিশান ডানহাঁটু ভাঁজ করে শূন্যে লাফ দিল বাজপাখির মতো। সামনে হাত বাড়িয়ে দু-হাতের তালুতে বন্দি করল কদমছাঁটের মাথা। এবং হাঁটুর গাঁট দিয়ে ওর চিবুকের নীচে এক মরণ-আঘাত করল।

ব্যাপারটা সেখানেই থামল না। ওর মুন্ডু শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মেঝেতে চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ল জিশান। সেই প্রবল টানে মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি হল। শব্দ শুনে মনে হল এই বুঝি কারও খুলিতে ফাটল ধরল।

জিশানের মুখে তখন ছুঁয়ে রয়েছে কদমছাঁটের মুখ। নাকে আসছে উৎকট ঘামের গন্ধ। জিশান যেন চিড়িয়াখানায় কোনও জন্তুর খাঁচায় ঢুকে পড়েছে হঠাৎ।

নিউ সিটি জিশানকে লড়াইয়ের এইসব কলাকৌশল শিখিয়েছে। শিখিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। তাই নিউ সিটির এই অসভ্য জানোয়ারটাকে নিউ সিটির শিক্ষা ফেরত দিচ্ছিল ও। এবং তারই শেষ দফা হিসেবে ও কদমছাঁটের গালে ভয়ংকর এক কামড় বসাল। ব্যাকরণের বাইরে লড়াই।

এর ফলে যে-চিৎকারটা তৈরি হল তাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কসাইখানায় ছুরি যখন আগু-পিছু করে কোনও শুয়োরের গলা কাটে তখন সে

বোধহয় এরকম আর্তনাদই করে থাকে।

জিশান শরীরটাকে কয়েক পাক গড়িয়ে ছিটকে সরে এল চামোনের কাছ থেকে। ও তখন গালে হাত চেপে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে আর একইসঙ্গে পাগলের মতো চিৎকার করছে। ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুইয়ে-চুইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

পাবলিক এবার চিৎকারের ঢেউ তুলল। তাতে উত্তেজনার সঙ্গে মিশে আছে ভয়ের ছোঁয়া। কেউ-কেউ ভয়ে সরে গেল অন্য কোথাও। কারা যেন কাদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। কেউ বা ব্যস্তভাবে মোবাইল ফোনের বোতাম টিপছে।

জিশান উঠে দাঁড়াল। ওর চোখ, মুখ, চোয়ালের রেখা এখন অন্যরকম লাগছে। জিভে নোনা স্বাদ। সত্যিই ও এখন কিল গেমের পার্টিসিপ্যান্ট।

চামোনের দু-বন্ধু জিশানের প্রতিরোধের চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। জিশানের ক্ষমতা আর শক্তি ওরা এতক্ষণ আঁচ করতে পারেনি। কিন্তু এখন আঁচ করতে পারা সত্ত্বেও বন্ধুর হেরে যাওয়ার অপমানের বদলা নিতে ওরা তিরবেগে ঝাঁপিয়ে এল জিশানের দিকে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

ওরা বুলেটের মতো জিশানের দিকে আসছিল, কিন্তু ওদের রুখে দিল পাবলিক।

কোঁকড়াচুল আর ব্যাকব্রাশ এটা কল্পনাও করেনি। ওদের সঙ্গে পাবলিকের হুড়োহুড়ি আর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। রেস্তোরাঁর সামনের লাউঞ্জটা মুহূর্তে কুরুক্ষেত্রের চেহারা নিল।

জিশানের চোখ এবার গুনাজিকে খুঁজতে লাগল।

বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না। বরং গুনাজিই ওকে খুঁজে নিল। জটলার ফাঁক দিয়ে আচমকা হাজির হল। তারপর জিশানের হাত ধরে টান মারল ঃ 'দাদা, শিগগির চলে এসো—।'

ওরা দুজনে প্রায় দৌড়তে শুরু করল।

অটো-এলিভেটরে করে নামার সময় জিশান বলল, 'সিমানের এনার্জি প্যাক তো আর নেওয়া হল না...।'

গুনাজি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'পথে কোথাও গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিয়ে নেব।'

জিশানের ভালো লাগছিল না। ওর গাল জ্বালা করছিল। ও মারপিট করতে চায়নি। হুলস্থূল বাধাতেও চায়নি। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল!

পার্কিং লটে এসে ওরা গাড়িতে উঠে বসল। জিশান তাকাল সিমানের দিকে। এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

গুনাজি গাড়িতে স্টার্ট দিতেই জিশান বলল, 'তাড়াতাড়ি চলো। আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'চিন্তা কোরো না, দাদা—এক্ষুনি পৌঁছে যাব।'

বাইরে সন্ধে নেমে গেছে। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোয় আলো জ্বলে গেছে। কখনও-কখনও চোখে পড়ছে বিজ্ঞাপনের রঙিন নকশা। এই রাতটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই নিউ সিটি হিংসা আর প্রতিহিংসার ব্যাবসা করে।

জিশানের নিজের ওপরে ঘেন্না হল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ও অনেকটা যেন আপনমনেই বলল, 'বিশ্বাস করো, আমি মারপিট করতে চাইনি...।' নাকি কথাটা ও বলল মিনিকে?

সামনের রাস্তার দিকে চোখ রেখে গুনাজি বলল, 'জানি, দাদা। আমি মার্শালের অফিসে খবর পৌঁছে দিয়েছি। বলেছি, তোমাকে ওই গুন্ডাগুলো টরচার করতে-করতে মেরেই ফেলত। বলেছি, তোমার কোনও দোষ নেই। দেখো, মার্শাল তোমাকে কিছুই বলবে না—গ্যারান্টি।'

শেষ শব্দটা শুনে জিশানের হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু হাসতে গিয়েই গালে টান পড়ল। গালের জ্বালাটা বেড়ে গেল।

রঙ্গপ্রকাশের বাড়ি আর কতদূর? মনে-মনে ভাবল জিশান।

●

একটা আর্ক কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে ছিলেন শ্রীধর পাত্রা। ধনুকের মতো বাঁকানো এল. সি.ডি. পরদায় একটা লোকের নিরীহ মুখ। ফরসা। বেশ গোলগাল দেখতে। চোখগুলো ছোট-ছোট। গালে থুতনিতে খাপছাড়াভাবে হালকা দাড়ি।

মুখটা খুঁটিয়ে দেখে শ্রীধরের পছন্দ হল। দারুণ কনট্রাডিক্‌শান। দেখে যা মনে হয় না লোকটা ঠিক তাই। লোকটার মুখে কেমন একটা নিষ্পাপ বাচ্চা-বাচ্চা ভাব। অথচ লোকটা প্রথম সারির একজন হার্ডকোর ক্রিমিনাল। অপাশি কানোরিয়া। বয়েস পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ।

ওর যা বয়েস ওর খুনের সংখ্যাও প্রায় তাই। এ পর্যন্ত বত্রিশটা খুন করেছে অপাশি। তার মধ্যে তিনটে ফ্যামিলি আছে যাদের ও এক-এক খেপে খুন করে রক্তের হোলি খেলেছে। পরিভাষায় যাকে বলে ম্যাসাকার।

প্রথম ফ্যামিলিতে চারজন ছিল। মাঝবয়েসি বাবা-মা। আর তাদের সদ্য তরুণ ছেলে আর মেয়ে। চপার হাতে আধঘণ্টার মধ্যে সেই চারজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় খতম করেছিল অপাশি। ওদের ফ্ল্যাট রক্তে ভেসে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় ফ্যামিলিতে ছিল পাঁচজন। অল্পবয়েসি বাবা-মা, আর তাদের ছোট-

ছোট তিন সন্তান। দু-ছেলে, এক মেয়ে।

এই হত্যালীলায় অপাশি কানোরিয়ার অস্ত্র ছিল চপার আর শাবল। শাবলটা ও ওদের বাড়ির বাগানে খুঁজে পেয়েছিল।

তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ বুঝতে পেরেছিল যে, বয়েসে সবচেয়ে ছোট আট বছরের মেয়েটাকে অপাশি সবার শেষে খুন করেছিল। ওকে তাড়া করে অপাশি ধরে ফেলে বাড়ির বাগানে। তারপর ওইটুকু বাচ্চা মেয়েকে জঘন্য হেনস্থা করে শাবল দিয়ে পিটিয়ে মেরেছিল।

তৃতীয় ফ্যামিলিতে সদস্যের সংখ্যা ছিল তিন। বাবা-মা আর ষোলো বছরের একটি মেয়ে।

মাথায় থান ইটের বাড়ি মেরে অপাশি প্রথমে ওদের তিনজনকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। তারপর ইলেকট্রিকের তার দিয়ে কষে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল। সবশেষে ওদের গায়ে পেট্রল ঢেলে ওদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল।

এ ছাড়া নানান কারণে অপাশি প্রচুর খুচরো খুন করেছে। ক্রিকেট খেলায় বাউন্ডারি না মেরে খুচরো এক রান কি দু-রান নেওয়ার মতো। ওর খুন-খুন খেলায় বাউন্ডারি বলতে ওই তিনটে ঃ চার, পাঁচ, আর তিন।

আর্ক কম্পিউটারের পরদায় অপাশি কানোরিয়ার হুলিয়া দেখছিলেন শ্রীধর। আর ওর অত্যন্ত পোটেনশিয়াল সি-ভি খুটিয়ে পড়ছিলেন। কিল গেমের পক্ষে অপাশির সি-ভি সত্যিই এক্সপ্লোসিভ মেটিরিয়াল।

অপাশি কানোরিয়া সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তার সবই রয়েছে এই সফ্‌ট ফাইলে। আর সমস্ত বিবরণের পর রয়েছে ফোটো-ফাইল। সেখানে অপাশির নানান ঢঙে তোলা অসংখ্য রঙিন ছবি রয়েছে। আর তার পরে, ওর জীবনীর শেষ অধ্যায় হিসেবে, রয়েছে ওর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল।

পরদার ওপরে ঝুঁকে পড়ে শ্রীধর পাট্টা লেখাগুলো এক মনে পড়ছিলেন আর ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখছিলেন। একইসঙ্গে মনের মধ্যে খুশি ছটফটিয়ে উঠছিল। কিল গেমে জিশানের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য অপাশি কানোরিয়া ক্যান্ডিডেট হিসেবে একেবারে 'খাপে খাপ, আবদুল্লার বাপ!'

ঠোঁটের কোণে হাসলেন শ্রীধর। কনট্রাডিক্‌শান। সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল যা বলছে, খুনি হিসেবে কানোরিয়ার দক্ষতা, হিংস্রতা আর অভিজ্ঞতা যা বলছে, ওর ফোটোগ্রাফগুলো ঠিক তার বিপরীত। যেন হাসি-খুশি এক নিষ্পাপ গোলগাল শিশু—যে একটা মশাও মারতে পারে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীধর। কিল গেমে জিশান পালচৌধুরীর সঙ্গে খেলার জন্য প্রথম প্লেয়ার বাছা হয়ে গেছে।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বের করলেন। হাঁ করে মুখ তুললেন ওপরদিকে। শিশির ছিপি খুলে কয়েক ফোঁটা এনার্জি সল জিভে ঢাললেন।

তারপর আওয়াজ করে স্বাদ নেওয়ার ঢঙে জিভ দিয়ে টাকরায় টকাস-টকাস শব্দ করলেন। শরীরে শক্তির আগুন ঝাঁজিয়ে উঠল।

কিল গেমের তারিখ ক্রমশ এগিয়ে আসছে—দরজায় কড়া নাড়ছে।

শ্রীধর পাট্টার পাশে তিনজন অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের গায়ে ব্ল্যাক ইউনিফর্ম। নিউ সিটির সেন্ট্রাল জেলের সব অফিসারের পোশাকই এইরকম। শুধু চিফ জেলারের বুকে দশটা সিলভার স্টার বসানো।

চিফ জেলার হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীধরের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। চেহারায় ছোটখাটো কিন্তু স্মার্ট। চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা।

হরিমোহন জানেন যে, জানেন যে, কিল গেমের আগে মার্শাল নিজে সেন্ট্রাল জেলে আসেন। কিল গেমের তিনজন প্লেয়ারকে চুলচেরা বিচারের পর সিলেক্ট করেন। সেই সিলেকশানের সময় মার্শালের নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ডেথ সেন্টেন্স পাওয়া অপরাধীদের সম্পর্কে নানারকম তথ্যের জোগান দিতে হয়। সেজন্যই হরিমোহন সঙ্গে দুজন জুনিয়ার অফিসারকে ডেকে নিয়েছেন।

ওঁরা চারজন এখন যে-ঘরটায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেটা সেন্ট্রাল জেলের কন্ট্রোল রুম।

নিউ সিটি আর ওল্ড সিটির সীমানার গা ঘেঁষে সেন্ট্রাল জেলের চার কিলোমিটার বাই দু-কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা। শুটারে চড়ে উড়ে আসার সময় ওপর থেকে নীচে তাকালে সেন্ট্রাল জেলের মানচিত্রটা ছবির মতো ধরা পড়ে।

জেল এলাকার একটা দিক পরিখা বরাবর টানা দু-কিলোমিটার। সেদিক দিয়ে কোনও অপরাধীর জেল ভেঙে পালানোর কোনও উপায় নেই। কারণ, পরিখার খাড়া কংক্রিটের দেওয়াল। সেই দেওয়াল বরাবর পঁচিশ ফুট গভীরতায় গেলে তবেই জলের শুরু। আর সেই গভীর খালের মধ্যে কিলবিল করছে বিষধর সাপ আর পিরান্‌হা মাছ। ওরা যাতে আরামে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য জলের উষ্ণতা, নোনতা ভাব—সবকিছুই সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পরিখার দিকটা জেল বিল্ডিং-এর পিছনদিক। বিল্ডিংটা লম্বায় পাঁচশো মিটার। একতলা। গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি। বিল্ডিং-এর সব গেটেই বুলেটপ্রুফ পলিমারের অটোমেটিক শাটার। সেন্ট্রাল লকিং সিস্টেম দিয়ে লক করা।

জেল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলে পাওয়া যাবে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

ডানদিকে আর বাঁ-দিকে সাড়ে সাতশো মিটার করে ধু-ধু মাঠ। আর সামনে চার কিলোমিটার, ফাঁকা জায়গা। সেখানে দেড়-দু-ইঞ্চি লম্বা মিহি ঘাসের শিষ ছাড়া আর কিছু নেই। তাও ঘাস রয়েছে কোথাও-কোথাও—বেশিরভাগ জায়গাটাই ধুলো মাখা ধূসর মাঠ।

জেল বিল্ডিং ছাড়া বাকি জায়গাটা হাতের তালুর মতো ফাঁকা। পোকামাকড় ছাড়া আর কোনও প্রাণীর পক্ষে সেই খোলা জায়গায় লুকোনো

সম্ভব নয়। যদি কোনও ক্রিমিনাল জেল ভেঙে পালাতে পারে তা হলে জেল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে তাকে ধু-ধু মাঠের ওপর দিয়ে অন্তত সাড়ে সাতশো মিটার পেরোতে হবে।

সেই সময় তাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসবে রক্ষীদের মিসাইল পিস্তলের গুলি। এই আলট্রামডার্ন পিস্তলের গুলি ইনফ্রারেড সোর্স লক্ষ্য করে ছুটে যায়। মানুষের শরীর থেকে যে-ইনফ্রারেড তাপ-তরঙ্গ বেরোয় সেটাই গুলিটাকে জানিয়ে দেয় কোথায় গিয়ে তাকে আঘাত করতে হবে। মানুষটা যেভাবেই এঁকেবেঁকে দৌড়োক না কেন গুলিও 'বুদ্ধিমান' ছুঁচোবাজির মতো তার পিছন-পিছন এঁকেবেঁকে ছুটবে। তারপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে ছুটন্ত মানুষটাকে গতিতে হারিয়ে দেবে। এবং খেল খতম।

ধরে নেওয়া যাক, কোনও অপরাধী মিসাইল পিস্তলের গুলিকে ফাঁকি দিয়ে জেল এলাকার সীমানায় পৌঁছতে পারল।

সেখানে তার মুখোমুখি হবে কুড়ি ফুট উঁচু বুলেটপ্রুফ পলিমারের মসৃণ স্বচ্ছ পাঁচিল। সেই পাঁচিল পেরোলেই মুক্তি।

কিন্তু সেই পাঁচিলের মাথার দিকে প্রায় এক ফুট-জায়গা জুড়ে রয়েছে অনেকগুলো সমান্তরাল তামার তার। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। পলিমার অন্তরক পদার্থ হওয়ায় তামার তারগুলো পলিমারের মধ্যে অর্ধেকটা করে গেঁথে বসানো—পরিভাষায় যাকে বলে এমবেড করা। সেই তারে রয়েছে 6.6 কিলোভোল্ট এসি সাপ্লাই।

স্বচ্ছ পাঁচিলের মাথায় যদি কেউ উঠতে চায় তা হলে তাকে ভয়ংকর শক খেয়ে মরতে হবে।

জেল এলাকার ধু-ধু মাঠের নানান জায়গায় রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার।

ওয়াচ টাওয়ারগুলো একটু অদ্ভুত চেহারার।

স্বচ্ছ ফাইবারের একটা লম্বা খুঁটি খাড়া উঠে গেছে ওপরদিকে। সেই খুঁটির মাথায়—প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরে—রয়েছে একটা ট্রান্সপারেন্ট কিউবিক্‌ল। সেখানে একজন সান্ত্রী মিসাইল পিস্তল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

ওয়াচ টাওয়ারে যেহেতু ওঠা-নামার কোনও সিঁড়ি নেই তাই সান্ত্রী বদলের কাজটা করা হয় শুটার দিয়ে। সেন্ট্রাল জেলের আন্ডারে মোট দশটা শুটার রয়েছে।

ওয়াচ টাওয়ারের মাথা থেকে ছাতার ফ্রেমের মতো ন'টা মেটালিক আর্ম বেরিয়ে রয়েছে। প্রায় দশমিটার লম্বা এই বাহুগুলোর প্রান্তে লাগানো রয়েছে অতি শক্তিশালী মেটাল হ্যালাইড ল্যাম্প। রাতে এই বাতিগুলো জেল এলাকাকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। সেই আলোয় একটা নেংটি ইঁদুরও ছায়ার আড়াল খুঁজে পায় না।

নিউ সিটির সেন্ট্রাল জেল নিউ সিটির গর্ব। দেশবিদেশ থেকে বহু হোমরাচোমরা মানুষ এই হাই-টেক আলট্রামডার্ন জেল দেখতে আসেন। এটা শ্রীধর পাট্টার খুব ভালো লাগে। গর্বে বুক কয়েক ইঞ্চি ফুলেও ওঠে হয়তো। কারণ, এই সেন্ট্রাল জেলের চিফ ডিজাইনার শ্রীধর নিজে।

শ্রীধর পাট্টা চেয়ারে বসে পড়লেন আবার। হরিমোহনকে ইশারায় বসতে বললেন। হরিমোহন ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে বোধহয় একটা বেয়াদব ব্যথাকে শায়েস্তা করলেন। তারপর একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে শ্রীধরের একরকম মুখোমুখি বসে পড়লেন। ওঁদের দুজনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে আর্ক কম্পিউটারের মনিটর চোখে পড়ছিল। সেখানে অপাশি কানোরিয়ার বেশ কয়েকটা রঙিন ফোটোগ্রাফ।

বাঁ-হাতের পিঠের ওপরে ডানহাতের আঙুল দিয়ে কয়েকবার তাল ঠুকলেন শ্রীধর। ছোট করে ওপর-নীচে থুতনি নাড়লেন কয়েকবার। তারপর খুব আলতো গলায় বললেন, 'এই ক্রিমিনালটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। জিশান পালচৌধুরীর মোকাবিলা করতে হলে এরকম হার্ডকোর ক্রিমিনালই দরকার। ওর সি-ভি আমার দারুণ লেগেছে।' অল্প হাসলেন শ্রীধর ঃ 'ওকে কোথায় পেলেন? লাস্ট কিল গেমের সময় যখন আমি সিলেকশানে এসেছিলাম তখন ওর সি-ভি তো স্টোরেজ ফাইলে ছিল না!'

ছোট্ট করে দুবার কাশলেন হরিমোহন। মার্শালের স্মৃতিশক্তির তারিফ না করে উপায় নেই!

তারপর ওপরের ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন, স্যার। অপাশি কানোরিয়া আমার জেলে এসেছে আড়াই মাস। ওর ডোসিয়ারের ফার্স্ট পেজে ওর এন্ট্রির তারিখটা লেখা আছে। ওল্ড সিটির নর্দার্ন বেল্টের পাহাড়ি এলাকা থেকে ওকে আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম।'

'আমি ওর ফাইলটা ওপর-ওপর স্ক্যান করেছি। ভয়ংকর মানুষ হিসেবে খুবই অ্যাট্রাকটিভ সি-ভি। ওর টোটাল ফাইলটার একটা সফ্‌ট কপি আর একটা হার্ড কপি কাল বিকেলের মধ্যে আমার কিল গেমের ইন-বক্সে পাঠিয়ে দেবেন। এখন ওর ব্যাপারে ইন আ নাটশেল কিছু আমাকে বলবেন?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন হরিমোহন। বিনা প্রয়োজনে হাত কচলানোর ঢঙে হাতে হাত ঘষলেন। তারপর ঃ 'আপনি এগজ্যাক্টলি কী জানতে চাইছেন জানি না, স্যার...তবে...অপাশির ফেরোসিটি কোশেন্ট হল ৯.৪—অর্থাৎ, আলট্রা-হাই রেঞ্জে...।'

নিউ সিটির সেন্ট্রাল জেলে ভয়ংকর ক্রিমিনালদের রেটিং ঠিক করা হয় ফেরোসিটি স্কেল দিয়ে—অনেকটা ভূমিকম্পের রিখ্‌টার স্কেলের মতো। একজন অ্যাভারেজ ক্রিমিনালের ফেরোসিটি কোশেন্ট হল ৪.৫। আর, একজন সিরিয়াল

কিলারের ফেরোসিটি কোশেন্ট ৮.০।

শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে ডক্টর মনসুখ চক্রপাণি আর ডক্টর গণপত আচারিয়া—যাঁদের শ্রীধর যথাক্রমে 'এ' এবং 'কিউ' বলে ডাকেন—এই ফেরোসিটি স্কেলের কনসেপ্ট আর তার ভ্যালু কম্‌পিউট করার ইমপিরিক্যাল ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন। সেন্ট্রাল জেলে সব অপরাধীরই ফেরোসিটি স্কেল হিসেব করা আছে।

'চমৎকার! চমৎকার!' হাঁটুতে ছোট-ছোট তিনটে চাপড় মারলেন শ্রীধর। ফেরোসিটি স্কেল যার ৯.৪ তার কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করা যেতে পারে।

দুবার জোরে-জোরে নাক টানলেন। তারপর ভুরু উঁচিয়ে হরিমোহনকে জিগ্যেস করলেন, 'আর ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ? সেটা কীরকম?'

হরিমোহন চটপট জবাব দিলেন, 'সেটাও খারাপ নয়। তবে ওর হাত আর কাঁধে জোর সবচেয়ে বেশি। স্রেফ চপার চালিয়ে অপাশি একটা ছোটখাটো গাছের গুঁড়ি এককোপে কেটে ফেলতে পারে—।'

'আর কোনও ইমপরট্যান্ট ইনফরমেশান?'

একটু ইতস্তত করলেন। তারপর ঃ 'এটা আদৌ কোনও ইনফরমেশান কি না জানি না—তবে অপাশি একটু একাচোরা টাইপের...।'

'মানে?'

'মানে...মানে...সবসময় একা-একা থাকতে ভালোবাসে। বিকেলের রিল্যাক্স আওয়ারে ও কারও সঙ্গে মেশে না। উঁহু, "মেশে না" কী বলব, কথাই বলে না...।'

থুতনিতে আঙুল বোলালেন শ্রীধর। বিড়বিড় করে বললেন, 'ওর সি-ভি-তে ক্রাইম রেকর্ডও একই কথা বলছে। সবক'টা খুন ও একা করেছে—সঙ্গে কোনও অ্যাকম্‌প্লিস নেয়নি। হি ইজ আ লোন অপারেটার।'

চিফ জেলারের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর শ্রীধর বললেন, 'এবার আমি অপাশি কানোরিয়াকে দেখব। ওর সঙ্গে কথা বলব—।'

'অফ কোর্স, স্যার।' হরিমোহন চোখের পলকে 'হুজুরে হাজির' হয়ে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে-সঙ্গে দুজন অফিসার তাঁদের শরীরের ঢিলেঢালা ভাবটাকে পলকে ঝেড়ে ফেলে টান-টান হয়ে দাঁড়ালেন।

'অপাশি কানোরিয়া—' হরিমোহন বললেন ঃ 'কোড নম্বর A-1207। মার্শাল স্যার ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন—কথা বলবেন। যান, গিয়ে অ্যারেঞ্জমেন্ট করুন, আমি মার্শাল স্যারকে নিয়ে আসছি...।'

অফিসার দুজন জুতোর গটগট শব্দ করে চলে গেলেন।

ওদের মিনিট দশেক সময় দিলেন হরিমোহন। শ্রীধরের সঙ্গে সেন্ট্রাল জেলের নানান সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। তারপর একসময় বিনীত গলায় মার্শালকে বললেন, 'চলুন, স্যার। অপাশি কানোরিয়া—।'

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় পথ দেখিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। শ্রীধর চুপচাপ ওঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

করিডর আর তার দুপাশের ঘর, দেওয়াল ইত্যাদি, আলোর ব্যবস্থা, এমনকী সিলিংও যথেষ্ট আধুনিক এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখে জেলের বদলে একটা থ্রি স্টার হোটেলের কথা আগে মনে পড়ে। জেলের এই স্তরের যত্ন নেওয়ার খরচ জোগায় সিন্ডিকেট—অথবা, আরও সরাসরি বলা ভালো—শ্রীধর পাত্রা। কারণ, এই জেলের হার্ডকোর ক্রিমিনালদের ওপরে নির্ভর করছে কিল গেমের জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য, বিজ্ঞাপনের রেভিনিউ, নিউ সিটির ইকনমি।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওঁরা একটা লেসার ডিসপ্লে দেখতে পেলেন। তাতে লাল আলোর হরফে ইংরেজিতে লেখা 'রেস্ট্রিক্‌টেড এরিয়া'। তারপরই বিভাজনের স্বচ্ছ দেওয়াল।

হরিমোহন মার্শালের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'স্যার, আপনি এক বছর আগে সেন্ট্রাল জেল মডার্নাইজেশানের জন্যে যে-তিরিশ কোটি টাকা গ্রান্ট দিয়েছিলেন সেটা ইউটিলাইজ করেই এসব হাই-টেক ব্যাপার করেছি। এই দেওয়াল পেরোলেই হার্ডকোর ক্রিমিনালদের এলাকা। তাই দেওয়ালটা আক্ষরিক অর্থেই একদম "হার্ডকোর"—মানে, ট্রান্সপারেন্ট, রেসিলিয়েন্ট আর বুলেটপ্রুফ।'

কথা থামিয়ে পরিতৃপ্তির চোখে মার্শালের দিকে তাকালেন হরিমোহন।

প্রভুভক্ত অ্যালসেশিয়ানের পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ঢঙে চিফ জেলারের পিঠ চাপড়ে দিলেন শ্রীধর ঃ 'আপনার এফিশিয়েন্সি আমি ভালো করেই জানি। সেইজন্যেই তো আপনার ওপরে এতটা ডিপেন্ড করি...।'

হরিমোহন জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। ওঁর লেজ থাকলে সেটা নিশ্চয়ই এখন এদিক-ওদিক দুলত।

স্বচ্ছ দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে চারজন সিকিওরিটি গার্ড। তাদের কোমরে শকার এবং হাতে মিসাইল পিস্তল। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল ওরা মানুষ নয়—পাথরের মূর্তি। হরিমোহন আর শ্রীধরকে দেখে ওরা যান্ত্রিকভাবে বাও করল।

দেওয়ালের গায়ে কোনও দরজা চোখে পড়ছিল না শ্রীধরের। ঠিক যেন একটা সিমলেস বিভাজন পাত।

তিনি সামান্য ভুরু কুঁচকে হরিমোহনের দিকে তাকাতেই হরিমোহন



পকেট থেকে একটা ছোট রিমোট ইউনিট বের করে সেটা দেওয়ালের দিকে তাক করে একটা দশ ডিজিটের কোড ইনপুট করলেন।

স্বচ্ছ দেওয়ালের একটা স্বচ্ছতর অংশ নিঃশব্দে একপাশে সরে গেল। হরিমোহন শ্রীধরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

হার্ডকোর ক্রিমিনালদের এলাকায় আলোর কোনও ঘাটতি নেই। এ ছাড়া তার নানা জায়গায় আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া।

হরিমোহন অলিপথ ধরে হাঁটছিলেন আর রিমোটের কীসব বোতাম টিপছিলেন। পাথরের মেঝেতে ওঁদের জুতোর শব্দ ফাঁকা প্রতিধ্বনি তুলছিল।

একটু পরেই একটা সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে।

স্বচ্ছ ফাইবারে তৈরি একটা ওয়ান রুম স্টুডিয়ো ফ্ল্যাট। ভেতরে উজ্জ্বল আলো। একজন মোটাসোটা লোক টেবিলের কাছে বসে কী যেন লেখালিখি করছে।

হরিমোহন চাপা গলায় বললেন, 'অপাশি কানোরিয়া, মার্শাল স্যার—।'

শ্রীধর দেখলেন, ঘরটা সুন্দরভাবে সাজানো। এমনকী ঘরে রঙিন টিভি পর্যন্ত রয়েছে।

নাঃ, এদের যত্নআত্তির ব্যাপারে কোনও খামতি নেই। হরিমোহন জানেন, এরা নিউ সিটির বলতে গেলে অ্যাসেট।

শ্রীধরদের দিকে একবারও চোখ তুলে তাকাল না অপাশি। নিজের মনে লিখতে লাগল। তারপর হঠাৎই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করতে লাগল। শ্রীধরদের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

অপাশি সরাসরি শ্রীধরদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু চোখে শূন্য দৃষ্টি।

শ্রীধর পাট্রা অস্বস্তি পাচ্ছিলেন। ইতস্তত করে অবাক চোখে চিফ জেলারের দিকে তাকালেন।

হরিমোহন হেসে বললেন, 'আপনাকে চমকে দেব বলে আগে থেকে বলিনি, স্যার। আমি রিমোটের বোতাম টিপে একটা স্পেশাল কোড ইনপুট দিলেই এই সেলের ফাইবারের ওয়ালগুলো সব ওয়ান ওয়ে মিরার হয়ে যায়। তাই অপাশি ওর ঘরের দেওয়ালগুলোকে এখন আয়না হিসেবে দেখছে—আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।'

শ্রীধর অপাশিকে দেখতে লাগলেন।

একটু আগে কম্পিউটারে যা দেখেছিলেন, কনট্রাডিক্‌শান যেন তার চেয়েও অনেক বেশি। যেমন নিষ্পাপ চেহারা ঠিক তেমনই নিষ্পাপ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আর অভিব্যক্তি। তবে ছোট-ছোট সরু চোখের কোথায় যেন মিশে আছে এক ফোঁটা সতর্কতা।

শ্রীধরের কেন জানি না মনে হচ্ছিল, এই ওয়ান ওয়ে মিরারের গল্পটা অপাশির অজানা নয়।

বেশ কয়েক মিনিট অপাশিকে লক্ষ করলেন ওঁরা দুজনে। তারপর শ্রীধরের ইশারায় রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের বোতাম টিপে সেলের ফাইবার ওয়ালের ক্যারেকটার পালটে দিলেন হরিমোহন। ওটা এখন টু ওয়ে সি থ্রু ফাইবার শিট হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে অপাশি ওঁদের দুজনকে দেখতে পেল। সরলভাবে একগাল হেসে দিল ও।

সেই মুহূর্তে কনট্রাডিক্‌শানের মাত্রাটা এক ঝটকায় এমন বেড়ে গেল যে, শ্রীধর পাট্টার মতন মানুষও চমকে উঠলেন।

হরিমোহন আবার রিমোট ইউনিটের বোতাম টিপলেন।

ওঁদের সামনের দেওয়ালে আটটা ছোট-ছোট জানলা তৈরি হয়ে গেল। দুটো সারিতে চারটে করে খুদে জানলা—প্রত্যেকটা মাপে এক ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি।

হরিমোহন গর্বের হাসি নিয়ে ঘুরে তাকালেন মার্শালের দিকে। বললেন, 'সেলের কয়েদিদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এই ব্যবস্থা, স্যার...।'

শ্রীধর ওঁর দিকে চেয়ে একচিলতে হাসলেন শুধু।

এবার হরিমোহন অপাশির দিকে ইশারা করে ওকে ডাকলেন ঃ 'মিস্টার কানোরিয়া, প্লিজ, আমাদের কাছে আসুন—।'

শ্রীধর অবাক হয়ে চিফ জেলারের দিকে তাকালেন।

চিফ জেলার বললেন, 'ও "আপনি-আজ্ঞে" ব্যাপারটা খুব পছন্দ করে। তাতে বেশ হাসি-খুশি আর শান্ত থাকে।'

অপাশি কানোরিয়া শ্রীধরদের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। মুখে হাসি, চোখে সামান্য কৌতূহল।

চিফ জেলার শ্রীধরের সঙ্গে অপাশির পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'মিস্টার কানোরিয়া, ইনি হলেন নিউ সিটির পিস ফোর্সের মার্শাল মিস্টার শ্রীধর পাট্টা। ঠিকভাবে বলতে গেলে, ইনিই নিউ সিটির শেষ কথা...।'

হাসল কানোরিয়া। বলল, 'যেমন এই জেলে আপনিই শেষ কথা।' তারপর শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে ঃ 'হাউ আর য়ু, মার্শাল,? নাইস টু মিট য়ু...।'

শ্রীধর কানোরিয়ার শেষের দিকের কথাগুলো ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছিলেন না। কারণ, ওঁর মাথায় ঘুরছিল কনট্রাডিক্‌শান।

কানোরিয়ার মধ্যে কনট্রাডিক্‌শানের চূড়ান্ত দেখে শ্রীধর ভেতরে-ভেতরে টগবগ করছিলেন।

কী আশ্চর্য মিহি অপাশি কানোরিয়ার গলার স্বর! এ যেন কোনও মেয়ের গলাকেও হার মানায়!

অথচ এই লোকটাই গুনে-গুনে বত্রিশটা মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে! বত্রিশ রান!

কিল গেমের দিন ও নিশ্চয়ই অনায়াসে আরও একটা রান স্কোর করতে পারবে!

●

সিমানকে অনেকক্ষণ ধরে ফোন করে পাচ্ছিলেন না রঙ্গপ্রকাশ। ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। একইসঙ্গে ব্যথার জগতে হারিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রায়ই এরকম হয়। ছেলেটা বলতে গেলে সবসময়েই রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালাকে দুশ্চিন্তায় রাখে। কে জানে কোনও বিপদে পড়ল কি না!

সিমানের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ইকনমিক ইনডেক্স-এর কথাও ভাবছিলেন। ভাবছিলেন ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর কথা।

মাথার দুপাশ দপদপ করছিল। কেউ যেন প্যাঁচ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ইস্পাতের তুরপুন চালিয়ে দিচ্ছে মাথার ভেতরে।

পর্ণমালা পাশের ঘরে। বোধহয় পামটপ নিয়ে ব্যস্ত। নিশ্চয়ই ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কাউন্সিলের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছে। হয়তো ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তাও করছে, কিন্তু পর্ণমালাকে বাইরে থেকে দেখে ওর ভেতরের ঝড় খুব একটা আঁচ করা যায় না। কিন্তু রঙ্গপ্রকাশের সে-দক্ষতা নেই। তাই ওঁর কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।

গলা তুলে পর্ণমালাকে এক কাপ কফি দেওয়ার জন্য বললেন। দেখা যাক, এক কাপ কফি তুরপুনের তেজ কমাতে পারে কি না।

প্লাজ্মা কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকালেন। সেখানে জিশানের ভিডিয়ো ছবি চলছে—তবে সাউন্ড 'মিউট' করে দেওয়া। শব্দহীন চলচ্চিত্র দেখছেন ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস। কারণ, ওঁর প্রিয় এলাকা হল 'কাইনেসিক্স'। অর্থাৎ, অঙ্গভঙ্গি আর শরীরের ভাষার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশচর্চার বিজ্ঞান। না বলা মনের ভাব, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝে নেওয়া।

এখন জিশানের নিঃশব্দ ছবি দেখে ওর মনের ভেতরের রহস্য আরও গভীরভাবে বুঝতে চাইছেন। যা-যা বুঝতে পারবেন সেসব চলে যাবে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলের ফাইলে।

ঠিক এমন একটা সময়ে, প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে, অচেনা একটা নম্বর থেকে ফোন এসেছিল।

তিনি 'হ্যালো' বলামাত্রই ও-প্রান্ত থেকে জিশান পালচৌধুরীর গলা শোনা গিয়েছিল। হ্যাঁ, জিশান—জিশান পালচৌধুরী!

টেলিফোনে জিশানের বলা কথাগুলো রঙ্গপ্রকাশের মনের ভেতরে হঠাৎই বেজে উঠল আবার।

'হ্যালো, জিশান বলছি—জিশান পালচৌধুরী...।'

উত্তর দেওয়ার সময় রঙ্গপ্রকাশের গলা কেঁপে গিয়েছিল। তারপর...।

তারপর, সিমানের কথা শোনার পর, মন এবং গলা সংযত করে জিশানকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। কিন্তু ফোনে কথা বলা শেষ করার পর নিজেকে আর সুস্থির রাখতে পারেননি। তাসের ঘরের মতো ছত্রখান হয়ে গিয়েছেন।

মরণাপন্ন জন্তুর মতো আর্তনাদ করে ডুকরে উঠেছেন। পাঁজরার পলকা হাড়গুলো যেন পটপট করে মটকে যাচ্ছিল।

অদ্ভুত যন্ত্রণার শব্দে পর্ণমালা ছুটে এসেছেন কম্পিউটার রুমে। বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে দেখেছেন বিজ্ঞানী স্বামী টেবিলের ওপরে মাথা রেখে সব-হারানো বাচ্চার মতো কষ্টে জর্জরিত হয়ে ছটফট করছেন।

পর্ণমালার হাত থেকে গরম কফির কাপ খসে পড়েছে অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ফ্লোরে। কাপটা পাঁচ টুকরো হয়ে গেছে। আর কফিও ছড়িয়ে গেছে যেখানে-সেখানে।

ওঁর মুখ দিয়ে গোঙানির মতো 'সিমান! সিমান!' শব্দটা বেরিয়ে আসছিল বারবার। ওঁকে দেখে পায়ে কুচলে দেওয়া কেন্নোর মতো লাগছিল।

ছেলেকে যে তিনি কতটা ভালোবাসেন সেটা যেন আবার নতুন করে বুঝতে পারছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। ভয় হচ্ছিল, তিনি বোধহয় শত-সহস্র টুকরোয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত ধুলো হয়ে যাবেন।

কিন্তু সেটা হল না পর্ণমালার জন্য।

ছুটে এসে স্বামীকে জাপটে ধরে সামাল দিতে লাগলেন। সান্ত্বনা দিতে, সাহস জোগাতে কত না এলোমেলো কথা বললেন। তারই মধ্যে উতলা গলায় জিগ্যেস করছিলেন, 'কী হয়েছে? সিমানের কী হয়েছে?'

ওঁদের আপাত সুন্দর সুখী বাড়িটার ভেতরে দুশ্চিন্তা আর শোকের ঢেউ উথলে উঠছিল বারবার। কিন্তু বাইরের রাস্তা থেকে সেসব কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ওঁরা সামলে উঠলেন। তারপর সোফায় হেলান দিয়ে থমথমে মুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সিমান কখন আসবে কে জানে!

স্বামীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পর্ণমালা আরও তিনবার কফি তৈরি করে নিয়ে এলেন। রঙ্গপ্রকাশকে দিলেন, নিজেও নিলেন। তারপর পরিস্থিতির চাপ হালকা করার জন্য প্লাজ্মা কম্পিউটারে জিশানের হলোগ্রাম ভিডিয়ো ইমেজ দেখতে শুরু করলেন।

রঙ্গপ্রকাশের চোখের কোল ফোলা। বারবার নাক টানছেন। কিন্তু

একইসঙ্গে ওঁর চোখ আটকে রয়েছে কম্পিউটারের পরদায়। কীভাবে যেন ওঁর বিজ্ঞানী সত্তার একটা ছোট্ট অংশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। 'কাইনেসিক্স' রঙ্গ প্রকাশকে উসকে দিচ্ছে।

এভাবে কতক্ষণ যে কেটেছে ডক্টরের খেয়াল নেই। হঠাৎই ওঁর কম্পিউটার রুমের দরজায় হাজির হয়ে গেল দুজন মানুষ।

জিশান আর সিমান।

রঙ্গপ্রকাশ কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা বলতে পারলেন না। নিষ্পলক চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই টগবগে তরুণ কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় প্লাজ্‌মা কম্পিউটারের মনিটর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে ওঁর ঘরের দরজায়।

অনেক পরে মনোযোগ গেল ছেলের দিকে।

ক্লান্ত-শ্রান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। কপালে ব্যান্ডেজ। গায়ে হসপিটালের রুগিদের মতো ঢোলা পোশাক। জিশানের গায়ে হেলান দিয়ে কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কফির কাপ টেবিলে রেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন পর্ণমালা। চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। আপাত সংযমের বর্মের নানান স্তর মোচার খোলার মতো খসে পড়ল একে-একে। দৃষ্টিহীন মানুষের মতো এলোমেলো পা ফেলে ছেলের কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর আচমকা ওকে বুকে জাপটে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

'সিমান! সিমান! এ কী দশা হয়েছে তোর! কোথায় ছিলি তুই? কোথায় ছিলি, বাবা?'

জিশান আর রঙ্গপ্রকাশ মা আর ছেলেকে দেখতে লাগলেন। জিশানের মনে পড়ল অর্কনিশানের কথা! ওঃ! কতদিন ওর সোনামণি শিশুটাকে ও বুকে জড়িয়ে ধরেনি!

স্ত্রীকে দেখে খানিকটা যেন অবাক হচ্ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। সিমানের জন্য পর্ণমালার এতটা টান তিনি আগে কখনও বুঝতে পারেননি। মাতৃস্নেহ তা হলে সহজে মরে না!

জিশানের হাতে একটা বায়োডিগ্রেডেব্‌ল প্যাকেট ছিল। তার মধ্যে সিমানের ভিজে জামাকাপড় রয়েছে।

ও দু-পা সামনে এগিয়ে প্যাকেটটা কফি টেব্‌লের ওপরে রাখল। বলল, 'এর মধ্যে সিমানের ভেজা জামা-প্যান্ট রয়েছে...।'

জিশানকে সামনাসামনি দেখা আর সিমানকে ঠিকঠাক অবস্থায় ফিরে পাওয়ার শক ধীরে-ধীরে কাটিয়ে উঠলেন রঙ্গপ্রকাশ। সোফা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর এক পা সামনে এগিয়ে জিশানের দিকে হাত-বাড়িয়ে দিলেন।

'থ্যাংক্স। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ...।' রঙ্গপ্রকাশের চোখে জল এসে গেল। ভাঙা গলায় নিজের আর পর্ণমালার পরিচয় দিলেন।

জিশান হাত মেলাল। সামান্য হাসল ঃ 'ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই, ডক্টর বিশ্বাস। একজন সাধারণ মানুষ যা করত আমি তা-ই করেছি—তার বেশি কিছু করিনি—।'

এইজন্যই বোধহয় জিশান অসাধারণ। ভাবলেন রঙ্গপ্রকাশ।

'আপনি প্লিজ বসুন...।'

একটা সিঙ্গল সোফার দিকে ইশারা করলেন ডক্টর। চোখ মুছে নিজের জায়গায় বসে পড়লেন।

জিশান বসল—রঙ্গপ্রকাশের মুখোমুখি। সিমান আর পর্ণমালাকে একপলক দেখল। তারপর অ্যাক্সিডেন্টের শুরু থেকে সব বলতে শুরু করল।

গাড়িতেই সিমানের নেশার ঘোর কেটে গিয়েছিল। তখন গাড়ি থামিয়েছে গুনাজি। জিশান গাড়ি থেকে নেমে সিমানের পাশে গিয়ে বসেছে। ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সফ্‌ট এনার্জি প্যাক থেকে অল্প-অল্প করে এনার্জি ড্রিংক ওকে খাইয়েছে। তারপর ওর শরীরটাকে যত্ন করে আঁকড়ে ধরে বসে থেকেছে।

গুনাজির স্টিয়ারিং তখন রঙ্গপ্রকাশের বাড়ির সঙ্গে ওঁর সি থ্রু অটোমোবিলের দূরত্ব দ্রুতগতিতে কমাচ্ছে।

'সিমানের সবরকম মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট করা হয়ে গেছে—' জিশান রঙ্গপ্রকাশের চোখে চোখ রেখে বলল, 'এখন ওর শুধু রেস্ট দরকার।'

জিশানের কাছে সব ঘটনা শুনতে-শুনতে রঙ্গপ্রকাশের চোখ আবার ভিজে উঠেছে। তিনি চট করে উঠে দাঁড়ালেন। সিমান আর পর্ণমালার কাছে গেলেন। ছেলের মাথায় স্নেহমাখা হাত বোলালেন কয়েকবার। বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে নিজের চোখের জল মুছলেন। ভারী গলায় পর্ণমালাকে বললেন, 'ওকে ভেতরে নিয়ে যাও। বিছানায় শুইয়ে দাও। রেস্ট—অ্যাবসোলিউট রেস্ট। ওকে এত ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে...।'

পর্ণমালা ছেলেকে নিয়ে ধীরে-ধীরে চলে গেলেন ভেতরের ঘরের দিকে।

রঙ্গপ্রকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর হঠাৎই যেন খেয়াল করলেন, সামনের কম্পিউটারের পরদায় জিশান চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে—কিন্তু কোনও শব্দ নেই।

কম্পিউটারের মনিটর থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নজর ঘোরালেই আসল জিশান।

রঙ্গপ্রকাশের বিজ্ঞানী সত্তা বলে উঠল, 'আচ্ছা, ছবির জিশান, আর সামনে বসে থাকা জলজ্যান্ত জিশান—কাইনেসিক্স কি এই দুজনের শরীরের ভাষার তুলনামূলক বিচার করে নতুন কোনও উত্তর বের করতে পারে?'

সামনে বসা জিশানকে দেখছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, জিশান যতই বিনয় করে বলুক না কেন, ও আসলে সাধারণ নয়। ও যে অন্যরকম, তার একটা অদৃশ্য বিকিরণের তেজ রঙ্গপ্রকাশ অনুভব করতে পারছিলেন। সেইসঙ্গে সিমানকে নিরাপদে ফিরে পাওয়ার স্বস্তি এবং আনন্দ মনের ভেতরে বুদ্বুদের ফোয়ারা তৈরি করছিল। আর সামনে বসা তরুণটির প্রতি কৃতজ্ঞতার ঢেউ বুকের ভেতরে আছড়ে পড়ছিল বারবার।

জিশান ঘরটা অবাক চোখে দেখছিল। দেখছিল সেমি-ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস পার্টিক্‌ল ইমপ্রেগনেটেড পলিমারের ফার্নিচার। আর দেওয়ালের জায়ান্ট প্লেট টিভি এবং প্লাজ্‌মা কম্পিউটারের মনিটর।

রঙ্গপ্রকাশ ওকে লক্ষ করছিলেন।

জিশানের কপালে একটু ভাঁজ পড়েছে। একটা ভুরু সামান্য উঁচিয়ে রয়েছে। হাত, হাতের আঙুল উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতস্তত নড়াচাড়া করছে।

সব মিলিয়ে বিস্ময়, কৌতূহল, অস্বস্তি।

সত্যি, 'কাইনেসিক্‌স' বড় বিচিত্র বিষয়। প্রায় চারশো বছর আগে নৃবিজ্ঞানী রে বার্ডহুইস্টেল প্রথম এই শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি গবেষণা করে বুঝতে চেয়েছিলেন, মুখের ভাবভঙ্গি, হাতের ইশারা, পায়ের নড়াচড়া, দাঁড়ানোর ঢং এসবের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে ভাবের আদানপ্রদান করে। এই নন-ভার্বাল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মের ব্যাকরণও তৈরি করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমরা যে সামাজিক জীবনে নিয়মিত ভাব বিনিময় করি তার মাত্র তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ শতাংশ করি ভাষার মাধ্যমে—আর বাকিটা অভিব্যক্তি আর অঙ্গভঙ্গি দিয়ে।

সেসব কথা খুব মনে পড়ছিল এখন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিশান বলল, 'গাড়িতে আসার সময় আমি সিমানের সঙ্গে...কথা বলছিলাম। তাতে যা...জেনেছি...সেগুলো আপনাকে...জানানো দরকার। সিমানের ভালোর জন্যে...।'

রঙ্গপ্রকাশ ছোট একটা ধাক্কা খেলেন। 'সিমানের ভালোর জন্যে....।' তার মানে?

উৎকণ্ঠিত হয়ে জিশানের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একসময় অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'বলুন—কী বলবেন...।'

টেবিলের দিকে চোখ নামাল জিশান। নীচু গলায় বলল, 'আপনার ছেলে সিমান...সুইসাইড করতে চেয়েছিল...।'

এবার বড় একটা ধাক্কা খেলেন। সুইসাইড করতে চেয়েছিল সিমান?

কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না রঙ্গপ্রকাশ। ওঁর ঠোঁট সামান্য

কাঁপতে লাগল। কিন্তু ওঁর বিজ্ঞানী সত্তা তখনও জিশানের অভিব্যক্তি আর নড়াচড়া লক্ষ করছিল।

না, জিশান যে মিথ্যে বলছে সেরকম কোনও লক্ষণ চোখে পড়ছে না।

রঙ্গপ্রকাশের বুকের ভেতরে কয়েকটা বিশাল লোহার বল গড়াতে লাগল। দম আটকে আসতে চাইল। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এখন কথা বলার চেষ্টা করলে শুধুই কান্না বেরিয়ে আসবে।

যে-ছেলেটার জন্য তিনি সবসময় মানসিক চাপ আর যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, যার জন্য নিউ সিটি ছেড়ে চলে যাওয়ার আতঙ্ক মনের আকাশে কালো মেঘের মতো ছেয়ে রয়েছে, সে রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালার জীবন থেকে চিরকালের জন্য চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

রঙ্গপ্রকাশ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পর্ণমালাকে এ-ঘরে একবার ডাকা দরকার। কারণ, জিশান এবার যে-কথাগুলো বলবে সেগুলো একা-একা শোনার মতো সাহস তিনি তৈরি করতে পারছেন না। নিউ সিটির 'সাইকোঅ্যানালিসিস সেন্টার'-এর চিফ সাইকোলজিস্ট এখন নিজের মনের শক্তি এবং গতি-প্রকৃতি নিয়ে বিভ্রান্ত।

জিশানকে বললেন, 'আপনি একটু বসুন। আমার ওয়াইফকে একটু ডেকে নিয়ে আসি—।'

ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। টের পাচ্ছিলেন পা দুটো ঠিকঠাক জায়গামতো পড়ছে না। ভয় পাচ্ছিলেন, এই বুঝি টলে পড়ে যাবেন।

ভাগ্য নেহাত ভালো বলতে হবে যে, চারটে কি পাঁচটা পা ফেলার পরই পর্ণমালাকে দেখতে পেলেন। একটা শৌখিন ট্রে হাতে এগিয়ে আসছেন ওঁদের দিকে। ট্রে-তে স্ন্যাক্স আর কফি—জিশানের জন্য।

তাড়াতাড়ি সোফার কাছে ফিরে এলেন রঙ্গপ্রকাশ। সোফায় বসার আগে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'সিমান?'

কফির টেবিলে হাতের ট্রে-টা নামিয়ে রেখে শান্ত গলায় জবাব দিলেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা নার্ভ সুদার দিয়েছি...।'

'পর্ণ, তুমি একটু এখানে বোসো। মিস্টার পালচৌধুরী কী বলছেন শোনো—।'

স্বামীর কাছে বসলেন পর্ণমালা। জিশানের দিকে তাকালেন।

জিশান খেয়াল করল, সিমানের জন্য কান্নাকাটি করে পর্ণমালা ওর মেকাপের ধার যেটুকু নষ্ট করেছিলেন সেটা এটুকু সময়ের মধ্যেই সাধ্যমতো মেরামত করে এসেছেন।

জিশান কফির কাপে চুমুক দিল।

রঙ্গপ্রকাশ একটু ইতস্তত করে বললেন, 'জিশান, বলুন, সিমানের কথা

কী বলছিলেন—।'

'হ্যাঁ-বলছি।' পর্ণমালার দিকে তাকাল জিশান ঃ 'ম্যাডাম, আপনাদের ছেলে সিমান গাড়ি চালিয়ে স্কাই-হাই ফ্লাইওভার থেকে সেন্ট্রাল লেকে ঝাঁপ দিয়েছে। ও সুইসাইড করতে চেয়েছিল। তারপর...তারপর কীভাবে ওকে রেসকিউ করা হয়, মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়, সেসব তো আগেই ডক্টর বিশ্বাসকে আমি ফোনে জানিয়েছি...।'

রঙ্গপ্রকাশ পাশে হাত বাড়ালেন। পর্ণমালার হাতটা খুঁজলেন। একসময় সেটা পেয়ে আঁকড়ে ধরলেন।

'ও সুইসাইড করতে চেয়েছিল কী করে বুঝলেন?' পর্ণমালার ভুরুতে ভাঁজ। কণ্ঠস্বরে হালকা বিদ্রোহ।

জিশান হাতে হাত ঘষল। এদিক-ওদিক উদ্দেশ্যহীন তাকাল। তাকাল, কিন্তু ওর চোখ কিছু দেখতে পেল না।

রঙ্গপ্রকাশ বুঝলেন, ও দোটানায় পড়েছে। স্পষ্ট কথা বলবে, নাকি মানবিক সৌজন্য বজায় রাখবে? একজন বাবা-মা-কে আঘাত দেবে, নাকি দেবে না?

শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হল।

জিশান রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালার দিকে একপলক করে তাকিয়ে মাথা নীচু করল। বলল, 'সিমান নিজে আমাকে বলেছে...।'

খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখালেন পর্ণমালা। পালটা জিগ্যেস করলেন, 'কেন, সুইসাইড করতে চেয়েছে কেন? ওর কীসের কষ্ট? কীসের অভাব? আমাদের কোনও ব্যবহারে কি ও ব্যথা পেয়েছে?'

জিশান ইতস্তত করে বলল, 'না, না, ঠিক সেরকম নয়। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে! সিমান ওর খুব পারসোনাল কথা...গাড়িতে আসার সময় আমাকে বলেছে...।'

'খুব পারসোনাল কথা। অথচ আমাদের না বলে আপনাকে বলেছে!' পর্ণমালার ভুরু এখনও কুঁচকে রয়েছে। চোখের তারায় আলতো বিস্ময়।

জিশান একটু নড়েচড়ে বসল। সোফায় শরীরটাকে খানিকটা এলিয়ে দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে গিয়ে কফির কাপে কয়েকবার চুমুক দিল। স্ন্যাক্সে কামড় দিল। তারপর বলল, 'আশা করি আপনারা এগুলো সিমানের সঙ্গে আলোচনা করবেন না!' ঠোঁটের ওপরে একবার আঙুল বুলিয়ে নিল জিশান। এপাশ-ওপাশ তাকাল। তারপর ঃ 'আলোচনা যদিও বা করেন, প্লিজ, বলবেন না যে, এসব আপনারা আমার কাছ থেকে শুনেছেন। তা হলে...তা হলে আমার প্রতি ওর যে আস্থা আর বিশ্বাস—সব নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা...সেটা আমার ভালো লাগবে না...।'

'আপনাকে এসব পারসোনাল কথা ও বলতে গেল কেন?' পর্ণমালা এখনও সেই একই প্রশ্নে আটকে আছেন। কারণ, জিশানকে সিমানের ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলার ব্যাপারটা পর্ণমালা আর রঙ্গপ্রকাশের সঙ্গে সিমানের সম্পর্কের দূরত্বটাকে বড্ড কুৎসিতভাবে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে।

'একটা কথা বলি, ম্যাডাম—' পর্ণমালার দিকে সরাসরি তাকাল জিশান ঃ 'আমাকে নিশ্চয়ই আপনাদের খুব কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। কারণ, গত তিনমাস ধরে টিভিতে, রাস্তাঘাটের বিলবোর্ডে, নানান জায়গায় আমাকে—আমার ছবিকে—বেপরোয়াভাবে প্রচার করা হয়েছে। আপনাদের মিডিয়া আমাকে আপনাদের ঘরের লোক করে তুলেছে। এই শহরে ঘুরে বেড়িয়ে আমি দেখেছি, কিল গেম পার্টিসিপ্যান্ট জিশান পালচৌধুরীকে নিয়ে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের মধ্যে কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা, কী হুল্লোড় মাতামাতি আর হইচই। ওদের কাছে আমি সুপারহিরো হয়ে গেছি—।'

রঙ্গপ্রকাশ বিড়বিড় করে বললেন, 'আমাদের কাছেও।'

পর্ণমালা স্বামীর দিকে একবার তাকালেন। তারপর জিশানের দিকে আবার মনোযোগ দিলেন।

'সেইজন্যেই বোধহয় সিমান ওর মনের কথা আমার কাছে বলেছে।... বলেছে, ও ইচ্ছে করে ফ্লাইওভার থেকে সেন্ট্রাল লেকের জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। ওর আর বাঁচতে ইচ্ছে করছিল না...।'

●

আপনি ওর লাইফ সেভ করেছেন।' রঙ্গপ্রকাশ বললেন, 'উই আর গ্রেটফুল টু য়ু...।'

'প্লিজ—' অনুনয় করে বলল জিশান, 'একটা মামুলি কর্তব্যকে শুধু-শুধু বড় করে দেখাবেন না। যাই হোক, ডক্টর বিশ্বাস, মিসেস বিশ্বাস...আপনাদের ছেলে প্রায় একবছর ধরে ড্রাগ, বেটিং আর গ্যাম্বলিং-এ মেতে আছে। আপনাদের এই নিউ সিটির সুপারফাস্ট লাইফস্টাইলে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। অথচ এই লাইফস্টাইলের ভেতরটা যে ফোঁপরা সেটা আপনারা দুজন নিশ্চয়ই বোঝেন।

'ডক্টর, টাকা খরচ করতে পারার ক্ষমতাটাই একমাত্র ক্ষমতা নয়, গায়ের জোরে কাউকে হারাতে পারার ক্ষমতাটাই একমাত্র ক্ষমতা নয়। যারা এসব সত্যি বলে ভাবে তারা ভালোবাসার ক্ষমতার কথা জানে না...।' কফিতে আবার চুমুক দিল জিশান ঃ 'আসলে কী জানেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে যে-টান—সেই টানটাই সবচেয়ে পাওয়ারফুল। আপনাদের সঙ্গে সিমানের

রিলেশানের টান কতটা ডেভেলাপ করেছিল সেটা আপনারাই ভালো জানেন। তবে...তবে...' একটু ইতস্তত করল জিশান। তারপর নীচু গলায় বলল, 'সিমান বলছিল, সেই টানটা ও কখনও সেভাবে টের পায়নি। ওর সবসময় মনে হয়, ওর কোনও পিছুটান নেই—।'

রঙ্গপ্রকাশ অবাক হয়ে জিশানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এসব কী শোনাচ্ছে জিশান। রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালার সঙ্গে সিমানের সম্পর্কের গোপন কথা?

কে সাইকোলজিস্ট? রঙ্গপ্রকাশ, না জিশান?

রঙ্গপ্রকাশ জিশানের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না। 'কাইনেসিক্স' বলবে, তিনি আসলে বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

আড়চোখে পর্ণমালার দিকে তাকালেন। ওঁর অবস্থাও একইরকম। ঘরের ফার্নিচার খুঁটিয়ে দেখার কাজে মনোযোগ দিয়েছেন।

জিশান তখন বলছিল, 'আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলছি বলে, প্লিজ, ক্ষমা করবেন। কিন্তু সিমানের কথাগুলো শুনে আমার মনে হল সেগুলো আপনাদের দুজনের কাছে পৌঁছোনো দরকার। তা হলে হয়তো সিমানের সঙ্গে আপনাদের কমিউনিকেশানের গ্যাপটা কমবে। যেমন ধরুন...।' সামান্য মাথা ঝাঁকাল জিশান। রঙ্গপ্রকাশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আঙুলে আঙুল ঠেকাল।

রঙ্গপ্রকাশ বুঝতে পারছিলেন, যে-কথাটা জিশান এখন বলতে চায় সেটা বলতে ও ইতস্তত করছে, সময় নিচ্ছে। বোধহয় কথাটা বেশ স্পর্শকাতর।

'যেমন ধরুন, আপনি—ডক্টর বিশ্বাস—আমার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করছেন...।'

রঙ্গপ্রকাশ চমকে গেলেন। জিশান এ-কথা জানল কেমন করে? ওর তো এসব জানার কথা নয়!

পর্ণামালাও অবাক হয়েছিলেন। ফার্নিচারের দিক থেকে চকিতে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছেন জিশানের দিকে।

জিশান বলল, 'না, না, ডক্টর—এতে আপনার অস্বস্তি পাওয়ার কিছু নেই। সেপ্টেম্বরের দু-তারিখে আমাকে কিল গেমে নামতে হচ্ছে। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় সত্যি—এর মধ্যে কোনও 'ইফ্স অ্যান্ড বাট্স' নেই। এবং আপনাকে বলে রাখছি, আমি সেদিন প্রাণপণ লড়ব। জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করব। কেন জানেন, ডক্টর?'

হঠাৎই উঠে দাঁড়াল জিশান। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওর মাইক্রোভিডিয়োফোন ইউনিটটা বের করল।

এই মুহূর্তে ওর মিনির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে। শানুকেও দেখতে ইচ্ছে করছে।

সেটটা অন করে একটু টিউন করতেই জিশানের আপনজনেরা চলে এল ওর চোখের সামনে।

মিনি। সুন্দর মুখে ঘাম এবং হাসি। জিশানের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ দুটো আরও জীবন্ত হয়ে উঠল। আস্তে করে জিগ্যেস করল, 'কেমন আছ?'

জিশান হাসল ঃ 'ভালো—।'

'দু-তারিখ তো দেখতে-দেখতে এসে যাবে...।' সামান্য চোখ নামাল মিনি।

'হ্যাঁ, এসে যাবে। তারপর পেরিয়েও যাবে। তখন তোমাদের কাছে ফিরে যাব। আমার দেরি সইছে না।'

'তখন...তখন...' মিনির কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল ঃ 'তখন যদি ওই শ্রীধর পাট্টা তোমাকে ফিরতে না দেয়?'

'না দিলে ওকে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলব। তারপর তোমাদের কাছে ফিরে যাব।'

কথাটা বলার সময় জিশানের চোয়ালের রেখা যে শক্ত হল সেটা রঙ্গপ্রকাশের চোখ এড়াল না।

'শানু কোথায়?' জিশান ছেলেকে দেখতে চাইল।

মিনি ওর এমভিপি সেটটা নিয়ে গেল ছোট্ট ছেলেটার কাছে। বলল, 'এই দ্যাখো, মেঝেতে খেলনা ছড়িয়ে কী কাণ্ড করছে!'

ছেলেকে দেখতে পেল জিশান। এই চার মাসে কত বড় হয়ে গেছে!

কয়েকটা ভাঙা গাড়ি আর রঙিন পুতুল চারপাশে ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে।

এমভিপির পরদায় শানুর ফুটফুটে মুখ দেখা গেল। জিশান ওর এমভিপি সেটটা নিয়ে চলে এল রঙ্গপ্রকাশের পাশে। পরদার ছবিটা দেখিয়ে বলল, 'আমার ছেলে, ডক্টর। ওর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমাকে কিল গেমে জিততে হবে। ওর মায়ের কাছে ফেরার জন্যেও। ওরাই আমার সবচেয়ে জোরালো টান, সবচেয়ে বড় শক্তি—।'

পর্ণমালাও ঝুঁকে পড়ে শানুকে দেখছিলেন। ওঁদের সিমানও একদিন এইরকম ফুটফুটে ছিল।

জিশান সরে এল নিজের সোফার কাছে। বসে পড়ল। আরও কয়েক মিনিট মিনি আর শানুর সঙ্গে কথা বলে কাটাল। তারপর সেটটা অফ করে দিল।

রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালা দুজনেই তাকিয়ে ছিলেন জিশানের মুখের দিকে। সেখানে এক অদ্ভুত দ্যুতি ওঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন ঃ প্রিয়জনের ভালোবাসার দ্যুতি। সেই দ্যুতির সঙ্গে প্রাণশক্তির উজ্জ্বলতাও মিশে ছিল।

রঙ্গপ্রকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে

বুঝতে পারলেন সেই দীর্ঘশ্বাসের কোমল শব্দ পর্ণমালা শুনতে পেয়েছেন।

জিশান বলল, 'ডক্টর বিশ্বাস, আপনি আমার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করছেন। নিশ্চয়ই শ্রীধর পাট্রার জন্যে। কিল গেমের জন্যে। যাই হোক, আপনার কাজ আপনি করবেন। আমারটা আমি। তবে একটা কথা আপনাকে বলি। কিল গেমের ফরম্যাট অনুযায়ী দু-তারিখে তিনজন মার্ডারার—লাইফার—আমাকে খুন করতে নামবে। আমি ওদের ফাঁকি দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। যেটুকু জেনেছি তাতে এখানকার নিয়ম অনুযায়ী যাবজ্জীবনের সাজা পাওয়া আসামিকে সত্যি-সত্যি সারাটা জীবন জেলে কাটাতে হয়। তাই ওই তিনজনের সামনে কোনও নতুন ভবিষ্যৎ নেই। বর্তমানটাই ওদের ভবিষ্যৎ...' একটু থামল জিশান। অপলক চোখে তাকাল রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাসের দিকে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'কিন্তু আমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এক নয়, ডক্টর। আমি মিনি আর শানুর কাছে ফিরে যাব। ফিরে যাওয়ার এই টানটা আমার বর্তমান, আর ফিরে যাওয়াটা আমার ভবিষ্যৎ।

'আপনার তৈরি করা সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলে এই ফিলিংটা নিশ্চয়ই নেই। আপনি কাইন্ডলি এটা ইনক্লুড করে নেবেন। আমি চাই নিউ সিটির সবাই জানুক আমি একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান—।'

জিশানের ফরসা মুখে লালচে আভা দেখতে পাচ্ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ।

জিশান ওঁর বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে, এত কথা বলছে—সেটা রঙ্গপ্রকাশের সাইকোলজিস্ট ব্যক্তিত্বের ভালো লাগছিল। কারণ, খুব দ্রুত প্রচুর তথ্য পাচ্ছিলেন। তিনি জিশানের প্রোফাইল এ পর্যন্ত যা তৈরি করেছেন এখন পাওয়া তথ্যকণাসাগর তার সঙ্গে জুড়ে নিলে প্রোফাইলটা অনেক গুণ সমৃদ্ধ হবে।

আর সরাসরি যেটা বুঝতে পারছিলেন, কিল গেমে জিশান সহজে হারবে না, সহজে মরবে না। ও সত্যিই একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান। ও হারার আগে মারবে, মরার আগেও মারবে। ফ্যামিলির জন্য টান ওর সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র।

কিন্তু যে-প্রশ্নটা রঙ্গপ্রকাশকে খোঁচাচ্ছিল সেই প্রশ্নটাই এবার করলেন, 'আমি যে আপনার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করছি সেটা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'সিমান।' বলে হাসল জিশান। মাথা দোলাল কয়েকবার। তারপর ঃ 'সিমান আরও অনেক কিছু জানে। ও জানে যে, আপনার ইকনমিক ইনডেক্স ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে চলে গেছে। সেটা ইমপ্রুভ করার জন্যে আপনার হাতে সময় রয়েছে নব্বই দিনেরও কম...।'

রঙ্গপ্রকাশ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভয় পাওয়া বিমূঢ় মুখে তাকিয়ে রইলেন জিশানের দিকে।

পর্ণমালা এক ঝটকায় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছেন স্বামীর দিকে। এ কী কথা শুনছেন তিনি! ই. আই. নেমে গেছে!

রঙ্গপ্রকাশ কাঁপতে লাগলেন। বিস্ময় আর নপুংসক রাগ ওঁর ভেতরে উত্তাল ঢেউ তুলল।

সিমান এ-কথা জানল কেমন করে! যে-কথা রঙ্গপ্রকাশ ভীষণ যত্নে গোপন রাখতে চেয়েছেন সেটা এখন যেন হুড়মুড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবার সামনে কফি টেব্‌লের ওপরে।

পর্ণমালা যে এ-ঘটনায় বেশ ধাক্কা খেয়েছেন সেটা ওঁর বিহ্বল চোখ-মুখে স্পষ্ট ধরা পড়েছে।

রঙ্গপ্রকাশের মুখে যে-নীরব প্রশ্নটা ফুটে উঠেছিল সেটা জিশান পড়ে নিতে পেরেছিল। তাই ও আলতো গলায় থেমে-থেমে বলল, 'সিমান...আপনার... আপনার ই-মেল অ্যাকাউন্ট...হ্যাক করেছে। হ্যাক করে সব জেনেছে। ই. আই. ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে যাওয়ার কথাও...।'

পর্ণমালা স্বামীর পাশে চলে এলেন। অসহায় মুখে ওঁর দিকে তাকিয়ে ওঁর জামা খামচে ধরলেন ঃ 'এসব...এসব সত্যি? আমাদের ইকনমিক ইনডেক্স ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে চলে গেছে! সিমান...সিমান তোমার মেল হ্যাক করেছে!'

রঙ্গপ্রকাশ মাথা ঝুঁকিয়ে বসলেন। সামান্য মাথা নাড়লেন ওপর-নীচে। ভাঙা গলায় বললেন, 'সত্যি—সব সত্যি...।'

জিশান ভেঙে পড়া বাবা-মা-কে দেখছিল। ওর খুব খারাপ লাগছিল। নিউ সিটির ইকনমিক ইনডেক্সের ব্যাপারটা সিমানই ওকে বলেছে। জিশানের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তক্ষুনি। মনে পড়ে গিয়েছিল বাবার কথা। যে-বাবা সবসময় মাথা তুলে বাঁচার কথা বলতেন।

ইকনমিক ইনডেক্স! মুখের ভেতরটা তেতো লাগল জিশানের। এই অমানবিক নিয়ম একমাত্র নিউ সিটিকেই মানায়।

এখন কী করবেন রঙ্গপ্রকাশ? কোথায় মুখ লুকোবেন? সিমান ওঁর মেল হ্যাক করে সবকিছু জেনেছে বলেই কি সুইসাইড করতে গিয়েছিল?

সম্পর্কের টানের অভাব বহুদিন ধরে টের পেয়েছে সিমান। আর একইসঙ্গে জানতে পেরেছে ই. আই.-এর নড়বড়ে অবস্থা। তাই হয়তো ও সুইসাইড করতে গিয়েছিল এবং জিশান দেবদূত হয়ে ওকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু এখন কী হবে?

সিমানকে ফিরে পেয়ে রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালা প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু এখন যদি সিমান জানতে পারে যে, ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে যাওয়া

এই ই. আই.-কে মেরামত করার কোনও ক্ষমতা ওঁদের নেই! তা হলে কী হবে? সিমান কি সেরে উঠে আরও উচ্ছৃংখল হয়ে উঠবে, নাকি আবার সুইসাইড করায় চেষ্টা করবে?

তখন?

রঙ্গপ্রকাশ পর্ণমালার দিকে তাকালেন। ভেতরে-ভেতরে ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। জিশানকে কি খুলে বলবেন নতুন সমস্যার কথা? যদি এক্ষুনি জিশানকে কিছু না জানান তা হলে পরে আর জানানোর সুযোগ পাওয়া যাবে না। জিশান হয়তো আর পাঁচ-দশ মিনিট কথা বলেই চলে যাবে। তারপর হয়তো ওর সঙ্গে আর কোনওদিনও দেখা হবে না।

রঙ্গপ্রকাশের বারবার মনে হচ্ছিল, জিশান এমনই একজন মানুষ যে সব পারে। সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে নিমেষে। ওর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল থেকেও ওর 'প্রবলেম সলভিং স্কিল'-এর ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছিল। তা হলে একবার বলেই দেখা যাক না!

রঙ্গপ্রকাশ স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে এলেন। চাপা গলায় বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কোরো, পর্ণ। আমি তোমাকে ই. আই.-এর ব্যাপারটা সাহস করে বলে উঠতে পারিনি। আমি পাগলের মতো একটা সলিউশান খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—কিন্তু কোনও পথ পাইনি।'

প্রায় ফিসফিস করে পর্ণমালা বললেন, 'আমরা...আমরা এখন কী করব? আমাদের তা হলে নিউ সিটি ছেড়ে চলে যেতে হবে?'

'জানি না।' মাথা নাড়লেন রঙ্গপ্রকাশ ঃ 'হাতে এখনও মাস তিনেক সময় আছে। কিন্তু তাতে কী লাভ! যখন সামনে কোনও ওয়ে আউট দেখতে পাচ্ছি না...।'

'ওল্ড সিটিতে গিয়ে থাকতে হলে আমি...আমি সিম্প্লি মরে যাব। আর...আর সিমানও কতটুকু বাঁচবে জানি না...।' পর্ণমালার চোখে জল এসে গেল। হাত দিয়ে চোখ মুছলেন।

জিশান খুব অস্বস্তি পাচ্ছিল। বুঝতে পারছিল, একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত আলোচনার আবহাওয়ায় ও ঢুকে পড়েছে।

রঙ্গপ্রকাশ জিশানের দিকে তাকালেন। একটু আগেই জিশান বলছিল, ও একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান। কিন্তু রঙ্গপ্রকাশের এখন মনে হল, জিশান একা নয়—তিনি নিজেও একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান।

রঙ্গপ্রকাশ দুবার ঢোঁক গিললেন। চোয়াল শক্ত করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর জিশানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জিশান, আপনি আমার ছেলেকে আজ বাঁচিয়েছেন বটে কিন্তু আসলে পুরোপুরি বাঁচাতে পারলেন না। কারণ, আমরা তিনজনেই শেষ হয়ে গেছি। আমাদের হাতে আর মাত্র তিন মাস

সময়—তারপরই আমরা শেষ।'

জিশান বলল, 'জানি—ভালো করেই জানি। আমি একসময় এই নিউ সিটিতে ছিলাম। আমার যখন বারো বছর বয়েস তখন এই ই. আই.-এর প্রবলেমের জন্যে আমাকে আর আমার বাবাকে নিউ সিটি ছেড়ে চলে যেতে হয়। বাবার চোখের জলের কথা আমার এখনও মনে পড়ে। তখন আমার নাম ছিল নিশান। ওল্ড সিটিতে গিয়ে বাবা আমার নতুন নাম রাখেন জিশান। আমি সেই দিনটার কথা ভুলতে পারি না, ডক্টর। আমার বাবা বাকি জীবনটা কী কষ্ট পেয়েছিলেন তা আমি ভালো করে জানি।'

রঙ্গপ্রকাশ মুখ নামালেন। জিশানের ব্যথাটা অনুভব করতে চাইলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জিশান। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'ডক্টর, আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কোড নম্বরটা আমাকে দিতে পারেন?'

'কেন?' চমকে উঠে মুখ তুললেন রঙ্গপ্রকাশ।

জিশান বলল, 'দিন না—একটু দরকার আছে—।'

রঙ্গপ্রকাশ পর্ণমালার দিকে তাকালেন। দেখলেন, ওঁর মুখেও বিস্ময়।

জিশানের কথা আর ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল যে, রঙ্গপ্রকাশ আর আপত্তি করতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে পকেট থেকে একটা ম্যাগনেটিক কার্ড বের করলেন। জিশানও ওর পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোনটা বের করে নিল।

রঙ্গপ্রকাশ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অ্যাকাউন্ট কোড কেন চাইছে জিশান? ও কি রঙ্গপ্রকাশের ই. আই.-এর ব্যাপারটা হাতে-কলমে যাচাই করে নিতে চাইছে?

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কোড নম্বরটা ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করলেন। আর জিশানও টাচ স্ক্রিন কি-প্যাডে আঙুল ছুঁইয়ে সংখ্যাগুলো ওর ফোনে ইনপুট করতে লাগল।

নম্বর বলা শেষ হলে রঙ্গপ্রকাশ কার্ডটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'এই কোড নাম্বার দিয়ে আপনি কী করবেন?'

'এই কোড নম্বর দিয়ে আমি সিমানকে বাঁচাব। এবার বোধহয় ওকে পুরোপুরি বাঁচাতে পারব।'

'তার মানে?' পর্ণমালা। ওঁর চোখের পাতা সামান্য কাঁপছে।

হাসল জিশান ঃ 'ম্যাডাম, এই নিউ সিটিতে এসে আমি বহু টাকার প্রাইজ জিতেছি। আমার এক বন্ধু মনোহর সিং-ও ওর প্রাইজ মানি আমার ছেলেকে গিফ্‌ট করে গেছে। আমার এখন অনেক টাকা। এই টাকাটা আমি কাজে লাগাতে চাই...।' কথা বলতে-বলতে স্যাটেলাইট ফোনের কি-প্যাডে আঙুল ছোঁয়াচ্ছিল জিশান। কয়েক সেকেন্ড পরে মুখ তুলে রঙ্গপ্রকাশের দিকে তাকাল, হাসল ঃ

'আপনার অ্যাকাউন্টে আমি আট লাখ টাকা ট্রান্সফার করলাম, ডক্টর...। আপনাদের জন্যে না—সিমানের জন্যে। আর একটা কথা...প্লিজ, আমাকে কোনও ধন্যবাদ জানাবেন না...।'

রঙ্গপ্রকাশ হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। পর্ণমালা স্বামীর গায়ে হেলে পড়লেন, ওঁর বাহু আঁকড়ে ধরলেন।

পর্ণমালার চোখ বোজা। ঠোঁট কাঁপছে।

রঙ্গপ্রকাশ কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু ওঁর কথা জড়িয়ে গেল।

জিশান ঠোঁটে আঙুল তুলে ইশারায় ওঁকে চুপ করতে বলল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'ডক্টর, কিল গেমে জিতে আমি যে-একশো কোটি টাকা পাব তা দিয়ে ওল্ড সিটির প্রচুর মানুষকে আমি নিউ সিটির সিটিজেন করে দিতে পারব। আমি ওদের এখানে নিয়ে আসতে চাই কেন জানেন?' ঠোঁটের কোণে হাসল জিশান। বলল, 'আপনাদের এখানে মনুষ্যত্বের বড় অভাব। ওরা এখানে এলে সেই অভাব অনেকটা ঘুচবে...।'

এক লহমা চুপ করে থেকে জিশান বলল, 'যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আশা করি সেপ্টেম্বরের দু-তারিখের পর আমাদের আবার দেখা হবে।'

ওঁরা দুজনেই রুদ্ধ গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, দেখা হবে। তখন আমরা অনেক গল্প করব। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট, জিশান—।'

স্যাটেলাইট ফোনটা পকেটে ঢোকাতে-ঢোকাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জিশান। খুব টায়ার্ড লাগছে। গালটাও সামান্য জ্বালা করছে। তবে মনটা ভালো লাগছিল।

জিশান ঘড়ি দেখল। না, আর দেরি করলে চলবে না। সুধাসুন্দরীর কাছে সময়ের মধ্যে ফিরতে হবে। কন্ট্রোল্‌ড ফ্রিডম।

বাইরে বেরিয়ে আসার সময় ও একটা হাই তুলল।

●

সুখারাম নস্কর মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল।

কী সাংঘাতিক নীল! দেখলে লোভ হয়। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে, 'চলে আয়!'

আর সেই নীলের চাদরে গাঁথা রয়েছে একটা ঝলমলে সোনালি বল। জ্বলছে। তবে এখন বিকেল বলে তেজ কম।

এই দুটো জিনিসের দিকে তাকালেই সুখারামের স্বাধীন হতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে এই সেন্ট্রাল জেল থেকে পালাতে। আর তখনই ওর মন-কেমন-

করা শুরু হয়।

সেন্ট্রাল জেলের প্রকাণ্ড মাঠে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল কয়েদিরা। কেউ-কেউ বারবেল বা ডাম্বেল নিয়ে শরীরচর্চা করছে। কয়েকজন নিজেদের মধ্যে টিম তৈরি করে খেলাধুলো করছে। পাঁচটা ফুটবল মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। তার পিছনে খেলোয়াড়রা। আবার কোথাও বা ক্রিকেট বল আর ব্যাট নিয়ে হইহই চলছে।

সব কয়েদির পরনে একইরকম পোশাক। ছাই রঙের টাইট স্লিভলেস ভেস্ট আর কালো রঙের টাইট প্যান্ট। প্রত্যেকের ভেস্টের ওপরে সামনে এবং পিছনে বারকোড প্রিন্ট করা। এই বারকোড লেজার স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করলেই সেই কয়েদির সমস্ত খুঁটিনাটি স্ক্যানারের ফাইবার অপটিক কেব্‌ল দিয়ে চলে যাবে কম্পিউটারের মেমোরিতে। এবং কম্পিউটারের মনিটরে ফুটে উঠবে।

শুধুমাত্র বিকেলের এই ড্রিলের সময় কয়েদিদের সেল থেকে বেরোতে দেওয়া হয়। চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত এই 'স্বাধীনতা'-র সময়টাকে ওরা ঠাট্টা করে বলে 'ফান আওয়ার'। এই সময়টা জেলের খোলা মাঠে ওরা খেলাধুলো কি গল্পগুজব করে নিজেদের খুশিমতো সময় কাটায়।

জেল বিল্ডিং-এর এক কোণে রয়েছে 'ড্রিল কাউন্টার'। সেই কাউন্টার থেকে কয়েদিরা নিজেদের পছন্দমতো 'ড্রিল আইটেম' পেতে পারে। 'আইটেম' বলতে ফুটবল, ব্যায়ামের যন্ত্র, ক্রিকেট খেলার ব্যাট-বল—এইসব। তারপর সাড়ে পাঁচটা বাজলেই সমস্ত আইটেম কাউন্টারে আবার ফেরত দিয়ে জেল বিল্ডিং-এ ঢুকতে হয়। কেউ যদি কোনও আইটেম কাউন্টারে জমা না দিয়ে জেল বিল্ডিং-এ ঢোকে তা হলে স্পেশাল লেজার স্ক্যানার লাগানো দরজা দিয়ে পার হওয়ার সময় বিশেষ ধরনের বিপিং সাউন্ড শোনা যাবে। তখন শাস্তি হিসেবে সেই 'অপরাধী'-কে একটানা তিনদিন স্রেফ জল খেয়ে কাটাতে হবে।

সুখারাম মাঠের একটা জায়গায় পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে ছিল। চারপাশের চেনা দৃশ্যটা একজন নিরপেক্ষ দর্শকের চোখে দেখছিল। আর মাঝে-মাঝে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল।

ড্রিলের এই সময়টা মাঠে বসে বা শুয়ে আকাশের দিকে তাকালেই ওর এই সেন্ট্রাল জেল থেকে পালাতে ইচ্ছে করে। যদিও ও জানে সেটা অসম্ভব।

হঠাৎই সুখারামের নজরে পড়ল, বেশ খানিকটা দূরে দুজন কয়েদির মধ্যে হাতাহাতি লেগেছে।

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে সেন্ট্রাল জেলের লং ডিসট্যান্স লেজার স্ক্যানার কাজ শুরু করে দিল। বেশ কয়েকটা ওয়াচ টাওয়ার থেকে সিকিওরিটি গার্ডদের লেজার স্ক্যানিং গান পলকে অ্যাক্টিভ হয়ে উঠল। সেই লেজারের আলো গিয়ে পড়ল যুযুধান দুই কয়েদির ওপরে। ওদের বারকোড স্ক্যান হয়ে সমস্ত

তথ্য ঢুকে পড়ল জেলের কম্পিউটারে।

এরপর কী হবে সুখারাম জানে।

ওই কয়েদি দুজনকে নিয়মমাফিক কম-বেশি শাস্তি পেতে হবে।

সত্যি, এই সেন্ট্রাল জেলের নজরদারির প্রযুক্তির তুলনা নেই!

সুখারাম নস্করের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ও অলসভাবে চেয়ে রইল লড়াইখ্যাপা দুই কয়েদির দিকে।

কয়েদি দুজনের লড়াই একটু পরেই থেমে গেল।

এরকমটা প্রায়ই হয় ঃ এই লড়াই, তো এই ভাব।

এই জেলে সুখারাম আছে তিন বছর, কিন্তু তিন বছরে মাত্র চারবার ওর সঙ্গে অন্য কয়েদির হাতাহাতি হয়েছে। আর প্রত্যেকবারই সুখারাম ঝগড়া মিটিয়ে নিয়েছে। তারপর হেসে হ্যান্ডশেক করেছে শত্রুর সঙ্গে।

কোনও-কোনও কয়েদি সুখারামকে দুর্বল ভাবলেও বেশিরভাগ কয়েদি তা ভাবেনি। বরং তাদের মনে হয়েছে, যে-ছেলেটা ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, যার হাত আর পায়ের মাস্‌ল নমনীয় অথচ মজবুত, যে দৌড়ে হরিণকে হার মানাতে পারে, শূন্যে ছ'ফুট লাফাতে পারে, সে আর যা-ই হোক দুর্বল হতে পারে না।

সুখারাম নস্কর নিজেও সেটা জানে। তবে যেটা অনেকেই জানে না সেটা হল, ঝগড়া কিংবা মারপিট করতে ওর ভালো লাগে না। ওর ভালো লাগে খোলা আকাশের নীচে দৌড়তে। দৌড়, দৌড়, দৌড়।

ও স্বপ্ন দ্যাখে, ও দৌড়চ্ছে—না, দৌড়চ্ছে না, উড়ে যাচ্ছে বাতাসের বেগে, আর ওর মাথার ওপরে নীল আকাশ আর সোনালি সূর্য।

অথচ হাফ-ম্যারাথন রানার সুখরাম নস্কর এখন সেন্ট্রাল জেলের ট্রান্সপারেন্ট ফাইবারের পাঁচিলের ঘেরাটোপে বন্দি।

সুখারাম পুরোনো অভ্যেস ছাড়তে পারেনি। একজন লং ডিসট্যান্স রানারের প্র্যাকটিসের অভ্যেস। এই জেলে আসার আগে, যখন ও স্বাধীন ছিল, তখন ও সপ্তাহে গড়ে ছাপ্পান্ন কিলোমিটার করে দৌড়ত। প্রতিদিন প্র্যাকটিসের সময় ওর কোচ বরাট স্যার স্টপ ওয়াচ হাতে লক্ষ রাখতেন। বলতেন, 'সুখা, অ্যাভারেজে তোর এক-একমাইল কভার করতে পঞ্চান্ন সেকেন্ড লেগে যাচ্ছে!' মাথা নাড়তেন বরাট স্যার ঃ 'কমা, কমা। টাইম আরও কমা। অন্তত পঞ্চাশ সেকেন্ড কর্‌...।'

বরাট স্যার কোচিং-এর জন্য সবার কাছ থেকে টাকা নিতেন—শুধু সুখারামের কাছ থেকে কিছু নিতেন না। কারণ, তিনি সুখারামের বাড়ির অবস্থা জানতেন। অসুস্থ বিধবা মা, আর স্কুলে পড়া একটা ছোট বোন। অভাব ছাড়া ওদের সম্বল বলতে আর কিছু ছিল না। তিনটে প্রাণীর দু-বেলার খোরাকি জোটাতে সুখারাম ওল্ড সিটিতে দিনে দশঘণ্টা করে সাইকেল ভ্যান টানত। বরাট

স্যার ওকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'বাচ্চা, চালিয়ে যা। জানিস, লোড করা সাইকেল ভ্যান টানলে পায়ের কাফ মাস্‌ল কত ডেভেলাপ করে, কত স্ট্রং হয়!'

পঁচিশ বছরের সুখারাম সব বুঝত। বরাট স্যারের কথাগুলো মিথ্যে ছিল না। কিন্তু তার মধ্যে একটা আক্ষেপ লুকিয়ে থাকত। নিজের সেরা ছাত্র সুখারামের জন্য তিনি একটা ভালো চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেননি।

সুখারামের তাতে দুঃখ ছিল না। ও হাসিমুখে সাইকেল ভ্যান টানত। আর রোজ ভোরবেলা প্র্যাকটিসে আসত—একদিনও কামাই করত না। কারণ, দৌড়তে ওর দারুণ ভালো লাগত। ওর মনে হত, দৌড়টাই ওর জীবন।

সেইজন্যই সুখারাম ওর পুরোনো অভ্যেস ছাড়তে পারেনি। জেলের ভেতরে এই বিশাল খোলা মাঠে ও ড্রিলের সময়টায় দৌড় প্র্যাকটিস করে। রোজ গড়ে আট কিলোমিটার করে ওর দৌড়নো চাই-ই চাই। তা হলে সপ্তাহে ছাপ্পান্ন কিলোমিটারের কোটা পূরণ হয়। বরাট স্যার যা বলেছিলেন।

এই মাঠে যখন ও দৌড়য় তখন ওয়াচ টাওয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও একজন সান্ত্রীকে ও বরাট স্যার বলে কল্পনা করে নেয়।

বয়েস পঞ্চাশ-বাহান্ন। রোগা চেহারা। মাথায় অর্ধেকটা টাক। চোখে চশমা। গাল বসা। কপালে অনেক ভাঁজ। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ঢোলা ফুলপ্যান্ট। এবং সেই পাঞ্জাবি বা ফুলপ্যান্টের কোথাও না কোথাও অল্পবিস্তর ছেঁড়া থাকবেই। মানুষটা রেগে গিয়ে যখন চিৎকার করে ছাত্রদের গালিগালাজ করত তখন তার মুখ দিয়ে থুতু ছিটকে বেরোত।

বরাট স্যার বয়েসকালে লং ডিসট্যান্স রানার ছিলেন। তবে দৌড়ে খুব বেশি এগোতে পারেননি। এ-পাড়া সে-পাড়ায় দু-চারটে লোকাল কাপ জিতেছেন—ব্যস, এই পর্যন্তই।

অনেকে আড়ালে ওঁকে ব্যঙ্গ করে বলে, যারা অ্যাথলেটিক্সে আলটিমেটলি কিছু করতে পারে না, তারাই বয়েস হলে কোচ হয়ে ইয়াং অ্যাথলিটদের ওপরে মাতব্বরি করে আর পয়সা কামায়।

কথাটা কী করে যেন পাঁচকান হয়ে বরাট স্যারের কানে গিয়েছিল। পরদিন ভোরবেলা মাঠে এসে বরাট স্যার বলেছিলেন, 'শোন, আমি তোদের আর প্র্যাকটিস করাব না।'

সুখারামরা মোট পাঁচজন ছিল সেদিন। ওরা প্রায় একসঙ্গে জিগ্যেস করেছিল, 'কেন, স্যার? শেখাবেন না কেন?'

বরাট স্যার ওদের খুব কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। ভাঙা গলায় জানতে চেয়েছিলেন, 'আমি তোদের ওপরে মাতব্বরি করি? তোদের কাছ থেকে পয়সা কামাই?'

বরাট স্যারের সেই অপমান মাখা কণ্ঠস্বর সুখারামের আজও মনে আছে।

প্রশ্ন দুটো করার সময় বরাট স্যার কেঁদে ফেলেছিলেন। এবং সেই কান্না মেশানো গলায় একই প্রশ্ন বারবার করতে-করতে ভাঙাচোরা মানুষটা পাশের একটা গাছের নীচে বসে পড়েছিলেন। আর সুখারামরা স্যারকে ঘিরে ধরে প্রাণপণে সান্ত্বনা দিয়েছিল, আর বারবার বুঝিয়েছিল যে, কথাগুলো সব মিথ্যে।

প্রায় আধঘণ্টা পর চশমার কাচ মুছে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং কোচিং শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেদিন ততটা মন দিয়ে শেখাতে পারেননি।

স্যারের কথা ভাবতে-ভাবতে সুখারাম নস্কর জেলের মাঠে শুয়ে পড়েছিল। ওর চোখে জলও এসে গিয়েছিল। বরাট স্যার এখন কী করছেন কে জানে! তিনি যদি জানতেন, সুখারাম একজন সান্ত্রীকে বরাট স্যার ভেবে নিয়ে সেন্ট্রাল জেলের এই মাঠে রোজ বিকেলে দৌড় প্র্যাকটিস করে তা হলে কী খুশিই না হতেন!

চোখ বুজে স্যারের কথা ভাবছিল সুখারাম, আর মনে-মনে রেসিং ট্র্যাকে দৌড়চ্ছিল। ট্র্যাকের এক-একটা পাক শেষ করার সময় ট্র্যাকের ঠিক পাশে ও বরাট স্যারকে দেখতে পাচ্ছিল। স্টপ ওয়াচ দেখছেন আর উত্তেজিত হাতের ইশারা করে বলছেন, 'চালিয়ে যা, সুখা! চালিয়ে যা!'

সুখারামকে স্যার খুব ভালোবাসতেন। সবসময় বলতেন, 'তুই আমার সেরা ছাত্র। আমি শিয়োর—তুই একদিন কিছু না কিছু করে দেখাবি...।'

তো রিজিওন্যাল মিটে সুখারাম নস্কর পাঁচ কিলোমিটার রেসে ফার্স্ট হয়েছিল। কাপ, ক্যাশ প্রাইজ আর সার্টিফিকেট নিয়ে ডায়াস থেকে নামতেই বরাট স্যার ওকে জাপটে ধরেছিলেন। আবেগে মানুষটা কোনও কথা বলতে পারছিল না। বারবার শুধু বলছিল, 'সুখা...সুখা...সুখা...।'

প্রাইজের টাকা দিয়ে বরাট স্যারকে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর একটা সস্তার ফুলপ্যান্ট কিনে দিয়েছিল সুখারাম। ওঁর বস্তির দেড়খানা ঘরে গিয়ে যখন ও উপহারের প্যাকেটটা স্যারকে দেয় তখন হতবাক মানুষটা আবার ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর আবেগে কেঁপে যাওয়া গলায় বিড়বিড় করে বলছিল, 'এ তুই কী করলি! এ তুই কী করলি! তোর নিজেরই এত টানাটানি...।'

সুখারাম উত্তরে নীচু হয়ে স্যারের পা জড়িয়ে ধরেছিল। ভাঙা গলায় বলেছিল, 'এ আমার গুরুদক্ষিণা, স্যার...গুরুদক্ষিণা...।'

বরাট স্যার ওকে একহাতে ধরে দাঁড় করিয়ে মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করি, সুখা। তুই আমার সেরা ছাত্র...।'

স্যারের পাঞ্জাবিতে মুখ গুঁজে সুখারাম বলেছিল, 'আমি শুধু ছুটতে চাই, স্যার। সারাজীবন ছুটতে চাই...।'

ওর মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে স্যার বলেছিলেন, 'শুধু ছুটবি না—আমি জানি তুই একদিন বড় কিছু একটা করে দেখাবি। অনেক বড় কিছু...।'

আজ হঠাৎ বরাট স্যারের কথাগুলো খুব বেশি করে মনে পড়ছে।

স্যার বলতেন, 'শোন, পিচের রাস্তা কিংবা সিমেন্ট বাঁধানো চাতালে কখনও দৌড়বি না। আর মাঠে যদি কোনও ঢাল টের পাস তো সেখানেও প্র্যাকটিস করবি না। সমান জায়গা চাই—সমান। আর শোন, ছোটার সময় পায়ের তলার মাটি স্প্রিং-এর কাজ করে। এই স্প্রিং অ্যাকশান সিমেন্টে কি অ্যাসফাল্টে পাবি না—।'

একদিন জুতোর ফিতে ঢিলে করে বাঁধা ছিল বলে ছুটতে-ছুটতে আচমকা ট্র্যাকে ছিটকে পড়েছিল সুখারাম। একইসঙ্গে সেই রেস থেকেও ছিটকে গিয়েছিল।

তাতে বরাট স্যার ব্যাপক রেগে গিয়েছিলেন। দু-চারটে অশ্লীল গালিগালাজও বয়স্ক লোকটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুখারামকে সেদিন স্যার মুখে তুলোধোনা করেছিলেন। কথার সঙ্গে-সঙ্গে সেদিন স্যারের মুখ থেকে থুতু ছিটকে বেরোচ্ছিল।

'আরে ছাগল, প্রিপ্যারেশানে ধেয়ান দে! তুই যখন ট্র্যাকে দৌড়স তখন কি আসলে তুই দৌড়স নাকি?'

সুখারাম প্রশ্নটার মানে বুঝতে না পেরে হাঁ করে স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

রাগে অগ্নিশর্মা মানুষটা তখন বলেছিল, 'শোন পাঁঠা, ট্র্যাকে যখন তুই দৌড়স তখন তুই না—আসলে তোর ভেতরে আমি দৌড়ই! আমি! আমি!'

এ-কথা বলতে-বলতে পাগলের মতো নিজের বুকে আঙুল ঠুকেছিল লোকটা।

'সুখা, তোকে নিয়ে আমার কত আশা! আর তোর এই ভুল! ছিঃ!' আপশোশে এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়েছিলেন বরাট স্যর ঃ 'মন দিয়ে প্র্যাকটিস কর্—মন দিয়ে। আমি শিয়োর, তুই একদিন বড় কিছু একটা করে দেখাবি... বড় কিছু...।'

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত 'বড় কিছু একটা' করে দেখিয়েছে সুখারাম। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একা পাঁচ-পাঁচটা ক্রিমিনালকে খতম করে দিয়েছে। আর সেই 'বড়' কাজটা করার সময় ওকে দৌড়তে হয়েছিল। এমন দৌড় ও লাইফে কখনও দৌড়য়নি।

এই সাংঘাতিক ঘটনাটার খবর পেয়ে বরাট স্যার থানায় ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এসে প্রিয় ছাত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন, বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

সেদিন স্যারের বুকে মুখ রেখে সুখারাম নস্কর হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। আর একইসঙ্গে ও স্যারের খদ্দরের পাঞ্জাবি থেকে ঘামের গন্ধ পেয়েছিল।

সেই গন্ধে এত আদর আর আন্তরিকতা মাখানো ছিল যে, সুখারামের মনে হয়েছিল এই গন্ধটা স্বর্গ থেকে ভেসে আসছে।

●

রবিবারের সেই মেঘলা বিকেলটা সুখারামের স্পষ্ট মনে আছে। যে-বিকেল থেকে ওর জীবনটা বাঁক নেওয়া শুরু করেছিল।

কাঠ-মিলের মাঠে ফুটবল ম্যাচ ছিল। সুখারামদের বস্তির সঙ্গে পোড়া বস্তির ছেলেদের।

কাঠ-মিলের মাঠটা মাপে বিশাল বড়। তার তিন দিক ঘিরে রয়েছে বড়-বড় স'মিল। তার মধ্যে গোটা ছয়েক চালু রয়েছে, আর বাকিগুলো গা-ছমছমে ভাঙাচোরা পোড়োবাড়ি। কাঠ-মিলগুলোর সামনে ছোট-বড় কাঠের গুঁড়ির স্তূপ। লম্বা করে শোয়ানো। একটার ওপরে একটা চাপিয়ে সার দিয়ে ছোট-ছোট পিরামিডের মতো সাজানো। ক'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে বলে গুঁড়িগুলো ভেজা, বাতাসে ভেজা কাঠের ভুসির গন্ধ। ছোটবেলায় সুখারাম যখন বন্ধুদের সঙ্গে মিলে ঝুলন সাজাত তখন এইসব মিল থেকে বিনাপয়সায় কাঠের ভুসি নিয়ে যেত।

কাঠ-মিলের মাঠের একদিকে ছাল-ওঠা এবড়োখেবড়ো পিচের রাস্তা। আর তারপরই নোংরা জলের সরু খাল।

খালের জল কালো, তেলচিটে—অনেকটাই কচুরিপানায় ঢাকা। খালের দু-পাড় থেকে কালো মাটি আর পাঁক ঢাল বেয়ে প্রায় মাঝখান পর্যন্ত চলে এসেছে। খালের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে প্রবল দুর্গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারে। তার একটা বড় কারণ, কুকুর-বেড়াল গোরু-ছাগল মারা গেলে তাদের ডেডবডি ফেলার জায়গাও এই খাল।

খালপাড় ধরে একটানা ঝুপড়ি। বর্ষার আক্রমণ ঠেকাতে নীল, সবুজ, কালো কিংবা লালরঙের পলিথিনের টুকরোয় ঢাকা।

মাঠের কাছ থেকে প্রায় কিলোমিটারখানেক দূরে পোড়া বস্তি। সুখারামের খুব ছোটবেলায় খালধারের ওই বস্তিটায় আগুন লেগে গিয়েছিল। তার পর থেকেই ওটার নাম হয়ে গেছে পোড়া বস্তি।

পোড়া বস্তির বেশিরভাগ ছেলেই চুরি, ডাকাতি আর ছিনতাইয়ের কাজে জড়িয়ে থাকে। তার সঙ্গে খুন-জখমের খেলাও আছে। ওদের মধ্যে ফেরোশাস্ যে দু-চারজন, তারা ধীরে-ধীরে 'ভাইয়া' বনে গেছে। ফলে তারা পয়সা করেছে। বস্তিতে থেকেও ঠাটবাট বজায় রাখতে পারে। মোটরবাইকে চেপে ঘুরে বেড়ায়।

সুখারামের সঙ্গে পোড়া বস্তির কারও কোনওরকম দোস্তি ছিল না। তবে

সুখারামদের বস্তির কয়েকজন ছেলের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিল। আর সেই যোগাযোগ থেকেই কীভাবে যেন ফুটবল ম্যাচটার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল।

সকাল থেকেই মেঘলা, আর আকাশ থেকে একঘেয়েভাবে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

বিকেল চারটের সময় দুটো দল দুটো ফুটবল নিয়ে কাঠ-মিলের মাঠে হাজির হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া মাঠে ছিল জনা তিরিশ কি চল্লিশজন দর্শক। কারও মাথায় ছাতা, কারও বা পলিথিন, আবার কারও মাথায় শুধুই ভেজা আকাশ। মাঠের পাশে রাখা ভেজা কাঠের গুঁড়ির গ্যালারিতে দর্শকরা যে-যার মতো বসে পড়েছিল। এ ছাড়া মাঠের গোলপোস্টের পিছনে দাঁড় করানো ছিল বেশ কয়েকটা সাইকেল, মোটরবাইক, আর সাইকেল ভ্যান। তার মধ্যে সুখারামের সাইকেল ভ্যানটাও ছিল।

খেলা শুরু হওয়ার দু-পাঁচ মিনিট পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। ফলে দর্শকের ভিড়টা আরও একটু বেড়ে গেল। হইচই চিৎকারের মধ্যে খেলা চলতে লাগল। মাঠ ভরতি জল-কাদায় বাইশজন প্লেয়ার আর একজন রেফারি বেদম ছুটোছুটি করতে লাগল।

প্লেয়ারদের কারও পায়ে কেড্স, কারও পায়ে সস্তার স্নিকার, আর বেশিরভাগেরই খালি পা।

সুখারামের দু-জোড়া রানিং শু। একজোড়া নতুন, একজোড়া পুরোনো। ও পুরোনো জুতোটা পরেই মাঠে নেমেছিল। এ ছাড়া পোশাক বলতে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি।

সুখারাম ফুটবল প্লেয়ার হিসেবে বিরাট কিছু নয়, তবে লং ডিসট্যান্স রানার হওয়ার সুবাদে ও অনায়াসে বলের পিছনে ছুটোছুটি করতে পারছিল। অন্যদের মতো সহজে হাঁপিয়ে পড়ছিল না।

খেলা যখন প্রায় শেষের দিকে তখনই গোলমালটা বাধল।

ম্যাচের রেজাল্ট তখন ফোর টু থ্রি। সুখারামদের টিম এক গোলে হারছিল।

সেই অবস্থায় হঠাৎই মিডফিল্ড থেকে সুখারাম পায়ে বল পেয়ে গেল এবং হরিণের মতো ছুটতে শুরু করল।

ছুটতে-ছুটতে ও ঢুকে গেল বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে। কিন্তু গোলে শট নেওয়ার মতো পজিশন তৈরি করার আগেই বিপক্ষের একজন ডিফেন্ডার পাশ থেকে ছুটে-এসে ওকে হাঁটুর নীচে লাথি মারল।

সুখারাম উলটে পড়ল এবং রেফারি বাঁশি বাজাল। পেনাল্টি।

ম্যাচ ড্র করতে পারার সুযোগ সামনে পেয়ে ওদের দলের সবাই 'পেনাল্টি! পেনাল্টি!' বলে চেঁচাতে লাগল। আর ওদের সাপোর্টাররা তার দশগুণ

চিৎকারে মেঘলা আকাশ ফাটাতে লাগল।

সুখারাম সেরকম কোনও চোট পায়নি। পড়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ও উঠে দাঁড়িয়েছিল। মাথাটা পলকের জন্য গরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজানোয় ও রাগটাকে সামলে নিয়েছিল। শুধু বেঁটে মোটা ডিফেন্ডারটার দিকে কটমট করে কয়েকবার তাকিয়েছিল।

রেফারির দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় বল বসিয়ে সুখারাম যখন পেনাল্টি শট নেওয়ার জন্য কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই সেই ডিফেন্ডার ছেলেটা ছুটে এসে এক লাথিতে বলটাকে উড়িয়ে দিল। তারপর সুখারামকে লক্ষ করে খিস্তির বন্যা ছুটিয়ে তেড়ে গেল ওর দিকে। জোড়া হাতের জোরালো ধাক্কায় ওকে ছিটকে ফেলে দিল।

ব্যস, শুরু হয়ে গেল প্রবল হট্টগোল আর হাতাহাতি। রেফারি গণ্ডগোল থামানোর চেষ্টায় ঘন-ঘন বাঁশি বাজাতে লাগল, কিন্তু কেউ তাতে কান দিচ্ছিল না।

একটু পরেই হাতাহাতিটা মারপিটে পৌঁছে গেল। তার সঙ্গে পরস্পরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে চোখ রাঙিয়ে গলাবাজি করে তর্কাতর্কি।

মাঠের ধার থেকে, কাঠের গুঁড়িব 'গ্যালারি' থেকে, দর্শকরা নেমে এল মাঠের মধ্যে। তারপর ব্যাপারটা 'দুই বস্তির মধ্যে সংঘর্ষ' গোছের চেহারা নিল।

সংঘর্ষের নিউক্লিয়াসটা মাঠের মধ্যে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে কী করে যেন মাঠের কিনারায় চলে এল।

বেঁটে ডিফেন্ডারটা বারবারই সুখারামের দিকে তেড়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু কয়েকজন ওর হাত-কোমর ইত্যাদি আঁকড়ে ধরে ওকে বশে রাখছিল। যেটা বশে রাখা যাচ্ছিল না, সেটা হল ওর মুখ থেকে ফোয়ারার তোড়ে বেরিয়ে আসা অশ্রাব্য খিস্তি।

সুখারাম হাত-পা নেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, তবে বড় কোনও গোলমালে জড়াতে চাইছিল না।

হঠাৎই বেঁটে ডিফেন্ডারটা বুনো মোষের শক্তি দিয়ে এক ঝটকায় সঙ্গীদের হাতের বাধন ছাড়িয়ে নিল। তারপর সুখারামের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখে একটার পর একটা ঘুসি বসাতে লাগল।

সুখারাম যতটা পারল সেগুলো এড়িয়ে গেল কিংবা মুখের সামনে হাতের ঢাল তৈরি করে আটকাল। তারপর অ্যাথলিটের ক্ষিপ্রতায় পাশে সরে গেল।

ঘুসিগুলো জুতসইভাবে প্রতিপক্ষের মুখে না লাগায় ডিফেন্ডার ছেলেটা খেপে গেল। ও ষাঁড়ের মতো একরোখাভাবে ছুটে গেল সুখারামের দিকে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, ছেলেটার মাথায় বোধহয় একজোড়া শিং রয়েছে। সেটা দিয়ে ও সুখারামকে গুঁতিয়ে খতম করতে চাইছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সুখারাম ছেলেটার আক্রমণ-রেখা থেকে ছিটকে সরে গেল।

তিরবেগে ছুটে যাওয়া ছেলেটার মাথা কাঠের গুঁড়িতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল। সংঘর্ষের শব্দটা এমন জোরালো শোনাল যে, সবাই চমকে উঠল।

ডিফেন্ডার ছেলেটা ক্যারমের ঘুঁটির মতো কাঠের গুঁড়িতে রিবাউন্ড করে মাঠে ছিটকে পড়ে গেল। তারপর আর একটুও নড়ল না।

এতক্ষণ ধরে যে-শোরগোলটা চলছিল সেটা হঠাৎই থেমে গেল।

দু-চারজন ছেলেটার ওপর ঝুঁকে পড়ে ওকে ডাকতে লাগল ঃ 'মদনোয়া! এ মদনোয়া! উঠ, সালে! উঠ জলদি...!'

কিন্তু মদন, অথবা মদনোয়া, সে-ডাকে সাড়া দিল না।

তখন দুজন ওর মাথার কাছে উবু হয়ে বসে পড়ল। ওর কাঁধ আর বুকে হাত রেখে ওকে ঠেলতে লাগল আর নাম ধরে ডাকতে লাগল।

কিন্তু মদনোয়া নড়ল না।

দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন বয়স্ক লোক সামনে এগিয়ে এল। মিশকালো রং, গায়ে ময়লা প্যান্ট-শার্ট। গালে দু-চারদিনের না-কামানো সাদা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

মদনোয়াকে ঘিরে থাকা ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়ল লোকটা। মদনোয়ার মাথার কাছে বসে ওর কানের তিন আঙুল নীচে হাত রেখে কী যেন অনুভব করতে চাইল।

তারপর ওর নাকের খুব কাছে হাতের পিঠ রেখে বুঝতে চাইল নিশ্বাস পড়ছে কি না।

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল লোকটা। তারপর শেষতম পরীক্ষার জন্য উপুড় হয়ে মাথা পেতে দিল মদনোয়ার বুকে।

নাঃ, হৃৎপিণ্ডের কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সব চুপচাপ।

বৃদ্ধ লোকটা মাথা তুলে চোখ বড়-বড় করে তাকাল চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে। ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল, 'আরে, ইয়ে সালা তো মর গয়া!'

কথাটা শোনামাত্রই কোন এক আশ্চর্য ম্যাজিকে জমে থাকা ভিড়টা পাতলা হতে শুরু করল। তিন-চারটে ছেলে মদনোয়ার ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওর শরীরটাকে পাগলের মতো ঝাঁকাতে শুরু করল, আর গলা ফাটিয়ে ওর নাম ধরে ডাকতে লাগল।

সুখারাম একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না এখন কী করবে। তাই এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল।

ওর বস্তির দু-চারজন ছেলে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। একজন বলল,

'সালা কেলো হয়ে গেল। মদনোয়ার দাদা বদনোয়া পোড়া বস্তির ভাইয়া। ও সালা বহুত খতরনাক তোলাছপ্পন মাল। এ কেস তো সহজে সালটাবে না...।'

আর-একজন বলল, 'সুখা, তুই হাপিস হয়ে যা। নইলে বদনোয়া তোকে পালিশ দিয়ে গিলে করে দেবে।'

সুখারাম অবাক হয়ে বলল, 'কেন, আমি কী করেছি? কেসটা তো পাতি অ্যাক্সিডেন্ট! মদনোয়ার বুকে সালা খিঁচ ছিল—তাই টপকে গেছে...।'

'সে তো অ্যাক্সিডেন্ট আমরা সবাই জানি। কিন্তু বদনোয়ার গ্যাং সেটা মানবে না। সালারা বদলা নিতে আসবে—।'

কয়েকটা মোটরবাইক স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শোনা গেল। সুখারাম শব্দের উৎসের দিকে চোখ ফেরাল। গোল পোস্টের পিছনে দাঁড় করিয়ে রাখা তিনটে মোটরবাইক ততক্ষণে স্টার্ট নিয়ে খালপাড়ের রাস্তায় পৌঁছে গেছে। ফটফট আওয়াজ তুলে বাইকগুলো পোড়া বস্তির দিকে ছুটে গেল। বোধহয় বদনোয়াকে খবর দিতে।

সুখারামকে ওর সঙ্গীরা নানান পরামর্শ দিতে লাগল। তার মধ্যে সংখ্যার হিসেবে সবচেয়ে বেশি যে-পরামর্শটা পাওয়া গেল সেটা হল, কোথাও পালিয়ে গিয়ে কয়েকদিন লুকিয়ে থাকা।

বিধবা মা আর বোনের কথা মনে পড়ল সুখারামের। ওদের ছেড়ে ও কোথায় যাবে? ওর তো যাওয়ার আর কোনও জায়গা নেই! এমন কোনও আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নেই যাদের কাছে গিয়ে এক-দু-সপ্তাহ গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যায়।

তা হলে কোথায় পালাবে সুখারাম?

গিন্টি নামে একজন বন্ধুর কাছে মোবাইল ফোনটা জমা রেখে ও ম্যাচ খেলতে নেমেছিল। গিন্টি বস্তিতে ওর পাশেই থাকে। ও গিন্টিকে ডেকে ফোনটা চেয়ে নিল। তারপর বাড়িতে একটা ফোন করল।

মা ফোন ধরল।

'মা, সুখা, বলছি।'

'বল—।'

'ফুটবল ম্যাচে একটা কেস হয়ে গেছে—।'

'কী হয়েছে?' মায়ের গলায় উদ্বেগ।

সুখারাম সব বলল।

বদনোয়া আর তার গ্যাঙের কথা শুনে মা একটু ভয় পেয়ে গেল।

'এখন কী করবি?'

'ক'টা দিন একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। গিন্টিরা সব তাই বলছে...।'

'সে কী রে!' মায়ের গলায় কান্না এসে গেল।

'হ্যাঁ। আমি এক্ষুনি বাড়ি যাচ্ছি। টুকটাক ক'টা জিনিস গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়ব। তুই একদম চিন্তা করিস না, মা। সব সালটে যাবে—।'

ফোন কেটে দিয়ে সাইকেল ভ্যানের দিকে ছুটল সুখারাম। তারপর মজবুত পায়ে প্যাডেল করে সোজা বাড়ির দিকে।

মাঠে তখনও বেশ কিছু লোকের ভিড় ছিল। সুখারাম জানে, ভাইয়ের অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে একটু পরেই বদনোয়া আসবে, তারপর হয়তো পুলিশ। কিন্তু ওল্ড সিটিতে পুলিশের যা অবস্থা তাতে ওদের শুধু গায়ের পোশাক আর তক্‌মাটুকুই আছে—বাকি সব গেছে।

বদনোয়াকে ওর বস্তির ছেলেরা নানারকম রং চড়ানো গল্প শোনাবে, ওকে ওসকাবে। তারপর ক্ষিপ্ত বদনোয়া সুখারামের পিছনে ছুটবে। তখন ওকে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হবে। যেমন করে হোক প্রাণে বাঁচতে হবে। কারণ, সুখারাম প্রাণে না বাঁচলে ওর মা আর বোন বাঁচবে কেমন করে! সুখা বিনা ওরা ভুখা মরে যাবে।

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্যাডেল করছিল সুখারাম। ওর মনে হচ্ছিল যেন ও কোনও রেসিং ট্র্যাকে ছুটছে। তখনই ওর বরাট স্যারের কথা মনে পড়ল। কাল ভোরবেলা ও প্র্যাকটিসে যেতে পারবে না ভেবে খারাপ লাগল। ক'টা ভোরবেলা এখন নষ্ট হবে কে জানে!

সন্ধের অন্ধকার নেমে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। সাইকেল ভ্যান নিয়ে সুখা ওর বস্তিতে ঢুকে পড়ল।

নোংরা কাদা প্যাচপেচে রাস্তা, টিমটিমে আলো, দুপাশে আবর্জনার স্তূপ। দম আটকানো বাতাসে উৎকট দুর্গন্ধ। কিন্তু এসবই সুখারামের গা সওয়া। ওকে মোটেই নাক টিপে ধরতে হয় না। বরং এই দুর্গন্ধটা ওর অস্তিত্বের এক ধরনের পরিচয়পত্র। এই বিশেষ গন্ধটা নাকে এলেই ওর মনে হয় ও বাড়ি ফিরেছে। মা আর বোনের কাছে ফিরেছে।

সাইকেল ভ্যানটা ওদের ঝুপড়ির সামনে দাঁড় করাল। মশার ঝাঁক ওকে ঘিরে ধরে পিনপিন শব্দে উড়তে লাগল।

দরজায় ধাক্কা দিতেই সুখারামের বোন চোলি দরজা খুলল। ওর পিছনে হ্যারিকেনের আলো থাকায় ওর মুখটা অন্ধকার দেখাচ্ছিল। কিন্তু সুখারাম জানে চোলিকে সুন্দর দেখতে, আর সেজন্য ওদের অনেক বাজে উৎপাত সহ্য করতে হয়।

সুখারাম ঘরে ঢুকতেই চোলি দরজাটা চটপট আবার বন্ধ করে দিল। তারপর চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, দাদাভাই?'

মা ঝুপড়ি-ঘরের এক কোণে বসে ছিল। ঘরের মেঝেতে পলিথিনের চাদর পাতা, তার ওপরে চাটাই আর পুরোনো পিচবোর্ড। এক পাশে তেলচিটে বিছানা।

মা আর চোলি ওই বিছানায় শোয়।

বিছানাটার পাশেই দরমার 'পাঁচিল'। সেই পাঁচিলের ওপারে সুখারামের বিছানা পাতা।

সুখারাম মায়ের পাশে গিয়ে পলিথিনের ওপরে বসে পড়ল। চোলিও ওর কাছ ঘেঁষে উবু হয়ে বসল।

সুখারাম মাঠের কাহিনি সংক্ষেপে আবার বলল।

বদনোয়ার নাম শুনে মা ডুকরে উঠল। চোলি কাঁদতে শুরু করল।

চোলির দিকে তাকিয়ে সুখারামের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

হলদে রঙের একটা সালোয়ার কামিজ পরে আছে। সেটা ময়লা হলেও ওকে বেশ মানিয়েছে। পোশাকটায় কোথাও না কোথাও ছেঁড়া-ফাটা নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটা দেখা যাচ্ছে না।

চোলির বয়েস উনিশ-কুড়ি। মাজা রং। ওকে দেখে মোটেই ঝুপড়িবাসী বলে মনে হয় না। বরং ঠিকঠাক পোশাক পরলে ওর সঙ্গে সুখারামদের দূরত্বটা অনেক বেড়ে যাবে।

চোলির জন্য মাঝে-মাঝে দুঃখ হয় ওর। কেন যে এই সুন্দরী মেয়েটা এই বস্তিতে জন্মাতে গেল! ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। মা আর সুখারাম ওর বিয়ের জন্য চেষ্টা করছে, খোঁজখবর করছে—কিন্তু এখনও যোগাযোগ করে উঠতে পারেনি।

সুখারাম ঠিক করেছে, ঝুপড়ির কোনও ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেবে না। তার জন্য যত কষ্ট করতে হয় হোক।

এখনও পর্যন্ত যে চোলির কোনও সম্বন্ধ ঠিক করা যায়নি তার একটা তুচ্ছ কারণ আছে ঃ চোলির বাঁ-পাটা লম্বায় সামান্য খাটো—তাই ও একটু খুঁড়িয়ে চলে।

কিন্তু ওকে যে এত সুন্দর দেখতে, সেটা কিছু নয়!

চোলি আর মা-কে ক'দিন ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে সুখারামের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

ও বোনের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মোবাইল ফোনটা ঠিকমতো চার্জ দিয়ে রাখিস, মা। আমি খুব ভোরবেলা আর রাত বারোটার পর ফোন করব...।'

বস্তির ঘরে-ঘরে বিদ্যুৎ না পৌঁছোলেও বস্তির ল্যাম্পপোস্টের গোড়ায় মোবাইল ফোন চার্জ করার সকেট লাগানো আছে।

চোলি আর মা-ও এবার উঠে পড়ল। সুখারামের দরকারি জিনিসগুলো ভরে দিল একটা নাইলনের থলেতে। বিছানার নীচ থেকে কিছু টাকা বের করে মা ছেলের হাতে দিল। তারপর কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'ঠিকমতো

খাওয়াদাওয়া করিস, সুখা...।'

'তুই কোনও চিন্তা করিস না। ক'টা দিনের তো ব্যাপার। সব্বাই দেখেছে ওটা অ্যাক্সিডেন্ট—আমি কিচ্ছু করিনি...।'

হঠাৎ করে সুখারামের কী মনে হল, ও ঝুঁকে পড়ে চট করে মা-কে প্রণাম করল। তারপর চোলির মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল, 'বরাট স্যারকে আমি ফোন করে দেব যে, ক'দিন প্র্যাকটিসে যাব না। নইলে স্যার চিন্তা করবে...বাড়িতে খোঁজ নিতে চলে আসবে।' থলেটা হাতে তুলে নিল ঃ 'তোরা সাবধানে থাকিস। কোনও প্রবলেম হলে আমাকে ফোন করবি। আমি গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি...।'

চোলি কাঁদছিল। কাঁদতে-কাঁদতেই জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'জানি না। জানলেও বলতাম না। বদনোয়ার গ্যাং বাড়িতে এসে হামলা করতে পারে। তখন আমার ঠেক জানার জন্যে তোদের জ্বালিয়ে খাবে—টরচার করবে।'

না, মা আর বোনকে সুখরাম ওর ভাবী আস্তানার কথা জানায়নি। যদিও ও মনে-মনে ওর লুকোনোর জায়গাটা ঠিক করে ফেলেছিল।

চোখে জল নিয়ে চোলি আর মা দরজার কাছে এল। অন্ধকারের মধ্যে সুখারামের ছায়া সাইকেল ভ্যানে উঠল। তারপর গাড়িটা চলতে শুরু করল।

এবড়োখেবড়ো পথে নেমে এসে সুখারাম ভাবল, এখন ওর আর মায়ের দুটো মোবাইল ফোনই সমস্ত ভরসা। সস্তায় কেনা এই সেকেন্ড হ্যান্ড কি থার্ড হ্যান্ড মোবাইল সেটগুলো ঠিকঠাক কাজ করলে হয়!

ঘোরালো নির্জন পথ ধরে সাইকেল ভ্যানটা ছুটে যাচ্ছিল। এই রাস্তাগুলো দিনের বেলাতেও কেউ ব্যবহার করে না। নেহাত রাস্তাগুলোর পালানোর উপায় নেই তাই ওরা চুপচাপ এখানে পড়ে আছে। নইলে ওরাও এই নির্জনতা ছেড়ে পালাত।

রাস্তার পাশে কখনও-সখনও ল্যাম্পপোস্ট চোখে পড়ছে এবং তার দু-একটায় মলিন বাল্‌ব জ্বলছে। ভাঙাচোরা রাস্তার এখানে-সেখানে বৃষ্টির জল জমে আছে।

সুখারাম জোরে-জোরে প্যাডেল ঘোরাচ্ছিল আর ভাবছিল বরাট স্যারের কথা। ওর কাফ মাসল এখন প্রতি মুহূর্তেই শক্তিশালী হচ্ছে। ক'দিন প্র্যাকটিসে না যেতে পারার খামতিটা ওকে মাঝরাত্তিরে ভ্যান চালিয়েই পুষিয়ে নিতে হবে।

সুখরাম লুকিয়ে থাকার যে-জায়গাটা পছন্দ করেছে সেটা কাঠ-মিলের মাঠের পাশেই। যে-মিলগুলো বহু বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে তারই একটা ভাঙাচোরা গা-ছমছমে মডেল বেছে নিয়ে সুখারাম তার অন্দরমহলে

আস্তানা গাড়বে। বদনোয়া বা ওর গ্যাং ভাবতেই পারবে না সুখারাম নস্কর অকুস্থলের এত কাছাকাছি গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

না, এখন সুখারাম ওখানে যাচ্ছে না। কারণ, এখনও হয়তো মাঠে মদনোয়ার ডেডবডি পড়ে রয়েছে। এখনও হয়তো মাঠে গজল্লা চলছে।

তাই এখন ও সাইকেল ভ্যান নিয়ে খানাখন্দে ভরা অন্ধকার নির্জন রাস্তাগুলোয় ঘুরে বেড়াবে। কিংবা কোথাও গাড়ি লাগিয়ে বিশ্রাম নেবে। তারপর রাত অনেক গাঢ় হলে কোনও সস্তার হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে ওর নতুন আস্তানায় গিয়ে ঢুকবে।

অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি চালানোর পর একটা লোহালক্কড়ের স্তূপ দেখতে পেল সুখারাম। তার পাশে একটুকরো ফাঁকা জায়গা। কী ভেবে সেখানে একটু আড়াল করে গাড়িটা লাগাল। তারপর গাড়িতেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল, থলেটা মাথার নীচে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

মেঘ সরে গিয়ে তারা ফুটেছে। কালো আকাশে সোনার কুচি জ্বলছে। ওদের দিকে তাকিয়ে মনে যে-আনন্দ পাওয়া যায় সেটা সবার জন্য—সেখানে গরিব-বড়লোক কোনও ভাগাভাগি নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝে ওর মনে হয়, ইস, ওরা যদি অল্প-অল্প বড়লোক হত তা হলে খুব ভালো হত। বেশ কিছুটা বরপণ দিয়ে চোলিটার বিয়ে দেওয়া যেত। তখন মায়ের দুশ্চিন্তা কমে যেত। সুখারামেরও।

হঠাৎই মোবাইল ফোন বেজে উঠল। চমকে উঠল সুখারাম।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল। থলের ভেতরে হাতড়ে মোবাইল ফোনটা বের করে নম্বরটা দেখল।

মা ফোন করেছে।

'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপে 'হ্যালো' বলতেই চোলির গলা শুনতে পেল।

'দাদাভাই!'

'হ্যাঁ—বল।' চাপা গলায় বলল সুখারাম।

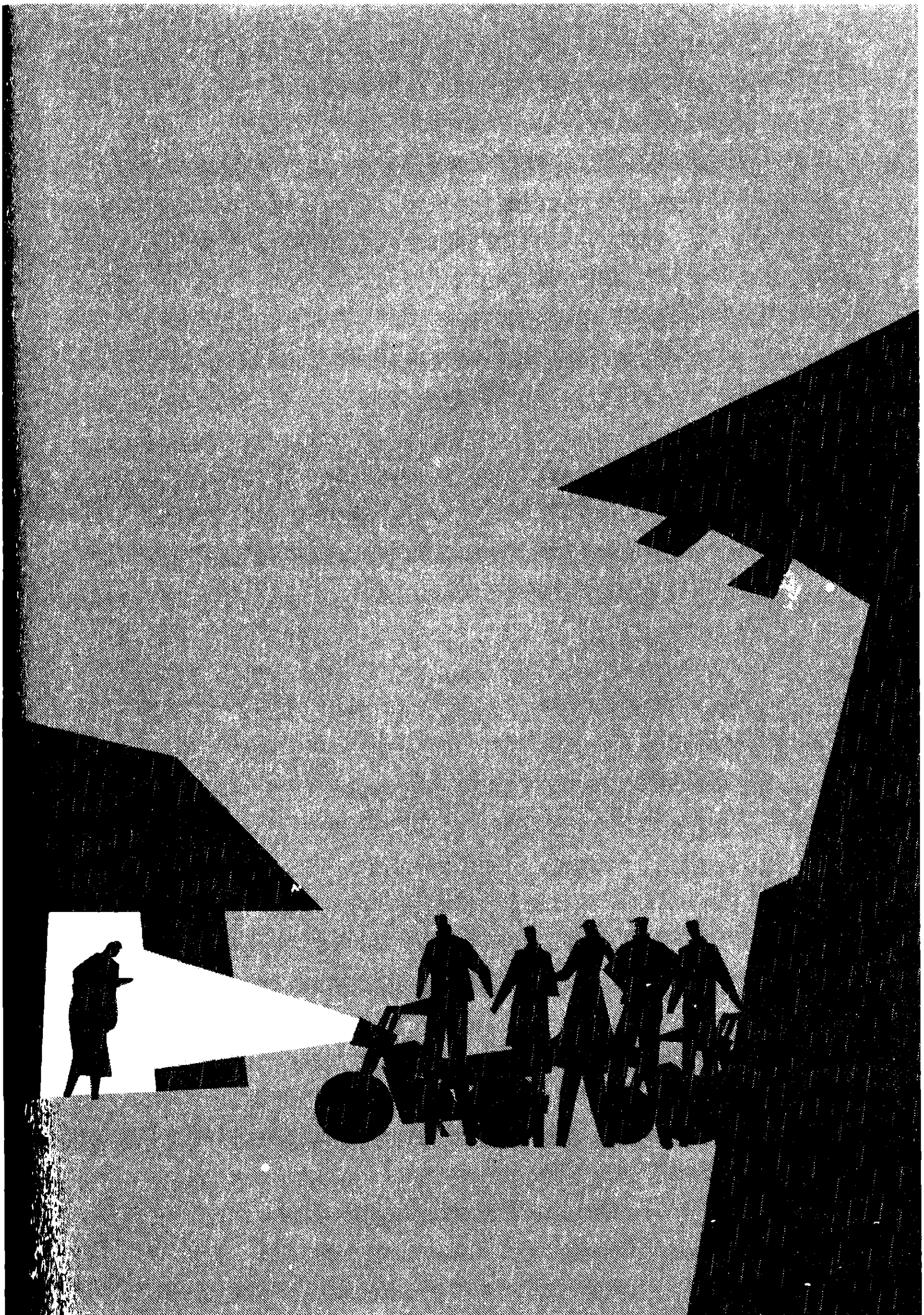
'তুই ঠিক আছিস তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি। কিন্তু ফর নাথিং আমাকে ফোন করিস না। বিপদ হবে—।'

'মা ফোন করতে বলল। বলতে ভুলে গেছি...থলের মধ্যে ছ'টা রুটি, একটু আলুভাজা আর চিনি আছে—খেয়ে নিস। তার সঙ্গে দুটো জলের বোতলও আমি দিয়ে দিয়েছি...।'

অবাক হয়ে গেল সুখারাম। চোখে জল এসে গেল। এত তাড়াহুড়ো আর টেনশানের মধ্যেও মা ওর রাতের খাবারটা গুছিয়ে দিতে ভোলেনি!

হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। চোলিকে বলল, 'হ্যাঁ, খেয়ে নেব। তোরা



চিন্তা করিস না...।'

'তুই সাবধানে থাকিস, দাদাভাই...।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল চোলি। তারপর কান্না-কান্না গলায় বলল, 'যেখানেই থাকিস না কেন...।'

'তোরাও সাবধানে থাকিস। রাখছি—।'

ফোন কেটে দিল সুখারাম।

আর ঠিক তখনই দূরে তিনটে হেডলাইটের আলো দেখতে পেল। সঙ্গে সাইলেন্সারের ফটফট শব্দ শোনা গেল।

এবড়োখেবড়ো রাস্তায় লাফাতে-লাফাতে তিনটে মোটরবাইক এগিয়ে আসছে। রাস্তার নানান গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির জলে হেডলাইটগুলোর ছায়া থেকে-থেকেই ঝলসে উঠছে। তিনটে আলো সংখ্যায় চারটে, পাঁচটা কিংবা ছ'টা হয়ে যাচ্ছে।

সুখারাম নস্করের বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

বদনোয়ার দল নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে, সুখারাম ওর ঝুপড়িতে নেই। তাই ওরা মোটরবাইকে করে সব রাস্তায় টহল দিতে বেরিয়েছে। খ্যাপা নেকড়ের মতো সুখারামকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ভয়ে সুখারামের মুখ শুকিয়ে গেল। ভীষণ জল তেষ্টা পেল ওর। ঝটপট সাইকেল ভ্যান থেকে নেমে লোহালক্কড়ের স্তূপের আড়ালে চলে গেল। বোতাম টিপে মোবাইল ফোনটা সুইচ অফ করে দিল। নইলে ফোনটা আচমকা বেজে উঠলেই সর্বনাশ।

জং ধরা লোহালক্কড়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল সুখারাম।

মোটরবাইকের আলোগুলো নাচতে-নাচতে ওর দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছিল।

●

সুখারাম ভয় পেল। না, শুধু এভাবে লুকিয়ে থাকলে চলবে না,—আরও কিছু করতে হবে। কারণ, ওর পায়ে রানিং শু, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, আর হাফপ্যান্ট। এগুলো ওর মাঠের পোশাক। এগুলো দেখলেই ওরা চিনে ফেলতে পারে।

সঙ্গে-সঙ্গে মোবাইল ফোনটা লোহালক্কড়ের খাঁজে গুঁজে দিল সুখা।

চটপট পায়ের জুতো খুলে ফেলল। জুতো জোড়া ছুড়ে দিল গাঢ় অন্ধকারের দিকে। একটানে খুলে ফেলল স্যান্ডো গেঞ্জি। ওটা তালগোল পাকিয়ে রাস্তার গর্তে জমে থাকা জলে ডুবিয়ে দিল। তারপর হাফপ্যান্টটার বোতাম খুলে

কোমরের খানিকটা নীচে টেনে নামিয়ে দিল। এবং উপুড় হয়ে শুয়ে পড়াল নোংরা রাস্তায়। ঠিক যেন চালচুলোহীন কোনও ভবঘুরে পথে মদ-টদ খেয়ে পড়ে আছে।

সুখারাম মনে-মনে ভগবানকে ডাকছিল। মোটরবাইকে ছুটে আসা শয়তানগুলো যেন ওকে দেখতে না পায়। ওর বস্তির ঘরে এককোণে ছোট্ট ঠাকুরের আসন রয়েছে। সেখানে মা কালীর ফটো রয়েছে। মা সকাল-সন্ধে ধূপকাঠি জ্বেলে নকুলদানা আর জল দিয়ে ঠাকুরের পুজো করে। এখন দু-চোখ বুজে সেই ফটোটাকেই দেখতে চাইছিল ও। আর আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিলও। ওই তো মা কালী—নৃমুণ্ডমালিনী!

বাইকগুলো ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ও আড়চোখে দেখল, দুটো বাইকে পাঁচজন ছেলে বসে আছে। তার মধ্যে প্রথম বাইকটায় বসে আছে বদনোয়া। একা।

আবছা আলোতেও ওর মুখটা সুখারাম চিনতে পারল।

ভারী চেহারা। খানিকটা ভুঁড়ি রয়েছে। গালে চাপদাড়ি, মোটা গোঁফ। মাথার লম্বা চুল ব্যাকব্রাশ করা। ডানহাতে চকচকে সোনার বালা।

যেতে-যেতে একেবারে পিছনের বাইকটা হঠাৎই একটা গর্তে পড়ে টাল খেয়ে গেল। বাইকের আরোহী দুজন তাড়াতাড়ি রাস্তায় পা ফেলে পুরোপুরি পড়ে যাওয়াটা সামলে নিল। আচমকা এই দুর্ঘটনায় ওদের মধ্যে একজন গালাগাল দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সেটা কানে যাওয়াতে সামনের বাইক দুটো থেমে গেল। পিছনের বাইকটা তখন সুখারামের খুব কাছাকাছি।

পিছনে তাকিয়ে একজন বলল, 'দেখে চালা। রাস্তা তো নয় সালা—যেন গুটি বসন্তের ছল্লা লেগেছে—।'

কাত হয়ে যাওয়া বাইকটার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা স্টার্ট দিয়ে আরোহী একদলা পিক ফেলল রাস্তায়। চেঁচিয়ে বোধহয় বদনোয়াকে উদ্দেশ করে বলল, 'বস, সুখারাম হারামির বাচ্চাটা কোথায় সেঁধিয়ে গেল বলো তো! ব্যাটা একেবারে লাপাতা হয়ে গেল দেখছি...।'

সামনের বাইক থেকে বদনোয়া হিংস্র গলায় বলল, 'লাপাতা হোকে জায়েগা কাঁহা! পাতালে গিয়ে ঢুকলেও শুয়োরের বাচ্চার চুলের গোছা ধরে টেনে তুলে আনব। মদনোয়ার দাম সুদে-আসলে চুকতা করব।'

ওদের বাইকের কাছ থেকে ছ'-সাত ফুট দূরে অন্ধকারে পড়ে থাকা সুখারামের বুক ঢিপঢিপ করছিল। মায়ের জন্য, চোলির জন্য ওর বুক কেঁপে উঠল।

ঠিক তখনই ওদের একজন হেসে বলল, 'সুখারাম পালালে কী হবে? ওর ঘর-বাড়ি তো আর জায়গা ছেড়ে পালাতে পারবে না! ওর মা আর ফুলটুসি

বোনটাই বা কোথায় পালাবে?'

কথাটা শুনে সুখারামের শীত-শীত করে উঠল। ওর মনে হল, ও বিশাল এক বরফের স্ল্যাবের ওপরে শুয়ে আছে।

বাইক তিনটে আবার চলতে শুরু করল। শেষের বাইকটার চাকা আবার জল জমা গর্তে পড়তেই কাদাজল ছিটকে এল সুখার গায়ে। ওর মনের ভেতরে তখন স্টিম রোলার চলছিল।

বাইকগুলো চলে যেতেই মা কালীকে ডাকাডাকি করা থামিয়ে উঠে বসল। এখন ও কী করবে? কী করা উচিত?

মা আর চোলির কথা ভেবে ওর ভয় করতে লাগল। ওর ভেতরে এক অদ্ভুত টানাপোড়েন শুরু হল। ওর ভেতরে একটা সুখারাম বলতে লাগল, ওর এখন অন্ধকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা উচিত। কিন্তু একইসঙ্গে আর-একটা সুখারাম বলতে লাগল, ওর এখন বাড়ি যাওয়া উচিত—মা আর চোলির ওকে ভীষণ দরকার।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝিকিয়ে উঠল। তারপরই মেঘের বাঘের ডাক।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সুখা। হে মা কালী, আমাকে বলে দাও আমি এখন কী করব। আমি কি মায়ের কাছে যাব?

অমনই আকাশ থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে-সঙ্গে সুখারাম নস্করের মনে হল, এক মা ওকে বলছে আর-এক মায়ের কাছে যেতে। এই বৃষ্টি তারই সংকেত।

উঠে দাঁড়াল সুখা। প্যান্টটা ঠিকঠাক করে পরে নিল। সারা গায়ে কাদাজল লেপটে আছে। বৃষ্টি ওর গা ধুয়ে দিচ্ছে। সেই অবস্থাতেই ও এগিয়ে গেল অন্ধকারের দিকে। উবু হয়ে বসে ওর রানিং শু খুঁজতে লাগল।

একটু পরেই সেগুলো হাতে ঠেকল। রাস্তায় লেপটে বসে জুতো জোড়া তাড়াতাড়ি পরে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। মোবাইল ফোন। সাইকেল ভ্যান। ছুট, ছুট, ছুট।

ভ্যান চালাতে-চালাতেই মা-কে ফোন করল।

ফোন ধরল চোলি।

'দাদাভাই! বল....।'

'শিগগির মা-কে ফোন দে।'

চোলি ঘাবড়ে গেল। কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলে, 'কেন রে?'

'ওঃ, শিগগির মা-কে দে—।'

এক সেকেন্ড পরেই মায়ের গলা পাওয়া গেল।

'কী হয়েছে, সুখা?'

'মা, তুই আর চোলি এক্ষুনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যা—।'

'সে কী! কেন?'

'মা, বদনোয়ার গ্যাং আমাকে পাগলের মতো খুঁজছে। আমাকে হাতে না পেয়ে ওরা ঘরে গিয়ে তোদের অ্যাটাক করার কথা ভাবছে— তোকে আর চোলিকে। আমি নিজের কানে শুনেছি...।'

'কিন্তু এখন আমরা কোথায় পালাব? পালিয়ে কোথায় যাব?' হতভম্ব গলায় মা বলল।

'যেখানে হোক যা—' অধৈর্য গলায় বলল সুখারাম, 'গিন্টিদের ঘরে কি আর কারও ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাক। আমি ভ্যান নিয়ে এখুনি আসছি...।'

ফোনের লাইন কেটে দিল। পাগলের মতো সাইকেল ভ্যানের প্যাডেল ঘোরাতে লাগল। বৃষ্টি, খানা-খন্দ—কিছুই ও টের পাচ্ছিল না।

মনে পড়ল, কয়েক ঘণ্টা আগে চোলি ওকে কাঁদতে-কাঁদতে জিগ্যেস করেছিল, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

উত্তরে সুখা বলেছিল, 'জানি না। জানলেও বলতাম না। বদনোয়ার গ্যাং...।'

তখন ও একরকম টরচারের কথা ভেবেছিল—আর এখন অন্যরকম।

সাইকেল ভ্যানটা বস্তির কাছাকাছি চলে এসেছিল। এখানটায় রাবিশের চাপান দেওয়া কাঁচা রাস্তা। তার একপাশে সরু নালা মতন। নালার ঢাল বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে নামছে।

একপাশে দুটো ভাঙাচোরা ঘর চোখে পড়ল। যারা থাকত তারা মাসকয়েক আগে আস্তানা ছেড়ে চলে গেছে। তাদের ফেলে যাওয়া ঘরের বাঁশ, চাটাই, ছেঁড়া পলিথিন—যে যা পেরেছে হাতিয়ে নিয়েছে। এখন ঘর দুটো যে-অবস্থায় পড়ে আছে তাকে ঘরের 'কঙ্কাল' বললেও অনেকটা বাড়িয়ে বলা হয়। সুখারাম ওর সাইকেল ভ্যনটা সেই দুটো ঘরের একটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে খুব সাবধানে ওর ঘরের দিকে পা বাড়াল।

বস্তির গলিপথে অন্য অনেক কিছুর মতোই আলোরও অভাব। তাই বৃষ্টি যে পড়ছে সেটা দেখা যাচ্ছিল না, তবে বস্তির ঘরগুলোর চাল থেকে হালকা শব্দ উঠছিল, আর গায়েও টের পাওয়া যাচ্ছিল।

ধীরে-ধীরে এগোতে-এগোতে সুখারাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। না, তখনও ও কিছু দেখতে পায়নি—কিন্তু শুনতে পেয়েছে।

কারা যেন চিৎকার করছে। এবং সে-চিৎকারের যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তার বেশিরভাগটাই নোংরা গালিগালাজ।

ব্যাপারটা যে কী হচ্ছে সেটা আঁচ করতে পারল। তাই একটু তাড়াতাড়ি পা চালাল।

ওদের ঘরে পৌঁছনোর বাঁকটার মুখে একটা ফুটপাঁচেক চওড়া খাঁজ আছে।

সেখানে ভাঙাচোরা ইটের টুকরো আর নানান আবর্জনা। তার একপাশে সাইকেল আর সাইকেল ভ্যানের বাতিল টায়ার-টিউব, সিট কভার ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। সুখা জানে, ওজনদরে বিক্রি হয় এমন কোনও মেটাল পার্ট্‌স সেখানে নেই। শীতের সময় ওইসব টায়ার-টিউব টেনে নিয়ে বস্তির লোকরা ধুনি জ্বালিয়ে শীত তাড়ায়।

ওই খাঁজটাকে বস্তির সবাই বারোয়ারি বাথরুম হিসেবেও ব্যবহার করে। ফলে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নাকে হাত চাপা দেওয়াটা নেহাতই প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলা যেতে পারে।

তাই সুখারামও রোজকার অভ্যাসমতো বাঁকটা ঘোরার সময় নাকে-মুখে হাত চাপা দিয়েছিল।

ভাগ্যিস দিয়েছিল, নইলে বাঁক ঘুরেই যে-দৃশ্য ওর চোখে পড়ল তাতে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা জান্তব চিৎকারটা বদনোয়ার গ্যাং-এর কেউ না কেউ হয়তো শুনে ফেলত। কিন্তু নাক-মুখ হাতে ঢাকা থাকায় ওর চিৎকারটা ডুকরে ওঠা চাপা কান্নার মতো শোনাল। সুখরাম চট করে দুর্গন্ধময় খাঁজটায় ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে উঁকি মেরে ওর ঘরের সামনের দৃশ্যটা দেখতে লাগল। ওর মনে হচ্ছিল, ও যা দেখছে সেটা বাস্তব নয়—কোনও সিনেমার দৃশ্য। কিন্তু সেই সিনেমা দেখতে দেখতে ওর বুকটা নিংড়ানো ভেজা গামছার মতো বারবার মুচড়ে উঠছিল। দম আটকে আসছিল। রাগ আর কান্না বুকের ভেতরে দাপাদাপি করছিল।

মা আর চোলি তা হলে পালাতে পারেনি!

সুখারামদের ঘরের সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কয়েকটা বাঁশের খুঁটি পুঁতে নাইলনের দড়ি টাঙানো। বস্তির কয়েকঘর মানুষ ওই দড়িতে জামাকাপড় শুকোতে দেয়।

সেই জায়গাটায় বদনোয়াদের তিনটে মোটরবাইক দাঁড়িয়ে আছে। সুখারামদের ঘরের দরজা তাক করে তিনটে বাইকের হেডলাইট জ্বালানো। ফলে জায়গাটায় বেশ আলো ছড়িয়ে আছে। বাইকগুলোর দুপাশে একরকম সার বেঁধে বদনোয়ারা পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে। আলোর আওতার বাইরে থাকায় সুখারাম ওদের সিলুয়েট ছায়া দেখতে পাচ্ছিল। আর হেডলাইটের আলোয় আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ওর স্পষ্ট নজরে পড়ছিল।

আরও নজরে পড়েছিল যে, ওদের ঘরের দরজাটা বন্ধ এবং সেই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুখারামের মা কান্না ভাঙা গলায় হাহাকার তুলে চিৎকার করছে।

মায়ের ওই ছোটখাটো রোগা শরীরে এত তীব্র চিৎকারের তেজ জমা থাকতে পারে তা সুখারাম স্বপ্নেও ভাবেনি। মা চিৎকার করছিল, কাঁদছিল,

বদনোয়ার দলকে গালাগালিও দিচ্ছিল।

'দূর হ, হারামজাদার দল! সুখা কাউকে কিচ্ছু করেনি। ও খুব নেক আর সাচ্চা মানুষ। মদনোয়া অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। যা এখান থেকে। দূর হ! দরকার হয় থানায় যা! বলছি না, সুখা বাড়িতে নেই! ও কোনও মার্ডার করেনি। তোরা মার্ডারার—তোরা! যত্তসব ক্রিমিনালের হাড্ডি।'

মা চিৎকার করছিল। কিন্তু মায়ের চিৎকার ছাপিয়ে ওই পাঁচটা শয়তানের অন্তত দুজন তোড়ে খিস্তির ফোয়ারা ছোটাচ্ছিল। সেই গালিগালাজের মধ্যে সুখার মা-বাবা-ভাই-বোন কেউই রেহাই পাচ্ছিল না। ওর কোনও ভাই নেই। বাবা মারা গেছে সাড়ে চারবছর আগে। কিন্তু বদনোয়াদের তাতে কী!

সুখারামের ভেতরে আগুন জ্বলতে শুরু করল। ওর বাঁ-হাতটা থরথর করে কাঁপতে লাগল—যেন পিনাকেতে মহাদেব টংকার দেওয়ার পর তার তারে অনন্ত কাঁপন লেগেছে। কিন্তু ও কিছু করতে পারছিল না। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিল। বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল।

সুখারাম যে কিছু করার কথা ভাবেনি, শুধু স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, তার কারণ, বদনোয়ার দল ওর দিকে পিছন ফিরে থাকলেও ও ওদের হাতের অন্তত দুটো অস্ত্র দেখতে পাচ্ছিল।

বদনোয়ার হাতের মুঠোয় ধরা একটা মোটা নলওয়ালা রিভলভার।

আর ওর এক শাগরেদের হাতে ঝোলানো দেড় হাত লম্বা একটা ঝকঝকে সোর্ড।

এই দুটো জিনিস সুখারামকে আটকে দিয়েছিল।

অস্ত্রধারী দুজনেই তাদের হাতের অস্ত্রগুলোকে বেপরোয়াভাবে নাচাচ্ছিল, আর তার সঙ্গে এই বলে শাসাচ্ছিল যে, এক্ষুনি সুখারামকে ওদের হাতে না তুলে দিলে ওরা 'নাকের বদলে নরুন' নিয়ে চলে যেতে পারে।

সুখারাম স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, সেই 'নরুন' এখন ওদের বন্ধ দরজার ওপিঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া কবুতরের মতো কাঁপছে, বুক উঠছে, নামছে। পাগল-করা ছন্দে ধড়ফড় করছে।

বস্তির ভেতরে এত প্রবল চিৎকার, চেঁচামেচি—অথচ পাড়াপড়শিদের কোনও সাড়া নেই। সব ঘরেরই জানলা-দরজা বন্ধ। এখানে এত লোক গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে, অথচ এখন সুখারাম, ওর মা আর চোলি একেবারে একা।

হেডলাইটের জোরালো আলোয় সুখার মা হাত-পা নেড়ে চিৎকার করছিল, তড়বড় করে লাফাচ্ছিল। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য যতরকম ভাবভঙ্গি আর আস্ফালন করা সম্ভব সবই করছিল। সেটা দেখতে-দেখতে হঠাৎ সুখার মনে হল, কোনও সিনেমার যেন শুটিং চলছে। সেখানে ওর মা

স্পটলাইটের আলোয় শট দিচ্ছে। আর অন্ধকারের আড়ালে থেকে পরিচালক-সহ-পরিচালকের দলবল তাদর নির্দেশনামা শুনিয়ে চলেছে।

অসহায় সুখারাম কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। মা আর চোলিকে বাঁচাতে না পাবার কষ্টটা ওকে ধীরে-ধীরে অবশ করে দিচ্ছিল।

ঠিক তখনই শুটিং শুরু হল।

আওয়াজটা তেমন জোরে হয়নি, কিন্তু সুখারাম সেটাকে গুলির আওয়াজ বলে ভালোই চিনতে পারল।

চেনার আরও একটা কারণ, মায়ের প্রতিবাদের ফুলঝুরি আচমকা থমকে গেল, আর একইসঙ্গে ও দেখতে পেল মায়ের ময়লা শাড়ির বুকের কাছটা হঠাৎই লাল রঙে ভিজে উঠেছে, আর ওর মায়ের ছোট্টখাট্টো রোগা শরীরটা ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে।

সুখার ঝাপসা চোখের সামনে সেই পলকা তেজি শরীরটা পড়তেই লাগল। পড়তেই লাগল।

বদনোয়ার দল উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। ওদের একজন চিৎকার করে বলল, 'সালা, আমাদের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়া! গোটা ফ্যামিলিকে চুরচুর করে দেব!'

ওরা পাঁচজন বন্ধ দরজাটার দিকে এগোতে শুরু করল। অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্তে ঢুকে পড়ল। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। এ ওর দিকে তাকাচ্ছিল, বন্ধ দরজাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অঙ্গভঙ্গি করছিল।

সুখারাম এবার ওদের দেখতে পাচ্ছিল। চিনে নিতে পারছিল চেহারাগুলো। মনের মধ্যে সেগুলো গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

বদনোয়াকে ও চেনে। ভারী চৌকো, হিংস্র মুখ। কিন্তু বাকি চারটে মুখ ও নতুন দেখছে।

ওরা সবাই বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে অনায়াসে সুখারামের মায়ের দেহটাকে পাশ কাটিয়ে গেল। তারপর খিস্তির পঞ্চব্যঞ্জন তারস্বরে উগরে দিয়ে ঘরের পলকা দরজাটা পিটতে শুরু করল।

ঘরের ভেতর থেকে এই প্রথম একটা ভয়ের চিৎকার শোনা গেল। একটা কোণঠাসা মেয়ের চিৎকার।

চোলি।

সুখা এখন কী করবে? ছুটে যাবে ওই রিভলভার আর সোর্ডের মুখে? মায়ের মতো বেঘোরে প্রাণ দেবে?

তা হলে বদলা নেবে কে? ওপরওয়ালা?

না, সব কাজের দায়িত্ব ওপরওয়ালার ওপরে চাপাতে পারবে না সুখারাম।

এইসব ভাবছিল, থরথর করে ওর গোটা শরীর কাঁপছিল, ভয়ে মুখে কুলুপ আঁটা, কিন্তু দু-চোখ জল।

মা! মা রে! ওরা আসার আগে তোরা ঘর ছেড়ে পালাতে পারলি না? হা ভগবান!

সুখারামের মাথা ঘুরছিল, চোখে ঝাপসা দেখছিল। জীবনটা হঠাৎ করে কী থেকে কী হয়ে গেল!

অসহ্য টেনশানে মাথার ভেতরে যন্ত্রণা হচ্ছিল। বদনোয়ার দলবলের দরজা পেটানোর আওয়াজ ওর কানে বোমার মতো ভয়ংকর এবং তীব্র শোনাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি চোখে অন্ধকার নেমে আসবে, মাথার শিরাগুলো পটপট করে ছিঁড়ে যাবে।

এবং তাই হল।

ওদের ঘরের দরজাটা প্রথমে চিড় ধরে তারপর ভেঙে গেল। চোলির কানফাটানো আর্ত হাহাকার আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ভিজিয়ে দিল। আর সুখারামের চোখের সামনে একটা ভারী কালো পরদা নেমে এল।

ও আচমকা আবর্জনা, ইট, খোয়া আর রাবিশের ওপরে লুটিয়ে পড়ল। একটা শক্ত কিছুতে ওর মাথা ঠুকে গেল। নাকে এল জনতা-বাথরুমের ঝাঁজালো কটু গন্ধ।

তারপর সুখারাম নস্করের আর কিছুই মনে নেই।

●

জ্ঞান যখন ফিরল তখন ও কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে। সেখান থেকে বৃষ্টির ফোঁটা একঘেয়েভাবে নেমে আসছিল ওর মুখে, চোখে, শরীরে।

মাথায় অসহ্য ব্যথা, নাকে নোংরা গন্ধ।

হঠাৎই বমির ওয়াক বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। ওর শরীরটা প্রবল দমকে ঝাঁকুনি খেল।

উঠে বসল সুখারাম। মাথার পিছনটা টনটন করছে। সেই অবস্থায় ওয়াক উঠল আরও কয়েকবার। শব্দ চাপা দিতে মুখে হাত উঠে গেল ওর।

একটু পরে হাত সরিয়ে হাঁ করে দু-চারবার শ্বাস নিল। তারপর ভালো করে চারপাশে তাকাল। মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের দৃষ্টি সড়গড় করতে চাইল।

আরে! তিনটে বাইকের হেডলাইট তো এখনও জ্বলছে!

তা হলে বদনোয়া আর ওর দলবল গেল কোথায়?

উত্তর পেয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গেই।

সুখারাম দেখল, ওদের ঘরের ভাঙাচোরা দরজা দিয়ে শত্রুরা একে-একে বেরিয়ে আসছে।

প্রথমে বদনোয়া—আর ওর পিছনে-পিছনে বাকি চার শাগরেদ। হেডলাইটের আলোয় ওদের মুখগুলো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছিল।

মুখে অশ্লীল হাসি, তার সঙ্গে খিস্তিখেউড়, আর এলোমেলো পা ফেলে হাঁটা।

ঘরের ভেতর থেকে কোনওরকম চিৎকার-টিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না।

সুখারাম হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। যাতে শব্দ না হয় সেইজন্য দু-হাতের তালু চেপে ধরল মুখে। অসহায় বোবা মানুষের মতো গোঙাতে লাগল।

বসা অবস্থাতেই ও আরও অন্ধকার কোণে সরে গেল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল সামনের একটা জোড়াতালি দেওয়া ঘরের দিকে।

ও কী করবে এখন? বাঁচবে? না মরবে?

আধো অন্ধকারের মধ্যেও ও দেখল সামনের ঘরটার একটা খুপরি জানলা অর্ধেকটা খুলে গেল। সেখানে উঁকি মারছে একজোড়া ভয় পাওয়া চোখ।

সুখারামের মনে হল, বস্তির অনেক ঘরের জানলা থেকেই হয়তো এরকম ভয় পাওয়া কৌতূহলী চোখ আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। কিন্তু সাহস করে কেউ বেরিয়ে আসতে পারছে না। ওরা হয়তো বদনোয়ার গ্যাঙের এখনকার কীর্তিকলাপ অনেকটাই শুনেছে বা দেখেছে, কিন্তু আতঙ্ক ওদের সামনে আসতে দেয়নি, প্রতিবাদ করতে দেয়নি।

এমন সময় একটা ফায়ারিং-এর শব্দ শোনা গেল।

আড়াল থেকে উঁকি মারল। দেখল, বদনোয়ার রিভলভার শূন্যে উঁচিয়ে ধরা রয়েছে। আর ওর দুজন সঙ্গী খিস্তি দিয়ে সুখারাম এবং বস্তির লোকদের চেঁচিয়ে শাসাচ্ছে। একজনের হাতের সোর্ড শূন্যে আস্ফালন করে বৃষ্টির ফোঁটাকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করছে।

ওরা চলে যাচ্ছে! চলে যাচ্ছে ওরা! যুদ্ধ জয় করে ওরা সিনা ফুলিয়ে চলে যাচ্ছে—পোড়া বস্তির দিকে, ওদের ঠেকের দিকে।

মোটরবাইকগুলো স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। বাইকের হেডলাইটের আলো এলোমেলোভাবে নানান দেওয়াল আর গাছপালার ওপরে পড়ল। ফিরে যাবে বলে ওরা বাইকের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

কান্নার গোঙানি সুখারামকে চৌচির করে দিচ্ছিল। একটা অস্ত্র! একটা অস্ত্র যদি ও হাতে পেত তা হলে....।

ও পাগলের মতো আধখোলা জানলাটার ওপরে হামলে পড়ল।

বুঝতে পারল, জানলার চোখ দুটো একটা মেয়ের।

সুখারামকে হঠাৎ করে জানলার কাছে চলে আসতে দেখে মেয়েটি ভয় পেয়ে জানলা থেকে সরে যাচ্ছিল, কিন্তু সুখরাম কান্না মেশানো গলায় ডুকরে



উঠল, 'বোন—যেয়ো না...।'

মেয়েটা থমকে গেল। ওর ঘরের ভেতরটা অন্ধকার থাকায় ওকে ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

'বোন...শোনো...প্লিজ...।' সুখারাম চাপা গলায় কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'শিগগির কিছু একটা আমাকে দাও....ছুরি-কাটারি-বঁটি...যা হোক। শয়তানের বাচ্চাগুলো আমার...আমার মা আর বোনকে...।' আর কোনও কথা বলতে পারল না—শুধু কাঁদতে লাগল।

দুবার ঢোক গিলে বলল আবার, 'প্লিজ...বোনটি আমার...।'

ছায়া-ছায়া মুখটা চট করে জানলার কাছ থেকে সরে গেল।

সুখারাম ভয় পেয়ে গেল। মেয়েটা গেল কোথায়? মোটরবাইকের আলো তো আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওর গায়ে এসে পড়বে!

ও একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে অন্ধকার জানলাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎই চোখ দুটো আবার দেখা গেল। জানলার কাঠের গরাদের ফাঁক দিয়ে 'ঠং' শব্দে কী একটা গলির রাবিশের ওপরে পড়ল।

সেদিকে তাকিয়ে আধোআঁধারির মধ্যেও সুখারাম দেখতে পেল, কিছু একটা চকচক করছে।

জানলার চোখদুটো কয়েকপলক ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চাপা 'খট' শব্দ করে জানলার পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল।

সুখারাম ঝাঁপিয়ে পড়ে জিনিসটার দিকে হাত বাড়াল। ওটাকে ব্যস্ত মুঠোয় ধরে একরকম ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে গেল নিজের আশ্রয়ে। দেওয়াল ঘেঁষে উবু হয়ে বসল।

আবর্জনা, বাথরুমের দুর্গন্ধ, ছেঁড়া-ফাটা পুরোনো টায়ার-টিউব।

বৃষ্টির মধ্যেই মুঠোটা চোখের কাছে নিয়ে এল।

প্রায় সাত-আট ইঞ্চি ফলার একটা জং ধরা ছুরি। তার কাঠের হাতলের বেশ খানিকটা ভাঙা।

সোর্ড এবং রিভলভারের সঙ্গে মোকাবিলায় এই ছুরি নিতান্তই একটা বিন্দু!

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিন্দু থেকেই একটা প্রতিঘাতের লড়াই শুরু করা যেতে পারে।

●

মোটরবাইকের আলোগুলো এগিয়ে আসছিল। তার ঠিক পিছনেই বসে আছে খতম স্কোয়াডের পাঁচজন সদস্য। ওদের দুজনের কাছে অস্ত্র রয়েছে। সেই

দুজনকে নিয়েই সুখারামের বেশি দুশ্চিন্তা।

মায়ের কথা ভাবছিল সুখারাম। ভাবছিল চোলির কথা। এই দুঃসময়ের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত থেকেও ওর সুসময়ের কথা মনে পড়ছিল। অনেক অভাবের মধ্যেও মায়ের শাসন আর স্নেহ মাখানো দিনগুলো মনে পড়ছিল।

'সুখা, বৃষ্টিতে ভিজবি না। ঠান্ডা লাগলে জ্বর হবে, তারপরই ঝামেলা। ডাক্তার দেখাও, ওষুধ খাও...সে-পয়সা কোথায়? যা, ঘর যা!'

'এই নে, সুখা, এই রসগোল্লাটা খা।' তারপর সুখারামের অবাক চোখের দিকে তাকিয়েঃ 'আজ তোর জন্মদিন রে পাগলা! তাই তিনটে রসগোল্লা কিনে এনেছি—আমাদের তিনজনের...।'

'দাদাভাই, দশটা টাকা দে তো—।'

'কেন রে?'

'খরচ করব—।'

'তার মানে? কীসে খরচ করবি?'

'কেন, সব কি তোকে বলতে হবে?'

'মা, শোন—চোলির কথা শোন—।

'ও ঠিকই তো বলেছে! ও বড় হয়েছে। ও নেলপালিশ কি কিরিম কিনবে সব তোকে বলতে হবে! শিগগির দশ টাকা দে! ও তোর ছোটবোন—তোর কাছে চাইবে না তো কার কাছে চাইবে?'

সুখারাম শুনতে পাচ্ছিল চোলির গলা ঃ 'কী রে, দাদাভাই, বদলা নিবি না?'

চোলি বদলা চাইছে।

'ও তোর ছোটবোন—তোর কাছে চাইবে না তোর কার কাছে চাইবে?' মায়ের গলা।

সুখারামের ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল ঘরের দিকে, মায়ের দিকে, চোলির দিকে। ওরা কি এককণাও বেঁচে আছে? আছে?

থাক বা না থাক, সুখারামের খুব ইচ্ছে করছে ওদের কাছে যেতে। কিন্তু চোলি যে আবার আবদার করছে...কী যেন চাইছে...।

বাইকের আলোগুলো সুখারামের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

ছুরিটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরল সুখারাম। হে ভগবান! একটা সুযোগ দাও। একটা সুযোগ! তা হলে বাকি কাজটার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে না—আমিই নিতে পারব। তাতে বাঁচি-মরি কোনও দুঃখ নেই। কারণ, বেঁচে থাকার আর কোনও মানে নেই।

ওই দু-এক লহমার মধ্যেই নিয়তি একটা সুযোগ তৈরি করে দিল।

তিনটে মোটরবাইক ওকে পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই একেবারে

শেষের বাইকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইক চালাচ্ছিল যে-ছেলেটা সে একটা হাত শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'বস, একবার লিক না করলে হবে না—তলপেট সালা বাস্ট করবে...।'

সামনের দুটো বাইক থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'সালা পেটে মাল পড়লেই জামিয়ার খালি এমার্জেন্সি হিসি পায়। যাকগে, আমরা ঠেকে যাচ্ছি, তুই লিক করে আয়। খাওয়াদাওয়া সেরে ওই হারামির বাচ্চাটাকে আবার পাত্তা করতে বেরোব...।'

পিছনের বাইকটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার সামনের সিট থেকে শূন্যে পা ঘুরিয়ে নেমে পড়ল জামিয়া। তারপর সুখারামের অন্ধকার খুপরির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

বৃষ্টি আর আলো-আঁধারির মধ্যে ওকে ঠিকমতো ঠাহর করতে পারছিল না সুখা। শুধু বুঝতে পারছিল, জামিয়া লম্বা এবং ওর হাতে সোর্ডটা নেই।

জামিয়ার সঙ্গী বাইকের দুপাশে পা ছড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল। বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ হয়নি, তাই ফটফট আওয়াজ হচ্ছিল, আর বাইকের হেডলাইটটা একবার উজ্জ্বল হচ্ছিল আর একবার মলিন হচ্ছিল।

না, ওই ছেলেটার কাছেও সোর্ডটা আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওটা মনে হয় মাঝের বাইকের কারও কাছে আছে।

জামিয়া যেন ওকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি পা ফেলছে। প্রকৃতির চাপ আর সইতে পারছে না।

হাতল ভাঙা ছুরিটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরল। ওর আঙুলের হাড় ব্যথা করতে লাগল। আসুক জামিয়া—আরও কাছে আসুক। একজন-একজন করেই নিপাতের কর্মকাণ্ড শুরু হোক।

বাথরুম করার দুর্গন্ধ মাখা ছোট্ট এলাকাটায় ঢুকে পড়ার আগেই ব্যস্ত হাতে প্যান্টের 'জিপ' খুলে ফেলেছিল জামিয়া। তারপর ব্যস্তভাবে ঢুকে পড়েছে অন্ধকার খুপরিতে।

ভাঙাচোরা দেওয়াল আর ডাঁই করা আবর্জনার মধ্যে ঘাপটি মেরে কুঁকড়ে বসেছিল সুখারাম। নিয়তির অদ্ভুত খেলা দেখে ও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। গুহা থেকে বেরিয়ে ওকে আর দৌড়ে শিকার ধরতে হবে না। শিকার নিজেই চলে এসেছে গুহায়।

জামিয়া দু-পা ফাঁক করে পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই সুখরামের ছুরি শঙ্খচুড়ের ঢঙে ওকে ছোবল মেরেছে। ছুরির জং ধরা ফলাটা জামিয়ার 'লেটার বক্স'-এর ভেতর দিয়ে সরাসরি ঢুকে গেছে অন্ধকারে। সজোরে আঘাত হেনেছে।

ছুরির ফলাটা কোনও বাধা পেল না দেখে সুখারাম খানিকটা আশ্চর্য

হল। মনে হল, ও যেন একতাল মাখনের মধ্যে ছুরি চালিয়েছে।

জামিয়া যে-'ওঁক' শব্দটা করল সেটার ধরন অনেকটা মুরগির শেষ চিৎকারের কাছাকাছি। আর ওর দেহটা সামনে ভাঁজ হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুখারামের গায়ের ওপরে।

কিন্তু সেসব তেমন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করার মতো অবস্থা সুখারামের ছিল না। কারণ, ওর ডানহাত তখনও একই কাজে ব্যস্ত ছিল। টিভিতে একঘেয়ে অ্যাকশন রিপ্লে দেখানোর মতো ও বারবার মাখনের তালে জং ধরা ছুরিটা বসিয়ে যাচ্ছিল। আর মনে-মনে বলছিল, 'মা-চোলি। মা-চোলি, মা-চোলি... ।'

জামিয়ার চাপা আর্তনাদ ওর সঙ্গীর কানে পৌঁছয়নি। কারণ, আর্তনাদের তীব্রতা যথেষ্ট কম ছিল—আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বাইক থেকে জামিয়ার দূরত্ব, বাইকের ইঞ্জিনের শব্দ এবং আশপাশের টিনের চালে বৃষ্টির রিমঝিম।

কিন্তু জামিয়ার দেরি দেখে সে চেঁচিয়ে জামিয়ার নাম ধরে ডাকল। পরপর তিনবার। তাঁর মধ্যে শেষবারের ডাকটা যথেষ্ট অধৈর্য ভাব আর বিরক্তি মেশানো।

সুখারাম হাঁপাচ্ছিল। ওর বুকের ভেতরে ধকধক আওয়াজ হচ্ছিল। মনটা পাগলের মতো ছটফট করছিল। কিন্তু তাই বলে ওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। নিশাচর চিতার মতো ও ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল। ওর হাত, মুখ, বুক—সব ভিজে চটচটে হয়ে গিয়েছিল। এখন বৃষ্টির ফোঁটায় সেই চটচটে ভাবটা ধুয়ে যাচ্ছিল।

ও দেখল, বাইকে বসা ছেলেটা এবার সামনে ঝুঁকে পড়ে বাইকের হাতল দুটো ধরল। অ্যাথলিটের ভঙ্গিতে পা ঘুরিয়ে বাইক থেকে নেমে পড়ল। তারপর বাইকটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে ও জামিয়ার নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে সুখারামের আশ্রয়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আয়—এগিয়ে আয়। আরও কাছে আয়...।

সুখা মনে-মনে ওকে আর ভগবানকে ডাকতে লাগল।

ছেলেটা অকুস্থলের কাছাকাছি এসেই জামিয়াকে দেখতে পেল। নোংরা আর আবর্জনার মধ্যে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

ও জামিয়াকে কয়েকবার নাম ধরে ডাকল। ওর গলার স্বর আলতো, স্তিমিত। তার মধ্যে অল্পস্বল্প সর্তকতা ঢুকে পড়েছে।

অন্ধকারে দম বন্ধ করে উবু হয়ে বসে রয়েছে সুখারাম। যেন একটা নিথর গোটানো স্প্রিং। যে-কোনও মুহূর্তে ছিটকে লাফিয়ে পড়বে শত্রুর ওপরে।

কিন্তু শত্রু আরও কাছে আসছে না কেন?

ছেলেটা আর-একটু কাছে এল। ঝুঁকে পড়ে হাত লম্বা করে জামিয়াকে

ছুঁল। তারপর 'জামিয়া। আবে জামিয়া!' বলে ডাকল। ওর অসাড় শরীরটাকে কয়েকবার ঠেলা মারল।

ব্যস! তার পরই ও অনুসন্ধানী চোখে চারপাশে নজর চালাল। ওর চঞ্চল চোখ অন্ধকার খুপরির প্রতিটি আনাচকানাচ এক ঝলকে দেখে নিল।

আর তখনই দেখতে পেল কুঁকড়ে বসে থাকা শিকারি সুখারামকে।

দু-নম্বর জগতের অলিগলি ছেলেটার জানা। নানান ধরনের কাজিয়া, লড়াই, খুনোখুনির মধ্যে ও বড় হয়েছে। বদনোয়ার দলে থাকার মতো যোগ্যতা ওর যথেষ্ট আছে। তাই ও তক্ষুনি পরিস্থিতি আঁচ করে নিল। বুঝল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালানোটাই এই মুহূর্তে সেরা স্ট্র্যাটেজি। তাই উলটোদিকে ছুট লাগাল।

ছেলেটা যেভাবে মোটরবাইকটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল তাতে বোঝা গেল ও বাইক চালাতে জানে না।

চোখের পলকে গোটানো স্প্রিং-টা খুলে গেল। ছিটকে লাফিয়ে পড়ল গলির সিমেন্ট বাঁধানো জমির ওপরে। এবং ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে পালানো ছেলেটার পিছু নিল।

সুখারাম নস্করের খুব আনন্দ হচ্ছিল। কারণ, শত্রুকে এখন ও বাগে পেয়ে গেছে। ছেলেটা সুখার সঙ্গে রেসে নাম দিয়ে ফেলেছে। আর ওর ফেরার পথ নেই।

সুখারাম দৌড়চ্ছিল। খালি গা। হাফপ্যান্ট। আর পুরোনো রানিং শু।

বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় ছুটতে ওর খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না। তবে ওর বরাট স্যারের কথা মনে পড়ছিল। এই দৌড়টা জিততে হবে। জিততেই হবে!

বস্তির গলির ভাঁজগুলো পেরিয়েই বড় রাস্তা। রাস্তাটা গলির চেয়ে চওড়া বলেই এর নাম 'বড়' রাস্তা। কিন্তু আসলে ওল্ড সিটির অন্যান্য রাস্তার মতো এই রাস্তাটাও শতচূর্ণ।

রাস্তার শুরুর দিকটা সাপের মতো—আঁকাবাঁকা। তারপর খানিকটা অংশ সোজা—নাকবরাবর। সেই সোজা রাস্তায় এসে পড়তেই ছুটন্ত ছেলেটাকে দেখতে পেল সুখারাম। ওর সামনে—পঁচিশ কি তিরিশ মিটার দূরে—দৌড়চ্ছে।

সুখার ভেতরে তেজের ঝলকানি ঠিকরে বেরোল। ওর প্রতিটি স্নায়ুতে তেজস্ক্রিয় কণার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল। ট্র্যাক খারাপ হলেও ও মনের মতো করে দৌড়তে পারছিল। বেশ বুঝতে পারছিল। দুজনের মধ্যে দূরত্ব কমছে।

রাস্তার বাঁ-দিকে অবহেলায় পড়ে থাকা জমি। সেখানে ভাঙাচোরা বড়-বড় যন্ত্রপাতি, পুরোনো গাড়ি, দেওয়াল কিংবা ছাদ ভেঙে পড়া ঘর, আর গাছপালা তো আছেই! এ ছাড়া ডানদিকে ছোট-বড়-মাঝারি বিল্ডিং—আর তার লাগোয়া অসংখ্য ঝুপড়ি।

সুখারাম একমনে দৌড়চ্ছিল, মুখ দিয়ে টুঁ শব্দও বেরোচ্ছিল না। শুধু ওর নিশ্বাসের শব্দ আর হৃৎপিণ্ডের ধকধক শোনা যাচ্ছিল।

সামনের ছুটন্ত ছেলেটা কোনও আওয়াজ করেনি—শুধু প্রাণপণে ছুটছিল। একবার ও পিছনে তাকিয়ে সুখারামকে দেখেছিল—তারপর আর মুখ ফেরায়নি।

সাহায্যের জন্য কোনওরকম চিৎকারও করেনি ছেলেটা। কারণ, ও জানে চিৎকার করে কোনও লাভ নেই। এত রাতে এই বৃষ্টিতে কেউই ওকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে না। অবশ্য বৃষ্টিহীন বিকেলবেলা হলেও কেউ আসত না। শুধু বিনিপয়সার মজা দেখত। এটাই ওল্ড সিটির দস্তুর।

সামনের ছুটন্ত ছেলেটা কী করে যেন বুঝতে পারল সুখারামের সঙ্গে ওর দূরত্বটা বিপজ্জনকভাবে কমে এসেছে। তাই ও ছুটতে-ছুটতেই ডানদিকে বাঁক নিল। হয়তো ভেবেছে ঝুপড়িগুলোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার চেচামেচি করে সাহায্য চাইলে একটা হট্টগোল তো অন্তত হবে! তাতে যদি পিছন-পিছন ছুটে আসা কম্‌বখ্‌ত পাগলা কুত্তাটাকে রুখে দেওয়া যায়।

ছেলেটার ভাবনাটা ভাবনাই রয়ে গেল। কারণ, সেটা বাস্তবে অনুবাদ করার আগেই সুখারাম ওকে হাতের নাগালে পেয়ে গেল এবং এক ধাক্কা দিল।

ছেলেটা ছিটকে পড়ল রাস্তায়। পড়ে কয়েক পাক গড়িয়ে চলে গেল রাস্তার ধারে মাটিতে।

সুখারাম ওর কাছে গিয়ে পড়তেই ছেলেটা শরীর বাঁকিয়ে সুখার পা চেপে ধরল। গোঙানির সুরে বলল, 'ছোড় দে, ভাইয়া, হমে ছোড় দে। ইয়ে সব বদনোয়াকা কাম হ্যায়। হাম কুছ নাহি কিয়া। আমি কিচ্ছু করিনি—বিশ্বাস কর...।'

ওপরদিকে তাকিয়ে কথা বলার সময় ছেলেটার মুখে বৃষ্টির জল ঢুকে যাচ্ছিল—তাই ও বারবার ঢোক গিলছিল।

সুখারামকে প্রেতের মতো দেখাচ্ছিল। বৃষ্টি ভেজা খালি গা। মাথার চুল কপালে লেপটে আছে। কাদা মাখা ভেজা হাফপ্যান্ট। আর ডানহাতের মুঠোয় হাতল ভাঙা জং ধরা ছুরি।

ছেলেটাকে এক ধাক্কা মেরে পিছনে ঠেলে দিল সুখা। তারপর ওর গায়ের ওপর 'ছপাৎ' শব্দে বসে পড়ল। ছুরি ধরা হাতটা শূন্যে উঁচিয়ে।

দাঁতে দাঁত ঘষে ও হাঁপাতে-হাঁপাতে জিগ্যেস করল, 'বল, বাকি তিনটে হারামি কোথায় গেছে...।'

সুখারামের হাতের ছুরির চেহারাটা চটপট উত্তর পেতে সাহায্য করল।

'ওরা...ওরা পোড়া বস্তির ঠেকে গেছে—।'

ঘোড়ায় চড়ার মতো দুপাশে দু-পা রেখে ছেলেটার ওপরে সওয়ার হয়ে ছিল সুখা। চারপাশে ভিজে কাদা-মাটি। ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। অসহায়ের মতো

ওপরদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

সেই অবস্থাতেই ও বলতে লাগল পোড়া বস্তির ঠেকটা ঠিক কোথায়। বাংলা হিন্দি মিশিয়ে গোঙানির সুরে কথা বলছিল ছেলেটা। আর তার ফাঁকে-ফাঁকেই বলছিল যে, ও নির্দোষ। সবকিছুর জন্য বদনোয়া দায়ী।

সুখরামের মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছিল, উথালপাথাল চলছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেটার বলা জরুরি তথ্যগুলো ও স্মৃতিকোশে ঠিকঠাক গেঁথে নিতে পারছিল। ওর মনে হল, পোড়া বস্তির ঠেকটা ও অল্প-অল্প চিনতে পারছে। এই রাতের অন্ধকারে, এই বৃষ্টির মধ্যেও, সেটা চিনে নিতে ওর তেমন একটা অসুবিধে হবে না।

সুখরামের শরীরের নীচে ছেলেটা শান্তভাবে শুয়ে ছিল—শুধু বড়-বড় শ্বাস টানছিল। ওর চোখ সুখার হাতের ছুরিটার দিকে স্থির। ও বুঝতে পারছিল, ও বাঁচা-মরার সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভয়ার্ত চোখে শুধু অপেক্ষা করছিল।

ওকে বারবার জেরা করে সুখারাম একসময় নিশ্চিন্ত হল যে, ছেলেটা সত্যি কথাই বলছে। তখন ও বুঝল, ছেলেটাকে আর বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই। একইসঙ্গে ওর মাথার ভেতরে চোলি আর মা যেন চিৎকার করে কিছু একটা করতে বলছিল।

কিছুক্ষণ ধরেই বৃষ্টিটা কমে আসছিল। এখন হঠাৎই থেমে গেল।

সুখারাম মুখ তুলে আকাশের দিকে একবার দেখল। তারপর ছেলেটার দিকে।

এই ছেলেটা আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারত।

আচমকা ছুরিটা ওর গলার পাশে চেপে ধরল সুখা। ছেলেটা ভয়ার্ত জন্তুর মতো আওয়াজ করে উঠল।

সুখা হিংস্র গলায় বলল, 'হাঁ কর!'

ছেলেটা অবাক হয়ে গেল। সুখার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল।

'হাঁ কর সালা। নইলে নলি ফাঁক করে দেব!'

ছেলেটা ধন্দে থাকলেও চটপট হাঁ করল এবার।

সুখা ছুরিটা ওর গলার পাশ থেকে সরিয়ে এনে গলার নলির ওপর চেপে ধরল।

ছেলেটা ভয়ে কঁকিয়ে উঠল।

ওর মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল সুখারাম। ছেলেটা চুপ করে সিঁটিয়ে আছে। বোধহয় বুঝতে পারছে সুখারাম এখন মানুষ নয়—কিলার রোবট। যে অকাতরে এক ছোবলে জামিয়াকে খতম করে দিয়েছে।

চোখের পলকে সুখারাম একটা কাণ্ড করে বসল। বাঁ-হাতে এক খাবলা

কাদা-মাটি তুলে নিল। এবং সেটা থাবড়ে ঢুকিয়ে দিল ছেলেটার হাঁ করা মুখে।

ছেলেটা হাত-পা ছুড়ে হাঁসফাঁস করতে লাগল। সুখার হাত আঁকড়ে ধরল। ওর নখের আঁচড়ে সুখার হাত ছড়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সুখা দ্বিতীয়বার মাটির খাবলা তুলে নিয়ে ছেলেটার মুখের ওপরে চাপড়ে দিয়েছে। আর একইসঙ্গে ছুরির কাঠের হাতলের ডগাটা হাতুড়ি পেটার মতো সজোরে বসিয়ে দিয়েছে শত্রুর বাঁ-রগে।

ছেলেটা এলিয়ে গেল। ওর ঝটাপটি স্তব্ধ হয়ে গেল। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেল।

সুখারাম ওর নাক টিপে ধরল। ছুরি ফেলে দিয়ে আর-এক খাবলা মাটি ঠেসে দিল ওর মুখে। ঝটকা দিয়ে একবার কেঁপে উঠল ছেলেটার দেহ। তারপর আর নড়ল না—মৃতদেহ হয়ে গেল।

সুখারাম টের পায়নি, কখন যেন ও কাঁদতে শুরু করেছিল। ওর গাল গড়িয়ে চোখের জল নামছিল। ও ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে পাগলের মতো ঝাঁকাতে শুরু করল। আর কান্না ভাঙা গলায় আর্ত হাহাকার করে উঠল, 'মা! মা রে! চোলি! আমার চোলি...।'

বৃষ্টি ভেজা রাত ছাড়া আর কেউ সুখারাম নস্করের বুক ফাটা কান্না শুনতে পেল বলে মনে হল না। কিন্তু সুখারাম কেঁদেই চলল।

একসময় ও মৃতদেহটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ছুরিটা হাতের মুঠোয়।

ওর মনে হল, প্রতিশোধের দুইয়ের পাঁচ অংশ শেষ হয়েছে—তিনের পাঁচ অংশ এখনও বাকি।

●

সুখারামের নিজের ওপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। একটা জিন ঢুকে পড়েছিল ওর শরীরের ভেতরে। সে-ই যেন অন্তর থেকে নির্দেশ দিয়ে ওকে নানান কাজ করতে বলছিল, ওকে দিয়ে যা খুশি করাচ্ছিল।

সেই জিনের নির্দেশেই সুখারাম এখন দৌড়চ্ছিল। ছুরিটা হাফপ্যান্টের হিপ পকেটে গোঁজা। চোয়াল শক্ত। চোখে মরিয়া এক প্রতিজ্ঞা। ওর পায়ের প্রতিটি পেশি সেই প্রতিজ্ঞার শরিক হয়ে একমনে নিজেদের কাজ করে চলেছে।

বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় ওর ছুটন্ত পায়ের শব্দ হচ্ছিল। সেই শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিধ্বনির মতো শব্দ শোনা যাচ্ছিল। যেন আরও একজন সুখার সঙ্গে-সঙ্গে সমান তালে দৌড়চ্ছে।

সুখারামের মনে হল, সেটা বরাট স্যার।

এ-কথা মনে হতেই ওর শিরা-উপশিরায় নতুন তেজের স্রোত বয়ে গেল।

ও আরও জোরে ছুটতে লাগল। ওর নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে শব্দ বেরোতে লাগল।

ছুটতে-ছুটতে সুখারাম খালধারের রাস্তায় চলে এল। আর একটু, আর একটু—তারপরই চলে আসবে পোড়া বস্তির এলাকা, তারপর বদনোয়াদের ঠেক। তারপর...

সুখারামের বুক লক্ষ্য করে বাতাস ছুটে আসছিল। বৃষ্টি ভেজা বাতাসে খাল থেকে ভেসে আসা দুর্গন্ধ।

খালের দিকে চোখ গেল ওর। কালো তেলচিটে জল। পাঁক আর যত রাজ্যের তরল আবর্জনায় অনেক ঘন আর ভারি হয়ে গেছে। রাস্তার কয়েকটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলো ছিটকে পড়েছে সেখানে। চকচক করছে। সুখারামের মনে হল, খালটা যেন একটা মোটা কালো অজগর—ধীরে-ধীরে এঁকেবেঁকে গুড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে। একটু পরেই শিকারকে ওটা গিলে নেবে।

ছুট, ছুট, ছুট।

পোড়া বস্তির এলাকায় ঢুকে পড়ল। এইবার বাঁ-দিকে, তারপর ডানদিকে পরপর দুবার।

ওই তো, সামনেই অন্ধকার বাতাবরণের মধ্যে একটা টিনের চালাঘর! মাপে বড়সড়। তবে তার দরজায় কোনও পাল্লা নেই। ভেতরে আলো জ্বলছে। কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তার সঙ্গে হাসির শব্দ। ফুর্তির মজলিশ বসেছে। বদনোয়া আর তার খুচরো চামচামণ্ডলী।

মরণাপন্ন অসহায় ছেলেটা যেমন-যেমন বলেছিল তার সঙ্গে দিব্যি মিলে যাচ্ছে। আর তার ওপরে আগমার্কা সিলমোহর বসিয়ে দিয়েছে ঘরের বাইরে হেলিয়ে দাঁড় করানো দুটো বাইক।

পা টিপে-টিপে ঘরের কাছে এগিয়ে গেল। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। কোনও শব্দ নেই। শুধু ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা ওদের কথাবার্তা—আর সঙ্গে হিন্দি ঝিনচ্যাক গান। বোধহয় মোবাইলে বাজছে।

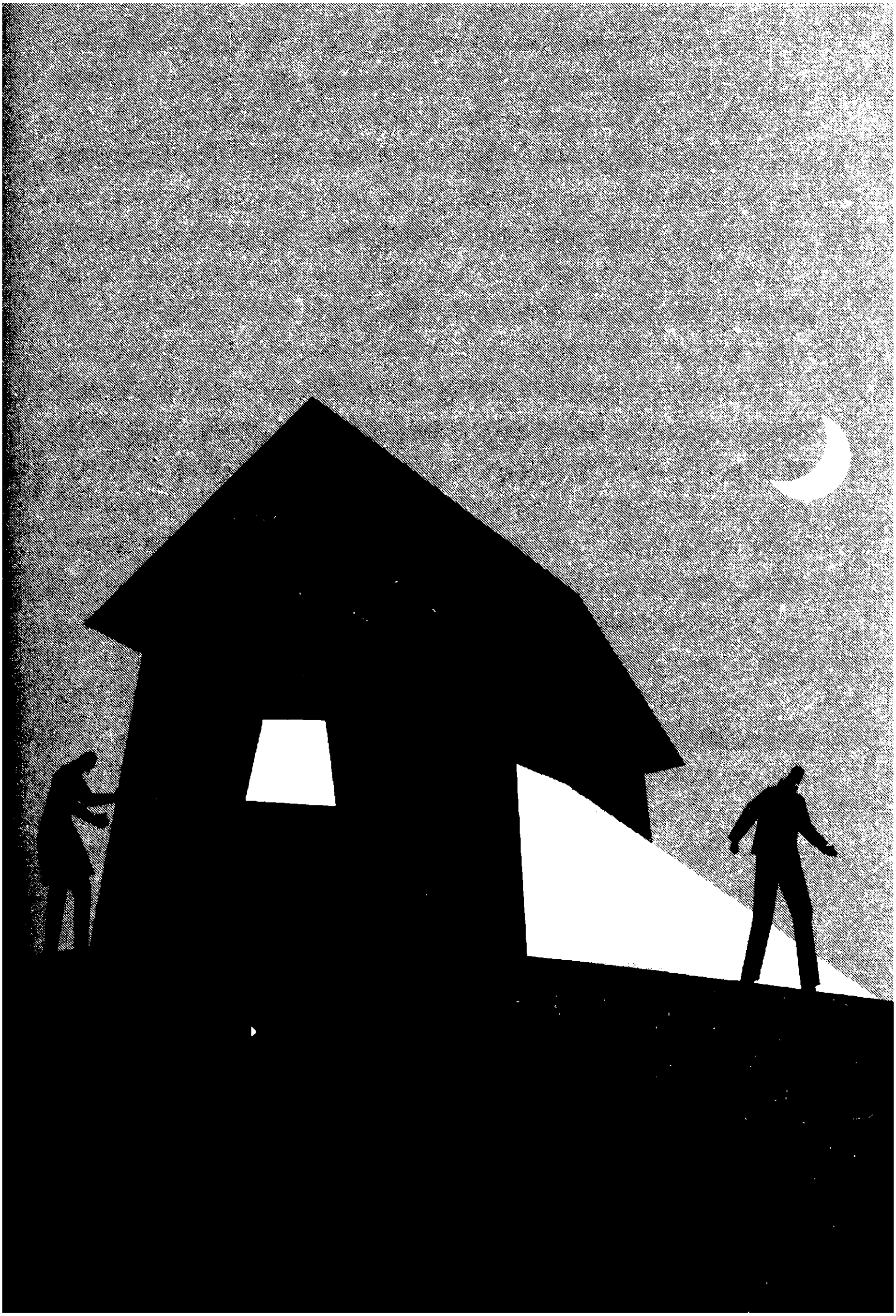
দরজার ফোকর দিয়ে উঁকি মারতেই কয়েকটা গ্লাস আর দুটো বোতল দেখতে পেল। সেইসঙ্গে কয়েকটা হাত-পা। কিন্তু কারও মুখ দেখতে পেল না।

বুকের ভেতরে নানান শব্দ টের পাচ্ছিল সুখারাম। একটা ঢিপঢিপ শব্দ। তার সঙ্গে চোলির গুঙিয়ে ওঠা কান্না আর মায়ের চিৎকার করা তেজি প্রতিবাদের বিনুনি।

এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে বদনোয়ার গলা শোনা গেল।

'জামিয়া আর পিল্লের কী হল রে? ওরা কি আনচাক্কা খোপে আশনাইয়ে লটকে গেল?'

ওই ছেলেটার নাম তা হলে পিল্লে! ভাবল সুখারাম।



বদনোয়ার এক শাগরেদের গলা শোনা গেল ঃ 'বারবার ফোন করছি—শুধু রিং হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, সালারা বিজি। যাক্‌গে, যখন আসে আসবে। এসে দেখবে সব মাল খতম। তখন সালারা বোতল চাটবে।'

তারপরই খ্যা-খ্যা করে হাসি। আর কাচের গ্লাস কিংবা বোতলের ঠোকাঠুকির আওয়াজ।

ওরা কি কেউ ঘরের বাইরে আসবে না? যদি একজন-একজন করে শয়তানগুলো বাইরে আসে তা হলে খুব ভালো হয়। সুখারাম একে-একে ওদের মোকাবিলা করবে, একে-একে ওদের খতম করবে।

কিন্তু যদি না আসে?

দ্বিধা দ্বন্দ্বে কয়েক মিনিট কাটতে না কাটতেই দরজায় এসে দাঁড়াল ওদের একজন। চোখের ওপরে হাতের আড়াল দিয়ে দূরের রাস্তার দিকে তাকাল ছেলেটা।

ওর রোগা চেহারা। চুলগুলো খাড়া-খাড়া। ডান হাতে তিনটে জ্যোতিষী আংটি। বাঁ-হাতটা কনুইয়ের কাছে ধনুকের মতো কিছুটা বাঁকা। চোখ ঢুলুঢুলু। চোখের নীচে ছোট-ছোট পাউচ।

দেখেই বোঝা যায়, ছেলেটা কমপক্ষে শতকরা আশি ভাগ মাতাল হয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল, 'নহী, বস্‌—কোই নহী। না কোনও বাইক, না কোনও মানুষ!'

সুখারাম চালাঘরটার দেওয়াল ঘেঁষে ছেলেটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। হিপ পকেটের ছুরিটা কখন যেন ওর হাতে উঠে এসেছে। বুকের ভেতরের বিচিত্র শব্দগুলো আরও জোরালো হয়ে উঠেছে, আর একইসঙ্গে বিকৃত শোনাচ্ছে।

সুখার কান ভোঁ-ভোঁ করছিল। চোখের নজর ঝাপসা হয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু ও মনের জোরে সেটাকে ঝাপসা হতে দিল না—ছেলেটার ওপরে ফোকাস করে রাখল।

বাইরের অন্ধকার সুখাকে সাহায্য করছিল, কিন্তু টিনের ফাঁকফোকর দিয়ে আলোর কয়েকটা বর্শা অন্ধকারকে অল্পবিস্তর চিরে দিয়েছিল।

সুখা চেয়েছিল, ছেলেটার সামনে আচমকা গিয়ে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠবে—কিন্তু বাস্তবে সেটা অল্পের জন্য হল না। ছেলেটার ছ'নম্বর ইন্দ্রিয় ওকে সাহায্য করল। শেষ মুহূর্তের ঠিক আগের মুহূর্তে ছেলেটা সুখারামকে দেখতে পেয়ে গেল।

সুখারামের হাত তখন শূন্যে। বুকের মধ্যে লকলকে আগুন। ঠোঁট সরে গিয়ে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে এসেছে। ওর হাতে ছুরিটা ধরা না থাকলে

মনে হত, ও বোধহয় দাঁত দিয়েই প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবে। দাঁতই ওর প্রাকৃতিক ধারালো অস্ত্র। ভ্যাম্পায়ারের মতো।

ছেলেটা অবাক হয়ে যাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠল : 'কওন হ্যায় বে তু?'

সুখারামের ছুরি ছেলেটার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিল। বিদ্যুৎঝলকের মতো ছেলেটাকে বুকে ছোবল মারল। একবার—দুবার—তিনবার।

সুখার ছুরি ধরা হাতের সঙ্গে বুকের সংঘর্ষের দাপটে ছেলেটা যেন স্লো মোশানে পিছনদিকে হেলে পড়তে লাগল। তারপর একসময় চিত হয়ে পড়ে গেল চালাঘরের মেঝেতে। ওর আঁকুপাঁকু হাতের ধাক্কায় একটা গ্লাস আর বোতল ছিটকে গেল। মদের গন্ধের ঝাপটা ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

ঘরের ভেতর থেকে বিকট চিৎকার শোনা গেল। তারপরই হুড়মুড় করে খসে পড়া ছেলেটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল বদনোয়া আর ওর শাগরেদ।

সুখারাম দরজার বাইরে থেকে ওদের দেখতে পেল।

বুকে গাঁথা ছুরির বাঁটটা দেখেই বদনোয়া পলকে গল্পটা বুঝতে পারল। সঙ্গে-সঙ্গে পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের রিভলভারটা খামচে ধরল ও। তারপর ওরা দুজনে দরজা লক্ষ্য করে পা ফেলতেই সুখারাম ছুটতে শুরু করল। শুধু ছুট নয়—একেবারে হরিণের দৌড়। চালাঘরটার সঙ্গে ওর দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছিল।

সুখারাম বুঝতে পারছিল এখন কী হবে। বদনোয়া আর ওর শাগরেদ ছুটে এসে বাইকে উঠবে। বাইক স্টার্ট দিয়ে সুখারামকে ধাওয়া করবে। গুলি ছুড়বে। তারপর একসময়...।

ব্যাপারটা অনেকটা তাই হল।

দরজার কাছ থেকেই সুখারামের ছুটন্ত শরীরটা লক্ষ্য করে রিভলভার ফায়ার করল বদনোয়া। বোতলের কর্ক-ছিপি খোলার 'প্লপ' শব্দ হল। কিন্তু রাতের আড়ালে থাকা 'মুভিং টারগেট' সুখারাম নস্করকে সে-গুলি ছুঁতে পারল না।

বদনোয়া ছুটে গিয়ে বাইকে চড়ে বসল। বাইক স্টার্ট দিল। উৎকট শব্দ আর ধোঁয়ার ভলক। বাতাসে পোড়া গন্ধ। বাইকটা গুলতি থেকে ছোড়া গুলির মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল।

বদনোয়ার সঙ্গী এক ঝটকায় ঘরের ভেতরে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল। ওর হাতে এখন অস্ত্র। প্রায় দেড়হাত লম্বা একটা সোর্ড। বোঝা গেল, এই অস্ত্রটা ব্যবহারেই ও অভ্যস্ত এবং দক্ষ।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বাইকের কেরিয়ারে সোর্ডটা কীভাবে যেন আটকে দিল ছেলেটা। তারপর বাইক স্টার্ট দিয়ে দৌড়। ও বুঝতে পেরেছে কে এই

আততায়ী। এই খ্যাপা কুত্তাটাকে নিকেশ না করে নিস্তার নেই। যেভাবেই হোক শুয়োরের বাচ্চাটাকে এখুনি খতম করতে হবে।

ভাঙাচোরা রাস্তা। যেখানে সেখানে খানাখন্দ। জল জমে আছে। আকাশে থমথমে মেঘ। কোথাও কালো, কোথাও লালচে, কোথাও বা গাঢ় ছাই রঙের। মেঘের স্তর ভেদ করে চাঁদ কিংবা তারা চোখে পড়ছে না। মনে হচ্ছে, যে-কোনও সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

এবড়োখেবড়ো রাস্তায় বদনোয়ার বাইক লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটছিল। বাইকের হেডলাইট ওল্ড সিটির রাস্তায় সুখারামকে খুঁজছিল। কিন্তু ছুটন্ত কাউকে ও দেখতে পাচ্ছিল না।

রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। যে দু-একজনকে চোখে পড়ছে তারা নিশ্চয়ই সহজে-ভয়-পাওয়া ছাপোষা লোক নয়। কারণ, এত রাতে ওল্ড সিটির অলিগলি রাজপথে ছাপোষা লোকরা ঘুরে বেড়ায় না। যারা ঘুরে বেড়ায় তারা না-পোষা, বুনো, ভয়-দেখাতে-চাওয়া মানুষ।

বাইকের গর্জন এই নিশুতিতে খ্যাপা বাঘের গর্জনের মতো শোনাচ্ছিল। আর সেই গরজানো বাঘের পিঠে আরও একটা হিংস্র বাঘ বসে ছিল। বদনোয়া।

ওর রিভলভারটা প্যান্টের বাঁ-দিকের কোমরে গোঁজা। ওটা থেকে একটু আগে ফায়ার করা হয়েছে বলে এখনও গরম।

বেশ কিছুক্ষণ এ-রাস্তা সে-রাস্তায় ঘোরাঘুরির পর বদনোয়া একটা দেশি মদের *ঠেকের* কাছে বাইক থামাল।

তিনজন খদ্দের দোকানের বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে বসে ছিল। তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা আলুথালু, নিয়ন্ত্রণহীন। হাত-পা এদিক-সেদিক ছড়ানো, মাথা একপাশে হেলে আছে।

আর-একজনের অবস্থা তুলনায় অনেক উন্নত। হাতে বোতল এবং গ্লাস। সে মাঝে-মাঝে রোবটের ঢঙে বোতল থেকে গ্লাসে তরল ঢালছে এবং গ্লাসটা একদম ঠিকঠাক নিজের ঠোঁটে পৌঁছে দিচ্ছে।

তার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল বদনোয়া। কাঁধ ধরে রীতিমতো ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে সজাগ করল। তারপর হিন্দিতে সুখারামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে ওর খোঁজ-খবর করতে লাগল। কিন্তু ছেলেটা বদনোয়ার সব প্রশ্নের উত্তরেই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়তে লাগল।

একসময় বদনোয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল। ডানপকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে নম্বর লাগাল।

'ঝাম্‌সা, তু কঁহা হ্যায় রে?'

'তেজানি মোড়ে এসেছি, বস্‌...।' ঝাম্‌সা জবাব দিল। ফোন বাজতেই ও বাইক থামিয়ে ফোন ধরেছিল। কিন্তু ওর চোখ চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক

নড়ছিল। সুখারাম নস্কর নামে কুত্তাটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

'কোনও খবর পেলি?'

'না, বস্। তবে এদিকটায় আসতে পারে। এখানে ছুপে যাওয়ার অনেক খোপ-খোপানি আছে। আমি ছানবিন করে রিপোর্ট দিচ্ছি—।'

বদনোয়া আপনমনে একটা খিস্তি দিল। ওর ভেতরে রাগ গরগর করছিল। এত বড় সাহস! বদলা নিতে বাঘের মুখের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে চাম্পুর বুকে ছুরি গেঁথে দেয়!

জামিয়া আর পিল্লের কথা ভেবে বদনোয়ার মনে কাঁটা খচখচ করে উঠল। ওরা এখনও ফিরল না কেন? এতক্ষণ ধরে একটাও ফোন করল না কেন? বদনোয়া আর ঝাম্সা যতবারই ফোন করেছে ওদের ফোন শুধু রিং হয়ে গেছে—কেউ ধরেনি।

'ঝাম্সা, শোন, তুই মালটাকে দেখতে পেলেই আমাকে ফোন লাগাবি। আমি ঝট্সে স্পটে চলে যাব। তারপর দুজনে মিলে যা করার করব। তুই একা কোনও রিস্ক নিবি না, সম্ঝা? মালটা খতরনাক আছে—।'

ঝাম্সা হাসল—আত্মবিশ্বাসের হাসি। তারপর বলল, 'বেফিকর রহো, বস্। সুখারামকে পেলে আমার দেড়-ফুটিয়া সোর্ড দিয়ে ওকে প্রথমে কিমা বানাব। তারপর তোমাকে তোফা দেব...।'

বদনোয়া হাসল না। আবেগহীন গলায় বলল, 'সে যা-ই কর—আমাকে ফোন করবি...।'

চাপদাড়িতে আঙুল ঘষতে-ঘষতে বদনোয়া বাইকের দিকে এগোল। একটা ঢেঁকুর তুলল। একঝলক মদের গন্ধ বেরিয়ে এল। এই গন্ধ ওর খুব চেনা হলেও এখন গন্ধটাকে একটু অচেনা মনে হল।

মনে হল, এর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ মিশে আছে।

●

ঝাম্সা বাইক নিয়ে তেজানি মোড়ে ধীরে-ধীরে চক্কর কাটছিল। আর মনে-মনে হিসেব কষছিল, ও যদি সুখারাম হত তা হলে কোথায় গিয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করত।

ঝাম্সা ঠান্ডা মাথার ছেলে—বদনোয়ার মতো রগচটা নয়। ও এ পর্যন্ত যা কিছু করেছে সবই ঠান্ডা মাথায় করেছে। লড়াইয়ের সময় সোর্ডটা যখন ও হাতে নেয় তখন ওর মনে হয়, সোর্ডটা কোনও আলাদা অস্ত্র নয়—বরং ওর ডানহাতটা যেন কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় আরও দেড়-ফুট লম্বা হয়ে গেছে। যখন ঝাম্সা সোর্ড চালায়, তখন ওর মনে হয় ও হাত চালাচ্ছে। ব্যাপারটা

ওর কাছে এতটাই সহজ আর স্বাভাবিক।

তেজানি মোড় থেকে দুটো চওড়া রাস্তা 'ওয়াই'-এর মতো দু-দিকে এগিয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা রাস্তা চলে গেছে ট্রাক টার্মিনালের দিকে। কী মনে হওয়াতে ঝাম্‌সা সেই রাস্তায় বাইক ছুটিয়ে দিল।

একটু এগোতেই রাস্তাটার চরিত্র পালটে গেল। ছেঁড়াখোড়া পিচের বদলে ইটের মাপের কালো পাথরের টুকরো শুরু হল। যেহেতু এ-রাস্তায় বেশিরভাগ সময় ভারী-ভারী ট্রাকের আনাগোনা, তাই এই ব্যবস্থা।

রাত দেড়টা বেজে গেছে। রাস্তায় লোকজন কেউ নেই। লাইটপোস্টের নিস্তেজ আলোয় ফাঁকা রাস্তাটা আরও বেশি ফাঁকা লাগছে।

ঝাম্‌সা বাইকের গতি কমাল। ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। আর একইসঙ্গে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল।

রাস্তার ধারে নানান ধরনের ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কোনওটা খালি, কোনওটা ভরতি। লোড করা মালের ওপরে তেরপলের ছাউনি আর নাইলন-দড়ির বাঁধুনি। ট্রাকগুলোর ফাঁকফোকরে অন্ধকার।

চালাঘর থেকে বাইক নিয়ে রওনা হওয়ার পর থেকে সুখারামের খোঁজে ঝাম্‌সা এর মধ্যে অনেক এলাকাতেই ঘুরে বেড়িয়েছে। যেটা ওর জানা ছিল না, সুখারামও ওকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। অথবা বদনোয়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

সুখারাম একসঙ্গে ওদের দুজনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চায়নি। কারণ, তা হলে প্রতিশোধের দুইয়ের পাঁচ অংশ অপূর্ণ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই সুখারাম একের পাঁচ অংশের ইনস্টলমেন্টে কাজটা শেষ করতে চাইছিল। তবে ইনস্টলমেন্ট হিসেবে বদনোয়া কিংবা ঝাম্‌সা নিয়ে ওর মধ্যে কোনও বাছবিচার ছিল না।

এ ছাড়া কিছুটা সময়ও সুখারাম হাতে চাইছিল—আর চাইছিল একটা অস্ত্র।

ঝাম্‌সা রাস্তা ধরে আরও এগোচ্ছিল। চোখে সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি। ও জানে, সুখারামের কাছে রিভলভার নেই। তাই চাম্পুকে ও দূর থেকে গুলি করেনি। ছুরি হাতে নিয়ে নিতান্ত দুঃসাহসে বিপদসীমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

সেই ছুরিটাও গেঁথে আছে চাম্পুর বুকে। সুতরাং, ছেলেটার কাছে এখন কোনও অস্ত্র নেই।

এইসব অঙ্ক কষতে-কষতেই ঝাম্‌সা একটা ঘেরা এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বারো ফুট উঁচু লোহার জাল দিয়ে ঘেরা বিশাল এলাকা। তার কোথাও-কোথাও জাল জং ধরে ছিঁড়ে গেছে। দরজা হয়তো এককালে ছিল—এখন

সেখানে বিশ ফুট চওড়া হাঁ—কোনও পাল্লা নেই।

ঘোরা এলাকার একপ্রান্তে, অনেকটা দূরে, কয়েকটা ভাঙাচোরা ট্রাক দাঁড়িয়ে। তার পাশে টিনের চালে ছাওয়া কয়েকটা তালিমারা ঘর। ছিরিছাঁদহীন ঘরগুলো এ-ওর গায়ে হেলে আছে। কোনওটার চাল ভাঙা, কোনওটার বা দেওয়াল নেই।

ঘরগুলোর পাশে টিনের ড্রামের পাহাড়। তাদের তিনটে চূড়া দূর থেকেই চোখে পড়ছে।

ঝাম্‌সা ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে জাল ঘেরা এলাকাটা দেখতে-দেখতে পেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎই পিছন থেকে কে ওকে ডাকল।

'এই সালা, সুয়ার কা বাচ্চা!'

বাইক থামাল ঝাম্‌সা। শব্দ লক্ষ্য করে মাথা ঘোরাল।

সুখারাম নস্কর।

বাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ সুখারাম একটু আগেই শুনতে পেয়েছে। তখনই ওর এলোমেলো খোঁজ শেষ হয়েছে। বুঝতে পেরেছে, ঘটনাচক্রে ওরা দুজন শত্রু কাছাকাছি চলে এসেছে।

এবার একের পাঁচ অংশের যুদ্ধ।

●

সুখারামের হাতে একটা ইট। আরও ভালো করে বলতে গেলে ইটের মাপের একটা পাথর। এটাই ওর অস্ত্র। পাথুরে রাস্তার পাশ থেকে ও কুড়িয়ে নিয়েছে।

ঝাম্‌সা সুখারামের ছায়া-ছায়া কালো চেহারাটা ভালো করে ঠাহর করে ওঠার আগেই সুখারাম হাতের ইটটা উঁচিয়ে ঝাম্‌সাকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে।

ঝাম্‌সা বাইক থামালেও ইঞ্জিন বন্ধ করেনি। সুখারাম কী করতে চলেছে আঁচ করে ও এক হ্যাঁচকায় বাইকটাকে সামনে এগিয়ে দিল, আর একইসঙ্গে মাথা নীচু করল। কারণ, ছুটন্ত অবস্থাতেই সুখা হাতের অস্ত্রটাকে ছুড়ে দিয়েছে।

ইটটা ঝাম্‌সার গায়ে লাগল না। লোহার জালে গিয়ে লাগল। তারপর পাথুরে জমিতে ছিটকে পড়ল। শব্দ করে দুবার লাফিয়ে তারপর থামল।

সুখারামের ভেতরে একটা অপার্থিব রাগ গরগর করছিল। ঝাম্‌সাকে যেমন করে হোক বাইক থেকে ফেলে দিতে পারলেই ওর অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে যাবে। তারপর...।

সুখা ছুটতে শুরু করল। এখন কী করবে ও? কী করবে?

পিছনে বাইকের আওয়াজ পেল। ঝাম্‌সা তাড়া করে আসছে। কিন্তু সামনেই লোহার জালের দেওয়াল। ডানদিকে ঘুরে দৌড়তে পারলে বোধহয় ভালো হত। ওই ভাঙাচোরা ট্রাকগুলোর কাছে পৌঁছতে পারলে হয়তো কোনও অস্ত্র খুঁজে পাওয়া যেত—লোহার কোনও রড বা গাড়ির পার্টস।

তাই ডানদিকে বাঁক নিল সুখারাম। আর তখনই দেখতে পেল ঝাম্‌সা দূরে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাইকের ইঞ্জিন গরগর করছে।

ঝাম্‌সার কোনও তাড়া ছিল না। ও বুঝতে পারছিল, সুখারাম নস্কর জাল ঘেরা খাঁচায় বন্দি—তা সে-খাঁচা যতই বড় হোক না কেন। এই খাঁচা থেকে বেরোতে হলে ঝাম্‌সার বাইকের পাশ দিয়েই ওকে বেরোতে হবে।

ঝাম্‌সার ফোন বাজছিল। পকেট থেকে ফোন বের করে নম্বরটা দেখল ও।

বদনোয়া।

হাসল ঝাম্‌সা। ওর হাতে এখন খুব জরুরি কাজ। ওই হারামির পিল্লাটাকে কিমা বানাতে হবে। এখন কেউ ওকে ডিসটার্ব করুক ঝাম্‌সা চায় না।

বদনোয়ার কল কেটে দিয়ে মোবাইল ফোনের সুইচ অফ করে দিল ঝাম্‌সা। আগে কাজ পরে ফোন।

সুতরাং, বাইকের কেরিয়ার থেকে সোর্ডটা ডান হাতে তুলে নিল। শরীর এবং হাত ঝুঁকিয়ে সোর্ডের ডগাটা মাটিতে ঠেকাল। তারপর বাইক ছুটিয়ে দিল সুখারামকে লক্ষ্য করে।

ঝাম্‌সার সোর্ডের ডগাটা পাথরে ঘষা খাচ্ছিল। ছুরিতে শান দেওয়ার সময় শানপাথর থেকে যেমন আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোয়, ঝাম্‌সার সোর্ডের ডগা থেকে ঠিক সেরকম আগুনের ফোয়ারা ছিটকে বেরোচ্ছিল। আর শিকার ধরার আনন্দে ঝাম্‌সার চোখে-মুখে নৃশংস উল্লাসের জ্যোতি ধকধক করছিল।

সুখারাম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ওই তো, ঝাম্‌সার মোটরবাইক ওর দিকে ধেয়ে আসছে! তার পাশে-পাশে আগুনের ফুলকির রেখা এঁকে দিচ্ছে ঝাম্‌সার সোর্ড! এখন কী করবে সুখা?

বাইকটা যখন খুব কাছে এসে পড়েছে তখন সুখারাম জাল লক্ষ্য করে বনবেড়ালের মতো লাফ দিল। জালের তার আঁকড়ে ধরে টিকটিকির মতো ক্ষিপ্রতায় তরতর করে কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল।

আর ঠিক তার পরের মুহূর্তেই ঝাম্‌সার বাইক তারের জালে এসে ধাক্কা খেল। সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় ঝাম্‌সা বাইকসমেত ছিটকে পড়ল। নেহাত কপালজোরে বাইকের নীচে ওর পা চাপা পড়ল না।

ছিটকে পড়ে গেলেও সোর্ডের হাতল ঝাম্‌সার শক্ত মুঠোয় ধরা দিল। পাথুরে মেঝেতে শোওয়া অবস্থাতেই ও দেখতে পেল, সুখারাম জাল ছেড়ে

লাফিয়ে পড়েছে নীচে। তারপর তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতো ছুট লাগাল।

ঝাম্‌সার পাশ দিয়ে সুখা ছুটে পালানোর সময় পেশাদার খুনি ঝাম্‌সা শুয়ে-শুয়েই সোর্ড চালিয়ে দিল—যদি শুয়োরের বাচ্চাটাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়।

না, পাওয়া গেল না।

তাই ঝাম্‌সা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাত হয়ে পড়ে থাকা বাইকটার পিছনের চাকা তখনও ধীরে-ধীরে ঘুরছিল। সেটাকে টান মেরে তোলার জন্য হাতের সোর্ডটা আড়াআড়িভাবে দাঁতে কামড়ে ধরল। তারপর বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে তাতে সওয়ার হয়ে বসল।

স্টার্ট। গর্জন। ছুট।

সুখারাম তখন টিনের ড্রামের পাহাড়ের দিকে ছুটেছে। ওর শরীর ক্লান্ত, নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে শ্বাস বেরোচ্ছে, খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। কিন্তু বুকের ভেতরের জ্বালা, রাগ, আর জেদ সবকিছু চাপা দিয়ে দিয়েছে।

তাই সুখারাম, লং ডিসট্যান্স রানার, দৌড়চ্ছে।

ঝাম্‌সার বাইক গোঁ-গোঁ করে ছুটে আসছিল। সোর্ডের ইস্পাতের ফলা পাথরে ঘষা খেয়ে আগুনের ফুলকির রেখা এঁকে চলেছে। অন্ধকারে সেটাকে ছুটন্ত তারাবাজি বলে মনে হচ্ছে।

সুখারাম ড্রামগুলোর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর পাগলের মতো একটা হাতিয়ার খুঁজছিল।

ড্রামগুলো সার বেঁধে শোয়ানো। একটা সারির ওপরে আর-একটা। তার ওপরে আবার একটা। সারিগুলো যত ওপরে উঠছে ততই একটা করে ড্রাম কমছে। সবমিলিয়ে একটা প্রকাণ্ড ত্রিভুজের চেহারা নিয়েছে।

জায়গাটা তেলচিটে, পিছল। ড্রামগুলোও তাই। বোধহয় ওগুলো পোড়া মোবিল চালানের কাজে ব্যবহার করা হয়।

জাল ঘেরা এলাকার বাইরে দুটো ল্যাম্পপোস্টে বাল্‌ব জ্বলছে। সেই আলোর সামান্য ছটা নেহাতই দয়া করে ড্রামগুলোর আশেপাশে ছিটকে এসে পড়েছে। সেই আলোকে আঁকড়ে ধরে সুখারাম মাথা ঝুঁকিয়ে নজর চালাচ্ছিল।

কোথায় হাতিয়ার? কোথায়?

তাড়াহুড়োয় ইটের মাপের একটা কালচে পাথর খুঁজে পেল সুখা। কিন্তু ওটা হাতে তুলে নেওয়ার আগেই ঝাম্‌সার বাইক কাছে চলে এল।

সুখারাম বাইকের আওয়াজ পাচ্ছিল, চোখের কোণ দিয়ে আলোর ফুলকি দেখতে পাচ্ছিল, আর ছুটন্ত বাইকটাকে কীভাবে যেন অনুভবও করতে পারছিল।

ও চকিতে ড্রাম বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। তিনটে ড্রামের জোটে একটা করে ছোট ত্রিভুজের মতো ফাঁক তৈরি হয়েছে। সেইসব খাঁজে থাবা আঁকড়ে,

পায়ের পাতা ঢুকিয়ে ও সরীসৃপের মতো ওপরে উঠে গেল। আর ঝাম্‌সা ওকে লক্ষ্য করে সোর্ড চালাল।

সুখার পিঠে কেউ যেন আগুনের রেখা টেনে দিল। জ্বালা-পোড়া যন্ত্রণায় ওর পিঠের প্রতিটি পেশি কুঁকড়ে গেল। মুখ দিয়ে আহত জন্তুর গোঙানি বেরিয়ে এল। ঝাম্‌সার সোর্ড ওর নাগাল পেয়ে গেছে।

কিন্তু একইসঙ্গে ড্রামের পাহাড় নড়ে উঠল।

কারণ, সুখারামকে কিমা বানানোর নেশার ঘোরে ঝাম্‌সা এতই মাতাল ছিল যে, বাইকের সঙ্গে ড্রামের পাহাড়ের দূরত্ব যে বিপজ্জনকভাবে কমছে সেটা আর খেয়াল করেনি।

তাই ড্রামের স্তূপের সঙ্গে ওর ছুটন্ত বাইকের জোরালো সংঘর্ষ হল। বাইকের ধাক্কায় খালি ড্রামগুলোয় শুধু যে প্রচণ্ড শব্দ হল তা-ই নয়, তিনটে ড্রামকে সঙ্গে নিয়ে ঝাম্‌সার বাইক ড্রামের পাহাড়ের নীচে গুঁতিয়ে ঢুকে গেল। ফলে ওপরের ড্রামগুলো হুড়মুড় করে নীচে পড়তে লাগল। মেঘ ডাকার মতো গুড়গুড় শব্দ হতে লাগল।

একটা ড্রামের ঢাকনার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঝাম্‌সার মুখ থেঁতলে গিয়েছিল। ওর কপালটা বাড়ি খেয়েছিল ড্রামের শক্ত গোল কানায়। ফলে ও যখন বাইক থেকে ছিটকে পড়ল তখন ওর কপাল ফেটে বীভৎসভাবে রক্ত পড়ছে। নাক-মুখ থেবড়ে গেছে। একটা দাঁত খসে গিয়ে মাড়ি থেকে কাঁচা রক্ত বেরোচ্ছে।

ঝাম্‌সা কোনও যন্ত্রণা টের পাচ্ছিল না, কারণ সংঘর্ষের সঙ্গে-সঙ্গেই ও অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওর মুখ-চোখ লাল রঙে মাখামাখি। ও চিত হয়ে তেলচিটে জমির ওপরে পড়ে ছিল। কিন্তু আশ্চর্যভাবে দেড়ফুট সোর্ডটা তখনও ওর হাতের মুঠোয় ধরা।

সংঘর্ষের পর সুখারাম কাত হয়ে পড়তে-পড়তেও নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ওর হাতের থাবা সেরকম কিছু আঁকড়ে ধরতে পারেনি। তাই হাঁচোড়-পাঁচোড় করে কোনওরকমে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করতে-করতে ও নীচে খসে পড়ল। অল্পের জন্য ওপর থেকে গড়িয়ে পড়া ড্রাম সরাসরি ওর মাথায় এসে লাগল না।

সুখারাম চিতপাত হয়ে পড়েছিল পাথুরে জমিতে। তারপর কিছুক্ষণ ওর আর কিছু মনে নেই।

একটু পরে চোখ যখন খুলল তখন ওর নজর গেল কালো আকাশের দিকে। আবার সেখানে মেঘ জমছে। তারারা একে-একে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

মাথার পিছনটা ব্যথা করছিল। দপদপ করছিল। একইসঙ্গে ডানহাতের ডানার কাছটায় ব্যথা। ডান পায়েও ব্যথা টের পাওয়া যাচ্ছে। গায়ে ড্রামের তেল-কালি লেগে আছে।

ভগবানকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিল সুখারাম, কারণ তিনি বেশিক্ষণের জন্য ওকে অজ্ঞান করে রাখেননি। সেটা হলে যে-কাজটা এখন ওর করার কথা সেই কাজটা বাকি থেকে যেত ঃ আরও একের পাঁচ অংশের সেটল্‌মেন্ট।

শুয়ে-শুয়েই পাশ ফিরে তাকাল।

ঝাম্‌সা পড়ে আছে—রঙিন ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি পুতুলের মতো। কপাল-মুখ সব রক্তে মাখামাখি। অস্ত্রটা হাতের মুঠোয় ধরা।

সুখারাম উঠে বসল। তখন বুঝল, ওর শরীরের ব্যথাগুলো গ্রাহ্য করার মতো বিরাট কিছু নয়। তার ওপর মা আর চোলির ডাক শুনতে পেল ও। একটা ধাতব টানেলের মধ্যে দিয়ে ওদের ফাঁপা চিৎকার প্রতিধ্বনি তৈরি করতে-করতে ছুটে আসছে।

সুখারাম উঠে দাঁড়াল। ভূতগ্রস্ত রোবটের মতো ঝাম্‌সার কাছে এগিয়ে গেল। ঝুঁকে পড়ে দেড়ফুট সোর্ডটা ঝাম্‌সার অসাড় হাতের মুঠো থেকে এক হ্যাঁচকায় ছাড়িয়ে নিল। তারপর সোর্ডটাকে শূন্যে তুলে ঝাম্‌সার দেহটা নেই ভেবে ওটা সোজা গেঁথে দিল পাথরের জমিতে। একবার নয়—চার বার।

ঝাম্‌সা অজ্ঞান হয়ে ছিল বলে মরণ-ঝাটকা দিতে পারল না, কিন্তু সুখারাম বুঝল, একের পাঁচ অংশের সেট্‌লমেন্ট হয়ে গেছে।

ঝাম্‌সার পকেট হাতড়ে মোবাইল ফোনটা বের করে নিল। ওটা একবার দেখে নিয়ে পকেটে ঢোকাল। এবার মোটরবাইকটা দরকার।

তাই হাতের সোর্ড মেঝেতে নামিয়ে রেখে বাইকটার দিকে নজর চালাল সুখারাম। ড্রামের জটলার ভেতরে বাইকটা কাত হয়ে আটকে আছে। বাইকের ইঞ্জিন এখনও চাপা গর্জনে গরগর করছে।

একটা-একটা করে ড্রাম সরিয়ে বাইকের কাছে গেল। ঝুঁকে পড়ে বাইকের হাতল চেপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে পিঠের জ্বালাটা চারগুণ হয়ে গেল। কিন্তু সুখারাম সেটা ভ্রূক্ষেপ করল না। কারণ, বুকের জ্বালাটা এখনও এর শতগুণ।

অনেক কসরত করে বাইকটাকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। এর আগে বারকয়েক ও বন্ধুবান্ধবের বাইক চালিয়েছে। সাইকেল চালানো দিয়ে ওর বালক-জীবন শুরু হয়েছিল। তারপর সময়ে-সময়ে বাইক চেখে দেখার সুযোগ হয়েছে। একসময় শখ করে পাঁউরুটি-বিস্কুটওয়ালাদের সাইকেল-ভ্যান দুষ্টুমি করে চালিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওপরওয়ালার দুষ্টুমিতে সেই সাইকেল-ভ্যান চালানোটাই পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ আবার ও একটা গোটা মোটরবাইক হাতে পেয়েছে। এবার শুধু বদনোয়াকে হাতে পাওয়া বাকি।

সোর্ডটা বাইকের কেরিয়ারে আটকে দিয়ে বাইকে চড়ে বসল। তারপর কয়েক সেকেন্ড কী চিন্তা করে ঝাম্‌সার মোবাইলটা অন করে খুটুর-খাটুর করতে

লাগল। বদনোয়ার ফোন-নম্বরটা ওর দরকার।

দু-চারবার বোতাম টিপতেই ফোন-নম্বরটা মোবাইল ফোনের পরদায় ভেসে উঠল।

সুখারামের রগের কাছে একটা শিরা দপদপ করছিল। রক্তের কণাগুলো পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। ওদের খিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে।

'ডায়াল' বোতামটা টিপল সুখা। 'কলার টিউন'-এর ঝিনচ্যাক হিন্দি গান বেজে উঠল। গান দু-লাইন বাজতে না বাজতেই বদনোয়া ফোন ধরল।

'কেয়া রে? সালে কা কুছ পতা চলা?'

'হাঁ, বস—।' মুখের কাছে কয়েকটা আঙুল রেখে একটু চাপা গলায় জবাব দিল সুখা। আঙুলের গরাদে ধাক্কা খেয়ে সুখারামের গলার স্বর খানিকটা বদলে গেল। তা ছাড়া গলা চেপে কথা বলায় বদনোয়া ওকে ঝাম্‌সা বলে ভুল করল।

'কাঁহা? কাঁহা হ্যায় উও গিদ্ধর কি আওলাদ?' বদনোয়ার গলা থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোচ্ছে।

'সালে কো জিন্দা লেকে আ রহা হুঁ—' জড়ানো চাপা গলায় বলল সুখা। কায়দা করে তার সঙ্গে একটু হাঁপানির হাঁসফাঁস জুড়ে দিল। তারপর ঃ 'তুম কাঁহা হো, বস?'

'আমি টাওয়ার কোম্পানির গোডাউনের কাছে—খালধারে...।'

জায়গাটা সুখারামের চেনা।

পোড়া বস্তি থেকে খালধার বরাবর দেড় কি দু-কিলোমিটার উত্তরদিকে টাওয়ার নামে একটা বিয়ার কোম্পানির অফিস ছিল। তার পাশেই ছিল ওদের বিশাল গোডাউন।

সবই 'ছিল', কারণ এখন আর কিছুই নেই। বছর দশেক আগে ওই গোডাউনে আগুন লাগে। সেই দাউদাউ আগুন সব গিলে ফেলেছিল। তারপর থেকে শুধু গোডাউনটার পোড়া কংকাল পড়ে আছে। শোনা যায়, গোডাউনের ওই কংকালের ভেতরে মানুষের কয়েকটা পোড়া কংকাল থাকলেও থাকতে পারে। রাতে ওটার পাশ দিয়ে গেলে নাকি এখনও আগুনে পোড়া মানুষের চিৎকার শোনা যায় আর মাংস পোড়া কটু গন্ধ পাওয়া যায়।

'ও. কে., বস—।' বলে ফোন কেটে দিল সুখারাম। বাইকে স্টার্ট দিয়ে ক্লাচ চেপে গিয়ার দিল। বাইক ছুটতে শুরু করল।

সুখারামের বড় অদ্ভুত লাগছিল। মুখে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা, পিঠে জ্বালা, মাথায় আগুন, বুকে প্রতিশোধের বিষ, অথচ মনটা ঠান্ডা ইস্পাতের মতো শান্ত।

শরীরটা ক্লান্ত হলেও সুখারাম রোবটের মতো একগুঁয়েভাবে শরীরটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।



কোথায় তুই, বদনোয়া? কোথায়?

কয়েক মিনিটের মধ্যে খালধারের রাস্তায় এসে পড়ল। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় বাইক লাফাতে-লাফাতে ছুটছে। ওই তো দেখা যাচ্ছে, আকাশ জুড়ে টাওয়ার কোম্পানির পোড়া গোডাউনের কালো ছায়া। তার পাশে অনেক উঁচুতে টাওয়ার কোম্পানির লাল-নীল রঙের নিওন সাইন। এখনও সেটা জ্যান্ত—জ্বলছে-নিভছে। বোধহয় পোড়া গোডাউনের ডেডবডিটাকে পাহারা দিচ্ছে।

মোটরবাইকের হেডলাইটের আলোয় বদনোয়াকে দেখতে পেল। খালধারের ভাঙাচোরা রাস্তার একদিকে টাওয়ার কোম্পানির গোডাউন, আর অন্যদিকে মা-বোনের মহাঘাতক। বাইকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে—হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

বাইকের গতি কমাতে লাগল সুখারাম। লক্ষ করল, বাইকটাকে দেখে বদনোয়া হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর ডানহাতটা পকেটে ঢোকাল।

সুখারাম জানত বদনোয়া ঝাম্‌সার বাইকটা আগে চিনতে পারবে, তারপর—কয়েক সেকেন্ড পর—বুঝতে পারবে বাইকের ওপরে যে বসে আছে সে একা। এবং সে ঝাম্‌সা নয়—অন্য কেউ।

কিন্তু ওই কয়েক সেকেন্ডই যথেষ্ট। যে-কাজের জন্য ওই কয়েক সেকেন্ড যথেষ্ট সেই কাজটাই এখন শুরু করল সুখারাম।

আচমকা বাইকের গতি বাড়িয়ে দিল। এক ঝটকায় বাইকটা গর্জন তুলে চিতাবাঘের গতি নিল। বদনোয়াকে লক্ষ্য করে পাগলের মতো ছুটে চলল।

বদনোয়া পকেট থেকে ওর রিভলভারটা বের করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুরোপুরি বের করে ওঠার আগেই সুখারামের বাইক সরাসরি এসে ওর পেটে ধাক্কা মারল।

আত্মরক্ষার জন্য বদনোয়া বাঁ-হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সংঘর্ষের অভিঘাতে ওর গোটা দেহটা সামনে ঝুঁকে পড়ল। সুখারামের মাথার সঙ্গে ওর মাথা ঠুকে গেল। যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এল দুজনের মুখ থেকেই। কিন্তু শব্দগুলো এমন জড়িয়ে গেল যে, আলাদা করে চেনা গেল না।

সংঘর্ষের সময় স্থিতিজাড্য বদনোয়ার ওপরে কাজ করেছিল। তাই ডানহাতটা ও আর পকেটে ঢোকাতে পারেনি—রিভলভারটা পকেটেই থেকে গেছে। আর ওর ভারী শরীরটা শূন্যে তুলে নিয়েছে সুখারামের বাইক। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় বদনোয়া বাইকের হাতল আঁকড়ে ধরেছিল। ওই অবস্থাতেই সুখার বাইক ওকে 'কোলে' করে ছুটে চলল।

মাথায়-মাথায় ঠুকে গিয়ে সুখারামের অসহ্য ব্যথা করছিল। মাথার ভেতরে পাগল করা দপদপানি। কিন্তু ওর হাত এক অমানুষিক জেদে অ্যাকসিলারেটর আঁকড়ে ধরে ছিল। গোঁ-গোঁ করতে-করতে বাইকটা ছুটে চলল খালের দিকে।

ইট-পাথরে ঠোকর খেয়ে বাইকটা লাফাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই দু-চাকাওলা গাড়িটা খালপাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

নামতে-নামতে নিয়ন্ত্রণহীন বাইকটা একটা তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের পাখির মতো শূন্যে ছিটকে গেল বদনোয়া আর সুখারাম। বাতাসে বৃত্তচাপ এঁকে ওদের শরীর দুটো খালের জলে গিয়ে পড়ল। কয়েক লহমার তফাতে দুটো 'ঝপাং শব্দ হল। খালের তেলচিটে কালো জল ওদের অজগর সাপের মতো গিলে ফেলল।

তেঁতুল গাছের গুঁড়ি আর একটা পাথরের ফাঁকে বাইকটা আটকে গিয়েছিল। বাইকের ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশ ক্ষয়ে আসছিল। হেডলাইটের আলোটাও মলিন হয়ে যাচ্ছিল। এদিক-ওদিক থেকে ছিটকে আসা ল্যাম্পপোস্টের আলো খালের জলে পড়ে চিকচিক করছিল। দুটো শরীর খালের জলে আলোড়ন তোলায় চিকচিক করা আলোর বিন্দুগুলো এপাশ-ওপাশ দুলছিল।

একটু পরে সুখারামের কালো মাথাটা খালের জলের ওপরে ভেসে উঠল। ওর চোখ-মুখ-নাক জ্বালা করছে, নাকে আসছে কটু দুর্গন্ধ। চারপাশে নোংরা আবর্জনা আর পচা কচুরিপানা। জলের মধ্যে মিশে আছে থকথকে পোড়া মোবিল আর কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ। সুখারামরা ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত যে, এই খালের জলে কেউ ডুবে মারা যাবে না, মারা যাবে বিষাক্ত দূষণে। ব্যাপারটা যে আসলে ঠিক কী সেটা সুখা এখন আন্দাজ করতে পারল।

খালটা তেমন গভীর নয়। জলের নীচে সুখার পা পাঁকের মধ্যে বসে যাচ্ছিল। ও হাত দিয়ে চোখ-মুখের ওপর থেকে কালো চটচটে জল সরাল। তারপর এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে বদনোয়ার খোঁজ করতে লাগল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বদনোয়ার মাথা দেখা গেল জলের ওপরে।

প্রাণপণে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, বাতাস টানার জন্য হাঁকপাঁক করছে।

সুখারাম ওর মাথা নামিয়ে নিল, প্রায় নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল জলে। তারপর খালের ধার ঘেঁষে ছেয়ে থাকা কচুরিপানার ঝাঁকের দিকে সরে যেতে লাগল।

দুর্গন্ধে সুখারামের দম আটকে আসছিল। কিন্তু প্রতিশোধের আক্রোশ ওকে সবকিছু সহ্য করার ক্ষমতা জোগাচ্ছিল।

আকাশে মেঘ অনেক গাঢ় হয়েছিল। হঠাৎই ছোট-ছোট বিদ্যুতের টুকরো ঝলসে উঠল সেখানে। তার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই চাপা গুড়গুড় আওয়াজ।

তখনই সুখারাম খেয়াল করল, বদনোয়ার ডানহাত উঁচিয়ে রয়েছে শূন্যে। সেই হাতের মুঠোয় ওর প্রিয় রিভলভার। ও এদিক-ওদিক নজর মেলে সুখারারাম

নস্করকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

জলে ভিজে যাওয়ার পর রিভলভার ঠিকঠাক কাজ করে কি না সুখা জানে না। তবে অনেক সিনেমায় ও নায়ককে জলের তলা থেকে গুলি ছুড়তে দেখেছে। তাই সাবধান থাকাটা দরকার।

কচুরিপানার ঝাঁককে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করল সুখারাম। একইসঙ্গে গা গুলিয়ে ওঠা ভাবটাকে দমিয়ে রাখতে দাঁতে দাঁত চাপল। হালকাভাবে হাত চালিয়ে খালের পাড়ে পৌঁছল।

খালের পাড়ে প্রচুর পরিত্যক্ত জিনিস আর আবর্জনা। তারই মধ্যে একটা লম্বা গাছের ডাল খুঁজে পেয়ে গেল। ফুট পাঁচেক লম্বা, সামান্য আঁকাবাঁকা, শক্তপোক্ত আর ভারী।

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ওটা আঁকড়ে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরে একধরনের আত্মবিশ্বাস আর শক্তি তৈরি হয়ে গেল। ডালটা ও নিঃশব্দে জলের মধ্যে টেনে নিল। জলের ওপরে বিছিয়ে থাকা কচুরিপানার জালের তলায় ঢুকে পড়ল। মাথা সামান্য উঁচিয়ে কচুরিপানার ফাঁকফোকর দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাতে লাগল।

বদনোয়া সতর্কভাবে পাঁকের ভেতরে পা ফেলছিল আর এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছিল। কোথায় গেল হারামি কা অওলাদ?

সুখাকে খুঁজতে-খুঁজতে খালের কিনারার দিকে এগোচ্ছিল বদনোয়া। হঠাৎই কচুরিপানার জাল ঠেলে একটা ভূত মাথা তুলল। তার হাতে ধরা একটা আঁকাবাঁকা লাঠি। বদনোয়া রিভলভার চালানোর আগেই লাঠিটা নিষ্ঠুরভাবে ওর ব্রহ্মতালুতে এসে পড়ল। একবার—দুবার।

তারপরই আর-একটা আঘাত এসে আছড়ে পড়ল ডান চোয়ালে। এবং আবার।

কালো ভূতটা একের পর এক নিষ্ঠুর আঘাতে বদনোয়ার মুখ আর মাথা গুঁড়ো করতে লাগল। একইসঙ্গে খ্যাপা জানোয়ারের মতো অর্থহীন চিৎকার করতে লাগল।

একটু পরেই বদনোয়া খালের জলে তলিয়ে গেল। কালো গাঢ় জলে বুড়বুড়ি উঠল কিছুক্ষণ। তারপর সব শেষ।

লাঠিটা ফেলে দিয়ে খাল থেকে টলতে-টলতে উঠে এল সুখারাম। আবেগে ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। সারা গায়ে কালো তেলচিটে আঠালো তরল আর কয়েকটা কচুরিপানা।

এলোমেলো পা ফেলে খালপাড়ের চড়াই বেয়ে ও কোনওরকমে উঠে এল রাস্তায়। মা, চোলি, তোরা দ্যাখ—আমার কাজ শেষ। খতমের খাতায় সবক'টা জানোয়ারের নাম তুলে দিয়েছি আমি।

রাস্তার ধারে টলে পড়ে গেল সুখারাম। সেই অবস্থাতেই মা আর চোলির সঙ্গে আপনমনে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল।

আকাশের দিকে তাকাল সুখারাম। গায়ের জ্বালা-পোড়া কমাতে ও ভগবানের কাছে বৃষ্টি চাইল। একইসঙ্গে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পুলিশের সাইরেন বাজানো টহলদারী জিপের জন্যও প্রার্থনা করল।

ভগবান ওর নীরব প্রার্থনায় সাড়া দিল।

প্রথমে বৃষ্টি এল।

তার কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ।

●

নিউ সিটিতে সাজ-সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। কারণ, সিন্ডিকেট কিল গেমের তারিখ ঘোষণা করেছে। সেপ্টেম্বরের দু-তারিখ, রবিবার।

সারা শহর জুড়ে জিশানের পাবলিসিটির হোর্ডিং। কোনও জায়গায় আবার জিশানের স্টিল ফটোগ্রাফের বদলে রঙিন ভিডিয়ো। সেইসব ভিডিওয়োতে জিশানের ট্রেনিং অথবা নানান গেমের রোমাঞ্চকর দৃশ্য ঃ স্নেক লেকের দৌড়, কমব্যাট পার্কে কোমোডোর সঙ্গে লুকোচুরি, কিংবা জাব্বার সঙ্গে পিট ফাইট।

কিন্তু জিশানের সঙ্গে কিল গেমে লড়বে কারা? কোন তিনজন খুনিকে বেছে নেওয়া হবে জিশানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে?

না, সেটা এখনও জানায়নি সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন। তার বদলে ওরা টিভির দর্শকদের নিয়ে একটা কনটেস্ট শুরু করে দিয়েছে। সেন্ট্রাল জেলের বারোজন খুনের আসামিকে ওরা বেছে নিয়েছে। তাদের প্রত্যেকের ফেরোসিটি কোশেন্ট আটের ওপরে। টিভিতে সেই বারোজনের ক্রিমিনাল রেকর্ড্‌স দেখানো হচ্ছে। দেখানো হচ্ছে তাদের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, আর অন্যান্য রেকর্ড।

এইসব দেখে বিচার করে দর্শকদের বলতে হবে, কিল গেমের জন্য এদের কোন তিনজনকে বেছে নেবে সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন। যদি কোনও দর্শক তিন জনের নাম ঠিকঠাক বলে দিতে পারে তা হলে সে পাবে সেরা পুরস্কার—পঁচিশ লক্ষ টাকা। তার নীচেই রয়েছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার। পনেরো এবং দশ লক্ষ টাকা। বরাবরের নিয়ম অনুযায়ী বিজয়ীর সংখ্যা বেশি হলে পুরস্কারের টাকা তাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে।

দর্শকরা এই কনটেস্টে ফোন করে অথবা ইন্টারঅ্যাকটিভ প্লেট টিভির মাধ্যমে অংশ নিতে পারে।

এই প্রোগ্রাম চলার সময় দেখানো হচ্ছে প্রচুর বিজ্ঞাপন। তার মধ্যে

কোনও-কোনও বিজ্ঞাপন জিশানকে নিয়ে। ফলে সেপ্টেম্বরের দু-তারিখকে নিয়ে দর্শকদের উত্তেজনা উৎসাহ ক্রমশ বাড়ছে। আর দিন-কে-দিন দর্শকের সংখ্যা হাইপারবোলিক ফাংশানের ঢঙে বেড়ে চলেছে।

নিউ সিটির বড়-বড় রাস্তায় বিশাল মাপের অসংখ্য ডিজাইনার হোর্ডিং। তাতে শুধু লেখা ঃ 'সেপ্টেম্বর দুই। কে জিতবে?'

শহরের নানান জায়গায় কিল গেমের গিফ্‌ট আইটেমের স্টল বসেছে। সেখান থেকে সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের এজেন্টরা গেম সিটির মডেল বিক্রি করছে, বিভিন্ন কম্পিটিশনে জিশান যেসব পোশাক পরেছে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে, জিশানের লড়াইয়ের নানা ভঙ্গির মডেল বিক্রি হচ্ছে, কম্পিটিশনের বিভিন্ন মুহূর্তের ফটোগ্রাফ বিক্রি হচ্ছে, জিশান আর জাব্বার পিট ফাইটের ফাইবার পলিমারের মডেল বিক্রি হচ্ছে।

সারা শহর জুড়ে এককথায় টগবগে হইচই।

এসব দেখে ওল্ড সিটির সুপ্রাচীন জমকালো সময়ের দুর্গাপুজোর কথা মনে পড়ে যায়। সেই পুজোর পাঁচদিনের আনন্দকে একদিনে জড়ো করেও এই উল্লাসের তীব্রতা বোঝানো যাবে না।

জিশান গুনাজির সঙ্গে শহরের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর শহরের প্রাণস্পন্দনটাকে অনুভব করতে চেষ্টা করছিল। ও বুঝতে পারছিল, নিউ সিটিতে জন্মের উৎসবের চেয়ে মৃত্যুর উৎসব অনেক বড়।

কিল গেমের দিন যত কাছে আসছে জিশানের ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এর তীব্রতা তত বাড়ছিল। এখন ওর একার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জিম ঃ অ্যানালগ জিম আর ডিজিটাল জিম। এই জিমে জিশান একা-একা প্র্যাকটিস করে। নানা ধরনের লড়াইয়ের অনেক কলাকৌশল এখন ওর আয়ত্তে। তার সঙ্গে রয়েছে মডার্ন আর্মামেন্ট ট্রেনিং-এর সাপোর্ট।

ঘাম-ঝরা শরীর নিয়ে জিমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল জিশান। গায়ের রং আরও তামাটে হয়েছে। শরীরের সমস্ত পেশি উৎকটভাবে মাথাচাড়া দিয়ে আছে। সবমিলিয়ে ওকে দেখাচ্ছে দুর্গাপুজোর অসুরের মতো—পেশিসর্বস্ব একটা দানব।

অ্যানালগ জিমে জিশান ভ্যারিয়েব্‌ল ফোর্স নিয়ে ওয়ার্কআউট করে। আর ডিজিটাল জিমে ওর শরীরচর্চা ইমপ্যাক্ট ফোর্স নিয়ে। সেখানে আচমকা ঘুসি ছুড়ে দেওয়ার জন্য রয়েছে বক্সিং মেশিন। এই মেশিন থেকে দস্তানা পরা ধাতুর হাত আচমকা ছুটে আসে। শরীরের সঙ্গে এই যান্ত্রিক ঘুসির সংঘর্ষ হলেই সংঘর্ষের তীব্রতা এবং স্থায়িত্ব ডিজিটাল স্ক্রিনে ফুটে ওঠে। তা ছাড়া চট করে কীভাবে ঘুসি এড়ানো যায় সেই কৌশলও শেখা যায় এই যন্ত্র থেকে।

জিশানের জিম দুটোর দেওয়াল মানেই আয়না। আর ঘরে সাজানো রয়েছে

আধুনিক সব মেশিন। সবক'টা মেশনিই মিটারে-মিটারে ছয়লাপ।

জিশান রোজ এই দুটো জিমে যন্ত্রের সঙ্গে 'লড়াই' করে নিজের দক্ষতা এবং যোগ্যতার মান বিচার করে। একসময় ও শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে জিম থেকে বেরোয়। তারপর স্নান, খাওয়া আর বিশ্রাম।

রোজ বিকেলে গুনাজির গাড়ি করে বেরোয় জিশান। তারপর ইচ্ছেমতো সময় কাটিয়ে ঠিক রাত ন'টায় ও ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাবে সুধাসুন্দরীর কাছে ফিরে আসে। ওর কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম রিচার্জ করার জন্য। তখন ওর দেখা হয়ে যায় রোগা, লম্বা, ফরসা মেয়েটার সঙ্গে। যে-মেয়েটা উদ্ধত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। এবং শুধু বিজ্ঞানের চাকর—আর কারও নয়।

আজ ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাবের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় জিশানের মনে হল, সুধাসুন্দরীকে যে-প্রশ্নটা ও প্রথম দিন ম্যাজিক শট নেওয়ার সময় করেছিল সে-প্রশ্নের উত্তর এখনও জানা হয়নি। সুধাকে যখনই ও প্রশ্নটা করেছে তখনই ও কোনও-না-কোনওভাবে পাশ কাটিয়ে গেছে। আজ জিশানের মনে হল, অপেক্ষা অনেক হয়েছে—আর নয়। আজ জিশান জেদ ধরবে, বাচ্চা ছেলের মতো বায়না করবে।

ল্যাবে কাজকর্ম ঠিকমতোই এগোল। সুধা জিশানের শরীরের ভেতরে ঢোকানো সিলভার ক্যাপসুলটাকে রিমোট অপারেশানে রিচার্জ করে দিল। তারপর, যখন ল্যাব থেকে বেরিয়ে আসার পালা, তখন জিশান ওকে আলতো গলায় বলল, 'সুধা, প্রথম দিন আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি বলেছিলে ''কাল বলব।'' কাল-কাল করে তো দু-সপ্তাহ কেটে গেল। সত্যি করে আমাকে বলো দেখি, তুমি কি উত্তরটা বলতে চাও—নাকি চাও না?'

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুধা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ—বলতে চাই...।'

'তা হলে বলো। সেকেন্ড সেপ্টেম্বর আসতে আর মাত্র চব্বিশ দিন বাকি। আর...তার পর যদি বলতে চাও তা হলে...তা হলে আমার হয়তো...হয়তো আর শোনা হবে না।'

সুধাসুন্দরী অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জিশানের দিকে। ওর বড়-বড় চোখের দিকে তাকিয়ে জিশানের মনে হল, জিশান যেন একটা খোলা বই—আর মেয়েটা সেই খোলা বইটা অনায়াসে পড়ে নিচ্ছে।

কয়েকসেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল সুধা। তারপর ধীরে-ধীরে চোখ খুলল। নীচু গলায় বলল, 'জিশান, তুমি কাল বিকেলে একবার আমার ল্যাবে আসতে পারবে? এই ধরো পাঁচটা নাগাদ?'

জিশান ঘাড় নাড়ল ঃ 'হ্যাঁ, পারব—'

'তা হলে মনে করে এসো। পাঁচটা। তখন তোমার সব প্রশ্নের উত্তর

পেয়ে যাবে। সেকেন্ড সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তোমাকে আমি অপেক্ষা করাতে চাই না।' শেষ দিকে সুধাসুন্দরীর গলা ধরে এল। ও মুখ নামিয়ে নিল। আঙুলের ডগা দিয়ে চোখের কোণ মুছে দিল।

'আমি কি তোমাকে হার্ট করলাম?' জিশান ইতস্তত করে জানতে চাইল।

'না, না—।' মাথা নেড়ে মেয়ে বলল, 'কাল এসো। পাঁচটা—। ও, ভালো কথা, তুমি আমার ফোন নাম্বারটা রেখে দাও। রিমোট অপারেশান্স ল্যাবের কাছে এসে আমাকে ফোন কোরো—আমি একমিনিটের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে আসব...।'

কথা শেষ করে ফোন-নম্বর বলল সুধা।

জিশান পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করল। ফোনটা মুখের কাছে নিয়ে সুধার নম্বরটা উচ্চারণ করল। নম্বর মেমোরিতে ট্রান্সফার হয়ে গেল।

সুধাসুন্দরীর ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল জিশান।

●

কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে চারপাশে তাকাচ্ছিল জিশান। ঘরে বাড়তি কোনও আসবাব নেই, সাজসজ্জার বাড়তি কোনও উপকরণ নেই। এই ড্রয়িংরুমটার সঙ্গে 'ছিমছাম' শব্দটা বেশ মানানসই হয়। ঘরের মধ্যে রুম ফ্রেশনারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

জিশানের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেছিল সুধা। ওর হাতেও কফির কাপ। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট চুমুক দিচ্ছে।

'এই বাড়িটায় আমি থাকি। আমার যা-কিছু প্রয়োজন সবই এখানে আছে। যদি নতুন কোনও কিছুর দরকার হয় মার্শাল স্যারকে একবার ফোন করে জানালেই হল—দ্য রিকোয়েস্ট উইল বি অনারড্ উইদিন আ হুইফ।

'এই ঘরটা ড্রয়িংরুম। এর পাশেই আছে আমার লাইব্রেরি কাম স্টাডি। এ ছাড়া ভেতরদিকে একটা বড় ঘর আছে—সেটা বেডরুম। কফিটা শেষ করে নাও—পরে তোমাকে গোটা বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি...।'

জিশান ওর কথা শুনছিল আর মনে-মনে একটু অবাক হচ্ছিল।

একটা ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিল জিশান। তার জন্য ওকে নিজের ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে এল কেন সুধা?

অবাক হলেও চুপ করে রইল জিশান। ওর মনে হল, সুধা ওকে যা-যা বলতে চায় বলুক। আজ জিশান শুধু শুনবে—কিছু বলবে না।

গুনাজির গাড়ি করে ঠিক পাঁচটার সময় রিমোট অপারেশান্স ল্যাবে পৌঁছেছিল জিশান। তারপর সুধাসুন্দরীকে ফোন করে সেটা জানান দিতেই

একমিনিটের মধ্যে ও এসে হাজির।

'তোমার গাড়ি ছেড়ে দাও। তুমি আমার গাড়িতে যাবে।'

সুধা কথাটা এমনভাবে বলল যে, সেটা অনুরোধের বদলে দাবির মতো শোনাল।

জিশান একটু ইতস্তত করছিল। তাই দেখে সুধা বলল, 'আমি তোমাকে ঠিক রাত ন'টার সময়ে আমার ল্যাবে নিয়ে আসব—তোমার ক্যাপসুল রিচার্জের জন্যে। তারপর তুমি তোমার গাড়িতে যেয়ো...।'

গুনাজিকে সেরকমভাবেই বলে দিল জিশান। রিমোট অপারেশান্স ল্যাবের পার্কিং লটে গাড়ি রেখে গুনাজি জিশানের জন্য অপেক্ষা করবে।

তারপর সুধা ওর গাড়িতে গিয়ে বসল। জিশান ওর পাশে।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর জিশান শুধু একবার জিগ্যেস করেছিল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'তোমার প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে—।' জিশানের দিকে তাকিয়ে হেসেছে সুধা।

পনেরো কি কুড়ি মিনিট চলার পর গাড়ি এসে থেমেছে একটা একতলা বাড়ির সামনে।

জিশান নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল। চওড়া রাস্তার দুপাশে সার বেঁধে সাদা রঙের একতলা বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির মাথায় ডিশ অ্যানটেনা। বাড়িগুলোর স্টাইল খুব আধুনিক। বাড়ির সামনে আর পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। বাগান বলতে সবুজ লন, আর লনের কিনারায় ফুলগাছের সারি।

সুধা জানাল, এটা সায়েন্টিস্টদের ক্লাস্টার। নিউ সিটির সব সায়েন্টিস্ট এই এলাকাতেই থাকেন। নিউ সিটিতে কোনও সায়েন্টিস্টের নিজস্ব বাড়ি থাকলেও তাঁর এখানে থাকাটা জরুরি। এটাই নিয়ম।

জিশানের বাবার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, নিজেদের বাড়ির কথা।

সুধা বলল, 'আমার সেসব প্রবলেম নেই, কারণ, আমার এই একটাই থাকার জায়গা—।'

বাড়ির ভেতরে ঢুকে প্রথমেই ড্রয়িংরুম—যেখানে বসে এখন ওরা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে।

জিশান সুধাসুন্দরীকে দেখছিল।

কালো রঙের একটা সালোয়ার। তার সঙ্গে নীল, কালো আর সাদার নকশাকাটা একটা কামিজ। ফরসা বলে ওকে বেশ মানিয়েছে। তবে সবচেয়ে সুন্দর ওর বড় মাপের চোখ। ওগুলো এমন গভীর আর বুদ্ধিদীপ্ত যে, মনে হচ্ছে চোখ থেকে এক অদ্ভুত আলো ঠিকরে ছড়িয়ে পড়ছে।

শর্মি নামের একটি মেয়েকে ডাকল সুধা। মেয়েটির বয়েস আঠেরো কি কুড়ি। শ্যামলা রং। রোগা, স্মার্ট।

ওকে কফি করতে বলল।

'শর্মি আমার কম্বাইন্ড হ্যান্ড। খুব চটপটে—অনেক কাজ করে। তার মধ্যে একটা হল রান্নাবান্না।'

কফি খাওয়া শেষ হলে সুধা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। আমার মতো সুপার লেভেলের একজন সায়েন্টিস্ট এই পোড়া নিউ সিটিতে কেন পড়ে আছে। তুমি শোনার জন্যে রেডি তো?'

জিশান কফির কাপ নামিয়ে রাখল সামনের টেবিলে। সুধার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, রেডি...।'

'আমি ইউ. এস. এ.-তে ছিলাম। নর্থ ক্যারোলাইনাতে। সেখানে স্টেট বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে চাকরি করতাম। "এমিনেন্ট সায়েন্টিস্ট" পোস্টে। আমি বেসিক্যালি একজন ডক্টর এবং পরে বায়োকেমিস্ট্রিতে পিএইচ. ডি. করেছি। তোমাকে আমার তেতাল্লিশটা পেটেন্টের কথা আগে বলেছি। সে ছাড়া আমার বাইশ-তেইশটা রিসার্চ পাবলিকেশান আছে—সবই ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে। আমার রিসার্চের এরিয়া হল, প্রোটিন, আর-এন-এ, ডি-এন-এ আর পলিফসফেট—এদের সিনথিসিস, স্ট্রাকচার এসব স্টাডি করা আমার কাজ।

'মা ছাড়া আমার ফ্যামিলিতে আর কেউ নেই। তাই নর্থ ক্যারোলাইনাতে আমি মা-কে নিয়েই থাকতাম। কিন্তু হঠাৎ করে ট্রাবল শুরু হল আমার একটা ডিসকাভারি নিয়ে। আমি চারবছর ধরে একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ডের ওপরে গবেষণা করছিলাম। ব্যাপারটা জেরান্টোলজি ওরিয়েন্টেড...।'

'জেরান্টোলজি মানে?' জানতে চাইল জিশান।

'জেরান্টোলজি মানে জরাবিজ্ঞান। মানে, আমাদের যে বয়েস বাড়ে সেই ব্যাপার রিলেটেড সায়েন্স।...যাই হোক, জেরান্টোলজি বরাবরই আমার রিসার্চের সেকেন্ডারি ফোকাস। তো রিসার্চ করতে-করতে আমি এমন একটা কম্পাউন্ড আবিষ্কার করলাম যেটা কয়েকটা অ্যানিম্যালের এজিং প্রসেস স্লো করে দেয়। অর্থাৎ, তাদের বয়েস ধীরে-ধীরে বাড়বে।

'ব্যাপারটা খুব এক্সাইটিং বুঝতেই পারছ। তা ছাড়া, যদি সত্যি-সত্যি এরকম একটা কেমিক্যালের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে সেটার ফরমুলা আর তৈরি করার সায়েন্টিফিক প্রসেস হাতে পাওয়ার জন্যে সারা পৃথিবী ছটফট করবে। ইন্টারন্যাশনাল কেয়স তৈরি হবে। কেজিবি, সিআইএ, র'—সমস্তরকম ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি মাঠে নেমে পড়বে।

'সেইজন্যে রিসার্চের ভাইটাল ব্যাপারগুলো আমি কাউকে জানাইনি।

নিজের কাছেই গোপন রেখেছিলাম। তবে ল্যাবের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টদের নিয়ে আমার নানান টেস্টিং আর এক্সপেরিমেন্টের কাজ চলছিল। কিন্তু এসব টেস্টের ঠিক কোন-কোন রেজাল্ট আমার কাছে জরুরি সেটা আমি কাউকে জানাইনি। জেরান্টোলজি রিলেটেড অবজারভেশানের কাজগুলো আমি একা-একাই করতাম।

'আমি ল্যাবে ইঁদুর, গিনিপিগ, বেড়াল আর কুকুরের ওপরে কেমিক্যালটা টেস্ট করেছি। তাতে অল্পবিস্তর পজিটিভ রেজাল্টও পেয়েছি। কেমিক্যালটা মানুষের ওপরে অ্যাপ্লাই করা তখনও বাকি। তা ছাড়া এজিং প্রসেস স্লো হওয়ার রেটটা ছিল বড্ড কম। আমি রিসার্চ করে সেই রেটটা বাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম, আর কীভাবে কেমিক্যালটা নিয়ে হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশানে যাওয়া যায় সে-কথা ভাবছিলাম...।'

'এরকম একটা সময়ে কীভাবে যেন রিসার্চ সেন্টারের কয়েকজন আমার রিসার্চের আসল ব্যাপারটা জেনে গেল। কয়েকজন আমাকে অভিনন্দন জানানোয় আমি বলেছি যে, এখনও অভিনন্দন জানানোর মতো কিছু আমি করে উঠতে পারিনি। প্রাণিদের এজিং প্রসেসের মিস্ট্রি নিয়ে আমি এখনও এক্সপ্লোর করে চলেছি এবং এখনও আমি অন্ধকারে। কিন্তু তাদের সবাই যে আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি সেটা তাদের মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।

'এর মাসখানেক পর আমার কাছে একটা ফোন আসে। যে-লোকটা ফোন করেছিল তার গলাটা একটু ফ্যাঁসফেসে, জড়ানো। আমি ফোন ধরতেই শুনলাম...'

'ডক্টর সুধাসুন্দরী স্পিকিং?' ইংরিজিতে কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে 'সুধাসুন্দরী' শব্দটা লোকটাকে কয়েকটা হোঁচট খাইয়ে দিল।

'ইয়েস—।' সুধা জবাব দিল।

'কনগ্র্যাচুলেশান্স। তোমার চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কথা আমরা জানতে পেরেছি। এতে সন্দেহ নেই, মানবজাতির অনেক কল্যাণ হবে—।'

সুধা অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'আপনি কে বলছেন? কোথা থেকে বলছেন?'

'এগুলো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন, ম্যাডাম। আমি একটা সংগঠনের পক্ষ থেকে বলছি। তোমার আবিষ্কারের জন্যে সারা পৃথিবী তোমাকে অভিনন্দন জানাবে, আশীর্বাদ করবে।'

'সেরকম কোনও আবিষ্কার তো আমি করিনি! আমি তো ছোট-ছোট কয়েকটা রুটিনমাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি...।'

'আমরা সব জানি। তুমি আমাকে ভুল বোঝাতে পারবে না, ম্যাডাম। আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর আছে...।'

'আপনি আমাকে ফোন করেছেন কেন? কী দরকারে?'

টেলিফোনের ও-প্রান্তে হাসল লোকটা ঃ 'এখনও বুঝতে পারোনি? তোমার আবিষ্কারের সব কাগজপত্রের ফাইলটা আমাদের চাই। কারণ, আমরা মনে করি, এই আবিষ্কারটার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে থাকা দরকার। পৃথিবীর পক্ষে এই আবিষ্কারটা নিশ্চয়ই খুব উপকারী—তবে আমাদের মনে হয়, এই মুহূর্তে এই আবিষ্কারটার কথা জানাজানি হলে বিপদ হবে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এটা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সেই লড়াই থেকে ব্যাপারটা হয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগোবে। আর সেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ—যেটা পরমাণু-যুদ্ধ হবে বলেই আমাদের ধারণা—যদি হয় তা হলে মানবজাতির সর্বনাশ হয়ে যাবে।' একটু থামল লোকটা। তারপর ঃ 'সুতরাং, ম্যাডাম, বুঝতেই পারছ, তোমার এই আবিষ্কারটা অত্যন্ত নিরাপদ হেফাজতে থাকা দরকার...।'

সুধাসুন্দরীর বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ হচ্ছিল। ভয়ডর ওর বরাবরই কম—কিন্তু, তা সত্ত্বেও ওর একটু-একটু ভয় করছিল।

এই যে লোকটা ওকে ফোন করেছে, সে সুধার আবিষ্কারের ঠিক কতটুকু জানে? লোকটা আন্দাজে ব্লাফ দিচ্ছে না তো!

লোকটাকে বাজিয়ে দেখতে সুধা বলল, 'আপনি আমার কোন আবিষ্কারের কথা বলছেন বলুন তো? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—।'

লোকটা হাসল—সবজান্তার ব্যঙ্গের হাসি। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, 'মানুষকে দীর্ঘায়ু করার আবিষ্কার। আমাদের শরীরে বার্ধক্য যে-গতিতে প্রভাব ফেলে, সেই গতি কমিয়ে দেওয়ার আবিষ্কার। তুমি আমাদের হোমওয়ার্কে কোনও ফাঁক পাবে না, ম্যাডাম।'

সুধাসুন্দরীর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। ও পাগলের মতো এই সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু পাচ্ছিল না।

লোকটা ধীরে-ধীরে বলল, 'আমি পরশুদিন তোমাকে আবার ফোন করব, ম্যাডাম। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

সুধা হঠাৎই সাহস জুগিয়ে শক্ত গলায় বলল, 'আমি যা-ই আবিষ্কার করে থাকি না কেন, সেটা যাকে-তাকে দেওয়ার জন্যে নয়।'

'একদম ঠিক বলেছ, ম্যাডাম। কিন্তু তোমার সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে ঃ হয় তুমি ওটা নিজে থেকে আমাদের হাতে তুলে দেবে, নয় তো ওটা আমরা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব। আর সেই কাড়াকাড়ির সময় অল্পবিস্তর কোল্যাটারাল ড্যামেজ হতে পারে—।'

'কোল্যাটারাল ড্যামেজ মানে?'

'তোমার মায়ের কথা ভুলে গেলে, ম্যাডাম?' হাসল লোকটা।

সুধাসুন্দরী পাথর হয়ে গেল। ওর মাথা আর কাজ করছিল না।

'উই উইল বি ওয়াচিং য়ু, ম্যাডাম। ওয়ান রং মুভ অ্যান্ড য়ু আর ডান অ্যালং উইথ ইয়োর মাম।'

লোকটা ফোন ছেড়ে দিল।

●

শরীরের ভেতরে বয়ে চলা একটা ঠান্ডা স্রোত টের পাচ্ছিল সুধা। আর তার সঙ্গে অদ্ভুত এক চিনচিন যন্ত্রণা।

মা! মায়ের কথা বলল লোকটা! আজকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী সুধাসুন্দরী যা কিছু, তার সবটাই ওর মায়ের জন্য। ওকে ভালো করে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তোলার জন্য ওর মায়ের চেষ্টা আর পরিশ্রম এক কথায় উদাহরণ। সেই মায়ের ক্ষতি করবে ওরা! কোল্যাটারাল ড্যামেজ!

সুধা উদভ্রান্তের মতো হয়ে গেল। এই হুমকিটা ফাঁকা আওয়াজ, না কি সত্যি? লোকটার কথা বলার ঠান্ডা সুর সুধার মনে প্রতিধ্বনি তুলছিল। ওর মন বলছিল, কথাকে কাজে পালটে দিতে এই ধরনের লোকের কোনও সময় লাগে না।

ফোনটা এসেছিল রাত আটটা নাগাদ। তার পর থেকে সুধাসুন্দরীর মনের স্বস্তি উধাও হয়ে গেল। ওর উসখুস অস্থির ভাব দেখে মা বেশ কয়েকবার জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে? তখন থেকে ওরকম ছটফট করছিস কেন?'

উত্তরে সুধা বলেছে, 'না, কিচ্ছু হয়নি—।'

রোজ ল্যাব থেকে বাড়ি ফিরে বেশিরভাগ সময়টাই সুধা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আজ ও পড়াশোনাতেও মন বসাতে পারছিল না। একটা কাঁটা কোথায় যেন খচখচ করছিল।

ভয়ে-ভয়ে দিন কাটতে লাগল সুধার। মা-কে ও একা বেরোতে বারণ করে দিল। বলে দিল, সুধার ফোন ছাড়া অন্য কারও ফোন যেন মা কখনও না ধরে, সুধা ছাড়া আর কাউকে যেন কক্ষনো দরজা না খোলে।

এসব কথায় মা ভয় পেয়ে গেলেন। বারবার জিগ্যেস করলেন, এত সাবধান হওয়া কীসের জন্য।

উত্তরে সুধা শুধু বলল, 'আমাদের হয়তো এ-দেশ ছাড়তে হবে, মা।'

ও মনে-মনে বুঝতে পারছিল, শত্রু যারাই হোক, তার হুট করে কিছু করবে না। সুধার কাগজপত্রগুলো ওরা হাতে পাবে, নাকি পাবে না—সে-ব্যাপারে

সুনিশ্চিত না হয়ে ওরা চরম ব্যবস্থা নেবে না।

ল্যাবে সুধা একটা অদ্ভুত কাজ করল। ওর জেরান্টোলজি রিসার্চের যত কাগজপত্র ছিল সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে তার প্রতিটি পৃষ্ঠায় কেমিস্ট্রির একটা করে ভুল সমীকরণ লিখল। তাও আবার পৃষ্ঠার নানান জায়গায়। তারপর সেই পাতাগুলো ওর অন্যান্য রাফ কাগজের পৃষ্ঠার সঙ্গে মিশিয়ে দিল। ঠিক যেন তাস শাফ্‌ল করে মেশাচ্ছে।

সবমিলিয়ে প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার এক 'পাহাড়' তৈরি হল। এর মধ্যে থেকে আসল কাগজগুলো একমাত্র সুধাসুন্দরীই খুঁজে বের করতে পারবে। ওই ভুল সমীকরণই ওর 'সংকেত'।

কাগজের স্তূপটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে ল্যাবের মধ্যে নানান জায়গায় রেখে দিল।

মনে-মনে বেশ শান্তি পেল সুধা। এই ল্যাবে হানা দিয়ে কারও পক্ষে 'আসল' কাগজগুলো খুঁজে পাওয়া বোধহয় আর সম্ভব নয়।

এর চারদিন পরেই একটা ঘটনা ঘটল।

দিনটা ছিল রবিবার। সেদিন বিকেলবেলা কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে পায়ে হেঁটেই ও রাস্তায় বেরিয়েছিল।

রাস্তায় লোকজন বেশি ছিল না। বয়স্ক দু-চারজন মহিলা কি পুরুষ চোখে পড়ছিল। দুজন মানুষকে চোখে পড়ল পোযা কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন।

রাস্তাটা ফাঁকা হলেও এখান দিয়ে ভালোরকমই গাড়ি যাতায়াত করে। থেকে-থেকে ছুটন্ত গাড়ি সুধাসুন্দরীর নজরে পড়ছিল।

সামনে একটা বাঁক ঘুরতেই ও দেখতে পেল রাস্তার পাশ ঘেঁষে একটা মেয়ে পড়ে আছে। গায়ে লাল আর কালো রঙের সুন্দর ছাঁদের পোশাক।

সুধাকে দেখেই মেয়েটা 'হেল্‌প! হেল্‌প!' বলে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

সুধা রাস্তার যেদিক ধরে হেঁটে যাচ্ছিল, মেয়েটা পড়ে আছে তার উলটোদিকে। তাই সাবধানে রাস্তা পার হয়ে ওপারে পৌঁছল। তারপর অসহায়ভাবে পড়ে থাকা মেয়েটির দিকে এগোল।

সুধা কাছে যেতেই মেয়েটি যন্ত্রণা মেশানো গলায় বলল যে, একটা গাড়ি ওকে ধাক্কা মেরে পালিয়েছে। ওর হাঁটু আর গোড়ালিতে অসহ্য যন্ত্রণা। নিজে-নিজে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। সুধা যদি, প্লিজ, ওকে একটু হেল্‌প করে তা হলে ভালো হয়।

সুধা আর দেরি করল না। ঝুঁকে পড়ে মেয়েটিকে তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

ঠিক তখনই কোথা থেকে দুজন তরুণ এসে হাজির হল। সুধাকে এবং পড়ে থাকা মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, 'হোয়াট্স দ্য ম্যাটার? হোয়াট হ্যাপেন্ড?'

সুধা সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলল। মেয়েটিও 'উঃ ! আঃ' করতে-করতে সাহায্য চাইল।

তক্ষুনি ছেলে দুটো কাজে নেমে পড়ল। আহত মেয়েটিকে তুলে নিয়ে রাস্তার পাশের ঘাসজমিতে শুইয়ে দিল। তারপর সুধাকে বলল, 'মিস, তুমি তোমার কাজে যাও—আমরা ওর মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের বন্দোবস্ত করছি—।'

আহত মেয়েটি সুধাকে দুবার 'থ্যাংক্স' জানাল। সুধা সৌজন্যের দু-একটা কথা বলে রাস্তা পার হতে লাগল।

ঠিক তখনই একটা ছাই রঙের পিক-আপ ট্রাক কোথা থেকে যেন দৈত্যের মতো ছুটে এল সুধার দিকে। ট্রাকটাকে ঘাড়ের ওপরে এসে পড়তে দেখে সুধা হকচকিয়ে গেল। পেটের ভেতরটা কেমন ফাঁকা মনে হল। ঠান্ডা ঘামের ফোঁটা আচমকা ওর কপাল, মুখ গলা ভিজিয়ে দিল। ও পাগলের মতো লাফ দিল একপাশে। ওর হাত থেকে মোবাইল ফোন ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

ট্রাকটা ওকে চাপা দেওয়ার জন্য ছুটে গেল। তারপর চাপা দিতে-দিতে একেবারে শেষ মুহূর্তে বাঁক নিয়ে ওর পড়ে থাকা শরীরটার গা ঘেঁষে ছুটে পালাল। চাকার মোচড়ের মিহি শব্দ ছিটকে উঠল বাতাসে। আর সুধাসুন্দরী রাস্তায় পড়ে দরদর করে ঘামতে লাগল। ওর আচ্ছন্ন চোখের সামনে রাস্তা, ঘর-বাড়ি, গাছপালা সব বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সেই অবস্থাতেই শরীরটাকে গড়িয়ে-গড়িয়ে রাস্তার কিনারায় নিয়ে এল। কোনওরকমে উঠে বসল। হাতে, কনুইয়ে আর হাঁটুতে ব্যথা। দু-জায়গায় ছড়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে ও বাড়ি ফিরতে পারবে তো? মোবাইল ফোনটা কোথায় গেল? এই রাস্তাটা যে এত দুর্ঘটনাপ্রবণ সেটা সুধা জানত না।

এমন সময় ওর চোখ পড়ল সেই দুটি ছেলে আর আহত মেয়েটির দিকে। ওদের দিকে তাকিয়ে ও তাজ্জব হয়ে গেল।

ওরা তিনজনেই সুধার দিকে তাকিয়ে হাসছে, বিদায়ের ইশারা করে হাত নাড়ছে।

সুধা হতবাক ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই একটা সাদা রঙের স্পোর্টস কার ওদের পাশে এসে ব্রেক কষল। ওরা তিনজনে চটপট গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়িটা সাঁ করে উধাও হয়ে গেল।

টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে তিনজন পথচারী ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ওর মোবাইল ফোনটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল ঃ 'তোমার মোবাইল ফোন, মিস। রাস্তার ওইখানটায় পড়ে ছিল...।'

সুধা চেতনাহীন রোবটের ঢঙে মোবাইল ফোনটা নিল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে একটু বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন?'

বাড়ি ফেরার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক সুধাসুন্দরীর নার্ভাস ভাবটা গেল না। আজ যদি ওর ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে যেত তা হলে ওর মায়ের কী হত!

রাতে ওর মোবাইলে যে-ফোনটা এল তাতে ঠিক এই প্রশ্নটাই করল লোকটা। এই লোকটাই প্রথম ওকে ফোন করে জেরান্টোলজির বিষয় নিয়ে ওকে শাসিয়েছিল্।

'যদি আজ তোমার কিছু একটা হয়ে যেত, ম্যাডাম, তা হলে তোমার মায়ের কী হত সেটা ভেবে দেখেছ। বয়স্ক মানুষ। এ-পৃথিবীতে একা-একা কী করে থাকতেন? হয়তো...হয়তো রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে শেষ পর্যন্ত...।' কথা আর শেষ করেনি লোকটা।

সুধা ভয় পেলেও মনে-মনে সাহস তৈরি করছিল। ও বেশ বুঝতে পারছিল, ওকে মেরে এই লোকগুলোর কোনও লাভ নেই। তাতে ওরা যা চায় সেটা কোনওদিনও ওরা আর হাতে পাবে না। ওরা শুধু সুধাসুন্দরীকে নিয়মিত ভয় দেখাবে। ভয় দেখিয়ে ওর কাছ থেকে রিসার্চের কাগজপত্রগুলো আদায় করবে।

ও ঠান্ডা জেদি গলায় বলল, 'আমি ভয় পাইনি। আপনারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।'

লোকটা হাসল ঃ 'ভয় পাবে না মানে! ভয় তো তোমাকে পেতেই হবে। কেন, ম্যাডাম, কোল্যাটারাল ড্যামেজের কথা ভুলে গেলে? ওই পিক আপ ট্রাকটা আজ ইচ্ছে করলে তোমাকে পিষে দিতে পারত—কিন্তু দেয়নি। কারণ, এটা আমাদের একটা ওয়ার্নিং।

'এবার মনে করো, তোমার বদলে তোমার মা আমাদের টার্গেট হয়ে গেলেন। তারপর টার্গেট থেকে ভিকটিম। ভিকটিম থেকে মর্গ। তারপর মর্গ থেকে পোস্টমর্টেম....।' খুকখুক হাসি দিয়ে লোকটা কথা শেষ করল।

কেন জানি না, সুধাসুন্দরীর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। ও কেঁদে ফেলল। মা-কে ছেড়ে থাকার কথা ও কখনও ভেবে দেখেনি। কারণ, এটা ও কখনও ভাবতেই পারবে না।

ওর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না শুনতে পেল লোকটা। অন্যায় করে ধরা পড়ে যাওয়া বাচ্চা ছেলের মতো অপরাধী গলায় বলল, 'আমাকে ক্ষমা করো, ম্যাডাম। আমি তোমার চোখে জল এনেছি। আসলে একটা কথা তোমাকে আমি স্পষ্ট করে বোঝাতে চাই। তুমি, প্লিজ, এটা বোঝার চেষ্টা করো। তোমার জেরান্টোলজির

রিসার্চ যতই ভ্যালুয়েব্‌ল হোক, তোমার মায়ের চেয়ে নিশ্চয়ই ভ্যালুয়েব্‌ল নয়। এই সিম্প্‌ল ট্রুথটা তুমি, ম্যাডাম, বোঝার চেষ্টা করো। গুড নাইট—।'

সুধা চুপ করে থেকেছিল। কোনও জবাব দিতে পারেনি। ওর চোখে তখনও জল। লোকটার শেষ কথাটা ওর কানে বাজছিল। লোকটা খুব সত্যি কথা বলেছে। সুধার জেরান্টোলজির গবেষণা ওর মায়ের চেয়ে অবশ্যই ভ্যালুয়েব্‌ল নয়।

এই কথাটা ওকে ভাবিয়ে তুলল বটে, কিন্তু গবেষণার জরুরি কাগজপত্রগুলো সরাসরি ওই লোকগুলোর হাতে তুলে দিতে ওর মন চাইল না।

সুধা ওর গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগল। আর একইসঙ্গে অন্তরের ঝড় তোলা টানাপোড়েনে প্রতিটি মুহূর্তে কষ্ট পেতে লাগল।

ও বেশ বুঝতে পারছিল, ল্যাবে যে-মনোযোগে ও সাধারণত কাজ করে, সেই মনোযোগে চিড় ধরছিল।

টেলিফোনের লোকটা কিন্তু ধৈর্য হারায়নি। সে পাঁচ-ছ'-দিন পরপরই সুধাকে ফোন করে। ঠান্ডা মাথায়, ঠান্ডা গলায়, সুধাসুন্দরীকে বশ করার চেষ্টা করে। সুধার কোনও কথাতেই সে রাগ করে না, উত্তেজিত হয় না। শুধু রোজ কথা শেষ করার আগে সুধাকে কোল্যাটারাল ড্যামেজের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এইভাবে কাজ করতে সুধার ভালো লাগছিল না। ও বেশ বুঝতে পারছিল, ইনস্টিটিউট-এ ডেডিকেটেড রিসার্চার হিসেবে ওর যে আকাশ-চুমু-খাওয়া খ্যাতি, সেই খ্যাতিতে একটু-আধটু চিড় ধরছিল।

টেলিফোনে ভদ্র ভাষায় হুমকি দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ও থানা-পুলিশ করতে পারেনি। কারণ, তার সঙ্গে ওর জেরান্টোলজির গবেষণার ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে। এই গবেষণা নিয়ে ও এখনই ঢাক পেটাতে চায় না।

রিসার্চ সেন্টারে ওর যারা কাছের লোক তারা শুধু লক্ষ করল যে, সুধাসুন্দরী আগের তুলনায় অনেক চুপচাপ হয়ে গেছে। যে-মেয়েটা কথা বলতে ভালোবাসত সে আর কথা বলতে তেমন ভালোবাসে না।

আসলে একটা দমচাপা উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি সুধার সবসময়ের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা ছাড়া, ও এখানকার পাট গুটিয়ে ইন্ডিয়ায় ফিরে যাবে কি না, সেই চিন্তাটাও মাঝে-মধ্যেই ওর মাথায় খোঁচা মারছিল। সেইজন্য কখনও-কখনও ল্যাবের ওর কাজে ভুল হয়ে যেত, অনেক কথা ঠিক-ঠিক সময়ে মনে পড়ত না।

একদিন সন্ধেবেলা রিসার্চ সেন্টার থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সুধা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকল।

'ফোর স্কোয়ার' নামের এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটা ওর খুব চেনা। এখানে ও নিয়মিত আসে। খাওয়াদাওয়ার নানান জিনিসপত্র থেকে শুরু করে তেল,

মশলা, শ্যাম্পু, সাবান—সবই ও এখান থেকে কেনে।

আজ যখন ও ট্রলি ঠেলে নিয়ে বিভিন্ন লেনের র‍্যাক থেকে দরকারি জিনিসগুলো বেছে-বেছে ট্রলির বাস্কেটে তুলছে তখনই ওর ফোন বেজে উঠল। অচেনা নম্বর। ছোট্ট আশঙ্কা নিয়ে 'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপে ফোন কানে দিল।

'হ্যালো—।'

ও-প্রান্ত থেকে একটা লোক কথা বলল। তার গলাটা সুধার ভীষণ চেনা।

'ম্যাডাম, আমাদের ব্যাপারটা কতদূর এগোল? তুমি কী ডিসাইড করলে?'

'কী ব্যাপার?' না বোঝার ভান করে জানতে চাইল সুধা।

লোকটা ছোট-ছোট শব্দ করে হাসল : 'জেরান্টোলজি, ম্যাডাম।'

সুধার খুব রাগ হচ্ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায় সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ও বলল, 'জেরান্টোলজি? জেরান্টোলজির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। ও নিয়ে আমি কোনও রিসার্চ করছি না।'

'কী দুঃখের ব্যাপার, ম্যাডাম!' আক্ষেপ করে বলল লোকটা, 'তুমি পৃথিবীর সব মানুষের আয়ু বাড়াতে চেষ্টা করছ, অথচ তোমার আর তোমার মায়ের আয়ু কমাতে চেষ্টা করছ! ভেরি স্যাড। কিন্তু এটাই কী তোমার শেষ কথা?'

'আমার কাছে কোনও অপশান নেই।' চোয়াল শক্ত করে বলল সুধা, 'আমি বিজ্ঞান ছাড়া আর কারও চাকর নই...।'

●

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লোকটা। সুধা যখন ভাবছে যে, লোকটা ফোন ছেড়ে দিয়েছে, তখনই লোকটা কথা বলল।

'গুড। গুড। সো উই অ্যাকসেপ্ট দ্য কোল্যাটারাল ড্যামেজ...।'

ফোন ছেড়ে দিল লোকটা।

নিজের টেনশন কাটাতে সুধা চুপচাপ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর আবার ওর কেনাকাটা শুরু হল। কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ও প্রাণপণে ছন্দে ফিরতে চাইছে।

প্রায় আধঘণ্টা পর সুধাসুন্দরীর কেনাকাটার পাট শেষ হল। ও জিনিস ভরতি ট্রলি নিয়ে একটা ক্যাশ কাউন্টারে লাইন দিল। চারপাশের লোকজনকে ও দেখছিল বটে কিন্তু তাদের 'ছবিগুলো' ওর মাথায় ঢুকছিল না। ওর বারবার লোকটার শেষ মন্তব্যটা মনে পড়ছিল, আর মায়ের কথা মনে পড়ছিল। মা-কে ভীষণ দেখতেও ইচ্ছে করছিল। ওর মনের মধ্যে বাড়ি ফেরার তাড়া উথলে উঠল।

হঠাৎই বছর পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্নর একজন প্রৌঢ় সুধার ট্রলির কাছে এসে দাঁড়াল। ট্রলি থেকে একটা দুধের প্যাকেট তুলে নিয়ে ওকে জিগ্যেস করল, 'এই দুধটা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, মিস?'

সুধা একটু অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল।

গোলগাল বেঁটে চেহারা। লালচে সাদা গায়ের রং। মাথাজোড়া টাক। মুখটা ফোলা-ফোলা, গায়ে একটা স্ট্রাইপ্‌ড কোট, পায়ে ময়লা সাদা প্যান্ট।

সুধা আজ তিনটে দুধের প্যাকেট কিনেছে—মায়ের জন্য। রোজ সকালে মা-কে একগ্লাস দুধ খেতে বাধ্য করে সুধা। মায়ের শরীর যা রোগা আর দুর্বল তাতে রোজ সকালে এই দুধটুকু দরকার। চারমাস আগে মা-কে হসপিটালে ভরতি করিয়ে সবরকম টেস্ট করিয়েছিল। সেইসব টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে মেডিসিনের নামি একজন ডক্টরকে দেখিয়েছিল। তাতে মা-কে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে রোজ হাফ লিটার করে দুধ খেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন ডক্টর। সেই পরামর্শটা মা-কে মানতে বাধ্য করেছে সুধা। মা-কে বলেছে, 'তুমি মাঝে-মাঝে ভুলে যাও কেন যে, আমিও একজন পাশ করা ডাক্তার!'

তারপর থেকে রোজ দুধ খাওয়ার নিয়মটা দাঁড়িয়ে গেছে।

সুধা নিজের চিন্তায় আনমনা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই ও খেয়াল করল, টাক মাথা ভদ্রলোক তখনও ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এবং আবার জিগ্যেস করছেন, 'মিস, এই ব্র্যান্ডের মিল্‌ক কি হেলদি? গুড ফর পেশেন্টস?'

সুধা ঘোর কাটিয়ে বলে উঠল, 'অ্যাঁ—হ্যাঁ। ইয়েস, ইয়েস—গুড ফর হেল্‌থ।'

'থ্যাংক্‌স—' ভদ্রলোক বললেন, 'আসলে আমার ওয়াইফ খুব সিক্‌লি। ডক্টর রোজ ওকে দুধ খেতে বলেছেন। কিন্তু এখানে এসে এতরকম ব্র্যান্ডের সুইট মিল্‌ক প্যাক দেখে আমি বেশ কনফিউজ্‌ড। তখনই তোমাকে খেয়াল করলাম। ভাবলাম, তোমার কাছ থেকে সাজেশান নিলে হয়। তাই তোমাকে বদার করলাম। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড...।'

'না, না—মনে করার কী আছে!'

ভদ্রলোক একটু অতি-বিনয়ের সঙ্গেই সুধাকে বেশ কয়েকবার ধন্যবাদ জানালেন। দুধের প্যাকেটটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর ওটা সুধার ট্রলিতে রেখে দিয়ে আরও একবার 'থ্যাংক্‌স' বলে চলে গেলেন।

ঘটনাটা ও বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু পরে ওর মনে হয়েছিল, ঘটনাটাকে গুরুত্ব না দিয়ে ভুলে যাওয়াটা ওর মস্ত বড় ভুল ছিল।

বিপদটা হল চারদিন পরেই।

তখন দুপুর সওয়া দুটো। লাঞ্চব্রেক থেকে ল্যাবে ফিরে সবে কাজের

ভেতরে আবার মাথা গলিয়েছে সুধা। এমন সময় ফোনটা এল।

মোবাইল কানে দিয়ে 'হ্যালো' বলতেই চেনা গলা শুনতে পেল।

'আমরা খুবই দুঃখিত, ম্যাডাম। তোমার কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি।'

'ক্ষমা চাইছি মানে? কীসের ক্ষমা? কী হয়েছে?'

লোকটা সুধার একটা প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমি হলে ল্যাব থেকে এখুনি বাড়ি চলে যেতাম...।'

লোকটা কীসের ইশারা করছে? বাড়ি যেতে হবে মানে?

সুধাসুন্দরীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। মা! মায়ের কিছু হল না কি? নাকি এটা নিছকই ওকে ভয় দেখানোর জন্য ফাঁকা আওয়াজ?

'কী বলতে চান সোজাসুজি বলুন!' অধৈর্য গলায় বলল সুধা।

লোকটা খুক-খুক করে হাসল ঃ 'ম্যাডাম, আর বাচ্চা মেয়ে সেজে থাকার ভান কোরো না। তুমি বুঝতে পারছ না কী বলতে চাইছি?' একটু চুপ করে থেকে লোকটা প্রায় ফিসফিসে গলায় বলল, 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ। তোমাকে প্রথম থেকেই আমরা সাবধান করেছিলাম। শুধু তোমার বোকা-বোকা জেদের জন্যেই এরকম একটা বাজে ব্যাপার ঘটে গেল....।'

লোকটা তো অসহ্য! ভাবল সুধা। ওর গলা উঁচু পরদায় উঠে গেলঃ 'কী হয়েছে বলুন, প্লিজ!'

'কোল্যাটারাল ড্যামেজ—ডান বাই য়ু। তুমি এখন জলদি বাড়ি যাও—।'

আর দেরি করেনি সুধাসুন্দরী। ল্যাবের কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে ছুটেছে বাড়ির দিকে।

ফ্ল্যাটের দরজা খোলার আগে থেকেই সুধা 'মা! মা!' বলে চিৎকার শুরু করেছিল, কিন্তু কোনও সাড়া পায়নি। দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর সাড়া না পাওয়ার কারণটা বুঝতে পারল।

ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসে একটা সোফায় মায়ের দেহটা এলিয়ে রয়েছে। চোখ দুটো বোজা। ডান হাতে টিভির রিমোট। টিভি চলছে।

মেঝেতে দুধের গ্লাসটা ভেঙে চৌচির। দুধ ছড়িয়ে পড়ে কার্পেটের অনেকটা জায়গা ভিজে গেছে।

'মা!'

সুধাসুন্দরীর মুখ থেকে যে-চিৎকারটা বেরোল সেটা আর্ত হাহাকারের মতো শোনাল। তারপরই কান্নার ঢেউ ওর বুক ঠেলে উথলে উঠল। কোল্যাটারাল ড্যামেজ!

হাতের ব্যাগ ছুড়ে ফেলে ও ছুটে গেল মায়ের কাছে। মায়ের দেহটা জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল। না, মায়ের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি ও টের পাচ্ছে

না। তখন শঙ্কা আর আশঙ্কা নিয়ে হাত বাড়াল মায়ের কবজির দিকে। পাল্‌স বিট দেখতে চাইল।

আছে! আছে!

আনন্দে খুশিতে সুধাসুন্দরীর ভেতরটা গলে গেল। ও যেন নতুন করে বুঝতে পারল, মা থাকা আর না থাকার মধ্যে কতটা তফাত। মা-কে জড়িয়ে ধরে ও আনন্দে কাঁদতে লাগল।

একটু পরেই ও নিজেকে সামলে নিল। মায়ের এখন চিকিৎসা দরকার। কী করে এমন হল, সেটাও জানা দরকার।

চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। মায়ের অচেতন দেহটা ঠিকঠাক করে শুইয়ে দিল সোফায়। রিমোটটা অসাড় হাতের মুঠো থেকে খুলে নিয়ে বোতাম টিপে টিভি অফ করে দিল। রিমোট রেখে দিল টেবিলে।

ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল সুধা। সবকিছু জায়গামতোই রয়েছে। কোথাও কোনও হানাদারের ছাপ নেই।

আর দেরি না করে হসপিটালের ইমার্জেন্সিতে ফোন করে দিল। পেশেন্টের কথা বলল। বাড়ির ঠিকানা আর লোকেশান বলল।

এবার অপেক্ষা।

সুধার বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছিল। মনের ভেতরে খারাপ-খারাপ স্মৃতির ছবিগুলো পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিল। মাথার দুপাশে দপদপানি। এসি অন থাকা সত্ত্বেও ঠোঁটের ওপরে ঘামের ফোঁটা।

ঝুঁকে পড়ে মা-কে পরীক্ষা করল—যন্ত্রপাতি ছাড়া যতটা করা যায়। ব্লাড প্রেশারটা মাপতে পারলে ভালো হত।

কী করে মায়ের এমন হল? হার্ট অ্যাটাক? না সেরিব্রাল অ্যাটাক? ঠিকমতো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

এমন সময় সধাসুন্দরীর মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

'ম্যাডাম, কেমন আছ?' মোলায়েম স্বরে প্রশ্নটা ভেসে এল।

উত্তরে একসঙ্গে অনেক কিছু বলতে চাইল সুধা। কিন্তু কথাগুলো ওর গলার ভেতরে আটকে গেল। ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

একটু পরে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'মা...! মা...!'

'হ্যাঁ, তোমার মা—' একবার কাশল লোকটা : 'তোমার মা বেঁচে আছে, ম্যাডাম। আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছি, তাই।'

'কী হয়েছে মায়ের? মা-কে কী করেছেন আপনারা?' উৎকণ্ঠায় কেঁপে ওঠা গলায় জানতে চাইল।

'তোমার মায়ের হার্ট অ্যাটাক বা সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়নি। তোমার মা দুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে...।'

'দুধ!'

'হ্যাঁ—দুধ।' হাসল সে ঃ 'তোমার মনে পড়ে, ম্যাডাম, কয়েকদিন আগে ''ফোর স্কোয়ার'' ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে তুমি তিন প্যাকেট দুধ কিনেছিলে?'

'হ্যাঁ—।'

'তখন একজন টাকমাথা লোক তোমার সঙ্গে আলাপ করে কথা বলেছিল। তোমার ট্রলি থেকে একটা দুধের প্যাকেট তুলে নিয়ে সেটার ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল। প্যাকেটটা অনেকক্ষণ তার হাতে ছিল। মনে আছে?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—।' সুধার বুকের ভেতরের শব্দটা কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

'ওই ভদ্রলোক অ্যাকচুয়ালি আমাদের লোক।' খুক-খুক করে হাসল ঃ 'তোমার ওই দুধের প্যাকেটে একটা হাই পোটেনশিয়াল টক্সিন ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ওই টাকমাথা লোকটার কাছে একটা আলট্রা-থিন নিড্‌লওয়ালা ইনজেক্‌শান সিরিঞ্জ ছিল। খুব ছোট সিরিঞ্জ। তার মধ্যে ছিল ওই টক্সিন। তোমার দুধের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে তোমার চোখের আড়ালে ওই টক্সিনটা প্যাকেটের মধ্যে পুশ করে দেওয়া হয়েছিল...।'

সুধাসুন্দরী কোনও কথা বলতে পারছিল না। মোবাইল ফোনটা আর-একটু হলেই ওর হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল।

অনেক চেষ্টায় ওর মুখ থেকে কয়েকটা অর্থহীন টুকরো শব্দ বেরোল শুধু।

লোকটা হেসে বলল, 'ইচ্ছে করলেই আমরা ওই প্যাকেটে স্ট্রং ডোজের পয়জন ইনজেক্ট করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। করলে তোমার মা ওপারে চলে যেত। সো কনসিডার ইয়োরসেল্‌ফ লাকি, ম্যাডাম। আসলে আমরা খুব দয়ালু...।'

সুধা চুপ করে রইল।

'বাট নেক্সট টাইম উই মে নট বি সো কাইন্ড। য়ু মে নট বি সো লাকি। এখন ছাড়াছি। পরে আবার ফোন করব। বাট ডোন্ট ফরগেট, উই উইল বি ওয়াচিং য়ু...।'

ফোন ছেড়ে দিল লোকটা।

মায়ের চিকিৎসা নিয়ে টানা দু-সপ্তাহ ব্যস্ত রইল সুধা। মা-কে সুস্থ করে তোলার জন্য হাসপাতালের ডাক্তার এবং নার্সরা প্রাণপাত পরিশ্রম করতে লাগল।

হাই পোটেনশিয়াল টক্সিনটা মা-কে ভালোমতোই জখম করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তার-নার্সরা জিতে গেল। ওদের সাহায্যে মা-কে শারীরিকভাবে সুস্থ করে তুলে বাড়িতে নিয়ে এল সুধা। তারপর থেকেই ভয় আর উৎকণ্ঠা ওর মনের ভেতরে বাসা বাঁধল। নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে পাট গোটানোর জন্য ও পাগলের মতো হয়ে উঠল। ওর বারবারই মনে হতে লাগল, আগে মা, পরে জেরান্টোলজি।

কয়েকদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সুধাসুন্দরী। ইন্টারনেটে নানান জায়গায় রিসার্চ সায়েন্টিস্ট পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে লাগল। আর সকলের চোখের আড়ালে জেরান্টোলজির রির্সাচের কাগজপত্রগুলো সালফিউরিক অ্যাসিডে পোড়াতে লাগল।

প্রায় দিনদশেক ধরে নিজের প্রাণের জিনিসগুলো ধীরে-ধীরে পুড়িয়ে শেষ করল সুধা। পোড়ানোর সময়ে ওর চোখে জল এসেছিল। কিন্তু মায়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে ও মন শক্ত করেছে, চোখের জল মুছে নিয়েছে।

ওর গবেষণার কেরিয়ারের জোরে পৃথিবীর অনেক জায়গা থেকেই চাকরির অফার পেল। অফার এল নিজের দেশ থেকেও। মা বারবার দেশে ফিরতে চাইছিল। বলছিল, ওল্ড সিটিতে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওল্ড সিটির যা অবস্থা সেখানে না আছে সুধাসুন্দরীর মতো বিজ্ঞানীর জন্য কোনও চাকরি, না আছে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা!

তাই ওই ছন্নছাড়া বিপজ্জনক হতশ্রী শহরটায় না ফিরে সুধা ফিরে এল তার খুব কাছাকাছি—নিউ সিটিতে। চাকরির অফারটা নেওয়ার ফাইনাল স্টেজে ও কথা বলল সরাসরি শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে। স্পষ্ট বলল, স্বাধীনভাবে গবেষণা করার জন্য ওর কী-কী চাই। কোন-কোন ধরনের ল্যাব ওর দরকার, ক'টা 'ক্লিন' রুম দরকার, কী ধরনের ম্যানপাওয়ার ওর চাই।

শ্রীধর পাট্টা প্রতিভা চিনতে কখনও ভুল করেন না। তা ছাড়া সুধাসুন্দরীর সম্পর্কে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পর তিনি ওর কেরিয়ার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাই ওর সব কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন, সুধাসুন্দরী নিউ সিটিতে রিসার্চ কেরিয়ার নতুন করে শুরু করছে মানে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানের ম্যাপে নিউ সিটি জায়গা করে নেবে। তাই সুধাকে অসম্ভব গুরুত্ব আর স্বাধীনতা উপহার দিলেন।

মা-কে নিয়ে দেশে ফিরে এল সুধা। শ্রীধর পাট্টার শহরে ও নতুন করে বিজ্ঞানী-জীবন শুরু করল। ওর তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকটা ল্যাবরেটরি গড়ে উঠল। সারা পৃথিবীর বায়োকেমিস্ট্রি ফিল্ডের বিজ্ঞানীরা এবার নিউ সিটির দিকে চোখ ফেরাতে লাগল।

কয়েক বছরের মধ্যেই সুধাসুন্দরী নিউ সিটির অংশ হয়ে গেল।

ওর কাহিনি শেষ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সুধা। জিশানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ওর বড়-বড় চোখে প্রত্যাশার ছায়া। যেন বলতে চাইছে, এবার জিশান কিছু বলুক।

জিশান চটপটে তেজি বিজ্ঞানী মেয়েটাকে দেখছিল। ওর ভয়ংকর

দিনগুলো ভাবতে চেষ্টা করছিল ঃ জেরান্টোলজির গবেষণা, ওই ভয়-দেখানো টেলিফোন, মায়ের ওপরে ওইরকম নৃশংস অ্যাটেম্প্‌ট...। সত্যি, অনেক সইতে হয়েছে সুধাকে! যেমন, জিশান এখন সইছে।

জিশান হেসে বলল, 'তুমি একজন রিয়েল ফাইটার।'

'তোমার মতো নয়। তুমি এখন একজন আইকন—নিউ সিটি আর ওল্ড সিটির সবার কাছে...।

'তোমার মা এখন কেমন আছেন?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল সুধাসুন্দরী। কী একটা বলতে গিয়েও বলল না। টেবিলের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ তুলে জিশানের দিকে তাকাল ঃ 'চলো, মায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। মা বেডরুমেই থাকে—খুব একটা বেরোতে পারে না...।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুধা। জিশানও।

সুধা ছোট্ট করে বলল, 'এসো...।'

সুধাসুন্দরীর পিছন-পিছন এগিয়ে চলল জিশান। সম্পর্কের টান আর তাকে জড়িয়ে থাকা ভালোবাসার কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল মিনি আর শানুর কথা। মিনি দোসরা সেপ্টেম্বর তারিখটার কথা প্লেট টিভির দৌলতে জেনেছে। জিশান যখন ওকে এম-ভি-পি-তে কিল গেমের তারিখটার কথা বলে তখন মিনি ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিল, 'জানি—।'

সেদিন মিনি বড্ড চুপচাপ ছিল। শুধু শানুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল। হয়তো ভাবছিল, জিশান চলে গেলে ছোট্ট শানুকে ও একা-একা মানুষ করতে পারবে তো!

জিশান ওকে বলেছিল, 'দু-তারিখের ব্যাপারটা মিটে গেলে তিন তারিখ সকালে তোমাকে ফোন করব...।'

মিনির চোখের দিকে তাকিয়ে জিশানের মনে হয়নি যে, মিনি ওর কথা বিশ্বাস করেছে।

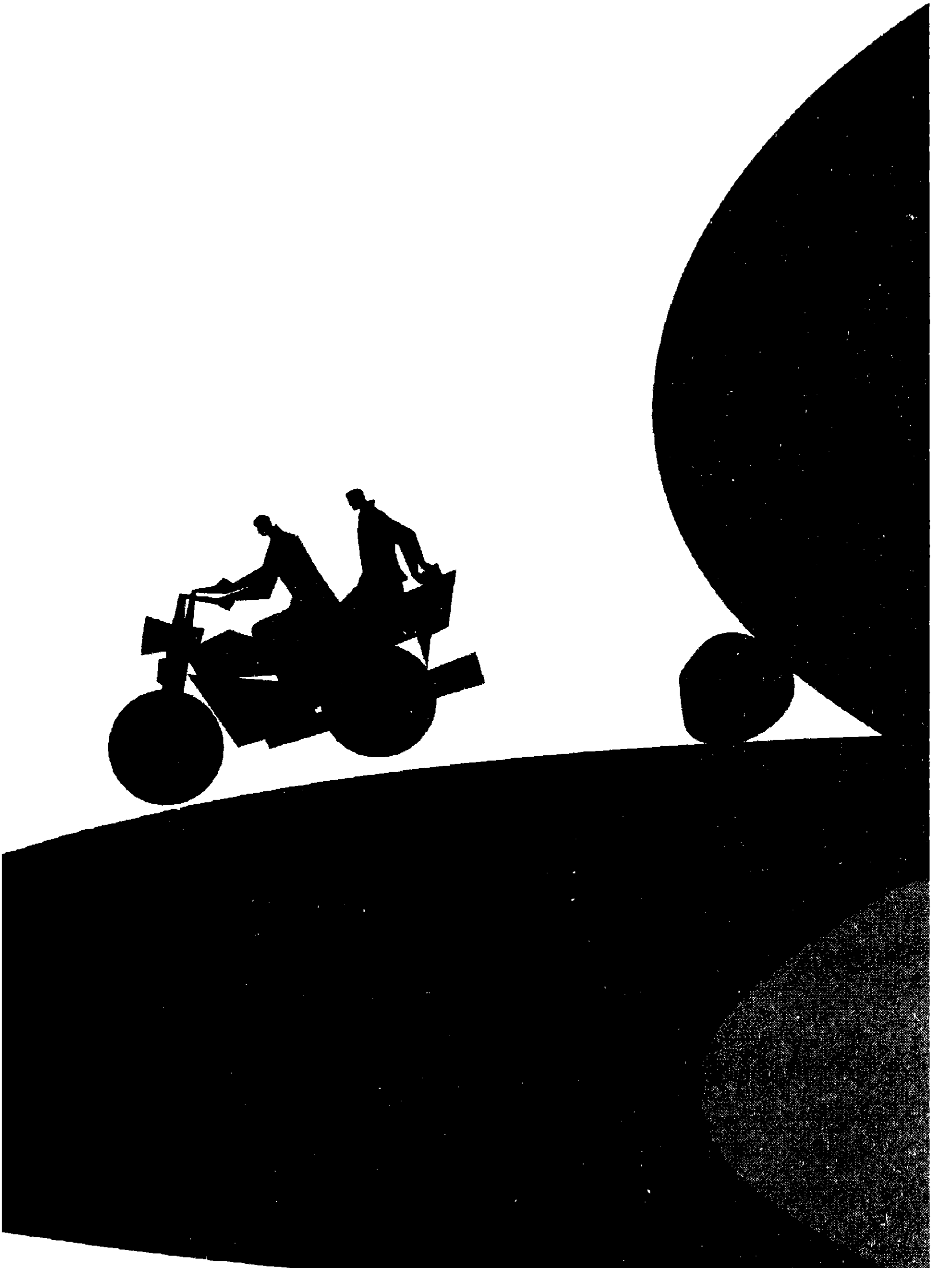
সুধাসুন্দরীর বেডরুমের দরজায় দাঁড়াতেই ওষুধের মতো একটা গন্ধ জিশানের নাকে এল। সুধা তখন কাউকে লক্ষ্য করে একটু জোরালো গলায় ডেকে উঠেছে, 'মা!'

ঘরে ঢুকেই সুধার মা-কে দেখতে পেল জিশান।

ধপধপে সাদা বিছানায় বসে আছেন একজন ধপধপে সাদা মহিলা। পরনে ধপধপে সাদা শাড়ি।

সাদা বিছানার পটভূমিতে মহিলাকে প্রায় দেখাই যেত না, যদি না ওঁর মাথার চুলগুলো কালো হত।

রোগা ক্ষীণজীবী চেহারা। সামনে টিভি চলছে, কিন্তু সেদিকে ওঁর মন



নেই। বিছানার চাদরের ওপরে আঙুল দিয়ে অদৃশ্য দাগ টেনে কাটাকুটি খেলছেন। ওঁর গায়ের চামড়ায় এত ভাঁজ যে, জিশান অবাক হল। আগে কখনও কারও চামড়ায় এত ভাঁজ দেখেনি ও।

বিছানার কাছেই একটা সবুজ রঙের হেক্সাগনাল ব্লকের ওপরে শর্মি বসে ছিল। জিশানকে শোওয়ার ঘরে দেখে ও কেমন যেন একটু জড়োসড়ো হয়ে গেল। চট করে উঠে দাঁড়াল।

'মা! এই দ্যাখো, জিশান তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে। এই যে—তাকাও এদিকে...।'

সুধা গিয়ে মায়ের পাশে বসল। মায়ের একটা হাত জড়িয়ে ধরল। শর্মিকে ইশারা করতেই ও একটা নীল রঙের হেক্সাগনাল ব্লক বিছানার কাছে নিয়ে এসে রাখল।

'জিশান, এসো—বোসো—।' ব্লকটা জিশানকে ইশারা করে দেখাল সুধা।

জিশান বসল। সুধাসুন্দরীর মায়ের খুব কাছে—মুখোমুখি।

কাছ থেকে ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে জিশান অবাক হয়ে গেল।

লোলচর্ম এই বৃদ্ধার দু-চোখের মণির ওপরে সাদা পরদার আস্তরণ। মনে হচ্ছে, ওঁর চোখের ওপরে কুয়াশা জমেছে।

'মা, এই যে, জিশান—' মায়ের হাতটা নিয়ে জিশানের হাত ছুঁইয়ে দিল সুধা ঃ 'জিশান এখন নিউ সিটির সুপারহিরো। সেপ্টেম্বরের দু-তারিখে গেম সিটিতে ওর লড়াই—কিল গেম—সকাল থেকে রাত পর্যন্ত...।'

বৃদ্ধার সাদা কুয়াশা ঢাকা চোখ জিশানের দিকে তাকাল। ভাঁজ পড়া গাল কাঁপল। জিশানের হাতের ওপরে আলতো করে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'সুধার খুব বিপদ। ওকে টেলিফোন করে সবাই ভয় দেখায়...।'

জিশান সুধার দিকে তাকাল। চোখে আবছা প্রশ্ন।

সুধা ওকে হাতের ইশারায় চুপ করে থাকতে বলল।

'তোমাকে কেউ ভয় দেখায় না তো, জিশান?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন।

'না, কাকিমা—কেউ ভয় দেখায় না। কারণ, আমি ভয় পাই না...।'

'খুব ভালো, খুব ভালো—' জিশানের হাতে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'ভয় পেয়ো না। আর শোনো, রাস্তাঘাট দেখে পার হবে—কোনও গাড়ি যেন তোমাকে ধাক্কা না মারে...।'

জিশান উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

সুধা ওর মায়ের পাশ থেকে উঠে জিশানের পাশটিতে এসে দাঁড়াল। জিশানের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'মা যা বলে চুপচাপ শুনে যাও আর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাও। পরে তোমাকে সব বলছি...।'

সুধা আবার ওর মায়ের পাশে গিয়ে বসল।

বৃদ্ধা তখনও শূন্য চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলছেন, 'দেখে-শুনে রাস্তা পার হবে, বুঝলে। নইলে কোথা থেকে গাড়ি-টাড়ি ছুটে আসবে—হুট করে ধাক্কা মেরে দেবে...।'

বৃদ্ধার হাতে চাপ দিল জিশান। বলল, 'আজ আসি, কাকিমা। আশীর্বাদ করুন যেন কিল গেমে জিততে পারি...।'

'তুমি জিতবে...জিতবে...।'

বৃদ্ধার হাতটা আলতো করে ফিরিয়ে দিল জিশান। তারপর উঠে দাঁড়াল।

সুধার দিকে চোখ গেল ওর। চোখের কোণ চিকচিক করছে। মুখে কাতর ছায়া।

জিশান একটু সরে আসতেই সুধাসুন্দরী উঠে দাঁড়াল। জিশানের খুব কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'ওই মিসহ্যাপটার পর মায়ের ব্রেন খানিকটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। বিশেষ করে অপটিক আর ভেগাস ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো। এ ছাড়া আর-একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়েছে। মায়ের এজিং প্রসেসে একটা ডিজর্ডার দেখা দিয়েছে—মা খুব তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে। মা-কে আর কতদিন ধরে রাখতে পারব জানি না...।' সুধার গলা ধরে এল।

ওর দিকে তাকিয়ে জিশান স্পষ্ট বুঝতে পারল ও প্রাণপণে কান্না চাপতে চেষ্টা করছে।

সুধা হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। গলা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে ওর মা-কে লক্ষ্য করে নীচু গলায় বলল, 'মা, আসছি...।'

ইশারা করে শর্মিকে মায়ের কাছে এসে বসতে বলল সুধা। তারপর জিশানকে সঙ্গে নিয়ে বেডরুমের দরজার দিকে এগোল।

হঠাৎই পিছন থেকে কাঁপা গলায় ডেকে উঠলেন বৃদ্ধা, 'জিশান...।'

জিশান ঘুরে দাঁড়াল ঃ 'বলুন, কাকিমা—।'

'তুমি কখনও দুধ খেয়ো না, জিশান...।'

•

গুনাজির কাছে নিয়মিত গাড়ি চালানো শিখছিল জিশান। এবং গাড়ির মধ্যে যেসব আধুনিক অটোমেটিক ব্যবস্থা রয়েছে তাতে গাড়ি চালানো শিখতে ওর সময় বেশি লাগল না। তারপর গুনাজি ওকে চালানোর নানান কায়দা, কসরত আর কেরামতি শেখাতে লাগল।

ঢাল বেয়ে নামার সময় কীভাবে গাড়ি চালাতে হয়। সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথে কীভাবে স্টিয়ারিং আর ব্রেককে কন্ট্রোল করতে হয়। যদি দেখা

যায় যে, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছেই—কিছুতেই এড়ানো যাচ্ছে না—তখন কী-কী স্টেপ নিলে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে। হঠাৎ করে গাড়ির ব্রেক ফেল হয়ে গেলে জিশান কীভাবে নিজেকে বাঁচাবে। ব্যাক গিয়ার দিয়ে কীভাবে গাড়ি পিছনদিকে জোরে ছোটাতে হয়।

এইরকম আরও কত কী!

জিশান বাধ্য ছাত্রের মতো সব শিখে নিচ্ছিল আর মনে-মনে ভাবছিল, এতসব কায়দাকানুন ওর শেখার দরকারটা কী?

একদিন ও গুনাজিকে প্রশ্নটা করেই বসল।

'গুনাজি, তুমি আমাকে ড্রাইভিং-এর এতরকম মারপ্যাঁচ শেখাচ্ছ কেন বলো তো? আমি কি কার রেসিং-এ নাম লেখাতে যাচ্ছি নাকি?'

জিশানের দিকে তাকিয়ে হাসল গুনাজি ঃ 'দাদা, আপনাকে কার ড্রাইভিং-এর সঙ্গে-সঙ্গে এসবও শেখাতে হবে। কারণ, মার্শাল স্যার আমাকে সেরকমই অর্ডার দিয়েছেন...।'

গুনাজিকে ভালো করে লক্ষ করল জিশান।

মাথার চুলে জেল। চুলের সোনালি রং রোদে চকচক করছে। মুখে প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনা। গা থেকে পারফিউমের গন্ধ বেরোচ্ছে।

'কেন, এরকম অর্ডার দিয়েছেন কেন?'

একটু চুপচাপ থাকার পর গুনাজি বলল, 'কিল গেমে যারা যায় তাদের এগুলো শিখে নেওয়া জরুরি, তাই। গেম সিটিতে দরকার পড়লে গাড়ি চালাতে হয়। আর সেটাও চালাতে হয় বেশ ডেঞ্জারাসভাবে...।'

জিশান গুনাজির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মনে হচ্ছিল, গুনাজি জিশান নয়, অন্য কারও কথা বলছে। কিল গেমের অন্য একজন প্লেয়ারকে গুনাজি গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে, গাড়ি নিয়ে নানান কসরত রপ্ত করাচ্ছে—তারই কথা বলছে গুনাজি। আর জিশান শুনছে।

ইস, এমনটা যদি সত্যি হত!

গাড়িটা একপাশে পার্ক করে কথা বলছিল গুনাজি। জিশান গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

বিশাল এলাকা জুড়ে নিউ সিটির এই ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার। নাম 'ফ্লাই বাই'। সুপারগেম্স কর্পোরেশনের পার্টিসিপ্যান্টরাই একমাত্র এই ট্রেনিং সেন্টারে গাড়ি এবং মোটরবাইক চালানো শিখতে পারে। তাও আবার কর্পোরেশনের অর্ডার পেলে তবেই।

এখানে এক-এক ধরনের ট্রেনিং-এর জন্য রয়েছে এক-একরকম ট্র্যাক। প্রতিটি ট্র্যাকের এলাকায় রঙিন এল-সি-ডি প্যানেলে নানান নির্দেশ লেখা। তার পাশে ছবি এঁকেও বোঝানো রয়েছে, এই এলাকাটা কোন ধরনের ট্রেনিং-এর

জন্য ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া প্রতিটি এলাকার জন্য রয়েছে বিশেষ ধরনের লোগো। সেই লোগোটা এলাকার নানান জায়গায় বেশ পরিকল্পনা করে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে কারও পক্ষে ভুল করে এক এলাকার বদলে অন্য এলাকায় ঢুকে পড়া মুশকিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ ঢুকে পড়ে তার জন্য রয়েছে বিপার এবং সিকিওরিটি গার্ড।

একটা গাড়ি যখন 'ফ্লাই বাই'-এর কোনও জোনে ঢুকতে চায় তখন সেই গাড়ির ড্রাইভারকে সেই জোনের একটা বড় মাপের লোগো কার্ড দেওয়া হয় ঃ স্পেশালি কোডেড ম্যাগনেটিক কার্ড। সেটা উইন্ডশিল্ডে লাগিয়ে নিতে হয়। এই লোগো কার্ড লাগানো অবস্থায় অন্য কোনও জোনে গাড়ি ঢুকলেই বিপার বেজে ওঠে আর লোগো কার্ডটা ফ্ল্যাশ করতে থাকে। তখন সিকিওরিটি গার্ডরা গাড়িটা থামিয়ে তার কন্ট্রোল হাতে নেয়।

'ফ্লাই বাই'-এর গার্ডদের পোশাকের রং নীল, তবে জোন অনুযায়ী তাদের পোশাকে নানান লোগো লাগানো রয়েছে।

গুনাজির কাছেই জিশান জেনেছে, এই ট্রেনিং সেন্টারের রাস্তাগুলো একটা স্পেশাল টাইপের সিনথেটিক অ্যাসফাল্ট দিয়ে তৈরি। এর ওপর দিয়ে যত জোরেই গাড়ি ছুটুক না কেন, তাতে রাস্তার ক্ষয় প্রায় হয় না বললেই চলে। অথচ গাড়ির টায়ারের গ্রিপের কোনও সমস্যা হয় না।

রাস্তা ছাড়াও ট্রেনিং-এর জন্য রয়েছে ধূ-ধূ মাঠ। এবড়োখেবড়ো, পাথুরে, আগাছায় ভরা। এ ছাড়া রয়েছে প্রকাণ্ড ঢিবি আর গর্ত। সবমিলিয়ে রাফ অ্যান্ড টাফ হোস্টাইল টেরেন। গাড়ি চালানো শিখতে হবে সবরকম রাস্তা আর জমিতে।

'ফ্লাই বাই'-এর চারপাশটা দেখে জিশান স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এত সুন্দর এবং আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার বুঝি স্বপ্নেই দেখা যায়! নাকি তাও দেখা যায় না?

কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা এই ট্রেনিং সেন্টার জীবন-মরণ নিয়ে জুয়া খেলার আধুনিক আয়োজন করে তা থেকে নিয়মিত কোটি-কোটি টাকা আয়ের কী চমৎকার স্থায়ী বন্দোবস্ত করেছেন শ্রীধর পাট্টা!

গুনাজির কাছে তিনদিন ট্রেনিং নেওয়ার পর জিশানের দায়িত্ব নিল অন্য একজন ট্রেনার—যদিও গুনাজি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সঙ্গে রইল।

এই ট্রেনিং-এর ধাপে জিশান যেটা শিখছিল সেটা হল, নিজেকে অক্ষত রেখে কী করে বেপরোয়াভাবে গাড়ি ড্রাইভ করতে হয়—তা সেটা সামনের দিকেই হোক বা পিছনের দিকেই হোক। তার সঙ্গে শেখানো হতে লাগল গাড়ি

ছুটিয়ে 'র‍্যাম্প' বেয়ে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ দেওয়া। ছুটন্ত গাড়ি জলের মধ্যে পড়ে গেলে ডুবে যাওয়া সেই গাড়ি থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসতে হয়। চলন্ত গাড়িতে আগুন ধরে গেলে কী করে নিজেকে বাঁচাতে হয়।

সোজা কথায়, গাড়ি নিয়ে যতরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতি হতে পারে তার মোকাবিলা করার ট্রেনিং চলতে লাগল।

জিশান বুঝতে পারছিল, ও একটা পেশিবহুল যন্ত্র থেকে ধীরে-ধীরে আরও নিখুঁত একটা পেশিবহুল যন্ত্রে পালটে যাচ্ছিল।

গাড়ি চালানোর ঘামঝরানো বেপরোয়া ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর জিশানের কিন্তু ছুটি হল না। শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে ওকে তুলে দেওয়া হল প্যাসকো নামের এক মোটরবাইক ওস্তাদের হাতে।

জিশানের সামনে অ্যাসফাল্টের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল 'বুলডোজার—ব্লু লাইন' মডেলের চার হাজার সি.সি.-র একটা বাইক। তার পাশে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ছিল প্যাসকো।

কালো রঙের বাইকটাকে মনে হচ্ছিল একটা বুনো মোষ। আর তার বাঁকানো দুটো হাতল যেন মোষের শিং।

জিশানের মনে হল, প্যাসকোর মোটাসোটা ভারী চেহারাটাও বুনো মোষের চেহারার খুব কাছাকাছি।

গায়ে কালো চামড়ার স্লিভলেস জ্যাকেট। জ্যাকেটের গলার কাছটায় কয়েক খাবলা লোম উঁকি মারছে। গায়ের রং গাঢ় তামাটে। মোটা-মোটা হাত দুটো যেন ইস্পাতের থাম। হাতের সব জায়গায় লাল-কালো-সবুজ রঙের উলকি। মাথার ঝাঁকড়া চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। মুখটা লাউয়ের মতো ভারী। বাঁ-কানে একটা সোনার মাকড়ি। থুতনিতে যে-দাড়িটুকু রয়েছে সেটা ফ্রেঞ্চকাট আর ছাগলদাড়ির মাঝামাঝি। তাতে আবার চকচকে রুপোলি রং মাখানো।

প্যাসকো কী যেন একটা চিবোচ্ছিল—কারণ, ওর চোয়াল নড়ছিল।

প্যাসকোকে দেখেই জিশানের মনে হল, প্যাসকো কিল গেমের একজন পার্টিসিপ্যান্ট। ওর চোখ দুটো ছোট-ছোট—ডুমো-ডুমো গালের কোলে ঢোকানো। দুটো চোখের মণি যেন বরফের টুকরো। ঠান্ডা, মরা মাছের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জিশানের দিকে।

প্রথম দিন সকাল ন'টার সময় জিশানকে মোটরবাইক ট্রেনিং জোনে পৌঁছে দিয়ে গুনাজি 'ভিজিটরস ওয়েটিং জোন'-এ চলে গিয়েছিল। সেখানে ও জিশানের জন্য বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

গাড়ি চালানোর কসরত শেখানোর সময় গুনাজি বলেছিল, 'দাদা, শুধু কার ড্রাইভিং নয়, আপনাকে মোটরবাইক চালানোও শিখতে হবে...।'

উত্তরে জিশান বলেছে, 'আমি মোটরবাইক চালাতে জানি, গুনাজি...।'

গুনাজি হেসে বলেছে, 'ওই শেখা দিয়ে কাজ হবে না, দাদা। গেম সিটিতে মোটরবাইক চালানো খুব সহজ নয়। অথচ সেখানে শত্রুকে প্রাণে মারার জন্যে...কিংবা নিজে প্রাণে বাঁচার জন্যে...মোটরবাইক চালানোয় ওস্তাদ হওয়া দরকার...।'

কথা বলতে-বলতে গুনাজি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কোনওরকমে চোখ মুছে নিয়ে ভাঙা গলায় বলল, 'সেটা আপনি দু-তারিখেই বুঝতে পারবেন। গেম সিটির মধ্যে এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমি, পাহাড়, নদী, জঙ্গল—সব আছে। আমাদের মার্শাল বলেন, এসব না থাকলে লুকোচুরি খেলা জমবে কী করে! টিভিতে কিল গেমের প্রোমোতে প্রায়ই এসব নিয়ে আলোচনা হয়, ছবি দেখায়। আমি দেখেছি...।'

কাঁধে হাত বুলিয়ে গুনাজিকে আশ্বাস দিল জিশান ঃ 'তুমি আমার ওপরে ভরসা রাখতে পারছ না, গুনাজি?'

'না, না—তা নয়...।' গুনাজি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলল।

'তুমি চিন্তা কোরো না, গুনাজি। আমি খুব মন দিয়ে মোটরবাইক চালানো শিখব। খুব মন দিয়ে লড়ব...।'

গুনাজি কোনও কথা বলল না। শুধু চোখের জল মুছে চোয়াল চেপে ওপর-নীচে মাথা নাড়ল। তারপর গাড়িতে উঠে 'ভিজিটর্‌স ওয়েটিং জোন'-এর দিকে রওনা হয়েছিল।

ওর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে জিশানের মনে হল, সত্যি কিল গেমের আর বেশি দিন বাকি নেই ঃ মাত্র চোদ্দো দিন।

প্যাসকোর কাছাকাছি পৌঁছতেই ও হাত বাড়িয়ে দিল জিশানের দিকে। ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় জিশান টের পেল, ওর শক্তিও বুনো মোষের যথেষ্ট কাছাকাছি।

'ওয়েলকাম, জিশান, ওয়েলকাম—।' হেসে বলল প্যাসকো, 'তোমার কাণ্ডকারখানা টিভিতে রোজ দেখছি। তোমার জবাব নেই।'

জিশানের মনে হল, প্যাসকোর হাসিটা খুব সরল এবং আন্তরিক। তা ছাড়া, ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে চোখের ঠান্ডা মরা মাছের দৃষ্টিটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

ওর হাসির উত্তরে জিশান অজান্তেই হেসে ফেলল।

'সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন তোমার ডোসিয়ার আমাকে পাঠিয়েছে। সামনের মাসের দু-তারিখে তোমার কিল গেম। আমাদের এই ''ফ্লাই বাই''-এ ছ'-জন মোটরবাইক ট্রেনার আছে। তবে আমি শুধু কিল গেমের ক্যান্ডিডেটদের ট্রেনিং দিই। সুতরাং তুমি আমাকে মোটরবাইক ট্রেনিং-এর সুপার ট্রেনার বলতে পারো। ...আচ্ছা, তুমি কি বাইক চালাতে জানো?'

প্রশ্নটা এমনভাবে হল যে, জিশান ঠিক তৈরি ছিল না। একটু থতমত খেয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ—জানি।'

'তা হলে আমাদের ট্রেনিং-এ অনেকটা সুবিধে পাওয়া যাবে—।'

'তোমার কাছে সুপার ট্রেনিং নিতে আমার ক'দিন লাগবে?'

জিশানের কথায় মজা পেয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে 'হা-হা' করে হেসে উঠল প্যাসকো ঃ 'ভালো বলেছ! সুপার ট্রেনিং!...এই যে এই বাইকটা দেখছ...,' বলে কালো বাইকটার গায়ে হাত বোলাল প্যাসকো। তারপর রেসে জেতা ঘোড়ার পিঠে অহঙ্কারের চাপড় মারার ঢঙে বাইকটার সিটে চাপড় মারল ঃ 'বুলডোজার—ব্লু লাইন বাইক। চারহাজার সিসি। ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল স্পিডে ছুটতে পারে। এককথায় সুপারবাইক...।'

'তা হলে আর ভুল কী বলেছি, প্যাসকো! সুপার ট্রেনার আর সুপার বাইক—সুপার ট্রেনিং তো হবেই হবে।'

প্যাসকো বাইকে উঠে বসল। পিছনে উঠে বসার জন্য জিশানকে ইশারা করল।

জিশান চটপটে পা ফেলে বাইকটার কাছে এগিয়ে গেল। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে প্যাসকোর পিছনে চড়ে বসল। তারপর আবার জিগ্যেস করল, 'আমার ট্রেনিং ক'দিন চলবে?'

প্যাসকো ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'দ্যাখো, আমার সিটের দুপাশে গ্রিপার আছে। ও-দুটো শক্ত করে চেপে ধরো। হ্যাঁ, তোমার ট্রেনিং। আমার কাছে তোমার ট্রেনিং চলবে চারদিন। সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা। ঝোড়ো ট্রেনিং। ক্র্যাশ কোর্স—।'

জিশান কোনও কথা বলল না। একটু নজর করতেই ও কালো ফাইবারের গ্রিপার দুটো দেখতে পেল। শক্ত করে সে-দুটো চেপে ধরল। তখনই খেয়াল করল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে একজন সিকিওরিটি গার্ড ওকে লক্ষ্য করে হাসছে।

ট্রেনিং-এ আসছে বলে জিশান টুপি বা কালো চশমা পরে আসেনি। তাই গার্ডটা ওকে চিনতে পেরেছে।

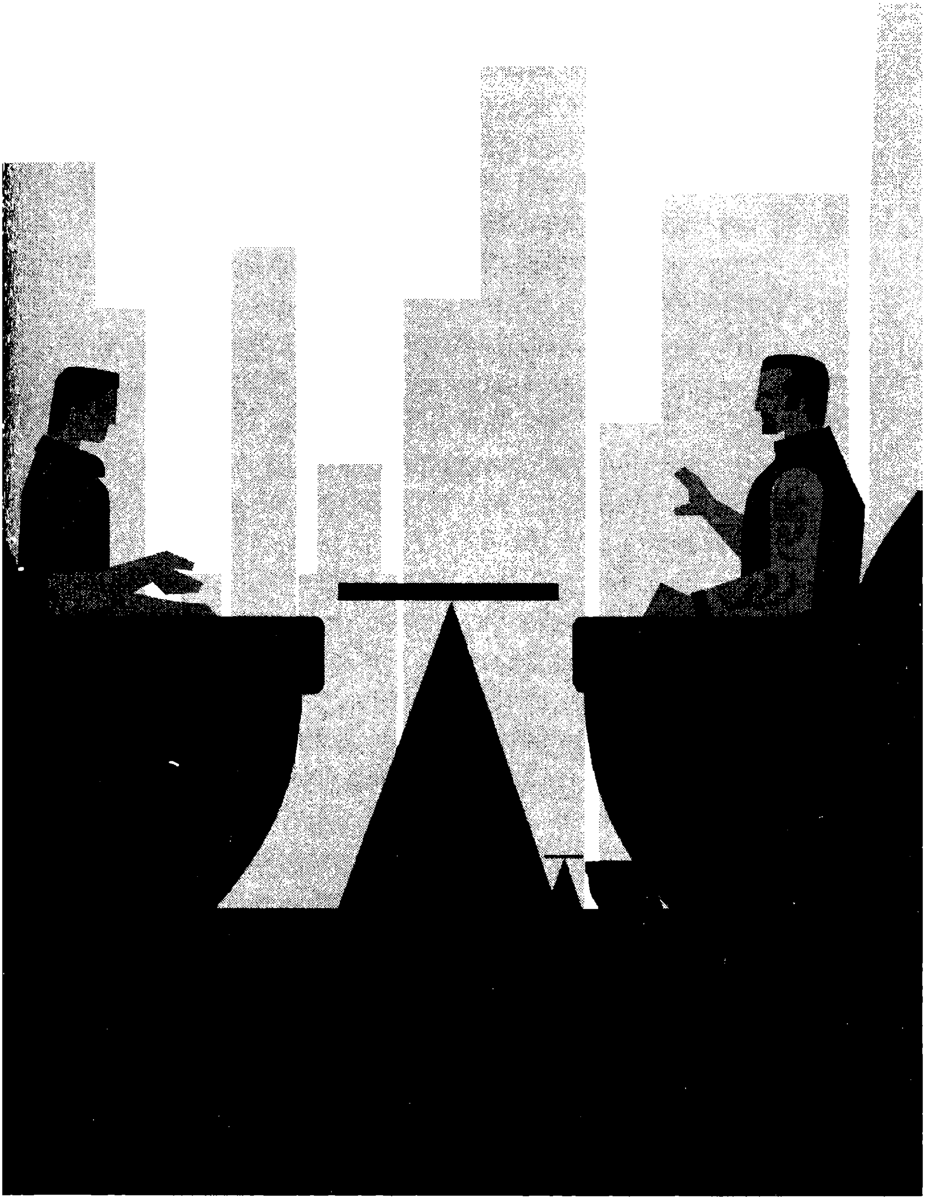
গার্ডটা হাত তুলে ওকে সেলাম জানাল।

জিশানও পালটা সেলাম ফিরিয়ে দিল।

তখন গার্ডটা দু-হাত শূন্যে তুলে দুটো 'ভি' অক্ষর দেখাল।

জিশান প্রথমটা ভাবল, গার্ডটা ওকে ডবল ভিকট্রি সাইন দেখাচ্ছে। কিন্তু তার পরেই মনে হল, না, তা নয়। গার্ডের দেখানো প্রথম 'ভি'-টা আসলে দুই—সেপ্টেম্বরের দু-তারিখ। আর দ্বিতীয় 'ভি'-টা ভিক্‌ট্রি।

বুলডোজার ছুটতে শুরু করেছিল। স্টার্ট দেওয়ার পর মাত্র দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যেই বাইকটা হাই ভেলোসিটিতে পৌঁছে গিয়েছিল। জিশানের চুল



বাতাসে উড়ছিল। বাইকের মসৃণ চলায় জিশান প্যাসকোর দক্ষতা টের পাচ্ছিল। ও ভেবেছিল, চারহাজার সিসি-র বাইক চলার সময় কানফাটানো আওয়াজ হবে, কিন্তু সেটা হচ্ছিল না। বাইকের দুপাশে প্রকাণ্ড মাপের দুটো সাইলেন্সার লাগানো রয়েছে। স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি সাইলেন্সার দুটোয় বড়-বড় খাঁজ কাটা, আর তাদের চেহারাও বিচিত্র। ওরাই বেশিরভাগ শব্দকে গিলে নিচ্ছিল।

পাঁচ-সাত সেকেন্ডের মধ্যেই ওরা ট্রেনিং জোনে এসে পড়ল। ট্রেনিং জোন, তবে সেটা প্রকৃতির তৈরি একটা বিশাল এলাকা। গাছপালা, উঁচু টিলা, উঁচু-নীচু রুক্ষ জমি, খানা-খন্দ-ডোবা—সবই আছে সেখানে।

জোনের একপাশে প্যাভিলিয়ন। সেখানে সবার জন্য ড্রেসিংরুম, বাথরুম আর ক্যান্টিন রয়েছে।

জিশান জামাকাপড় পালটে তৈরি হয়ে নিল। তখন দেখল, সেখানে আরও কয়েকজন ট্রেনার আর ট্রেনি রয়েছে। এই ট্রেনিরা নিশ্চয়ই অন্যান্য গেমের পার্টিসিপ্যান্ট।

ওরা সবাই জিশানকে দেখতে লাগল, নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা করতে লাগল।

জিশান লক্ষ করল, ট্রেনি কিংবা ট্রেনার, সবার চেহারাই সমীহ করার মতো। এদের মধ্যে যে-কেউই কিল গেমের পার্টিসিপ্যান্ট হতে পারে। কিন্তু চেহারাই যে সব নয় সেটা জিশান এর মধ্যেই বেশ ভালো করে জেনেছে। তাই ও মনে-মনে হাসল। ও এখন জানে, কিল গেমের ফাইনালে উঠতে হলে ভালো চেহারা ছাড়াও আর কী-কী লাগে।

শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্রতা, উপস্থিতবুদ্ধি, প্রতিপক্ষের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা, চুলচেরা বিচারের সূক্ষ্ম নজর, এক লহমায় পরিস্থিতি আঁচ করে নেওয়ার দক্ষতা, আর...।

আর পিছুটান। মিনি আর শানুর মতো জোরালো সুন্দর পিছুটান।

জিশান আগে ভাবত, যাদের কোনও পিছুটান নেই তারাই বোধহয় সবচেয়ে বেপরোয়া লড়তে পারে। এখন ও জানে, সেটা ঠিক নয়। বেপরোয়ার বেপরোয়া লড়তে পারে পিছুটানওয়ালা মানুষ। তার ভালোবাসার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য।

সারাদিনের ট্রেনিং যখন শেষ হল তখন জিশান সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছে। ও প্যাসকোর সঙ্গে ক্যান্টিনে গিয়ে বসল। আরামের গদিতে শরীরটাকে ছেড়ে দিল। তারপর গ্র্যানিউলার গ্রেভি স্যান্ডউইচ আর কন্‌সেনট্রেটেড এনার্জি ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল।

ট্রেনিং-এর মাঝে ব্রেকের সময় একবার ওরা ক্যান্টিনে এসেছিল বটে কিন্তু তখন আয়েস করার সময় ছিল না। সেকেন্ড হাফের ট্রেনিং শুরু করার

চাপ ছিল।

কিন্তু এখন সে-টেনশান নেই।

প্যাসকোর ট্রেনিং-এর কথা জিশানের মনে পড়ছিল। ওর মোটরবাইক চালানো দেখে মনে হচ্ছিল বুলডোজার বাইকটা ওর শরীরেরই অংশ। বাইক নিয়ে যে এরকম বিপজ্জনকভাবে এত কিছু করা যায় তা জিশান আগে কখনও কল্পনা করেনি। ও মোটরবাইক চালাতে জানে বলে প্যাসকোর ট্রেনিং খুব দ্রুত এগোচ্ছিল।

আজ ট্রেনিং-এর প্রথম ধাপে জিশান প্যাসকোর পিছনে বসেছে।

দ্বিতীয় ধাপে প্যাসকো বসেছে জিশানের পিছনে।

আর তৃতীয় ধাপে জিশান একাই বুলডোজার চালিয়েছে। তখন জিশানের কানে ছিল ইয়ারফোন। বহুদূরে দাঁড়ানো প্যাসকোর ইনস্ট্রাক্‌শন ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জিশানের কানে এসেছে।

আজ ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর জিশানের মনে হচ্ছিল, ও যেন কতদিন ধরে 'ফ্লাই বাই'-এ মোটরবাইক চালানোর ট্রেনিং নিচ্ছে।

ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর জিশান যে শুধু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়, ওর ভীষণ খিদেও পাচ্ছিল। ক্যান্টিনে এসে ওর খিদেটা কেউটের ফণার মতো ঝটকা দিয়ে লাফিয়ে উঠল।

ক্যান্টিনটা নামেই ক্যান্টিন, কিন্তু চরিত্রে সুপার হাই-ফাই রেস্তোরাঁ। নরম রঙিন আলোয় ভাসিয়ে দেওয়া ঠান্ডা মনোরম পরিবেশ। গোটা রেস্তোরাঁর ইন্টিরিয়ার ডেকরেশানে ব্যবহার করা হয়েছে শুধু রংহীন কাচ আর স্টেইনলেস স্টিল। রেস্তোরাঁর সামনে সুন্দর করে সাজানো সবুজ মাঠ, আর তাকে ঘিরে রঙিন ফুলের বাগান।

রেস্তোরাঁর কোথাও কোনও মেয়ের চিহ্ন নেই—চারিদিকে পুরুষ আর পুরুষ। তাদের বেশিরভাগই গেম্‌স পার্টিসিপ্যান্ট এবং তারা ওল্ড সিটির পাবলিক।

প্যাসকো হালকা গল্প করছিল। ওর চেহারা দেখে মনে হয় না ও কখনও কারও সঙ্গে এরকম ভেসে যাওয়া মুডে গল্প করতে পারে।

খেতে-খেতে ও হঠাৎই মুখ তুলে তাকাল জিশানের দিকে। আচমকা বলে বসল, 'জানো তো, আমি কিল গেমের পার্টিসিপ্যান্ট ছিলাম। চার বছর আগে। তোমার মতো ফাইনালেও উঠেছিলাম...।'

জিশান চমকে উঠল। ওর খাওয়া থমকে গেল।

অবাক হয়ে বলল, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি...।' প্যাসকো বলল।

'তারপর? তারপর কী হল? তুমি কিল গেমে জিতলে?'

'নাঃ...,' মাথা নাড়ল প্যাসকো। 'ফোঁস' করে একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, 'জিতিনি...।'

জিশান অবাক হয়ে গেল। না জিতলে প্যাসকো ওর সামনে বসে আছে কী করে? বেঁচে আছে কী করে?

তিন চামচ গ্র্যানিউলার গ্রেভি স্যান্ডউইচ মুখে পুরে দিল প্যাসকো। সেটা চিবোতে-চিবোতে চুমুক দিয়ে কয়েক ঢোঁক এনার্জি ড্রিংক তাতে মিশিয়ে নিল। তারপর বলল, 'আমার পিকিউলিয়ার একটা মিসহ্যাপ হয়েছিল...' একটু থেমে 'হুঁঃ' করে বিরক্তির একটা শব্দ করল। মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার ঃ 'কিল গেমের ঠিক দুদিন আগে আমি হঠাৎ সেন্সলেস হয়ে গেলাম। আমাকে নিউ সিটির সেন্ট্রাল নার্সিং ইউনিটে ভরতি করে দেওয়া হয়েছিল। পরদিন জ্ঞান ফেরার পর নার্সদের মুখে শুনলাম, হাইপারটেনশান আর হাই প্রেশার আমাকে আচমকা ধাক্কা দিয়েছে। কিল গেমের দিন যত এগিয়ে আসছিল আমার টেনশান নাকি ততই বাড়ছিল। তারপর আমি আর চাপ নিতে পারিনি...।'

'কিল গেমের কী হল?'

'কী আবার হল! শ্রীধর পাট্টা আমার বদলে অন্য একজন পার্টিসিপ্যান্টকে মাঠে নামিয়ে দিলেন। ছেলেটা দুপুর পেরিয়ে বিকেল হওয়ার আগেই বডি হয়ে গেল। গেম্স-এর অনেকগুলো রাউন্ডে ও জিতেছিল...কিন্তু সেরকম টাফ ছিল না।'

জিশান এনার্জি ড্রিংক শেষ করে হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল। হ্যাঁ, কিল গেমে চব্বিশ ঘণ্টা লড়তে গেলে টাফ হওয়া দরকার। প্যাসকোর গা থেকে টাফনেসের গন্ধ বেরোচ্ছিল। সেই সঙ্গে ঘামের গন্ধও।

একটু দূরে একটা টেবিল ঘিরে পাঁচজন ট্রেনির একটা দল বসে ছিল। নিজেদের মধ্যে ওরা গল্পগুজব করছিল, খাওয়াদাওয়া করছিল। আর থেকে-থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে জিশানকে দেখছিল।

জিশানকে ওরা চিনতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওরা এতবার তাকাচ্ছিল যে, জিশানের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বুঝতে পারছিল, শুধু তাকানো নয়, ওকে নিয়ে কিছু একটা আলোচনাও চলছে। তা ছাড়া মাঝে-মাঝেই ওরা জিশান আর প্যাসকোর দিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা গলায় কীসব বলাবলি করছে।

জিশান ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় প্যাসকোর দিকে তাকাল। যে-প্রশ্নটা কিছুক্ষণ ধরে ওর মনে খোঁচা মারছিল সেটাই করল ওকে।

'কিন্তু এই চাকরিতে তুমি ঢুকলে কেমন করে? আর এইরকম ব্যাপক বাইক চালাতেই বা শিখলে কী করে? মার্শাল তো আর এমনি-এমনি তোমাকে সুপার ট্রেনারের চেয়ারে বসাবেন না...।'

হাসল প্যাসকো। বলল, 'ঠিকই বলেছ। সে অনেক গল্প। তোমার ট্রেনিং

তো এখন চলবে। কাল শুনো...।'

'ঠিক আছে—তাই হবে।'

ক্যান্টিন থেকে বেরোনোর সময় প্যাসকো জিশানের পিঠে চাপড় মেরে বলল, 'তোমার মোটরবাইকের হাত ভালো—শিখছও তাড়াতাড়ি। একটা কথা মনে রেখো, জিশান। গেম সিটিতে মোটরবাইক হচ্ছে একটা বড় ওয়েপন। খুব পাওয়ারফুল ওয়েপন। এটাকে ঠিকঠাক ইউজ করতে পারলে তুমি জিতবে—।'

জিশান প্যাসকোর চোখের দিকে তাকাল। একটা দিনের পরিচয়েই লোকটাকে ওর বন্ধু বলে মনে হল।

●

পরদিন সুপার হাই-ফাই ক্যান্টিনেই ঘটনাটা ঘটল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে প্যাসকো আর জিশান ক্যান্টিনে বসে রিল্যাক্স করছিল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে ওরা কন্‌সেনট্রেটেড এনার্জি ড্রিঙ্কে চুমুক দিচ্ছিল। তখনই জিশান গতকালের ট্রেনির ঝাঁকটাকে লক্ষ করল।

আজ ওরা বসেছে জিশানদের টেবিলের একটা টেবিল পরেই—ফলে গতকালের তুলনায় অনেক কাছাকাছি। সুতরাং ওদের কথার্বাতার টুকরো জিশান আর প্যাসকোর কানে আসছিল। সেই টুকরোগুলোর মধ্যে ওদের নামও শোনা যাচ্ছিল। এ ছাড়া, গতকালের মতোই, ছেলেগুলো বারবার মুখ ফিরিয়ে জিশানদের দিকে দেখছিল। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা করছিল।

জিশান উশখুশ করছিল। প্যাসকোও জিশানের সঙ্গে মন দিয়ে গল্প করতে পারছিল না—ওর তাল কেটে যাচ্ছিল।

জিশান ভাবছিল যে, উঠে গিয়ে ওদের জিগ্যেস করবে, ব্যাপারটা কী? ঠিক তখনই ওদের দল থেকে লম্বা মতন একটা ছেলে উঠে এল, জিশানদের টেবিলের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

জিশান বসেই রইল। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ছেলেটা কোন গেমের পার্টিসিপ্যান্ট কে জানে! তবে পেটানো চেহারা। রং ময়লা। মুখের পেশি শক্ত। ঠোঁটের ওপরে সরু গোঁফ। গোঁফের দুপাশে ক্যালিপার্স-রেখা। আবছা ভেলভেট দাড়ি। চোখ দুটো টানা-টানা হলেও তাতে অভিসন্ধির ছাপ আছে।

'তুমি তো জিশান—' ছেলেটা প্যান্টের পকেটের কাছটায় হাত ঘষতে-ঘষতে বলল।

জিশান কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'হ্যাঁ, কেন?'

ছেলেটা হাসল : 'আমরা তোমাকে আর ওকে নিয়ে কাল থেকে ডিসকাস করছিলাম...।' প্যাসকোর দিকে আঙুলের ইশারা করল ছেলেটা।

জিশান কোনও কথা বলল না। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। প্যাসকো কুতকুতে চোখে ঠান্ডা দৃষ্টি নিয়ে ছেলেটার দিকে শুধু তাকিয়ে রইল।

জিশানদের টেবিল ঘিরে দুটো খালি চেয়ার ছিল। কিন্তু জিশানরা ছেলেটাকে বসতে বলেনি।

তা সত্ত্বেও ছেলেটা হঠাৎ 'বসছি—' বলে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল।

প্যাসকোর ধৈর্য বোধহয় জিশানের চেয়ে কম। ও মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলেটাকে জিগ্যেস করল, 'তোমার কী দরকার তাড়াতাড়ি বলো। আমরা নিজেদের মধ্যে প্রাইভেট কথা বলছি...।'

ছেলেটা আবারও হাসল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বন্ধুদের দিকে। ওরা বেশ আগ্রহ নিয়ে জিশানদের টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

ছেলেটা জিশানের দিকে চোখ ফেরাল। হেসে বলল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কাল থেকে আমরা তোমাদের নিয়ে ডিসকাস করছি...' সরু গোঁফের ওপরে আঙুল বোলাল : 'আমাদের পয়েন্টটা হচ্ছে, তোমাদের দুজনের মধ্যে ফাইট হলে কে জিতবে...।'

জিশান অবাক হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড ও কোনও কথা বলতে পারল না। প্যাসকোর অবস্থাও তাই।

আরও দুজন ট্রেনি ততক্ষণে নিজেদের জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছে। জিশানদের টেবিলের কাছে এগিয়ে আসছে।

প্যাসকো ছেলেটির দিকে জরিপ নজরে তাকিয়ে ছিল। বুঝতে চেষ্টা করছিল, ছেলেটি কোনও নোংরা রসিকতা করতে চাইছে কি না।

জিশান ঠান্ডা গলায় ছেলেটাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ বলো তো?'

ছেলেটার মুখে তখনও হাসিটা লেগে রয়েছে। ও বলল, 'আমরা তোমাদের একটা ফ্রি স্টাইল ফাইট দেখতে চাইছি। আমরা পাঁচজন সে নিয়ে বাজিও ধরতে রাজি। সুপারগেম্স কার্পোরেশনের নানান গেমে আমরা বেশ কয়েকটা রাউন্ডে কোয়ালিফাই করেছি। তাতে অনেক টাকাও পেয়েছি। তাই...।'

প্যাসকো সামনে ঝুঁকে পড়ে ওর ডানহাতটা ছেলেটার দিকে বাড়াতে যাচ্ছিল, জিশান সাপের ছোবলের ক্ষিপ্রতায় প্যাসকোর হাত চেপে ধরল। হাতের ওপরে আলতো করে চার আঙুলের চাপড় মেরে ওকে শান্ত হতে ইশারা করল।

বাকি দুজন ট্রেনি এখন ওদের বন্ধুর দুপাশে দাঁড়িয়ে। মুখে কৌতূহল, উত্তেজনা।

প্রথম ছেলেটা দু-বন্ধুর দিকে একে-একে তাকিয়ে ইশারায় বোঝাতে চাইল যে, ব্যাপারটা সে জিশানকে বলেছে।

জিশান বলল, 'যদি ঠিক বুঝে থাকি তা হলে তোমরা চাইছ, আমি আর প্যাসকো ফ্রি স্টাইল ফাইটে মোকাবিলা করি—।'

উত্তরে তিনজনেই বলল, 'ইয়েস! ইয়েস!'

প্রথম ছেলেটা বলল, 'আমরা পাঁচজনে মিলে তোমাদের ভালো টাকার প্রাইজ মানি দেব, জিশান—।'

প্যাসকো চট করে উঠে দাঁড়াল।

জিশানও উঠে দাঁড়াল ঃ 'প্যাসকো, প্লিজ...।' প্যাসকোকে শান্ত হতে ইশারা করল।

জিশান ছেলেটাকে বলল, 'তোমরা একটা ছোট্ট ভুল করছ। আমরা বন্ধু। আর জানোই তো, ফ্রেন্ড্স ডোন্ট ফাইট।'

এ-কথায় ছেলেটার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। তবে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'জিশান, তুমি কিল গেমে কোয়ালিফাই করেছ বটে, বাট য়ু ডোন্ট লুক সো টাফ। তোমার এই যে বন্ধু—প্যাসকো না কী নাম বললে—ও তোমার চেয়ে অনেক বেশি টাফ...।'

ওদের দলের বাকি দুজনও কখন যেন জিশানদের টেবিলের কাছে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওদের আর-একজন বলল, 'জিশান, লড়ে যাও! প্যাসকোকে দেখিয়ে দাও তোমাদের মধ্যে কে বেশি টাফ। কিল গেমে তুমি যখন কোয়ালিফাই করেছ তখন নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে একটা কিলার রয়েছে—।'

বন্ধুর কথার খেই ধরে নিয়ে প্রথম ছেলেটা বলল, 'কাম অন, কিলার, শো আস হু ইজ দ্য বস। কাম অন...।'

ছেলেটা কথাগুলো ইংরেজিতে বললেও তার মধ্যে যে লড়াইয়ের ওসকানি রয়েছে সেটা জিশান ভালোই বুঝতে পারছিল। তা সত্ত্বেও ও ঠান্ডা গলায় বলল, 'বললাম তো, বন্ধুরা কখনও ক্ষমতা দেখানোর জন্যে লড়াই করে না। অনেক কষ্ট করে একজন ভালো বন্ধু পাওয়া যায়...।'

ওদের মধ্যে একটা ছেলে বেশ মোটাসোটা, পালোয়ান গোছের। তাব ঘাড়ে লাল-কালোয় মেশানো উলকি আঁকা। সেই ছেলেটা তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে কয়েন টস করার ভঙ্গি করে বলল, 'আরে ভাই, ঠিক আছে—আমরা পাঁচজন মিলে ফিফটি থাউজ্যান্ড দেব। ছোট করে একটা ফাইট হয়ে যাক...।'

'রেস্টুরেন্টের বাইরে ওই খোলা জায়গাটায় ফাইটটা হতে পারে—' ওদের মধ্যে উৎসাহী একজন রেস্তোরাঁর বাইরের মাঠটা আঙুল তুলে দেখাল।

প্রথম ছেলেটা জিশান আর প্যাসকোকে হাতের ইশারা করে ডাকল : 'চলো, জিশান—ফাইট গেম শুরু করে দেওয়া যাক।'

যেটা জিশানকে অবাক করছিল সেটা হল, ছেলেগুলো শুধু নিজেদের কথা বলেই যাচ্ছিল—জিশানের কথাকে একফোঁটাও পাত্তা দিচ্ছিল না। ওরা হয়তো ওল্ড সিটি থেকে এসেছে—পুরস্কার জেতার লোভে। কিন্তু এর মধ্যেই নিউ সিটির রীতিনীতির সঙ্গে দিব্যি খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সেইজন্যই বন্ধুত্বকে টাকা দিয়ে টেক্কা দিতে চাইছে।

'কাম অন, প্যাসকো! কাম অন, জিশান! লেট্‌স গো—।' প্রথম ছেলেটা অধৈর্যভাবে প্যাসকো আর জিশানকে তাড়া লাগাল।

প্যাসকো অনেকক্ষণ ধরেই ভেতরে-ভেতরে ফুঁসছিল। ওর ভেতরে একটা ভূমিকম্প তৈরি হয়ে সেটা রিখ্‌টার স্কেলে ক্রমশ বাড়ছিল।

এবার বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

চোখের পলকে ছেলেটার মাথার চুল বাঁ-হাতে খাবলে ধরল প্যাসকো। এবং ডানহাতে সপাটে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল গালে।

পাইপগানের গুলি চালানোর মতো তীক্ষ্ণ শব্দ হল। আর শব্দের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে ছেলেটার গালের ক্ষতি হল।

ওর ডান গালটা আড়াই ইঞ্চি লম্বা হয়ে ফেটে গেছে। লালচে গালের ওপরে রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে-ধীরে।

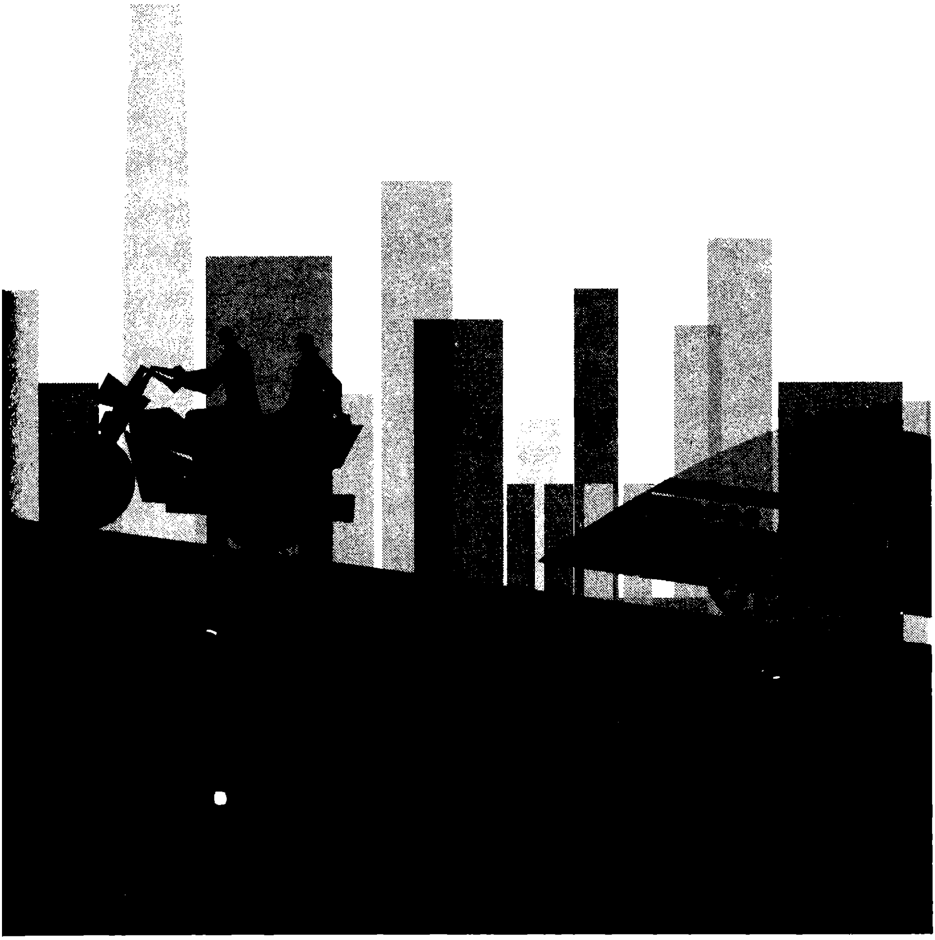
ওর চারজন সঙ্গী নানারকম চিৎকার করে উঠল। ওদের মধ্যে একজন প্যাসকোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, কিন্তু জিশান কী এক কায়দায় যেন লাথি চালাল। ছেলেটা রেস্তোরাঁর মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

বাকি তিনজন বুদ্ধিমান। ওরা প্যাসকো আর জিশানের কাছ থেকে পায়ে-পায়ে পিছিয়ে গেল।

প্যাসকো কিন্তু প্রথম ছেলেটার চুলের মুঠি ছাড়েনি—এখনও খামচে ধরে রেখেছে। ছেলেটার মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে। হাউমাউ করে চিৎকার করছে। অসহায়ভাবে শূন্যে দু-হাত নাড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে, বাতাসে সাঁতার কাটছে।

রেস্তোরাঁয় আর যারা ছিল, তারা গোলমাল দেখে চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার এবং কর্মীরা একপাশে এসে জড়ো হয়ে গেছে।

জোকারের মতো তিড়িংবিড়িং করা ছেলেটার গালে কয়েকটা আলতো চাপড় মারল প্যাসকো। মুখে 'চুক-চুক' শব্দ করে বলল, 'যাঃ, পালা। আমাদের



দোস্তি বিক্রি নেই। আবার এরকম দুষ্টুমি করলে একেবারে ফারফোর করে দেব...।'

কথা শেষ করে হতভাগা ছেলেটাকে পিছনে ঠেলে দিল প্যাসকো। ছেলেটা উলটো ডিগবাজি খেয়ে ছ'-সাত হাত দূরে পৌঁছে গেল। ওর সঙ্গীসাথীরা ওকে তাড়াতাড়ি আগলে ধরল। সোজা করে দাঁড় করাল। কাটা গালে রুমাল চেপে ওকে মেরামত করতে চেষ্টা করল। তারপর ক্যান্টিনের বাইরে পা বাড়াল। যাওয়ার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে জিশান আর প্যাসকোকে বারবার দেখছিল ওরা।

এত হইচই হুজ্জুতির মধ্যেও রেস্তরাঁর ডেকরেশান বা ফার্নিচারের কোনও ক্ষতি হয়নি। প্যাসকো হাত-পা নেড়ে ম্যানেজারকে ঘটনাটা সবিস্তারে বলছিল।

জিশান রওনা হওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। ম্যানেজারের সঙ্গে প্যাসকোর কথা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ক্যান্টিনের কাচের দেওয়ালের বাইরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। খুব হালকাভাবে মোটরবাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে আসছে। দূরে আধোআঁধারির মধ্যে হেডলাইটের ছুটে যাওয়া আলো দেখা যাচ্ছে।

ম্যানেজার চলে যেতেই প্যাসকো জিশানকে বসতে ইশারা করল : 'আর একটু বসে মেজাজ ঠান্ডা করে তারপর যাব। তোমার সঙ্গে কথা আছে—।'

জিশান বসল। প্যাসকো ওর মুখোমুখি বসে পড়ল আবার। দু-হাতের চেটো চামড়ার জ্যাকেটে কয়েকবার ঘষে নিয়ে বলল, 'নিউ সিটিটা একদম গেছে! খুব কম সময়ে একটা মানুষকে নষ্ট করে দেয়। পলিউশান।'

বেয়ারাকে ইন্ডিকেটর ল্যাম্প জ্বেলে কাছে ডাকল জিশান। দুটো এনার্জি ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল।

প্যাসকো ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'জিশান, আমি চাই তুমি কিল গেমে জিতে যাও। তা হলে যদি সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনকে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।' সামনে ঝুঁকে এল প্যাসকো। নীচু গলায় বলল, 'কিল গেমের সব পার্টিসিপ্যান্টকেই আমি খুব খেটে মন দিয়ে মোটরবাইক চালাতে শেখাই। এই আশায় যে, ওরা কিল গেমে জিতে যাবে...' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'কিন্তু সেটা হল কই? আমি আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু টিভিতে তোমার অ্যাকশান দেখে একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। মনে হল তুমিই পারবে। তুমিই শালা পারবে—।'

বেয়ারা এনার্জি ড্রিঙ্ক সামনে রেখে গেল।

জিশান প্যাসকোর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'থ্যাংক য়ু—।'

প্যাসকো মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদটা নিল। তারপর বলল, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, গেম সিটিতে মোটরবাইক হচ্ছে একটা বড় ওয়েপন। খুব পাওয়াফুল ওয়েপন। তোমাকে আমি জান দিয়ে শেখাব, জিশান।'

জিশান এনার্জি ড্রিঙ্কে চুমুক দিল। প্যাসকোও।

জিশান হেসে বলল, 'সে তো শেখাবে। তার আগে বলো দেখি, তুমি এরকম সুপার বাইক চালাতে শিখলে কোত্থেকে?'

প্যাসকো ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল। বলল, 'ছোটবেলা থেকেই আমি মোটরবাইকের পোকা। কেন জানি না, শালা বাইক ব্যাপারটাই আমাকে টানত। কিন্তু বাইক কেনার পয়সা ছিল না—কোত্থেকে থাকবে! বাপটা চাকরি করত বাড়ির কাছেই—নালাগড় কটন মিলে। আর আমরা চার-চারটে ভাই-বোন। ভাত-রুটি আর আলুসেদ্ধ—এই ছিল বলতে গেলে ডেইলি মেনু।

'আমার মোটরবাইক কেনার পয়সা না থাকলে কী হবে, সুযোগ পেলেই পাড়ার দাদাদের বাইকের পেছনে চড়ে বসতাম। ওদের বাইকগুলো ধোয়া-মোছা করতাম। ওরা আমাকে হাত খরচের পয়সা দিত। তাই দিয়ে সিগারেট-বিড়ি ফুঁকতাম, নেশা করতাম।' একটা বড় শ্বাস ছাড়ল প্যাসকো। ওর চোখে শূন্য দৃষ্টি। ও এখন ফিরে গেছে জীবনখাতার অতীতের পাতায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্যাসকো বলল, 'জানো, জিশান—আমি গরিব ছিলাম—তবে বেশ ছিলাম। বিনাপয়সায় মোটরবাইক চড়তাম, গলা ছেড়ে গান গাইতাম, আর সকালবেলায় কটনমিলের মাঠে বন্ধুরা মিলে লোহালক্কড় নিয়ে ব্যায়াম করতাম।

'বাইকের দেখভাল করতে-করতে আমি বাইক চালানো শিখে গিয়েছিলাম। নিজের খেয়ালেই বাইক নিয়ে নানান কসরত ট্রাই করতাম। তখন আমার কত আর বয়েস? বড়জোর ষোলো-টোলো হবে। পাড়ার দাদারা আমার বাইক চালানোর তারিফ করত, আর আমি ভেতরে-ভেতরে ফুলে যেতাম।

'ওরা আমাকে একটা বাইক ধরিয়ে দিয়ে নানান ফরমাশ করত : এখান থেকে ওখানে কোনও চিঠি বা প্যাকেট পাঠানো, কাউকে বাস স্ট্যান্ডে কিংবা স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া, মালের বোতল কিনে আনা—আরও কত কী! আমি বাইক চালানোর সুযোগ পেয়ে মনের আনন্দে কাজগুলো করতাম।

'তবে একটা ব্যাপার, জিশান—যতই অভাব থাক, আমি কখনও চুরি করিনি—না বাইকের পার্টস, না বাইকের তেল। শুধু এক বার বাইক চালানোর সুযোগের জন্যে মনটা ছটফট করত।'

'কিন্তু তুমি নিজের মোটরবাইক কিনলে কেমন করে?' জিশান জিগ্যেস করল।

হাসল প্যাসকো ঃ 'সেটা একটা থ্রিলিং ব্যাপার। শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে...।'

●

'কীরকম?' কৌতূহলে প্রশ্ন করল জিশান।

'আমাদের এলাকায় অনেক দাদা ছিল। তাদের বেশ কয়েকজনের বাইক ছিল।' টেবিলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসল প্যাসকো। পুরোনো কথা মনে করে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ঃ 'আর...কী বলব তোমায়...বাইকওয়ালা দাদা হলেই আমি যেন তার কেনা গোলাম হয়ে যেতাম। ওই বাইক চালানোর মওকার লোভে আর কী!

'তবে দাদাগুলো সবই দু-নম্বরি লাইনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। বন্ধ কারখানার স্ক্র্যাপ যখন নিলামে উঠত তখন দাদারা সেখানে ডাক চড়াত। সেখান থেকে ভালো নোট আমদানি হত। আমদানির রাতগুলোতে ফুর্তি-ফার্তা হত। ওরা সব বোতলবাজি করত, সঙ্গে কষা মাংস, পরোটা। মদে আমার কোনও টান ছিল না। মদের গন্ধে আমার উলটি আসত। এর আসল কারণ কী জানো?' প্রশ্নটা করে মুখে বিরক্তির 'হুঁঃ' শব্দ করল প্যাসকো। তারপর বলল, 'ছোটবেলা থেকে দেখছি আমার বাপটা মাল-টাল টেনে প্রায়ই আমার মা-কে পেটাত। আমার বেচারি মা!...ওই কাণ্ড দেখে ছোটবেলা থেকেই মদের ওপরে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। তো দাদারা ওসব খেত, নিজেদের মধ্যে হইচই করত...আর আমি এককোণে বসে কষে কষা মাংস আর পরোটা খেতাম। বাড়িতে তো এসব খাবার কখনও জুটবে না!

'শুধু স্ক্র্যাপের ডাক নয়, আমাদের পাড়ার বেশিরভাগ দাদাই আর-পাঁচটা কর্ডলাইনে লেনদেন করত। যেমন, ছুরি-বাটলি চালাচালি, ফোর শটার, সাদা গুঁড়ো, চরস, গাঁজা—আরও কতরকম জিনিসের কারবার! এ নিয়ে অন্য এলাকার দাদাদের সঙ্গে দুশমনি ছিল। দু-চারজন মার্ডারও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুরা লাইনে এসব ঝগড়া কাজিয়া তো থাকবেই!

'বুরা লাইনে লেনদেনের কাঁচা পয়সা আমাকে টানেনি। কেন জানো? আমার বাবাটা মাল খেত, মা-কে পেটাত, কিন্তু বহুত সৎ ছিল, খাঁটি মাল ছিল। হেভি বড়-বড় স্বপ্ন দেখত। কিন্তু একটা স্বপ্নও সত্যি হয়নি। লাইফে ফেল মেরে গিয়েছিল। তাই হয়তো নিজের ওপরে খেপে থাকত। সেই খ্যাপা রাগটা আমার বেচারি মায়ের ওপরে ঝাড়ত।

'যাই হোক, আমার অনেক দাদার মধ্যে একজন ছিল রিয়েল দাদা। তার নাম ছিল লালানি। আমরা সবাই লানিদা বলতাম। বড়রা বলত, লানি। লানিদা

খুব ডেয়ারডেভিল ছিল। দারুণ মোটরবাইক চালাত। ওকে আমি বাইক চালানোয় আমার গুরু বলে মানতাম।

'লানিদা যেটায় বেশি ইনভল্‌ভ ছিল সেটা হল আর্ম্‌সের বিজনেস। অনেক সময় সেই বিজনেসের কাজে কারও সঙ্গে ভেট করতে গেলে মোটরবাইকের পেছনে আমাকে বসিয়ে নিত।

'লানিদার অনেক দুশমন ছিল। তাই সবসময় কোমরের পেছনদিকে মেশিন গুঁজে রাখত। ঢোলা জামা পরত—বাইরে ঝুলিয়ে।

'লানিদা আমায় খুব ভালোবাসত। কখনও চাইত না, আমি ওদের মতো খারাপ লাইনে নামি। তাই সবসময় বলত, "তুই কখনও আমাদের এসব বাজে লাইনে আসবি না। তুই ঠিকঠাক একটা বিজনেস করবি, নয়তো কোনও দোকান বসাবি। আমি তোকে কিছু টাকা দেব—।"

'আমি লানিদাকে বলতাম, আমি মোটরবাইক সারানোর গ্যারেজ করব। এ-কথায় লানিদা হেসে বলত, "একদম ঠিক বলেছিস। বাইক সারানোর গ্যারেজ। নাম হবে 'প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ'। কী বলিস?"

'আমি হাসতাম। বলতাম, "তোমার বাইক আমার গ্যারেজে সারাতে দেবে তো লানিদা?"

"দেব না মানে!" তারপরই লানিদার একগাল হাসি।

'একদিন সন্ধের পর লানিদার সঙ্গে বাইকে বসে বেরোলাম। লানিদা খুব সিগারেট খেত। কিন্তু কখনও সিগারেটের প্যাকেট কিনত না। দুটো করে সিগারেট কিনত। তার মধ্যে একটা ধরাত, আর অন্যটা জামার বুকপকেটে রেখে দিত।

'লানিদার এই হ্যাবিটের কথা সবাই জানত। এটা নিয়ে সিনিয়ার কি জুনিয়ার ইয়ারদোস্তরা লানিদাকে মাঝে-মাঝে চাটত। তো বাইক নিয়ে বেরোলে লানিদার সিগারেট এনে দিতাম আমি। মাঝরাস্তায় কোথাও সিগারেটের তেষ্টা পেলে লানিদা প্রথমে জামার পকেটের ওপরে হাত চাপা দিত। তারপর সিগারেট নেই বুঝলে বাইক থামাত। আমার হাতে পয়সা দিয়ে বলত, "প্যাসকো, দুটো উইল্‌স ফিলটার।"

'লানিদা কোন সিগারেট খায় আমি ভালো করেই জানতাম। কিন্তু দাদার ওই অভ্যেস—সবসময় ব্র্যান্ডের নামটা বলত।

'সেদিন পাড়া থেকে অনেক দূরের একটা বাস-স্ট্যান্ডের কাছে লানিদা একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। লানিদা যখন ফোনে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল তখন কিছু টুকরো কথাবার্তা আমার কানে আসছিল। তাতে বুঝতে পারছিলাম যে, তিরিশটা ফোর শটার কেনাবেচার ব্যাপারে কথা হচ্ছে।

'বাস-স্ট্যান্ডটা আমি তখন চিনতাম না। পরে জেনেছি ওটা ছিল নাগরা বাস-ট্যান্ড। ওখান থেকে সব দূরপাল্লার বাস ছাড়ে।

'তো বিজনেসের কথাবার্তা বলতে লানিদা বাস-স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে একটা গলিতে একটা পুরোনো বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। আমাকে বাইরে বাইকের কাছে রেখে গেল।

'ঘণ্টাখানেক পর দাদা ফিরে এল। দেখলাম খুব বিরক্ত আর রাগ-রাগ ভাব। বাইকে বসে লানিদা আপনমনেই গজগজ করছিল। তার কিছু-কিছু কথা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

''আমার সঙ্গে ছকবাজি করলে আমিও ছাড়ব না। আমার ফোর শটারের বিজনেসে যে পা বাড়াবে তার টেংরি আমি কেটে নেব।...আমাকে বুরবাক পেয়েছে!''

'আমি পেছনের সিট থেকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, ''কী হয়েছে, লানিদা? এত খেপে গেছ কেন?''

'''ও কিছু না। ছাড়...।'' বলে বাইকে স্টার্ট দিল।

'বাইক ছুটছিল। আমি চুপচাপ বসেছিলাম। হাওয়ায় চুল উড়ছে। চারপাশে রাত। বাতাসে কারখানার ধোঁয়ার গন্ধ। ছুটে যাওয়া গাড়ির হর্ন। ঝরঝরে রাস্তায় চাকার শব্দ।

'একটা কালো রঙের বাইক আর একটা সাদা প্রাইভেট মাঝে-মাঝেই আমাদের ওভারটেক করে এগিয়ে যাচ্ছিল, আবার পিছিয়ে পড়ছিল। বাইকে বসা লোক দুটোর মাথায় হেলমেট।

'বারতিনেক এমনি হওয়ার পর আমার একটু খটকা লেগেছিল। কিন্তু লানিদার মেজাজের অবস্থা দেখে কিছু বলিনি।

'হঠাৎই লানিদা বুক পকেটের ওপরে হাত বোলাল। তারপরই বাইকের স্পিড কমিয়ে রাস্তায় ধারের একটা সিগারেট আর কোল্ড ড্রিংকের দোকানের কাছে বাইক সাইড করল। প্যান্টের পকেট থেকে টাকা বের করে আমাকে দিয়ে বলল, ''দুটো উইল্‌স ফিল্টার নে—।''

'আমি বাইক থেকে নেমে সিগারেট কিনতে গেলাম। আর ঠিক তখনই কয়েকটা পটকা ফাটার শব্দ কানে এল।

'আমি চমকে উঠে শব্দ লক্ষ্য করে ফিরে তাকালাম। দেখি লানিদা রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। বাইকটা কাত হয়ে পড়ে গেছে রাস্তায়। ওটার ইঞ্জিন গরগর করছে। আর কালো বাইক আর সাদা গাড়িটা ছুটে চলে যাচ্ছে দূরে।

'আমি ''লানিদা'' বলে চিৎকার করে উঠলাম। গোল্লায় যাক উইল্‌স ফিল্টার। ছুটে চলে এলাম লানিদার কাছে।

'লানিদার গায়ে অন্তত তিনটে গুলি লেগেছে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই লানিদা উঠে বসেছে। ডানহাত পেছনদিকে বাড়িয়ে কোমরে গোঁজা রিভলভারটা বের করার চেষ্টা করছে।

'আমি আর দেরি করলাম না। প্রথমে লানিদাকে টেনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলাম। "লানিদা! লানিদা!" বলে বারবার ডাকতে লাগলাম। কেন জানি না, আমি লানিদার জন্যে কাঁদতে শুরু করেছিলাম।

'দু-বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে কয়েকবার টানাহ্যাঁচড়া করতেই লানিদা অতিকষ্টে "উঃ! আঃ!" করতে-করতে কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দেখলাম, ওর কোমরে আর পাঁজরে রক্ত।

'তাড়াতাড়ি মোটরবাইকটার কাছে গেলাম। ওটাকে খাড়া করে চেপে বসলাম। লানিদাকে বললাম, পেছনের সিটে চড়ে বসতে। বললাম, শক্ত করে আমাকে জাপটে ধরতে।

'ব্যস, বাইক স্টার্ট দিলাম। তখনই দেখলাম, কালো মোটরবাইক আর সাদা গাড়িটা ইউ-টার্ন নিয়ে আমাদের দিকে আবার ফিরে আসছে। তিনটে হেডলাইট চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলছে।

'আমার মাথার ভেতরে কে যেন বলে উঠল, "লানিদাকে বাঁচাতেই হবে।" আর একইসঙ্গে মোটরবাইক দেবতা আমার মাথার ওপরে সওয়ার হয়ে বসল। আমি বাইক ছুটিয়ে দিলাম। আমার দিকে তেড়ে আসা গাড়ি আর বাইকের দিকে। কারণ, ওটাই আমাদের এলাকায় ফেরার পথ। তা ছাড়া তখন ইউ-টার্ন নিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ওই অবস্থায় এক সেকেন্ড বাড়তি সময়ও আমার কাছে মারাত্মক জরুরি।

'যে-আঁকাবাঁকা রেখায় আমার বাইক ছুটছিল তাতে সাপের চলার ঢঙও লজ্জা পেয়ে যাবে।

'রাস্তার পাশের পাথর, গর্ত, ঢিবি এসবের ওপর দিয়ে আমি বাইক চালাচ্ছিলাম। কারণ, মনে হচ্ছিল, এতে আমার বাইক এলোমেলোভাবে লাফাবে, ডানদিকে বাঁ-দিকে ছিটকে যাবে। তাতে ওদের ফায়ারিং-এর নিশানা ফসকে যাবে।

'ঠিক তাই হল। আমাদের লক্ষ্য করে ওরা গুলি চালাতে লাগল। বাইকে বসা লোকদুটো ফায়ার করতে লাগল। আর গাড়ির ভেতরে বসা দুজন জানলা দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে মেশিনের ঘোড়া টিপতে লাগল।

'গুলির ঘন-ঘন আওয়াজে চারপাশটা কেঁপে উঠল বারবার। আমি সবকিছু ভুলে বডিটাকে বাইকের হাতলের গায়ে প্রায় সেঁটে দিয়ে পাগলের মতো বাইক ছোটাতে লাগলাম। হঠাৎই মনে হল আমার ডান পায়ে একটা

গরম ছ্যাঁকা লাগল। জায়গাটা জ্বলতে লাগল। কিন্তু তখন আর পরীক্ষা করে দেখার মতো পরিস্থিতি নেই। শুধু জানি, আমাকে বাইক ছুটিয়ে উধাও হয়ে যেতে হবে।

'আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট পর আমাদের এলাকায় বাইক ঢোকাতে পেরেছিলাম। অন্য দাদারা আমাদের দেখতে পেয়েই ছুটে এসে ঘিরে ধরল। তখনই জানা গেল, লানিদা অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

জিশান মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্যাসকোর কাহিনি শুনছিল। আর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিনের সেই সতেরো বছরের কিশোরকে খুঁজছিল।

প্যাসকো যে শক্তিশালী সেটা ওকে দেখে বোঝা যায়। কিন্তু ওর মধ্যে যে সততা আর অন্য গুণগুলো রয়েছে সেগুলোও জিশান এখন দেখতে পাচ্ছিল।

ও যেন নেশার ঘোরে জিগ্যেস করল, 'তারপর?'

'তারপরই তো আসল ব্যাপার—' হাসল প্যাসকো। জ্যাকেটে হাত ঘষল কয়েকবার। একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, 'প্রায় একমাস ধরে হাসপাতাল নার্সিংহোম করে লানিদা সেরে উঠল। ওর বডিতে তিনটে গুলি লেগেছিল। আর আমার পায়ে একটা। আমার সেরকম কোনও চোট লাগেনি—শুধু চামড়া আর মাংস ছিঁড়ে গিয়েছিল। সাত-দশ দিনের মধ্যেই আমার পা ঠিক হয়ে গেল। শুধু একটা দাগ থেকে গেল।

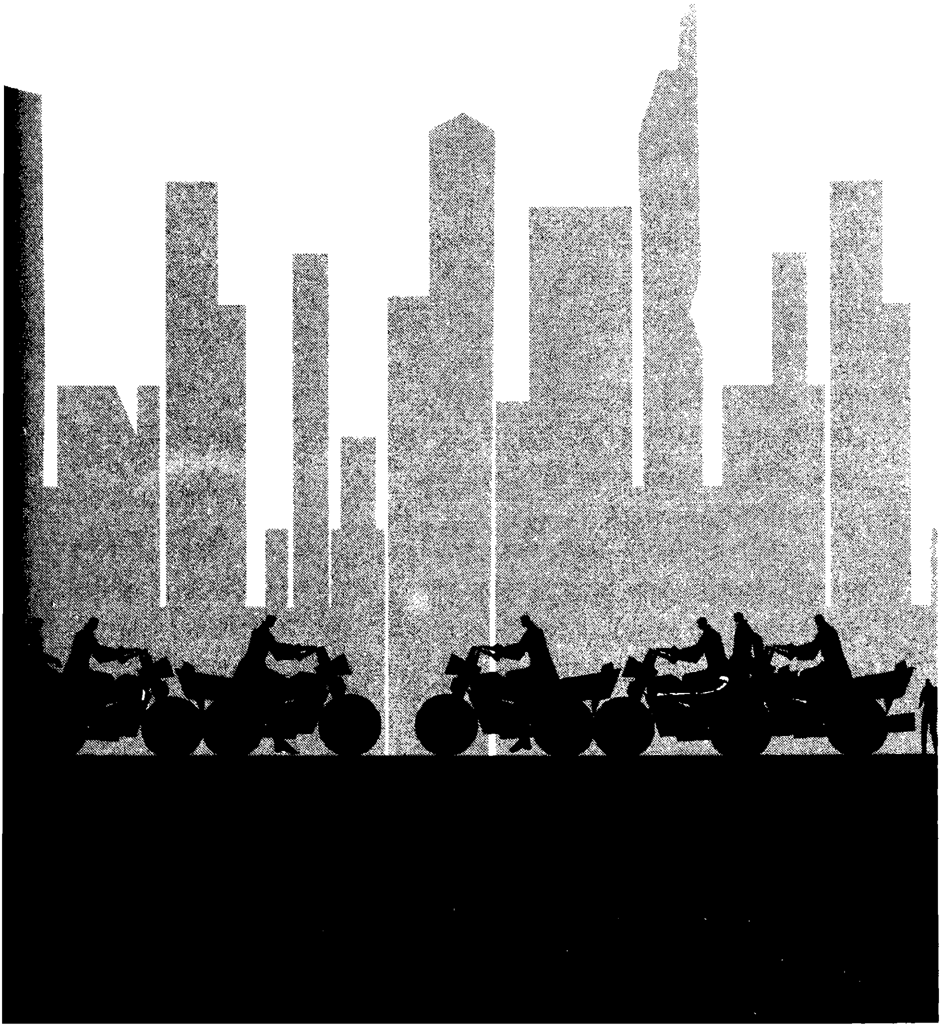
'হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম। লানিদা সেরে ওঠার পর ওর বাইকটা আমাকে গিফ্ট করে দিল। আমি আমার জীবনে প্রথমে মোটরবাইকের মালিক হলাম। সব দাদাদের সামনে লানিদা বলেছিল, ''প্যাসকো সেদিন আমার জন্যে যা করেছে সে শালা শোধ হওয়ার নয়। ওকে দেখলেই সবসময় আমার মনে পড়বে, আমি ওর জন্যে বেঁচে আছি।''

'জিশান, এই হল আমার মোটরবাইক কেনার কাহিনি। লানিদা আমার একটা স্বপ্নকে সত্যি করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, লানিদা আমাকে চল্লিশ হাজার টাকাও দিয়েছিল—মোটরবাইকের গ্যারেজ খোলার জন্যে। আমি পাড়ার মধ্যেই একটা জায়গা খুঁজে বের করে ভাড়া নিয়েছিলাম। তারপর সেখানে সত্যি-সত্যি একটা মোটরবাইক সারাইয়ের গ্যারেজ খুলেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম ''প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ''।

'কিন্তু সবচেয়ে ভালো ব্যাপার কী হয়েছিল জানো? যেটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল?'

'কী?'

'ওই অ্যাকশানের পর লানিদা খারাপ লাইন ছেড়ে দিয়েছিল। থানকাপড়ের ব্যাবসা স্টার্ট করেছিল। ব্যাবসা ওপেনিং-এর দিন লানিদা সবাইকে কবজি ডুবিয়ে খাইয়েছিল।'



জিশান প্যাসকোর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। মনে-মনে ভাবছিল, মোটরবাইক সারানোর গ্যারেজ খুলে একটা ইয়াং ছেলে দিব্যি করে খাচ্ছিল। দশ-বারো বছর পর সে হঠাৎ কিল গেমে নাম লেখাতে গেল কেন?

জিশানের স্যাটেলাইট ফোন ফ্ল্যাশ করে উঠল। গুনাজি ফোন করছে। দেরি হচ্ছে বলে ও চিন্তায় পড়ে গেছে।

জিশান ফোন ধরে ওকে বলল যে, আর দশ মিনিট—তার মধ্যেই ও 'ভিজিটর্‌স ওয়েটিং জোন'-এ গুনাজির কাছে পৌঁছে যাবে।

ক্যান্টিনের বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ক্যান্টিনের লোকজনও প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে।

প্যাসকো উঠে দাঁড়াল ঃ 'চলো, জিশান—লেট্‌স গো...।'

জিশানও উঠে দাঁড়াল। ক্যান্টিন থেকে বেরোতে-বেরোতে বলল, ' "প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ" তো ঠিকঠাকই চলছিল। তা হলে তার মালিক দশ-বারো বছর পর হঠাৎ কিল গেমে নাম লেখাতে গেল কেন?'

বেশ জোরে হেসে উঠল প্যাসকো। কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল 'জিশান, ওই ওয়ার্কশপের মালিকটা ছাব্বিশ বছর বয়েসে একটা মেয়েকে বিয়ে করে বসল—সংসারী হল—তোমার মতো...।'

'তারপর?'

'হুঁঃ।' আক্ষেপের একটা শব্দ করল প্যাসকো। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাল। সেখানে তখন কয়েকটা তারা ফুটছে। ওই তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ও কী খুঁজল কে জানে! তারপর আলতো গলায় ধীরে-ধীরে বলল, 'তারপর... তারপর...বিয়ে করার বছরখানেক পর...ওই লোকটার জীবনে একটা সর্বনাশ ঘটে গেল। সব...কেমন যেন...পালটে গেল।'

জিশান কোনও কথা বলল না। চুপ করে রইল।

প্যাসকো পায়ে চলা পথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল তোমাকে সব বলব। আজ, এখন, বলতে গেলে ভীষণ কষ্ট হবে—বিশ্বাস করো...।'

কোনও কথা না বলে জিশান প্যাসকোর হাত ধরল। আলতো করে চাপ দিয়ে বোঝাল, ও বিশ্বাস করেছে।

●

আমার প্যাসকো ওয়ার্কশপ ভালোই চলছিল। আর কাজে-অকাজে বাইক চালানোর সুযোগও মিলছিল প্রচুর। কাজ নিয়ে আমি বেশ খুশি ছিলাম। পাশাপাশি ব্যায়াম-ট্যায়ামও চলছিল।

আমরা বন্ধুরা মিলে প্লেট টিভিতে নিউ সিটির মারকাটারি খেলাগুলোর

লাইভ টেলিকাস্ট দেখতাম। অনেক সময় নিজেদের মধ্যে বাজিও ধরতাম।

এইভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর আমাকে ট্যাটুর নেশা পেয়ে বসল। সেই শখে হাতে-গায়ে নানান রঙের উল্কি আঁকলাম। দু-হাতে উল্কি আঁকা অবস্থায় যখন স্লিভলেস জ্যাকেট পরে বাইক চালাতাম তখন নিজেকে বেশ একজন কেউকেটা বলে মনে হত।

আমার বন্ধুদের আরও অনেকে হাতে-পায়ে-বুকে-পিঠে উল্কি আঁকিয়েছিল। তাদের কেউ-কেউ আবার মোটরবাইকও চালাত। আমরা বন্ধুরা যখন চার-পাঁচজন মিলে বাইক নিয়ে বেরোতাম তখন ওল্ড সিটির লোকরা আমাদের দেখে ভয় পেত। ভাবত আমরা 'মোটরবাইক গ্যাং'।

কিন্তু কেন সেটা ভাবত আমি জানি না। কারণ, মোটরবাইক গ্যাংগুলোর দু-একটা বাইকে একটা করে প্ল্যাকার্ড থাকত। সেই প্ল্যাকার্ডে গ্যাং-এর নাম কিংবা লোগো আঁকা থাকত—কিংবা দুটোই। আমার মনে হয়, তুমিও এটা দেখেছ। তো আমাদের দলের কারও বাইকে সেরকম কোনও লোগো আঁকা প্ল্যাকার্ড ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে ভুল বুঝত।

তুমি তো জানো, জিশান, ওল্ড সিটির নানা জায়গায় এরকম মোটরবাইক গ্যাং ঘুরে বেড়ায়। তারা পারে না এমন কোনও খারাপ কাজ নেই। লুঠপাট, ডাকাতি, ছিনতাই, রেপ, মার্ডার—এদের কাছে এসব নেহাতই মামুলি ব্যাপার। ওরা সাংঘাতিক বেপরোয়া, কাউকে ভয় পায় না। খোলা রাস্তায় দিনদুপুরেও ওদের নৃশংস তাণ্ডব চলে।

এই ধরনের খতরনাক গ্যাং-কে সবাই এড়িয়ে চলে। তাই আমরাও এড়িয়ে চলতাম।

আমার বিয়ের প্রায় মাস ছয়েক পর একবার আমরা চারজন দোস্ত একটা মোটরবাইক গ্যাং-এর মুখোমুখি পড়ে যাই। রাস্তার একটা বাঁক ঘুরেই ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়। সোজা রাস্তায় থাকলে আমাদের এই প্রবলেমটা হত না। দূর থেকে ওদের দেখামাত্রই আমরা চারজন বাইক ঘুরিয়ে সরে পড়তে পারতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হল না। আমরা মুখোমুখি পড়ে গেলাম।

গ্যাংটাতে প্রায় আট-দশজন ছিল। তাদের নানারকম বাইক, নানারকম চেহারা। তার মধ্যে তিনটে বাইকের সামনে প্ল্যাকার্ড লাগানো ছিল। প্রায় দেড়ফুট লম্বা স্টিলের রডের মাথায় একটা ছ'ইঞ্চি বাই ছ'ইঞ্চি চৌকো মেটাল প্লেট। তার ওপরে লাল রঙের একটা মড়ার খুলি আঁকা। তার নীচে ইংরেজিতে লেখা 'HELL'।

আমাদের চারজনকে দেখেই দলটা বাইক থামাল—কিন্তু ইঞ্জিন থামাল না। ওদের ইঞ্জিনগুলো গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল। যেন অনেকগুলো বাঘ গজরাচ্ছে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বুকের ভেতরে একটা ঠান্ডা স্রোত টের পেলাম।

●

ওদের দলের যে-লোকটা সবার সামনে বাইক এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার চেহারা চোখে পড়ার মতন।

লোকটা যে লম্বা সেটা বোঝা যায় ওর পা দেখে। বাইকের ওপরে বসেও ও অনায়াসে দুটো পা পৌঁছে দিয়েছে মাটিতে—যেন খাটো টুল কিংবা মোড়ায় বসে আছে।

লোকটার মাথায় কদমছাঁট চুল। ধবধবে ফরসা মুখে এককণাও গোঁফ-দাড়ি কিংবা ভুরু নেই। সারা মুখটা মসৃণ, তেলতেলে, সাদা—বেগুনের পোকার মতো। ঠোঁটের জায়গায় একটা চেরা দাগ। গায়ে লাল টি-শার্ট—তাতে এলোমেলো কালচে ছোপ। তারই মাঝে ইংরেজিতে '১৩' লেখা। পায়ে শতচ্ছিন্ন ব্লু জিনস আর কালো স্নিকার। ডান পায়ের জুতোর ওপরে মলের মতো একটা স্টেইনলেস স্টিলের বালা।

লোকটির গলায় কালো সুতোয় গাঁথা নখ আর হাড়ের টুকরোর মালা। অন্তত দেখে তাই মনে হচ্ছিল। আদতে সেগুলো নকল, প্লাস্টিকের তৈরি হলেও হতে পারে। দুটো মালার মধ্যে একটা মালায় লকেট লাগানো—স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি একটা মড়ার মাথা।

লোকটার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল ও-ই হচ্ছে 'হেল' গ্যাঙের লিডার।

লিডারের বাইক ঘা খাওয়া জন্তুর মতো গোঁ-গোঁ করছিল। আর থেকে-থেকেই ও বাইকের সামনের চাকাটা শূন্যে তুলে দিচ্ছিল—ছটফটে তেজি ঘোড়া যেমন মাঝে-মাঝে সামনের পা দুটো শূন্যে ছুড়ে দেয়।

'হেল' গ্যাঙের অন্য বাইকগুলোও গোঁ-গোঁ করছিল। ওদের সবক'টা বাইকের একঘেয়ে আওয়াজে আমার বিরক্ত লাগছিল। মনে-মনে চাইছিলাম, আমাদের মতো ওরাও নিজেদের বাইকের স্টার্ট বন্ধ করে দিক। তারপর আমাদের কিছু বলার থাকলে বলুক। এবং বলার কাজ শেষ হয়ে গেলে সবাই যার-যার পথে চলে যাক।

ওদের একজন বোধহয় লিডারকে লক্ষ্য করেই বলল, 'থার্টিন, এখন কী করব?'

বুঝলাম, লিডারটার নাম 'থার্টিন'। সেইজন্যেই ওর ময়লা ছোপ লাগা টি-শার্টে '13' লেখা।

থার্টিন ছোট করে ডানদিক-বাঁ-দিক মাথা নাড়ল। আমি ভাবলাম বোধহয়

মাথা নেড়ে 'না' বলছে কাউকে—কিংবা হয়তো আমাকেই। কিন্তু একটু পরে বুঝলাম, না, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াটা ওর মুদ্রাদোষ।

আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল থার্টিন। ওর ছোট-ছোট চোখ অনেকটা সাপের চোখের মতো লাগছিল।

তারপর থেমে-থেমে জিগ্যেস করল, 'তোমরা কোন গ্যাং?'

আমি বাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'আমরা কোনও গ্যাং নই। আমরা চারজন বন্ধু। আমরা এমনি বাইক নিয়ে বেরোই...।'

বিকট শব্দ করে রাস্তায় থুতু ফেলল থার্টিন। বাইকের ইঞ্জিন অফ করে বাইক থেকে নেমে পড়ল। ওটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এবার ঠিকঠাক বোঝা গেল ও কতটা লম্বা এবং চওড়া।

নিজের বুকে হাত ঘষল থার্টিন। ওর ডান হাতের আঙুলে তিনটে মেটালের আংটি চোখে পড়ল।

কয়েকটা পা ফেলে ও আমার বাইকের কাছে এগিয়ে এল।

আমি বাইকে বসেই ছিলাম—বাইক ছেড়ে নামিনি।

ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থার্টিন বলল, 'গ্যাং তৈরি করেছ, কোনও নেমপ্লেট লাগাওনি।'

আমি কোনও ঝগড়াঝাঁটি কিংবা মারপিট চাইছিলাম না। আর সেরকম কিছু হলে আমরা পেরেও উঠতাম না। কারণ, আমরা চারজন আর ওরা ন'জন। তা ছাড়া, এই মোটরবাইক গ্যাংগুলোর সঙ্গে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র থাকে। তাই ওদের বাইকের কেরিয়ার কখনও খালি থাকে না। উলটোদিকে আমরা নেহাতই নিরস্ত্র নিরীহ পাবলিক। হিসেবমতো হেল গ্যাং-কে আমাদের ভয় পাওয়ার কথা।

কিন্তু আমি মোটেই ভয় পাইনি। আমার বাকি তিন বন্ধুও তাই। আমরা বাইক চালানোর আনন্দে, পথে ঘুরে বেড়ানোর খুশিতে, ঘুরে বেড়াই। এটাই আমাদের স্বাধীন পাগলামো।

যে-মেয়েটির সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল ওর নাম ছিল মেহেন্দি। আমি ওকে 'মাহি' বলে ডাকতাম। ওকে যখন বিয়ে করি তখন কথা দিয়েছিলাম, ওর সঙ্গে কখনও আড়ি করব না। আর ও যদি কখনও কোনও কারণে আমার সঙ্গে আড়ি করে, তা হলে আমি জোর করে ভাব করে নেব।

আমার বাইকের নেশার কথা মাহি ভালো করেই জানত। তাই বিয়ের পরেও আমার এই স্বাধীন পাগলামোয় কখনও ও বাধা দেয়নি। তবে সবসময় বলত, রাস্তাঘাটে ঝামেলা মারপিট এড়িয়ে চলতে। তা না হলে ও আমার সঙ্গে আড়ি করে দেবে।

হেল গ্যাঙের লিডারের সঙ্গে কথা বলার সময় মাহির কথা আমার মনে ছিল। তাই খুব শান্তভাবে জবাব দিলাম, 'বললাম যে, আমরা কোনও গ্যাং নই।

তাই আমাদের কোনও নাম নেই। কোনও নেমপ্লেট নেই...।'

আমার কথা শুনে থার্টিনের ঠোঁটের চেরা দাগটা একটু চওড়া হল। নাকের দুপাশে দুটো ভাঁজ পড়ল। তার মানে থার্টিন হাসছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও বলল, 'স্-সালা ডরপোক!'

ওর গলার আওয়াজটা কেমন যেন চাপা ফ্যাসফেসে।

উত্তরে আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। একটা কথা যদি সত্যি হয় তা হলে যে সেটা অনেকবার বলতে হবে, এমনটা আমার জানা ছিল না। তাই চুপ করে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার তিন বন্ধুও চুপ করে রইল।

সময়টা বিকেল। রাস্তায় লোকজন চলাফেরা করছে। গাড়ি, সাইকেল, বাস, সাইকেল ভ্যান ব্যস্তভাবে ছুটে যাচ্ছে। যদিও রাস্তার করুণ অবস্থার জন্য 'ছুটে' যাওয়াটা অনেকটা 'হেঁটে' যাওয়ার মতো দেখাচ্ছে। কোনও গাড়ি জোরে ছোটার চেষ্টা করলে তাকে শূন্যে লাফিয়ে উঠে মাশুল গুনতে হচ্ছে।

রাস্তায় এতগুলো বাইক জড়ো হয়ে যাওয়ায় বেশ ভিড় জমে গেছে। কিন্তু ভিড়ের লোকজন মোটরবাইক গ্যাংদের ভালো করে চেনে। তাই ওরা একটা ভয়-পাওয়া দূরত্ব বজায় রেখেছে।

জায়গাটা যানজটের চেহারা নিয়েছিল। বেশ কয়েকটা গাড়ি আর বাস অধৈর্য হয়ে হর্ন বাজাচ্ছিল। কোনও-কোনও গাড়ি ফাঁকফোকর দিয়ে পথ তৈরি করে জটলাটা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

আমাদের চারপাশে জমায়েত হওয়া লোকজনের বেশিরভাগই ভিখিরি কিংবা ঝুপড়িবাসী। অন্তত তাদের পোশাকআশাক দেখে তাই মনে হল। তুমি তো জানো, জিশান, শতচ্ছিন্ন শহরটায় এরকম বাসিন্দাই বেশি। হয়তো আমিও তার মধ্যেই পড়ি।

জটলার বৃত্তে একটা ইয়াং মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফরসা, ছিপছিপে। পরনে হলদে আর বাদামি রঙের নকশা কাটা চুড়িদার। সঙ্গে একজন ছেলে-বন্ধু।

ছেলেটার চুল জেল মাখিয়ে এমনভাবে সেট করা যে, প্লাস্টিকের নকল চুল বলে মনে হচ্ছে। গায়ে একটা কালো টি-শার্ট আর ব্লু জিনস।

হেল গ্যাঙের সবচেয়ে পেছনে থাকা লোকটা হঠাৎই ওর বাইকটা নিয়ে মেয়েটাকে তাক করে তেড়ে গেল।

মেয়েটা চমকে লাফিয়ে সরে যেতে চাইল। সরে ও গেল বটে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে সরতে গিয়ে রাস্তায় পড়েও গেল।

মেয়েটার করুণ অবস্থা দেখে হেল গ্যাঙের চার-পাঁচজন হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতেই লাগল। ইঞ্জিনের গরগর ছাপিয়ে ওদের হাসির হররা চলতে লাগল।

আমি ওদের কদাকার বিচিত্র চেহারাগুলো দেখছিলাম। কারও মাথা ন্যাড়া, কারও মাথায় খাবলা-খাবলা চুল। ভুরুতে, কানে, চোখের নীচে সোনার আংটা লাগানো। ঘাড়ে, গলায়, হাতে নানান উলকি আঁকা। তার মধ্যে একজনের গলায় আবার একটা খয়েরি রঙের সরু সাপ জড়ানো।

যে-লোকটা বাইক নিয়ে অসভ্যতা করেছিল সে বাইকের ওপরে প্রায় শুয়ে পড়ে ঝুঁকে ওর লোমশ হাত বাড়াল মেয়েটার দিকে। হাসতে-হাসতে বলল, 'এসো, হাত ধরো, সোনামণি...।'

মেয়েটার ছেলে-বন্ধু কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেনি। মেয়েটাকে তোলার জন্যে ও উদ্যোগ নিয়েছিল। বাইক গ্যাঙের নোংরা লোকটাকে ওর বান্ধবীর দিকে হাত বাড়াতে দেখে ও খেপে গেল। একটা গালাগাল দিয়ে লোমশ হাতটাকে ও এক ঝটকায় ঠেলে সরিয়ে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে বাকি ঘটনাগুলো ঘটে গেল।

লোমশ হাতের মালিক এক ছোবলে ছেলেটার চুলের মুঠি চেপে ধরল। তারপর বাইক চালিয়ে দিল।

বাইকের গর্জন, ছেলেটার চিৎকার সবার কানে তালা ধরিয়ে দিল। মেয়েটাও কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করছিল। কিন্তু আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে কোনও হেলদোল ছিল না। ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুধু দেখছিল।

একটা বাইক-গুন্ডা বাইক নিয়ে মেয়েটার দিকে তেড়ে গেল। মেয়েটা ভয়ে চিৎকার করে তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। বোধহয় পালিয়ে বাঁচতে চাইল।

এদিকে ছেলেটার বডি রাস্তায় ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে যাচ্ছিল। কখনও-কখনও গরম সাইলেন্সার পাইপ ওর গায়ে ঠেকে যাচ্ছিল। তাই ওর যন্ত্রণার চিৎকার কিছুতেই থামছিল না।

এতসব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে অবাক করল। পেছন থেকে এত চিৎকার, চেঁচামেচি, হইচই শোনা গেলেও থার্টিন একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি—ও ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকেই।

আমার গোটা শরীরটা জ্বালা করছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম। গায়ের চামড়া যতটা মোটা হলে এসব নোংরা ঘটনা চোখের সামনে দেখেও দিব্যি নির্বিকার থাকা যায়, আমার চামড়া ততটা মোটা নয়।

আচ্ছা, মেহেন্দি যদি এখানে হাজির থাকত তা হলে কী হত?

কী হত আমি জানি। কোনও বিপদ-আপদ কিংবা ভয়ের তোয়াক্কা না করে ও মেয়েটাকে বাঁচাতে দস্যুগুলোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

থার্টিনের সাদাটে মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মাথার ভেতরে একটা

সুইচ হঠাৎই অন হয়ে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেল।

আমি বাইকে স্টার্ট দিয়ে ক্লাচ-গিয়ার দিকে যন্ত্রটাকে ছুটিয়ে দিলাম।

এত আচমকা ব্যাপারটা ঘটল যে, থার্টিন থতমত খেয়ে গেল। আমাব এই বোকা-বোকা সাহস আর আস্পর্ধার জন্যে ও মোটেই তৈরি ছিল না।

আমার বাইক ছুটে গিয়ে যে ওর তলপেটে আঘাত করল শুধু তাই নয়, বাইকের গতি আর সংঘাত ওর লম্বা শরীরটাকে উঠিয়ে দিল আমার বাইকের হাতলের ওপরে।

সেই অবস্থাতেই আমি জোরে বাইক চালিয়ে দিলাম। থার্টিনের মুখ দিয়ে এককণা শব্দও বেরোল না। নিজেকে বাঁচাতে ও একহাতে বাইকের হাতল আঁকড়ে ধরল, আর-এক হাতে আমার শরীর আর পোশাক খামচে ধরতে চাইল।

জনতার মুখ থেকে তুমুল হইচই শোনা গেল। থার্টিনের দলের অন্য বাইক-গুন্ডাগুলো চুপচাপ বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। যে-বাইক-গুন্ডাটা নিরীহ ছেলেটাকে চুলের মুঠি ধরে ঘোরাচ্ছিল, সে সর্দারের এই অবস্থা দেখে বাইক থামিয়ে ফেলেছে এবং ছেলেটাকেও ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু আমি ছাড়িনি। থার্টিনকে বাইকে চাগিয়ে পাগলের মতো ছুটে চলেছি। ওদের সবার চোখের সামনে—রাস্তার এদিক থেকে সেদিকে।

প্রায় কয়েক মিনিট এরকম চলার পর আমি বন্ধুদের বাইকের কাছে এসে আচমকা ব্রেক কষলাম। থার্টিনের বডিটা সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ল।

তখনই আমার প্রথম মনে হল, এ আমি কী করলাম। আবেগের মাথায় সাহস দেখাতে গিয়ে আমি বোধহয় নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করে বসে আছি।

একটু পরে বুঝলাম, মৃত্যু পরোয়ানা নয়, অর্ধ-মৃত্যু পরোয়ানা।

থার্টিন আর তার আট সঙ্গী মিলে আমাদের চারজনকে প্রচণ্ড মারধোর করল। ওদের সঙ্গে লোহার রড আর স্টিলের পাঞ্চ ছিল। সেই অস্ত্রগুলো ওরা আমাদের ওপরে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করল। নেহাতই দয়া করে ছুরি-টুরি কিংবা রিভলভার ব্যবহার করেনি।

আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম, আমার এক বন্ধু জনার্দনও সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের ফেলে রেখে হেল গ্যাঙের গুন্ডাগুলো চলে যাওয়ার পর পাবলিক আমাদের হেল্‌প করার জন্যে হাত বাড়ায়। চোখেমুখে জলের ছিটে দিয়ে ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করে ওরা আমাদের পাড়ায় পৌঁছে দেয়।

থার্টিনদের রোষে পড়ে আমাদের বাইকগুলোও অল্পবিস্তর ড্যামেজ হয়েছিল। সেগুলো সাইকেল ভ্যানে চাপিয়ে পাড়ায় নিয়ে আসতে হয়।



না, জিশান, এভাবে মারধোর খেয়ে আমরা কিন্তু ভেঙে পড়িনি। বরং আমার মনে একটা স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছিল। অবশ্য স্বপ্ন না বলে সেটাকে দুঃস্বপ্নও বলা যায়।

ঠিক করলাম, আমরা বন্ধুরা মিলে একটা মোটরবাইক গ্যাং তৈরি করব। তার নাম হবে 'অ্যান্টি-মোটরবাইক গ্যাং'—সংক্ষেপে এ-এম জি। আমাদের গ্যাঙের কাজ তো তার নামেই স্পষ্ট! অর্থাৎ, আমাদের কাজ হবে মোটরবাইক গ্যাঙের গুন্ডাগর্দি রুখে দেওয়া, ওদের টরচার আর ক্রাইমের হাত থেকে ওল্ড সিটির মানুষকে বাঁচানো।

আমরা প্রায় ছ'মাস সময় নিলাম। ওই সময়ে নিজেরা তৈরি হলাম। কিছু অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করলাম। আরও চারজন বন্ধু দলে জুটে গেল। সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করলাম, আমাদের এ-এম-জি দলের লক্ষ্য কী। কী হতে পারে তার ম্যানিফেস্টো।

এ-শহরের নানান জায়গায় আমরা টহল দিয়ে বেড়াব। কোনও মোটবাইক গ্যাংকে ক্রাইম করতে দেখলে আমরা রুখে দাঁড়াব, বাধা দেব। এ-কাজে অতি অবশ্যই আমরা পাবলিকের সাপোর্ট পাব।

প্রথমে আমরা প্রচুর ঘোরাঘুরি করে শহরের মোটরবাইক গ্যাংগুলোকে চিনে নিলাম। মোটরবাইক গ্যাঙের কোনও ক্রাইমের খবর পেলেই সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তথ্য জোগাড় করতে লাগলাম। এইভাবে ছ'মাস কেটে যাওয়ার পর আমরা তৈরি হয়ে রাস্তায় নামলাম।

না, আমাদের কোনও নেমপ্লেট ছিল না। তবে আমাদের আটজনের পোশাক ছিল একইরকম—সবুজ টি-শার্ট, আর কালো প্যান্ট।

আমরা সপ্তাহে দু-তিনদিন রাস্তায় টহল দিতে বেরোতাম। আমাদের টহলের নির্দিষ্ট কোনও রুট ছিল না, সময়ের নিয়ম ছিল না কোনও। আমরা আটজন যখন একসঙ্গে সময় মেলাতে পারতাম, তখনই আমরা নজরদারিতে বেরোতাম।

মেহেন্দি আমাকে এ-কাজে ভীষণ সাপোর্ট দিয়েছিল। থার্টিনদের সঙ্গে অ্যাকশনের পর যখন বাড়ি ফিরেছিলাম তখন আমার অবস্থা দেখে মাহি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি সেরে ওঠার পর ও বলেছিল, 'তুমি প্রোটেস্ট করে ঠিক করেছ। প্রোটেস্ট করার লোকজন তো দিন-কে-দিন কমে যাচ্ছে...।'

মাহির কাছ থেকে আর পাড়াপড়শিদের কাছ থেকে ব্যাপারটা নিয়ে এত সাপোর্ট পেলাম যে, আমাদের আটজনের কেউই পেছিয়ে আসার কথা আর ভাবল না। সুতরাং ছ'টা মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর এ-এম-জি মাঠে নামল। আমার 'প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ' যেমন চলতে লাগল, তার পাশাপাশি এটাও। আমরা আটজন সব লোকজনকে জানান দিয়ে সবুজ 'জার্সি' পরে অপারেশানে

বেরিয়ে পড়তে লাগলাম। কখনও সকালবেলা, কখনও দুপুরে, কিংবা বিকেল, সন্ধে, অথবা রাতে।

এইরকমভাবে ঘুরতে-ঘুরতে প্রায় দু-মাস পর থার্টিনদের সঙ্গে আমাদের দেখা হল।

সময় তখন সকাল সাতটা। ওল্ড সিটি থেকে বাইরে চলে যাওয়ার যে-তিনটে ইন্টারসিটি রাস্তা আছে তার দু-নম্বর সড়কটায় আমরা টহল দিচ্ছিলাম।

এর প্রথম কারণ দু-নম্বর ইন্টারসিটি হাইওয়েটার একটু বেশি বদনাম আছে। এই রাস্তাটায় খুন-জখম-রাহাজানির মাত্রাটা বড্ড বেশি। আর সবক্ষেত্রেই ক্রিমিনাল হচ্ছে কোনও-না-কোনও মোটরবাইক গ্যাং।

দু-নম্বর সড়কটা যে মোটরবাইক গ্যাংদের বেশি পছন্দ, তার কারণ আছে। সেটা হল, সড়কটার একদিকে ঘন জঙ্গল, আর অন্যদিকে নদী। এতে অপরাধীদের পালিয়ে যাওয়ারও যেমন সুবিধে, তেমনই লাশ লোপাট করতেও ঝামেলা কম। অনেক সময়েই দেখা যায় নীচে, নদীর খাতে, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া গাড়ি উলটে পড়ে আছে।

দু-নম্বর সড়কটা যে আমরা বেছে নিয়েছিলাম, তার আরও একটা কারণ ছিল। সেটা হল, গত একমাসে এই রাস্তায় মোটরবাইক গ্যাংরা সাত-সাতটা ভয়ংকর ক্রাইম ঘটিয়েছে। তার মধ্যে চারটে হয়েছে ভোরের দিকে—ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। তা ছাড়া সেদিন সকালে রাস্তার লোকজনের কাছ থেকে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে, একটা মোটরবাইক গ্যাং ভোরবেলার দিকে দু-নম্বর ইন্টারসিটির দিকে গেছে।

দু-নম্বর সড়কে ঢুকেই চোখে পড়ল কতকগুলো রং-চটা হোর্ডিং। তাতে সাবধানে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে বেশ কয়েকটি সতর্কতার কথা লেখা রয়েছে। আর জ্ঞানসূচক বাণীমালার একেবারে নীচে বড়-বড় হরফে লেখা ঃ গাড়িকে অবশ্যই মানুষ মারার অস্ত্র ভাববেন। বাক্যটির শেষে নিশ্চয়ই 'না' কথাটা লেখা ছিল, কিন্তু রং চটে যাওয়ায় সেই গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

একটা সুদীর্ঘ ময়াল সাপের মতো হাইওয়েটা শুয়ে আছে। তার জায়গায়-জায়গায় ছোট-বড় ক্ষতচিহ্নগুলো ময়াল সাপের গায়ের নকশা।

বাঁ-দিকে তাকালে চোখে পড়ে সূর্য। সেই আলো নদীতে পড়েছে, রাস্তায় এসে পড়েছে। ডানদিকে চোখ ফেরালে ঘন জঙ্গল। মনে হচ্ছে, গাছপালাগুলো হেঁটে এগোতে গিয়ে রাস্তাটাকে সামনে পেয়ে বাধ্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। নইলে ওরা হেঁটে-হেঁটে নদীর ঠিক পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াত।

হাইওয়ের পাশে কোথাও-কোথাও বিকল ট্রাক দাঁড়িয়ে। আবার কখনও চোখে পড়ছে অ্যাক্সিডেন্টে বেঁকেচুরে তুবড়ে যাওয়া গাড়ি। এ ছাড়া রয়েছে পরিত্যক্ত কয়েকটা টিনের চালাঘর—হয়তো কোনওকালে দোকান-টোকান ছিল।

রাস্তা ধরে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর দূরে একটা নীল রঙের গাড়ি চোখে পড়ল।

হাইওয়েতে গাড়ি চোখে পড়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার পাশে, মাটির ঢালের ওপরে। যে-ঢালটা জঙ্গ লে গিয়ে মিশেছে।

গাড়িটাকে ঘিরে কয়েকটা মোটরবাইক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর কয়েকটা বাইক গাড়িটাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আহত শিকারকে ঘিরে চিতাবাঘ যেমন ঘুরপাক খায়।

আমি হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করলাম। তারপর আমরা বাইক সাইড করে ঢাল বেয়ে নামিয়ে দিলাম। জঙ্গল ঘেঁষে যন্ত্রগুলো দাঁড় করালাম।

●

গাছের আড়াল থেকে আমরা ব্যাপারটা লক্ষ করতে লাগলাম। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম নীল গাড়িটাকে ঘিরে কোন কর্মকাণ্ড চলছে।

শুধু তাই নয়। বিরাট লম্বা আর চওড়া একটি লোককে চোখে পড়ল। গাড়ির বেশ কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় কদমছাঁট চুল। গায়ে লাল টি-শার্ট—তার ওপরে এলোমেলো কালচে ছোপ।

লোকটাকে আমি অল্পবিস্তর আঁচ করতে পারছিলাম। আর ঠিক তখনই ‘হেল’ গ্যাঙের সাইনবোর্ডটা আমার চোখে পড়ল।

থার্টিন আর তার দলবল দু-নম্বর ইন্টারসিটি হাইওয়ের ওপরে শিকার ধরেছে।

চাপা গলায় আমার সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে নিলাম।

আমরা আটজন বাইক নিয়ে থার্টিনদের ওপরে ঝোড়ো বাতাসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ব। ওদের ছত্রভঙ্গ করে দেব। আর বাইক থেকে কিছুতেই যেন আমরা না নামি—বা পড়ে না যাই। কারণ, আমাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই—গতিই আমাদের একমাত্র অস্ত্র।

আমাদের আটটা বাইক প্রায় একইসঙ্গে স্টার্ট নিল। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো গোঁ-গোঁ করতে-করতে উঠে এল হাইওয়ের ওপরে। তারপর ‘অকুস্থল’ লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল।

হাই এনার্জি সাইক্লোনের মতো আমাদের আটটা বাইক চোখের পলকে থার্টিনের দলের ওপরে আছড়ে পড়ল। ওদের মধ্যে একজন একটা মোটা নলের শটগান বের করে ফায়ার করল। আমার দলের একজন ‘ওঃ!’ আর্তনাদ করে চলন্ত বাইক থেকে ছিটকে পড়ল রাস্তায়। ওর বাইকটা পাগলের মতো ছুটে

গিয়ে নীল গাড়িটার বাঁ-দিকের হেডলাইটের কাছে ধাক্কা খেল। লাফিয়ে দুবার পালটি খেয়ে থার্টিনের দলের একটা বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটাল। তারপর দুটো বাইক লাট খেয়ে রাস্তার ঢাল বেয়ে পড়ে গেল।

নীল গাড়িটাকে ঘিরে একটা ডামাডোল শুরু হয়ে গেল। বাইকের গোঁ-গোঁ শব্দে সকালবেলার বাতাস অস্থির হয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

থার্টিন আত্মরক্ষার চেষ্টায় ছুটে ওর বাইকের কাছে গেল। বাইকটা রাস্তায় কাত হয়ে পড়ে ছিল। সেটাকে দাঁড় করিয়ে লাফিয়ে বাইকে উঠে বাইক ছুটিয়ে দিল।

আমি বুকের ভেতরে গনগনে রাগ নিয়ে ওকে তাড়া করলাম। তার আগে একঝলক দেখলাম, থার্টিনের দলের অন্যান্যরা হঠাৎ এই ঝোড়ো আক্রমণের চাপে পড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। ওদের একটা সোর্ড আর একটা শটগান রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। নীল গাড়িটা সুযোগ বুঝে স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করেছে। গাড়ির ভেতরে পুরুষ মহিলা মিলিয়ে চার-পাঁচজন বসে আছে।

থার্টিনের বাইকের স্টিয়ারিং-এ বোধহয় কোনও গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। কারণ, ওর বাইকটা বারবার টাল খেয়ে মাতালের মতো এঁকেবেঁকে ছুটছিল। আর আমাদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ কমছিল।

উলটোদিক থেকে দুটো গাড়ি আসছিল। একটা কালোরঙের প্রাইভেট কার, আর তার খানিক পেছনে বিচ্ছিরিরকম লোড করা একটা ফুল পাঞ্জাব ট্রাক।

রাস্তায় গর্ত আর খানাখন্দ থাকায় ট্রাকটা বিপজ্জনকভাবে ডানদিক বাঁ-দিকে টাল খাচ্ছিল। ট্রাকটার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হলে হাইওয়ের একেবারে বাঁ-দিক ঘেঁষে বাইক চালাতে হয়। তো আমি তাই করলাম। যতটা পারলাম বাঁ-দিকে সরে গেলাম। কিন্তু বেশি সরে গেলেই হালকা আগাছার ঝোপ আর ঢাল—নীচে নদীর দিকে গড়িয়ে গেছে।

থার্টিনও আমার মতো সাবধান হয়েছিল। তাই ওর বাইকটা ক্রমশ বাঁ-দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর কাছাকাছি এসে যাওয়া ফুল পাঞ্জাব ট্রাকটা হঠাৎই খাড়া অবস্থা থেকে দশ-পনেরো ডিগ্রি হেলে গেল।

থার্টিন ভয়ে চিৎকার করে উঠল। ওর বাইক বাঁ-দিকে আগাছার ঝোপের দিকে ছুটে গেল। শুধু ছুটে গেল নয়, তার ফাঁক দিয়ে ঢুকে ঢাল বেয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চলল। ও প্রাণপণ চেষ্টা করেও বাইকের স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাইকটাকে সামাল দিতে পারছিল না।

আমিও ঢাল বেয়ে বাইক নামিয়ে দিলাম। গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে আমার মোটরবাইক থার্টিনের মেশিনের দিকে ছুটে চলল। তারপর আমি যা চাইছিলাম তাই হল। দুটো মেশিনে প্রবল সংঘর্ষ হল। ওর বাইকের পেটের

কাছাকাছি জায়গায় ধাক্কাটা লাগল।

থার্টিনের বাইক কাত হয়ে গেল। আপন খেয়ালে অদ্ভুত বৃত্তচাপ এঁকে ঢালের ওপরে ছুঁচোবাজির মতো খানিক ছুটল। তারপর লাট খেয়ে ঢাল বেয়ে লাফিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল নদীর পাথর আর পলিমাটির পাড়ে।

সংঘর্ষের সঙ্গে-সঙ্গেই থার্টিনের দেহটা শূন্যে ছিটকে উঠেছিল। সেখান থেকে জমিতে পড়ে ওর অবস্থাও হল ওর বাইকের মতন। গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে।

আমার বাইক কিন্তু তখনও দু-চাকার ওপরে ছিল। আমি কসরত করে ওটাকে ঢালের ওপরে চালাচ্ছিলাম। আঁকাবাঁকা পথে ওটাকে নদীর পাড়ে নামিয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানে মোলায়েম মাটি আর ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় নুড়ি পাথর।

থার্টিন যে তেমন চোট পায়নি সেটা বুঝতে পারলাম তখনই। দেখলাম, ও উঠে দাঁড়িয়েছে এবং নদীর পাড় ধরে ছুটছে।

আমি বাইক নিয়ে ওকে তাড়া করলাম।

ও ছুটতে-ছুটতে একবার থামল। ঝুঁকে পড়ে একটা পাথর তুলে নিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। তারপর আবার দৌড়তে লাগল।

পাথরটা আমার বেশ কয়েক হাত দূর দিয়ে ছিটকে গেল। আমি বাইক থামালাম না। ছোট-বড় নানান মাপের পাথর কাটিয়ে ডিঙিয়ে কোনওরকমে গাড়িটা চালাতে লাগলাম।

যখন আমি থার্টিনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি তখন ও একটা কাণ্ড করল। চট করে ঘুরে নদীর জল লক্ষ্য করে দৌড়তে শুরু করল।

আমিও স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ওর পিছু নিলাম বটে, কিন্তু বুঝলাম, ওর বুদ্ধির কাছে আমি হেরে গেছি।

যা ভেবেছিলাম তাই হল। থার্টিন নদীর জলে নেমে পড়ল। ছপছপ করে পা ফেলে প্রায় কোমর জলে চলে গেল।

আমার বাইকের চাকা নদীর জল ছুঁয়ে ফেলতেই আমি গাড়ি থামালাম।

দৃশ্যটা আমার খুব অলৌকিক লাগছিল।

আমার গায়ে মাথায় রোদ। নদীর জলের গন্ধ। হালকা বাতাস। দূরের গাছপালার সারি। নাম-না-জানা পাখির ডাক। মাথার ওপরে আকাশের নীল।

এই রোমান্টিক পরিবেশে আমার পাশে মাহি যদি থাকত তা হলে দারুণ লাগত।

কিন্তু তার বদলে আমার সামনে একজন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর শত্রু। যার সারা গায়ে কাটা-ছেঁড়া দাগ, গালে-কপালে রক্ত লেগে আছে। যে এখন আমাকে তাক করে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে।

আমি অসহায়ভাবে বাইকে বসে রইলাম। থার্টিন তখন মুখ বিকৃত করে

বলছে, আমাকে কবজায় পেলে ও কী হাল করে ছাড়বে। আমার নকশা ও বদলে দেবে। আমার ফ্যামিলিকে ও থেঁতলে পিষে লেই বানিয়ে ছাড়বে।

আমি শুধু ওকে বললাম, যেখানেই তোমার গ্যাং-কে আমরা পাব, সেখানেই রুখে দেব। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—যেখানেই হোক।

থার্টিনের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও রিভলভার কিংবা শটগান ছিল না। থাকলে ও অবশ্যই আমাকে খতম করে দিত। তাই ও ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ আমরা একইভাবে স্থির রইলাম। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না এখন কী করব। আমার বন্ধুরা যদি আমাকে এখানে দেখতে পেয়ে নেমে আসে তা হলে হয়তো কিছু একটা করার কথা ভাবা যায়।

আমার পকেটে রাখা মোবাইল ফোন বাজছিল। কিন্তু আমার তখন ফোন ধরতে ইচ্ছে করছিল না। আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে থার্টিনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

হঠাৎই পেছন থেকে বাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তার সঙ্গে চিৎকার।

থার্টিন সঙ্গে-সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর ওপার লক্ষ্য করে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কতকগুলো সবুজ টি-শার্ট আর মোটরবাইক। ওপরে হাইওয়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করে ডাকছে, হাত নাড়ছে।

'প্যাসকো! প্যাসকো!'

আমি হাত নেড়ে ওদের নেমে আসতে বললাম। একইসঙ্গে থার্টিনের আচমকা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণও বুঝতে পারলাম।

বন্ধুদের কাছে জানতে পারলাম, আজকের অপারেশানে এ-এম-জি জিতেছে। আমাদের দলের দুজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছে—তবে সেটা সিরিয়াস কিছু নয়। আর 'হেল' গ্যাঙের একজন গুন্ডা ভালোরকম চোট পেয়েছে। তার বড়িটা জঙ্গলের মধ্যে গাছের আড়ালে শোয়ানো আছে। আর বাকি গুন্ডাগুলো পালিয়েছে।

থার্টিনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ও তখন সাঁতরে অনেক দূরে চলে গেছে।

আমরা বাইক নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম।

হাইওয়েতে উঠে দেখি সেই ফুল লোড ট্রাকটা রাস্তার ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে। তার মালপত্র ছড়িয়ে ছত্রখান হয়ে গেছে ঃ ইস্পাতের তৈরি ছোট-ছোট মেশিনারি পার্ট্‌স। সেগুলোর ওপরে রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। কাত হয়ে থাকা ট্রাকটার জন্যে ইন্টারসিটি হাইওয়ে জ্যাম হয়ে গেছে।

আমরা সবাই বাড়ি ফিরলাম বটে, কিন্তু থার্টিনের হুমকির কথা আমি ভুলতে পারছিলাম না।

রাতে মেহেন্দিকে আমি সকালের সব ঘটনা খুলে বললাম। ও শুনে আমার গালে একটা চুমু গেল। বলল, 'ঠিক করেছ। লাইফে পজিটিভ কিছু করা দরকার—।'

কিন্তু থার্টিনের একটা কথা আমার মনে কাঁটা হয়ে খচখচ করছিলঃ আমার ফ্যামিলিকে ও থেঁতলে পিষে লেই বানিয়ে ছাড়বে।

●

বিয়ের আগে মোহেন্দির সঙ্গে আমি প্রায় দু-বছর মিশেছি। আমার পছন্দ-অপছন্দ অভ্যাস সবই ওর জানা। সবকিছু জেনেই ও আমার সঙ্গে মিশেছিল। আমার বন্ধুদের সবাইকেই ও চিনত। আমাদের ঘরে কখনও-কখনও চায়ের আসর বসত। সেই আসরে নানান বিষয়ে তর্কাতর্কি হত। যেমন, কোন উলকির নকশা ভালো, আর কোনটা খারাপ। নিউ সিটির হাইফাই রিসকি গেমগুলোর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে খতরনাক। নিউ সিটির গেমে নাম লিখিয়ে টাকা জেতার চেষ্টা করা উচিত কি না। মোটরবাইক গ্যাংগুলোর সঙ্গে ঠিক কীভাবে আমাদের ফাইট করা উচিত।

এইসব আলোচনার সময় মেহেন্দিও আমাদের সঙ্গে গলা ফাটাত, মতামত দিত।

সেইসব হুল্লোড় আর তর্কাতর্কির সময় একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করেছিলাম ঃ নিউ সিটির গেমে নাম দেওয়ার ব্যাপারে ওর ঘোরতর আপত্তি ছিল। ও বলত, মানুষকে গিনিপিগ বানিয়ে তাকে নিয়ে নানান ডেঞ্জারাস খেলা খেলিয়ে মজা লোটার এই কায়দাটা ভীষণ জঘন্য আর নোংরা। ও কোনওদিনই নিউ সিটির মার্শালকে ক্ষমা করতে পারবে না।

আমার বন্ধুদের কেউ-কেউ ওইসব গেমে নাম দিয়ে 'জুয়াখেলা'য় জেতার কথা বললে মেহেন্দি তাদের বেধড়ক ঝাড়ত। আমি অনেক সময় ওকে খ্যাপানোর জন্যে নিউ সিটির গেমে নাম দেওয়ার কথা বলতাম, ওর সঙ্গে মজা করতাম। কিন্তু তাতে ও জেনুইনলি হেভি চটে যেত।

তখন জানতাম না, এই আমি সত্যি-সত্যি সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের কোনও গেমে নাম দেব।

আমার জীবনে চরম দুর্ঘটনাটা একদিন ঘটল।

দু-নম্বর ইন্টারসিটি হাইওয়েতে থার্টিনদের সঙ্গে এনকাউন্টার হওয়ার পর প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। আমার জীবনের সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। সপ্তাহের

ছ'টা দিন বাইক ওয়ার্কশপের কাজ, আর একটা দিন নিজের জন্যে। আমার আর মাহির জন্যে।

একরমই একটা ছুটির দিনে—দিনটা রবিবার ছিল—আমি আর মাহি মোটরবাইক চেপে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।

আমার আস্তানা থেকে সাত কি আট কিলোমিটার দূরে একটা পার্ক ছিল। নাম হেক্সাগন পার্ক। বুঝতেই পারছ, পার্কের চেহারাটা হেক্সইগনের মতো বলেই ওই নাম।

পার্কটা মাপে প্রকাণ্ড। আর তার ঠিক মধ্যিখানে হেক্সাগন চেহারার একটা লেক ছিল। এ ছাড়া প্রচুর গাছপালা।

কিন্তু পার্ক বলতে যেরকম ছবি মনের ভেতরে ভেসে ওঠে, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম ছিল না। অবহেলা আর অযত্নে পার্কের এককালের সুন্দর বাগান আর সাজানো গাছপালা অনেকটা জঙ্গলের চরিত্রে বদলে গিয়েছিল। লেকের নীল জলে একসময় লাল-নীল সব মাছ খেলা করত। কালে-কালে লেকের জলের রং বদলে শ্যাওলা ধরে ঘোলাটে সবুজ হয়ে গিয়েছিল। একসময়ে পার্কের যে-আলোকসজ্জার আমরা প্রশংসা করতাম, তখন সেই সজ্জার জাঁকজমক মৃত্যুশয্যায়।

তবুও সেখানে লোকজন যেত। বিশেষ করে আমার মতো গরিব। কারণ, হেক্সাগন পার্কে ঢোকার জন্যে কোনও টিকিট কাটতে হত না।

পার্কের ভেতরে লেকের চারদিকের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে আমার খারাপ লাগত না। আর আমার যেটা পছন্দের সেটা মাহিরও পছন্দের ছিল। তা ছাড়া আমাদের গোটা শহরের যেরকম দশ দশা, তাতে ওই হতমান হেক্সাগন পার্কই ছিল আমাদের এলাকার অক্সিজেন সেন্টার। তাই ছুটির দিনে দুপুরে বা বিকেলে মোটামুটি ভিড় হত সেখানে।

পার্কটা হতমান হলেও সেখানে অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে আমার আর মেহেন্দির ভালো লাগত। এলোমেলো বেহিসেবি গাছপালা, শান্ত লেকের ঘোলাটে জল, তাতে বুড়বুড়ি কাটা চানাচুনো আর তেলাপিয়া মাছ—তার মধ্যেই আমরা আমাদের অল্প-অল্প ভালো লাগা খুঁজে পেতাম।

তো অভ্যাসমতো সেই ছুটির দিনটায় আমি আর মেহেন্দি হেক্সাগন পার্কে গিয়েছিলাম।

সন্ধের মুখে আমি আর ও হাসাহাসি করতে-করতে পার্কের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

হঠাৎই একটি সতেরো-আঠেরো বছরের ছেলে আমার কাছে এগিয়ে এল। রোগাটে মুখ, চাপদাড়ি, বাঁ-দিকের গালে শ্বেতীর দাগ।

ছেলেটা জিগ্যেস করল, 'দাদা, ক'টা বাজে?'

আমি বাঁ-হাতের কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বললাম, 'পৌনে ছ'টা—।'

কথাটা বলতে না বলতেই ছেলেটা চকিতে ছোবল মেরে আমার জামার বুকপকেট থেকে মোবাইল ফোনটা তুলে নিল। তারপরই দে ছুট।

আমি আগুপিছু চিন্তা না করেই ছেলেটাকে ধরতে তাড়া করলাম। তখনই লক্ষ করলাম, ছেলেটার ডানহাতের কবজিতে একটা ঘড়ি রয়েছে। সেটা আমি কেন যে আগে খেয়াল করিনি!

আমি 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করছিলাম, কিন্তু তাতে আশপাশের লোকজন তেমন গুরুত্ব দিল বলে মনে হল না। কারণ, ওল্ড সিটিতে 'চোর! চোর!' চিৎকারটা এত বেশি চেনা যে, বলার কথা নয়।

কিছুক্ষণ ছোটার পরই বুঝলাম, আমার ভারী শরীর নিয়ে ওই রোগা দৌড়বাজ ছেলেটাকে আমার পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। তাই আমি থেমে গেলাম। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগলাম।

এমন সময় মেহেন্দির চিৎকার শুনতে পেলাম।

ও আমার নাম ধরে ডেকে উঠেছে। এই ডাকটা ভয়ের ডাক। বিপদ থেকে বাঁচতে চাওয়ার ডাক।

আমি ঘুরে মেহেন্দির দিকে তাকালাম। তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে একটা বরফের সাপ আমার শিরদাঁড়া পেঁচিয়ে নেমে গেল। মাথাটা টাল খেয়ে গেল পলকে।

তিন-চারটে মোটরবাইক মেহেন্দিকে ঘিরে ফেলেছে। একটা লম্বামতন লোক ওকে টেনেহিঁচড়ে একটা বাইকে তুলছে। আর মেহেন্দি আমার নাম ধরে চিৎকার করে চলেছে।

আমি শয়তানগুলোকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু ততক্ষণে ওকে বাইকে বসিয়ে বাইক গতি নিয়েছে।

বাইকটা চালাচ্ছে একজন। তার পেছনে মাহি। আর মাহিকে প্রাণপণে জাপটে ধরে ওর পেছনে চেপে বসেছে আরও একজন। দুটো পুরুষের মাঝে মাহি স্যান্ডউইচ হয়ে আছে।

লম্বা মতন যে-ছেলেটা বাইক চালাচ্ছে, ছুটতে-ছুটতেই ওর পায়ের দিকে চোখ গেল আমার। ছেলেটার বুট পরা পায়ের গোড়ালির কাছে কী যেন একটা চকচক করছে। ওর জিন্‌স-এর পায়াটা তার ভেতরে গোঁজা।

একটা স্টিলের বালা। ওর ডান পায়ে। থার্টিন। বলেছিল, আমার ফ্যামিলিকে ও থেঁতলে পিষে লেই বানিয়ে ছাড়বে।

থার্টিনকে চিনতে পারামাত্রই আমার মুখ দিয়ে একটা চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল। কসাইখানায় শুয়োর কাটার সময় যে-ধরনের চিৎকার শুনতে পাওয়া যায়।

জন্তুর মতো চিৎকার করতে-করতে আমি থার্টিনের মোটরবাইকের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। ভটভট গর্জন তুলে দুশমনের বাইকটা দূরে মিলিয়ে গেল। সেইসঙ্গে মাহির চিৎকারও।

আমি রাস্তায় বসে পড়লাম। মাটি চাপড়ে কপাল চাপড়ে অসহায়ের মতো অনেক কান্নাকাটি করলাম। রাস্তার লোকজন হাঁ করে আমাকে দেখতে লাগল। হয়তো ভাবল, একটা ভবঘুরে পাগল নিজের সুস্থতা ফিরে পাওয়ার জন্যে হা পিত্যেশ করে কাঁদছে।

একটু পরে কান্নাকাটি থামিয়ে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। তারপর আমার বাইকে উঠে থার্টিনদের খোঁজে বেরোলাম।

দিশেহারাভাবে সারাটা রাত ওদের খুঁজে বেড়ালাম আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার হাত শূন্য রয়ে গেল। ক্লান্ত শরীরে শূন্য হাতে ভোরবেলা বাড়ি ফিরে এলাম।

তারপর সারাদিন ধরে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ করলাম। ওদের কথায় থানা-পুলিশ নিয়ে প্রচুর দৌড়ঝাঁপ করলাম। কিন্তু মেহেন্দির খোঁজ পেলাম না।

তবুও আমি খুঁজে চললাম। ওল্ড সিটির সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় চষে বেড়ালাম।

না, মেহেন্দি কোথাও নেই।

কয়েকদিন পর আমার কিছু বন্ধু হাল ছেড়ে দিল, কিন্তু আমি জেদ ছাড়িনি। মাত্র তিনজন বন্ধুকে সঙ্গী করে খোঁজ চালাতে লাগলাম।

আরও কিছুদিন পর বন্ধুর সংখ্যা কমে দাঁড়াল মাত্র একজন। কিন্তু তাও আমি খোঁজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

শেষে, আরও পনেরোদিন পর, আমি একা। তখন আমি প্রায় পাগল হয়ে গেছি। কখন চান করি, কখন খাই, আর কখন ঘুমোই—কিছুই মনে থাকে না। শুধু খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ।

তবুও মাহিকে পেলাম না।

এইভাবে টানা একবছর কাটিয়ে তারপর বুঝলাম, মাহিকে আর কোনওদিনই আমি ফিরে পাব না।

ব্যস, তারপরই আমি কেমন যেন শান্ত পাথর হয়ে গেলাম। একা-একা চুপচাপ সময় কাটাতে লাগলাম। জীবন সম্পর্কেই আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

সেরকমই একটা সময়ে ঠিক করলাম, আমি নিউ সিটির কিল গেমে নাম দেব। যদি কিল গেমে জিততে পারি তা হলে সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের সব খেলা আমি খতম করে দেব। ওদের কোম্পানির ঝাঁপ বন্ধ করে চিরকালের জন্যে তালা লাগিয়ে দেব।

কারণ, মেহেন্দি এই খেলাগুলো একটুও পছন্দ করত না।

তো আমি কিল গেমে নাম দিলাম।

প্যাসকোর কাহিনি যখন শেষ হল তখন সুপার হাই-ফাই ক্যান্টিনের বাইরে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে।

জিশান প্যাসকোর দিকে তাকিয়ে ছিল। মানুষটার জীবনের ওঠা-পড়া কল্পনায় দেখতে চাইছিল।

প্যাসকো হঠাৎ বলল, 'একটা জিনিস দ্যাখো...।' বলে পকেট থেকে একটা চ্যাপটা ছোট ডকুমেন্ট বক্স বের করল। সেটা খুলে একটা রঙিন ফটোগ্রাফ বের করে নিল। তারপর ফটোটা বাড়িয়ে দিল জিশানের দিকে।

জিশান দেখল।

একটা অল্পবয়েসি রূপসি মেয়ে। চোখে অনেক স্বপ্ন।

প্যাসকো বলল, 'মেহেন্দি...মাহি...।'

মুখ তুলে তাকাল জিশান।

প্যাসকোর বাঁ-চোখে একফোঁটা জল।

●

৩১ আগস্ট। শুক্রবার। মাঝে আর একটা দিন—তারপরই রবিবার। কিল গেম।

শ্রীধর পাট্টা জিশানকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। চারজন গার্ড জিশানকে গ্রানাইট পাথরে ঢাকা করিডর ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জিশান ওদের সঙ্গে টুকটাক কথা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওরা কেউই সেরকমভাবে কোনও জবাব দিচ্ছিল না। শুধু ছোট্ট করে 'হু-হাঁ' করছিল।

জিশান বেশ অবাক হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী! নিউ সিটির গার্ডরা তো সবসময়েই জিশানের সঙ্গে কথা বলেছে, গল্প করেছে—এমনকী কেউ-কেউ ওকে হিরোর সম্মান পর্যন্ত দিয়েছে।

অবশেষে আর থাকতে না পেরে জিশান জিগ্যেস করেই ফেলল, 'কী ব্যাপার বলো তো! তোমরা কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না?'

জিশানের ডানপাশে যে-গার্ডটি হেঁটে যাচ্ছিল সে বলল, 'না, স্যার। আসলে মার্শাল নিয়ম করেছেন, কিল গেমের আগে আটচল্লিশ ঘণ্টা কেউ ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।'

জিশান হেসে বলল, 'কিল গেমের পরে কেউ কি আর আমার সঙ্গে

কথা বলতে পারবে?'

গার্ড মাথা নীচু করল। কোনও কথা বলল না।

ততক্ষণে ওরা একটা বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছে গেছে।

একজন গার্ড পকেট থেকে রিমোট বের করল। দরজার দিকে তাক করে বোতাম টিপল।

স্লাইডিং ডোর। দরজার পাল্লা নিঃশব্দে পাশে সরে যাচ্ছিল।

গার্ড চারজন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'গুডবাই, স্যার—।'

তখন থেকে ওরা 'স্যার-স্যার' শুরু করেছে কেন? অবাক হয়ে ভাবল জিশান। কারণ, গার্ডদের মধ্যে অন্তত দুজন জিশানের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। তার মধ্যে আবার একজনের গোঁফে পাক ধরেছে।

সামান্য হেসে 'স্যার-স্যার' রোগের কারণটা জানতে চাইল জিশান।

একজন গার্ড মুখ নামিয়ে বলল, 'যে যাই বলুক, স্যার। আমাদের কাছে আপনি ''স্যার''। আপনার মুখের দিকে আমরা সবাই চেয়ে আছি।'

আর-একজন গার্ড পাশ থেকে বলল, 'আমরা এখানে ভালো নেই, স্যার...।'

ওরা আর দাঁড়াল না। অ্যাবাউট টার্ন করে চটপট হাঁটা দিল।

ঠিক তখনই শ্রীধর পাত্রার অভ্যর্থনা শুনতে পেল জিশান।

'এসো, এসো, জিশান / এখন বুদ্ধিতে দাও শান।' একটু হেসে বাঁ-হাতটা শূন্যে তিরিশ ডিগ্রি ঘুরিয়ে ঃ 'পরশু কিল গেম / কী পাবে, শেম, না ফেম?'

জিশান কোনও উত্তর দিল না। ওর মধ্যে কেমন একটা থম-মেরে-যাওয়া ভাব কাজ করছিল। শ্রীধর পাত্রার ব্যঙ্গের ছুরি ওর গায়ে আঁচড় কাটতে পারছিল না।

শ্রীধর ছোট ঘেরওয়ালা একটা সাদা প্যান্ট পরে ছিলেন। প্যান্টটা এমন যে, পায়ের সঙ্গে চোস্তাই পাজামার মতো লেপটে আছে।

গায়ে প্যান্টের সঙ্গে মানানসই খাপি সাদা কোট। শ্রীধরকে যেন আদর করে জড়িয়ে ধরেছে। কোটের কলারে আর হাতায় কবজির কাছে সোনালি রঙের পটি। বুকে মাঝারি মাপের সোনালি বোতাম।

জিশান ভাবলেশহীন মুখে ঘরে ঢুকল। ওর আবেগ আর অনুভূতির জানলা-দরজা ও বন্ধ করে দিয়েছিল। নিজেকে পুরোপুরি একটা পোজিট্রনিক রোবট বলে ভাবতে শুরু করেছিল।

বিশাল ঘর। ঘরের সাজসজ্জা সবই সাদার কাছাকাছি রঙের। একদিকের দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড কম্পিউটার স্ক্রিন। ওটা খুলে মেঝেতে পেতে দিলে ডাবল বেড বিছানার ইলেকট্রনিক সংস্করণ বলে মনে হতে পারে।

কম্পিউটার স্ক্রিনের বিপরীত দিকের দেওয়ালের কাছে বসে আছেন

দুজন সাজুগুজু করা লোক—তাঁদের সামনে দুটো আর্ক কম্পিউটার। আর তাঁদের পাশে সার বেঁধে সাজানো চারটে সাদা সোফা।

ঘরের এসি এমন সেট পয়েন্টে চলছিল যে, জিশানের মনে হল ঋতুটা শীতকাল।

ইশারায় জিশানকে ডেকে নিলেন শ্রীধর। নিজে একটা সোফায় গিয়ে বসলেন। পাশেরটায় জিশানকে বসতে বললেন।

'জিশান, তোমাকে এখন ডেকেছি গেম সিটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে। তুমি তো জানো, পরশু কিল গেম খেলাটা গেম সিটিতে-ই হবে।' শ্রীধর ডানপাশে ফিরে ওঁর চাকরবাকর দুজনকে হাতের ইশারা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কম্পিউটারের মেগা স্ক্রিন জীবন্ত হয়ে উঠল। সেখানে ধীরে-ধীরে গুগ্‌ল ম্যাপের মতো একটা রঙিন মানচিত্র ফুটে উঠল।

চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা চৌকো এলাকা। তার মধ্যে গাছপালা, নদী, ঘরবাড়ি—এরোপ্লেন থেকে নীচের দিকে তাকালে ঠিক যেমন দেখায়।

শ্রীধর বললেন, 'এটা আমাদের গেম সিটি—টুয়েন্টি কিলোমিটার বাই টুয়েন্টি কিলোমিটার। চারশো স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা। পরশুদিন ভোর ছ'টা থেকে পরদিন ভোর ছ'টা পর্যন্ত—মানে, চব্বিশ ঘণ্টা—এটা তোমার এলাকা।' ছোট্ট করে মুচকি হেসে আরও যোগ করলেন ঃ 'এই এলাকায় ওই চব্বিশ ঘণ্টায় তুমি যা খুশি করতে পারো—আর তোমার যা খুশি হতে পারে...।'

শ্রীধরের কথার নিহিত অর্থ বুঝতে জিশানের এতটুকুও অসুবিধে হল না। ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখল, শ্রীধর ঠান্ডা চোখে জিশানের দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু ওঁর ঠোঁটের কোণে হাসি।

কয়েক সেকেন্ড পর শ্রীধর কম্পিউটার অপারেটরদের দিকে তাকিয়ে আঙুলে টুসকি দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একজন অপারেটর টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। একটা ক্যাবিনেটে-র ভেতর থেকে একটা অপটিক্যাল ট্যাবলেট বের করে নিল। অন করে নানান বোতাম টিপে সেট করে দিল। ট্যাবলেটের স্ক্রিনে গেম সিটির হাই রিজোলিউশন কালার ইমেজ ফুটে উঠল।

লোকটি জিশানের কাছে এল। পাশে বসে ট্যাবলেটটা ওর হাতে দিল। ঠিক যেন ষোলো ইঞ্চি ডায়াগনালের একটা ফ্রেমে বাঁধানো ফটো।

শ্রীধর পাত্রা বললেন, 'এটা তোমার। তোমার কাছেই থাকবে। সোমবার ভোর ছ'টা পর্যন্ত। এতে গেম সিটির যে-কোনও অংশের ছবি দেখতে পাবে। ছবি তোমার ইচ্ছেমতো জুম করতে পারবে। তা ছাড়া ছবিগুলো সবই থ্রি ডায়মেনশন্যাল ইমেজ। তাই হাই-ফাই ভিডিয়োগেমের মতো তুমি যে-কোনও অবজেক্টের—মানে, ঘরবাড়ি, গাছপালার চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে পারবে। কোনও বাড়ির জানলা কিংবা দরজা দিয়ে খুশিমতো ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে।

বাড়ির ভেতরের লোকজন, সিচুয়েশান, সবই দেখতে পাবে। ফলে তোমার কিলাররা যদি কোনও বাড়ির ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে থাকে, তুমি ইচ্ছে করলেই তাদের খুঁজে বের করতে পারো...।'

লোকটি তখন জিশানকে ট্যাবলেটের অপারেশন দেখিয়ে দিচ্ছে। জিশান ওর রোববারের 'এলাকা'-র রঙিন ছবি খুঁটিয়ে দেখছিল। কী স্পষ্ট, নিখুঁত ছবি! হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে, এমন বাস্তব!

শ্রীধর খুকখুক করে কাশলেন।

'তবে, জিশান—মনে রেখো, একইরকম অপটিক্যাল ট্যাবলেট ওই তিনজন কিলারের কাছেও থাকবে। ওরাও তোমাকে সবসময় ওয়াচ করবে, চোখে-চোখে রাখবে। তা না হলে খেলাটা ঠিক জমবে না—সমানে-সমানে হবে না। কী বলো?' প্রশ্নটা করে হাসলেন। তবে হাসিতে কোনও শব্দ ছিল না।

জিশান কোনও কথা বলল না। রোবটের মতো মুখ করে বসে রইল। আড়চোখে একবার শ্রীধর পাট্টার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। তখন শ্রীধরের চোখে ও বিকৃত উল্লাস দেখতে পেয়েছিল।

অপটিক্যাল ট্যাবলেটের ডেমো চলছিল। জিশান ওর সমস্ত মনোযোগ একজোট করে ট্যাবলেটের অপারেশন শিখছিল। ওর মস্তিষ্কের সব নিউরোন সজাগ হয়ে সমস্ত তথ্য স্মৃতিকোষে সঞ্চয় করে নিচ্ছিল।

জিশান সত্যি-সত্যি নিজেকে একটা রোবট বলে ভাবছিল, এবং রোবটের দক্ষতায় ও অপটিক্যাল ট্যাবলেটের অপারেশন নিখুঁতভাবে শিখতে চাইছিল।

ট্যাবলেটের অপারেশন শেখার কাজ মোটামুটিভাবে শেষ হওয়ার পর কম্পিউটার অপারেটর ভদ্রলোক ট্যাবলেটটা অফ করে একটা ছোট ম্যানুয়াল জিশানের হাতে দিলেন। বললেন, 'এই টার্বো ম্যানুয়ালটা সঙ্গে নিয়ে আপনি যদি ঘণ্টাখানেক এই ট্যাবলেটটা অপারেট করেন তা হলে এর নানান অপারেশান আপনার চটজলদি রপ্ত হয়ে যাবে।'

জিশান শুধু ছোট্ট করে মাথা নাড়ল—কিছু বলল না।

টেবিলে নীল রঙের একটা পলিব্যাগ রাখা ছিল। তার গায়ে সুপারগেম্স কর্পোরেশনের লোগো। ট্যাবলেটের ম্যানুয়ালটা সেই পলিব্যাগে ঢোকানোর জন্য অপারেটর ভদ্রলোক জিশানকে ইশারা করলেন।

ম্যানুয়ালটা ব্যাগে ঢোকানোর পর জিশান ট্যাবলেটটাও সেখানে ঢোকাতে যাচ্ছিল, কিন্তু শ্রীধর পাট্টা ওকে থামতে ইশারা করলেন।

'ট্যাবলেটের কাজ এখনও বাকি আছে, জিশান।'

জিশানের হাত থমকাল। শ্রীধরের মুখের দিকে তাকাল ও।

'ট্যাবলেটটা উলটে দ্যাখো—তা হলেই বুঝতে পারবে...।' ঘাড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দ্বিতীয় কম্পিউটার অপারেটরের দিকে তাকালেন শ্রীধর। আঙুল নাচিয়ে

তাঁকে জিশানের কাছে আসতে বললেন।

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। একইসঙ্গে প্রথম অপারেটর জিশানের পাশ থেকে উঠে নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন।

শ্রীধর কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বের করলেন—ওঁর নেশার শিশি। ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে দু-ফোঁটা তরল মুখে ঢাললেন। জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে শব্দ করলেন দুবার। ওঁর গাল আর নাকের ডগা লালচে হয়ে উঠল। চোখে ঝলসে উঠল নতুন দীপ্তি।

জিশান ট্যাবলেটটা উলেটে ফেলেছিল। অবাক হয়ে দেখল, উলটোদিকেও একটা পরদা। তবে সেটা এখন অন্ধকার।

ট্যাবলেটের দু-দিকেই পরদা থাকার ব্যাপারটা জিশানকে বেশ চমকে দিয়েছিল। এরকম 'দু-মুখো কম্পিউটার' ও আগে কখনও দেখেনি। ওল্ড সিটির মিউজিয়ামে একবার ও একটা জিনিস দেখেছিল। খুব পুরোনো কালের একটা রাইটিং গ্যাজেট—বাচ্চাদের লেখার জন্য। গ্যাজেটটার নাম 'স্লেট'। তার ওপরে সাদা রঙের একটা রাইটিং স্টিক দিয়ে লেখা যায়। ব্ল্যাক স্লেটের ওপরে হোয়াইট মার্ক পড়ে। সেইসব লেখা আবার ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা যায়।

এই ট্যাবলেটের ব্যাপারটা ঠিক যেন সেই স্লেটের মতো।

দ্বিতীয় কম্পিউটার অপারেটর ততক্ষণে জিশানের পাশটিতে এসে বসে পড়েছেন। রোগা, বেশ লম্বা, চোখে চশমা, গালে চাপদাড়ি।

'জিশান, ট্যাবলেটের এই দিকটা হচ্ছে একটা ট্র্যাকার...' ভদ্রলোক শান্ত মিহি গলায় বললেন, 'হাই-ফাই ইলেকট্রনিক ট্র্যাকার...।'

'ট্র্যাকার?' জিশানের অজান্তেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ—ট্র্যাকার।' ভদ্রলোক ঠোঁটের কোণে হাসলেন ঃ 'স্টেট অফ দ্য আর্ট টেকনোলজি। কিল গেমের সময় এই ডিভাইসটা আপনাকে দারুণ হেল্‌প করবে। গেম সিটিতে যখন গেম স্টার্ট হবে তখন থেকেই এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এর এল.সি.ডি. স্ক্রিনে গেম সিটির টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ফুটে উঠবে। তার ওপরে সুপারইমপোজ্‌ড থাকবে কো-অর্ডিনেট গ্রিড...।' কথা বলতে-বলতে জিশানের হাতে ধরা ট্যাবলেটের একটা বোতাম টিপে দিলেন ভদ্রলোক।

একটা ছোট্ট 'বিপ' শব্দ করে ট্র্যাকার অন হয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল গেম সিটির রঙিন ম্যাপ—তার ওপরে সাদা উজ্জ্বল রেখা দিয়ে ছক কাটা গ্রিড ম্যাট্রিক্স। ফলে গেম সিটির ছবিটা দাবার ছকের মতো চৌষট্টিটা চৌকো খোপে ভাগ হয়ে গেল।

ঠিক একই ছবি দেওয়ালের জায়ান্ট স্ক্রিনে ফুটে উঠল। জিশান সেদিকে একপলক তাকিয়ে আবার হাতের ডিভাইসটার দিকে চোখ রাখল।

ভদ্রলোক ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে শুরু করলেন।

'এটা টাচ স্ক্রিন অপারেটেড। স্রেফ আঙুলে ছুঁয়ে আপনি এর যে-কোনও একটা স্কোয়ার টাইলকে জুম করে ক্লোজ-আপ ভিউ পেতে পারেন। আবার ইচ্ছেমতো নরমাল সাইজে ফেরাতে পারেন।' ভদ্রলোক আঙুল ছুঁইয়ে ছবির দুটো স্কোয়ার ব্লককে ক্লোজ-আপ-এ নিয়ে এলেন, আবার নরমাল সাইজে ফিরিয়ে দিলেন।

জিশান খুঁটিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করছিল। রঙিন ম্যাপের নানান জায়গায় নানান রং। যেখানে গাছপালা জঙ্গল সেখানে সবুজ আর গাঢ় সবুজের বহুরকম শেড দিয়ে গাছপালার ছবি আঁকা আছে। পাহাড়ের জায়গায় ধূসর আর সবুজে আঁকা রয়েছে পাহাড়। এ ছাড়া রয়েছে নদী, বাড়ি-ঘর, রাস্তা, পার্ক, পুকুর, আরও কত কী!

সবমিলিয়ে কুড়ি কিলোমিটার বাই কুড়ি কিলোমিটার একটা মিনি শহর।

জিশানের পাশে বসা ভদ্রলোক প্রায় সবক'টা খোপ জুম করে-করে জিশানকে সব বুঝিয়ে বলছিলেন। জিশান মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনছিল। ও খেয়াল করল, গেম সিটির নানান অঞ্চল সুন্দরভাবে ছবি এঁকে বোঝানো থাকলেও বাড়তি সুবিধে হিসেবে নীচে এক কোণে লেজেন্ড টেব্‌ল রয়েছে—ম্যাপে যেমন থাকে।

ট্র্যাকারটা দেখতে-দেখতে জিশান শুধু একটা কথাই ভাবছিল ঃ ছবিটা তো গেম সিটির ইলেকট্রনিক ম্যাপ—এর মধ্যে ট্র্যাকিং-এর ব্যাপারটা কোথায়, আর কিল গেমের সময় ডিভাইসটা কীভাবেই বা ওকে হেল্‌প করবে?

জিশান যেন একটা হেলিকপটার থেকে গেম সিটিকে দেখতে পাচ্ছিল। একইসঙ্গে দেখতে পাচ্ছিল, গেম সিটিতে ও ছুটছে—ছুটে পালাচ্ছে—তিনজন কিলারের কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছে।

ভদ্রলোকের দেওয়া ডেমো শেষ হলে পর জিশান ওঁকে প্রশ্নটা করল।

'ডিভাইসটার নাম ট্র্যাকার কেন? ওটা কী ট্র্যাক করবে?'

'তোমাকে ট্র্যাক করবে, জিশান/তুমি হবে তিনজন খুনির প্রাণ।' কথাগুলো বলতে-বলতে আচমকা উঠে দাঁড়ালেন শ্রীধর পাট্টা। ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

আয়েশি পা ফেলে টেবিলের ওপাশে চলে গেলেন। জিশানের ঠিক বিপরীতে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'রোবট' জিশান শ্রীধরের দিকে তাকাল। কারণ, শ্রীধরের বলা কথার মধ্যে থেকে কিল গেমের দরকারি তথ্যগুলো ছেঁকে নেওয়া দরকার এবং ঠিকঠাকভাবে সেগুলো মাথায় রাখাটা জরুরি।

শ্রীধর বলতে শুরু করলেন। ঠোঁটের কোণ সামান্য বেঁকে গিয়ে একটা তেরছা হাসির আভাস তৈরি করেছে।

'আসলে, জিশান, তোমার প্রাণ ওই তিনজন খুনির প্রাণ। মানে, তোমার

প্রাণ নিতে পারলে ওরা তিনজনে প্রাণ ফিরে পাবে। ওদের ডেথ সেন্টেন্স মকুব করে দেওয়া হবে। ওদের হাতে বাইশ ঘণ্টা সময় আছে তোমাকে মারার জন্যে। আর তোমার হাতেও সেই বাইশ ঘণ্টা—তবে বাঁচার জন্যে।' অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাতাসে হাত নাড়লেন শ্রীধর। তারপর ঃ 'এবার ভালো করে শোনো। কিল গেম শুরু হওয়ামাত্র এই ইলেকট্রনিক ট্র্যাকার অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে। তখন গেম সিটির ওই রঙিন ম্যাপের ভেতরে একটা সবুজ আলোর ফুটকি দেখা যাবে। ফুটকিটা কম্পিউটারের কারসরের মতো দপদপ করবে।

'ওই সবুজ আলোর ফুটকিটা হলে তুমি। তুমি গেম সিটির ঠিক যে-লোকেশানে আছ ফুটকিটা ম্যাপে ঠিক সেই খোপের মধ্যে দপদপ করে জ্বলবে। তুমি চলতে শুরু করলে হুবহু তোমার চলার পথ ধরে ফুটকিটাও চলতে শুরু করবে। মানে, ওই গ্রিন ডটটা তোমার পজিশানকে ট্র্যাক করবে। দারুণ টেকনোলজি, না?' শব্দ করে হাসলেন মার্শাল। তারপর চুপচাপ টেবিলের দৈর্ঘ্য বরাবর আলতো পায়চারি করে চললেন।

কম্পিউটার অপারেটর ভদ্রলোক ট্যাবলেটের বোতাম টিপে একটা ডেমো প্রোগ্রাম চালু করে দিলেন। একটা সবুজ আলোর ডট ব্লিংক করতে-করতে ট্র্যাকারের পরদায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দুবার কাশির শব্দ করে জিশানের মনোযোগ চাইলে শ্রীধর।

জিশান ওঁর দিকে তাকালে আবার বলতে শুরু করলেন।

'এইরকম ট্র্যাকার তিনজন খুনির হাতে একটা করে থাকবে। ওরা এই ট্র্যাকারে তোমার ডায়নামিক পজিশান সবসময় জানতে পারবে। তোমার পজিশান জেনে নিয়ে ওরা ট্র্যাকারের উলটোদিকের অপটিক্যাল ট্যাবলেট অপারেট করবে। এবং তখনই ওরা তোমাকে ছবিতে ধরে ফেলবে।

'ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশান...আমাদের গেম সিটিতে এক লক্ষ চার হাজার তিনশো বত্রিশটা ক্যামেরা ফিট করা আছে, আর সেগুলো স্মার্ট নেটওয়ার্কিং-এ কানেক্টেড। গেম সিটির সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে ক্যামোরা নেটওয়ার্কটা অপারেট করা হয়। এসব এতই হাই-টেক ব্যাপার যে, তুমি কখনওই ক্যামেরার চোখ অ্যাভয়েড করতে পারবে না। কোনও না কোনও ক্যামেরা তোমাকে ক্যাচ করবেই।'

জিশানের ভুরুতে ভাঁজ পড়েছিল। সেটা লক্ষ করে শ্রীধর তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বুঝেছ, জিশান। ওই চব্বিশ ঘণ্টা তোমার প্রাইভেসি বলে কিছু থাকবে না। উই ওয়ন্ট য়ু অন ক্যামেরা অ—ল দ্য টাইম। কারণ, সেই সময়টা নিউ সিটির শো-টাইম।'

জিশান কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

শ্রীধর হাতে হাত ঘষে শীত তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন। তারপর আড়চোখে

নাটকীয় নজরে জিশানকে দেখলেন।

'তোমাকে এখনও লাল ডটের কথা বলিনি, জিশান। গেম সিটিতে ঢোকার পর থেকেই ওই তিনজন খুনির পজিশানও ধরা পড়বে এই ট্র্যাকারে। তিনটে লাল ডট—দপদপ করে জ্বলবে-নিভবে। তিনজন মার্ডারারের ডায়নামিক পজিশান। তার মানে কী দাঁড়াল?' দু-হাতের আঙুল ডগায়-ডগায় ঠেকালেন শ্রীধর। কম্পিউটার অপারেটরের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে অপারেটর ভদ্রলোক ট্র্যাকারের আর-একটা বোতাম টিপে দিলেন। আর-একটা ডেমো প্রোগ্রাম অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল। তিনটে লাল ডট জন্ম নিল পরদায়। এবং সেগুলো ধীরে-ধীরে সবুজ ডটটার দিকে এগোতে লাগল।

'আমাদের কিল গেম খুব ফেয়ার গেম। তাই তুমিও সবসময় খুনিদের পজিশান জানতে পারবে। অর্থাৎ, মোট চারটে ব্লিংকিং ডট ঘোরাফেরা করবে এই ট্র্যাকারে—তিনটে লাল, আর একটা সবুজ। কী পছন্দ?' মুচকি হেসে সরাসরি জিশানের দিকে তাকালেন মার্শাল।

ফেয়ার গেমই বটে! যার নকল সারভাইভাল ফ্যাক্টর 0.07 আর আসল সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর 0.0! চমৎকার! তার ওপর আবার একজনকে খুন করার জন্য তিনজন খুনি। একটা ইঁদুর ধরতে তিন-তিনটে বেড়াল!

যা বোঝার জিশান বুঝে গিয়েছিল। তাই মার্শালের উৎসাহে টুসটুসে মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইল—কোনও কথা বলল না।

শ্রীধর আবার নিজের আরামের সোফায় ফিরে গেলেন। অপারেটর দুজনকে বললেন, আরও অন্তত আধঘণ্টা ওঁরা যেন জিশানকে অপটিক্যাল ট্যাবলেটের আর ট্র্যাকারের ট্রেনিং দেন।

শ্রীধর সোফার হাতলে বসানো একটা ছোট্ট বোতামে চাপ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে খুব আলতো ভলিয়ুমে মিউজিক বাজতে শুরু করল। বিলম্বিত লয়ের বিষণ্ণ সুর।

সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন শ্রীধর। কিল গেম আসছে। শরীরের প্রতিটি রোমকূপে তার আগমনী বার্তা টের পাচ্ছেন। প্রতিটি রক্তকণিকায় যেন ফাগুনের আগুন—অথচ ফাগুন এখনও অনেক দূরে।

বড় করে শ্বাস টানলেন। চোখ বুজেও গেম সিটিকে দেখতে পেলেন। যেন খুন-খুন খেলা চলছে চোখের সামনে। আর শুনতে পেলেন উত্তেজিত জনতার উত্তেজনা উল্লাসের চিৎকার।

এবারের কিল গেমে আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেননি শ্রীধর। প্রচারের জন্য সবরকম মিডিয়াকে চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করেছেন। ফলে বিজ্ঞাপনও পেয়েছেন প্রচুর—কম করেও কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। তার পাশাপশি দর্শকদের প্রত্যাশাও পৌঁছে গেছে তুঙ্গে। এর আগে কোনও কিল গেমে প্রত্যাশার পারদ

এতটা ওপরে চড়েনি। বিজ্ঞাপনের আয়ও হয়েছে এবারের তুলনায় অনেক কম।

শ্রীধরের ধারণা এবারের কিল গেম হতে চলেছে সবার সেরা। এবারের কিল গেম ইতিহাস তৈরি করবে।

তার একটা বড় কারণ অবশ্যই জিশান। জিশান পাল চৌধুরী।

চোখ খুলে জিশানের দিকে তাকালেন। কিল গেমের জনপ্রিয়তার কিস্তিমাতের ঘুঁটি।

কম্পিউটার অপারেটর দুজন সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জিশানের আধঘণ্টার ট্রেনিং কয়েক মিনিট হল শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ওঁরা মার্শালের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। মার্শালের চোখ খোলার অপেক্ষা করছিলেন।

শ্রীধর ইশারায় ওদের ছুটি দিলেন। ওঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জিশান অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর সব ম্যানুয়াল পলিব্যাগে ঢুকিয়ে নিল।

'জিশান, তুমি এবার আমার কাছে এসে বোসো—প্লিজ।' মার্শাল ইশারায় ওকে কাছে ডাকলেন, 'তোমার সঙ্গে অনেকগুলো জরুরি কথা সেরে নেওয়ার আছে।'

জিশান পলিব্যাগটা সাবধানে টেবিলের ওপরে রাখল। তারপর শ্রীধরের কাছে গিয়ে বসল।

আবার হাতে হাত ঘষলেন শ্রীধর। তারপর ডানহাতের আঙুলের ডগা দিয়ে কপালের পাশে কয়েকবার চাপ দিলেন।

'তোমার সঙ্গে আজকে আমার শেষ মিটিং, জিশান...' একটু থামলেন। তারপর ঃ '...কিল গেমের আগে। আর...মানে...কিল গেমের পর দেখা হবে কি না সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। তুমি যদি গেম সিটিতে চব্বিশ ঘণ্টা টিকে যাও তা হলে দেখা হবে। এ ছাড়া তুমি যদি তিনজন কিলারকে চব্বিশ ঘণ্টার আগেই খতম করতে পারো তা হলে আরও আগে আমাদের দেখা হতে পারে।'

জিশান চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শ্রীধর পাট্টা আবার বলতে শুরু করলেন।

'ট্র্যাকারের লাল ডট আর সবুজ ডটের ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এটা বলিনি যে, তোমাদের ডায়নামিক পজিশন ওই ওয়্যারলেস ট্র্যাকারে ধরা পড়বে কেমন করে।

'আসলে ব্যাপারটা খুব সিম্প্‌ল। আগামীকাল তোমাদের চারজনের বডিতে একটা করে মাইক্রোইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তারই সিগন্যাল ট্র্যাকারে ধরা পড়বে। তবে চিন্তার কিছু নেই। খুব ছোট্ট অপারেশান। কী, ঠিক আছে?'

জিশান কোনও কথা বলল না। শ্রীধরের ঠান্ডা চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাঁচদিন আগেই ওর কন্ট্রোল্ ফ্রিডমের ব্যবস্থাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর একইসঙ্গে শুরু হয়েছে কড়া নজরদারি। জিশানকে কিল গেম ফাইনালিস্টের স্পেশাল কোয়ার্টারে শিফ্‌ট করে দেওয়া হয়েছে। সিকিওরিটি গার্ডরা ওকে রাউন্ড দ্য ক্লক প্রোটেক্‌শন দিচ্ছে, যাতে কেউ ওর কোনওরকম ক্ষতি করতে না পারে। সকাল-বিকেল ওর অ্যানালগ জিম, ডিজিটাল জিম আর মেডিক্যাল চেক আপ চলছে। ট্রেনাররা ওকে ট্রেইন করছে। ডায়েটিশিয়ানদের পরামর্শ মতো ওর খাওয়ার মেনু ঠিক করা হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় চলছে সবকিছু।

'শোনো, জিশান। তোমার ওই ছোট্ট অপারেশানটা করা হবে কাল বিকেল চারটের সময়। অপারেশানটা এমন যে, তুমি কিছু টেরই পাবে না। তাঁর ব্যথা-ট্যাথাও কিছুই হবে না। তারপর আমাদের টেকনিক্যাল টিম আর মেডিক্যাল টিম ট্র্যাকিং-এর ব্যাপারটা চেক করে দেখবে। ব্যস, তারপর তুমি রেডি!' কথাটা বলে পাতলা ঠোঁটের ওপরে আঙুল বোলাতে লাগলেন শ্রীধর। মনে-মনে বোধহয় তিনি ছুটন্ত জিশানকে গেম সিটিতে দেখতে পাচ্ছিলেন।

'রোববার ভোর চারটের সময় কিল গেম অপারেশান টিম তোমার কোয়ার্টারে যাবে। তোমাকে ওরা নিয়ে যাবে আরমারি ইউনিটে। সেখানে তুমি তোমার পছন্দসই অস্ত্রশস্ত্র বেছে নেবে—যা তোমার প্রাণ চায়। আর বেছে নেবে তোমার মনের মতো পোশাক।

'তারপর তুমি গিয়ে হাজির হবে "লাস্ট স্টপ" চেম্বারে। গেম সিটিতে ঢুকে পড়ার আগে তুমি যাদের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে চাও তারা সেখানে আসবে তোমাকে উইশ করতে। তারপর আবার ফাইনাল মেডিক্যাল চেক আপ। সেটা শেষ হলেই তুমি গেম সিটিতে ঢুকে পড়বে।' শ্রীধর পাট্টা উঠে দাঁড়ালেন। হাতের একটা ভঙ্গি করে বললেন, 'তুমি কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে তোমার দেখা করতে চাওয়ার উইশ লিস্টটা সিকিওরিটি চিফের হাতে দিয়ে দিয়ো। রোববার ভোর পাঁচটার সময়ে তাদের "লাস্ট স্টপ" চেম্বারে হাজির করানোর জন্যে আমি হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করব। তবে হ্যাঁ—নো ফ্যামিলি।' হাসলেন শ্রীধর ঃ 'কারণ, তোমার ওয়াইফ আর ছেলেকে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করানোর জন্যে ওল্ড সিটি থেকে নিয়ে আসা হয় তা হলে, আই অ্যাম শিয়োর, তোমার পক্ষে সেটা ডেঞ্জারাসলি হার্মফুল হবে—কারণ, তোমার কনসেনট্রেশান নষ্ট হবে...অ্যান্ড দ্যাট মে কিল য়ু আর্লিয়ার ইন দ্য গেম।' শ্রীধর হাসলেন।

জিশান উইশ লিস্টটা মনে-মনে তৈরি করা শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু শ্রীধরের শেষ কথাটা শোনামাত্র ও থমকে গেল। লিস্টের গোড়া থেকে মিনি

আর শানুর নামটা ও মনে-মনে কেটে দিল।

পরপর অনেক নামই ওর মনে পড়তে লাগল। মনোহর সিং, ফকিরচাঁদ, পান্ডা, মূর্তি, রিমিয়া, গুনাজি, ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস, প্যাসকো, সুধাসুন্দরী, আর খেলার মাঠে আলাপ হওয়া সেই গার্ড—যার বাড়ি নাহাইতলা গ্রামে।

তবে এদের মধ্যে কেউ আছে, কেউ নেই। মনোহর সিং, ফকিরচাঁদ...আরও কে-কে আছে বা নেই কে জানে!

জিশানের মনে পড়ল, গার্ড বলেছিল, ওর গ্রাম ছবির মতো—সুন্দর, শান্ত, নরম।

ছেলেটা আরও বলেছিল, ভগবানের ভরসায় বসে থাকলে হবে না। যা করার মানুষকেই করতে হবে।

তেইশ-চব্বিশের ছেলেটার মুখটা জিশানের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সত্যি, ও যদি শেষবারের মতো দেখা করতে আসে—শেষ সময়ে—তা হলে জিশানের খুব ভালো লাগবে। আর এই ভালো লাগাটা ওকে কিল গেমে লড়াই করার শক্তি জোগাবে।

একইসঙ্গে জেহাদি সিকিওরিটি গার্ড পান্ডার মুখটাও দেখতে পেল জিশান। বড়-বড় নেশাতুর চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে পান্ডা বলেছিল, 'জিশানের শেষ নেই।'

●

১ সেপ্টেম্বর। শনিবার। আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। তারপরই শুরু হবে জিশানের তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিটের লড়াই। অথবা তেইশ ঘণ্টা ঊনষাট মিনিট ষাট সেকেন্ডের লড়াই।

কিল গেম ফাইনালিস্টের স্পেশাল কোয়ার্টারে চুপচাপ বসে ছিল জিশান। খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আকাশটাকে এক মনে উপভোগ করছিল।

আকাশটা কী শান্ত, মসৃণ, নীল! কী সুন্দর!

জিশানের অবাক লাগছিল। আকাশটাকে কখনও ও এত মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করেনি। আজ মনে হচ্ছে, আকাশটার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকলেও ওর দেখা ফুরোবে না। আজ ওর ঘণ্টা, মিনিট গোনা হয়ে গেছে। গোনা হয়ে গেছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও। তাই হয়তো আজ এই মুহূর্তের ভালো লাগাটা অফুরান।

বিছানায় এসে বসল জিশান। এমন আরামের বিছানা, যেন মেঘ দিয়ে তৈরি। আরাম আর বিনোদনের সমস্ত উপকরণ ঘরের মধ্যে হাজির। কী নেই

এখানে! মাত্র সাতদিনের অতিথিশালা হলেও এখানে প্রকাণ্ড মাপের প্লেট টিভি রয়েছে। আর তার সঙ্গে কালার প্রিন্টার।

এই কোয়ার্টারে কোনও ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের কোনও সুইচ নেই। সবই ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড। ঠিকঠাক সেন্সরের সামনে গিয়ে 'অন' কিংবা 'অফ' বললেই কাজ হয়ে যায়।

এই সাতদিন এই স্পেশাল কোয়ার্টারের আরাম, বিলাস বোধহয় শুধু রূপকথাতেই পাওয়া যায়! আর আগামীকালের ভয়ঙ্কর রুক্ষ নিষ্ঠুর লড়াই—সেটাও বোধহয় আর-এক রূপকথা।

স্পেশাল কোয়ার্টারের চারিদিকে, আনাচেকানাচে, চোখ বুলিয়ে নিল জিশান। এই মনোরম মোলায়েম স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের নামই কি সুখ? না, নিশ্চয়ই নয়। তাই যদি হত, তা হলে ওল্ড সিটির গরিব মানুষের বস্তিতে জিশান, মিনি আর শানু যেখানে থাকে, সেখানে সুখ থাকত কেমন করে! 'থাকত', কারণ, এখন আর নেই। যেহেতু জিশান মিনি আর শানুর কাছে এখন নেই।

একটা কবিতার কথা মনে পড়ল জিশানের। মাত্র দুটো লাইন ঃ

'সুখ পড়ে আছে এখানে-ওখানে ঘরের কোণে,
খুঁজে নিতে হয় তাকে জেনো অতি সঙ্গোপনে।'

বস্তির সেই হতদরিদ্র ঘরে ঠিক এইভাবেই সুখ খুঁজে নিত জিশান আর মিনি। কালকের চব্বিশ ঘণ্টার দিনটা পার করে আবার ওল্ড সিটিতে ফিরবে জিশান। তারপর আবার ওরা দুজনে রোজ খুঁজে নেবে সুখের মণিকণা।

গতকাল রাতে মিনির সঙ্গে শেষবারের মতো কথা বলেছে জিশান। কথা বলেছে শানুর সঙ্গেও।

মাইক্রোভিডিয়োফোনে অনেক টকটাইম তিল-তিল করে জমিয়ে রেখেছিল। মনে-মনে ভেবে রেখেছিল, কিল গেমের আগে শেষবারের মতো যখন মিনির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে, তখন এই জমানো টকটাইম প্রাণ ভরে খরচ করবে।

গতকাল সকালে শ্রীধর পাত্রা জানিয়ে দিয়েছিলেন, শুক্রবার রাত বারোটার মধ্যে এম-ভি-পি শেষবারের মতো ব্যবহার করতে হবে। আর শনিবারটা হচ্ছে 'লাল পিরিয়ড'—সাইক্লোনের আগে খানিকটা সময় যেমন গুমোট থাকে, থাকে থমথমে স্তব্ধতা, ঠিক সেইরকম। তারপরই রবিবার, কিল গেমের সাইক্লোন।

শ্রীধর আরও বলেছিলেন, শনিবার দিনটা জিশানের মনোসংযোগের জন্য। মন থেকে সমস্ত আজেবাজে চিন্তা সরিয়ে ওকে শুধুই কিল গেমের কথা ভাবতে হবে।

অথচ এখন, কাল রাতে মিনির সঙ্গে কথা বলার সময়টুকুর ছবি জিশানের মনে ভেসে উঠছিল।

'মিনি!'

মাইক্রোভিডিয়োফোনের পরদায় মিনিকে দেখতে পাচ্ছিল জিশান। মিনিকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর কোলে বসে আছে শানু। সেই কারণেই হয়তো মিনিকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

শানু কত বড় হয়ে গেছে! আধো-আধো কথার টুকরো বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে।

জিশান ছেলের নাম ধরে ডেকে উঠল ঃ 'শানু! শানু!'

শানু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বুড়ো আঙুল চুষছিল। জিশানের ডাকে ঘুরে তাকাল।

এম-ভি-পি-র পরদায় বাবা আর ছেলের চোখাচোখি হল। জিশান আবেগে কেঁপে উঠল। ছেলের চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে আদরের অর্থহীন শব্দ করতে লাগল। শানুও বাবার অর্থহীন শব্দের উত্তরে আরও অর্থহীন, আরও দুর্বোধ্য সব শব্দ ফিরিয়ে দিল।

মিনির চোখ ভিজে উঠেছিল। ওড়না দিয়ে চট করে চোখ মুছে নিল ও।

জিশানও চোখ মুছল। বলল, 'শানু কীসব বলছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

মিনি অল্প হেসে বলল, 'ও বলছে, কিল গেমে তোমাকে জিততে হবে। তারপর কিল গেমকে চিরকালের মতো খতম করতে হবে...।'

জিশান ধরা গলায় বলল, 'তুমি মনে-মনে আমার সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই পারব...।'

'শানু তোমাকে কাঁদতে বারণ করছে।'

জিশান চোখ মুছল আবার। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করল।

'না, আর কাঁদব না। শ্রীধর পাট্টা ঠিকই বলেছে ঃ এতে আমার কনসেনট্রেশন নষ্ট হবে। কিল গেমে ভালো করে লড়তে পারব না...।'

আচমকা মিনি বলল, 'জিশান, আজ আর কথা নয়...তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব...।'

জিশান তাড়াতাড়ি বলে উঠল ঃ 'মিনি, মিনি! কিল গেমের আগে আজই তোমার সঙ্গে শেষ কথা। শ্রীধর আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। কাল তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলতে দেবে না—।'

'জানি। সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন আমাকেও ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছে।' নিজেকে শক্ত করল মিনি ঃ 'সেইজন্যেই আমি অনেক কথা বাকি রাখতে চাইছি।

বাকি কথাগুলো আমি বলতে চাই কিল গেমের পর...।'

জিশান প্রথমটায় ব্যথা পেলেও পরে বুঝতে পারল মিনি আসলে কী বলতে চাইছে।

'আমি এখন কানেক্‌শন কেটে দিচ্ছি, জিশান। সোমবার যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা না বলো তা হলে জীবনে তোমার মুখ দর্শন করব না। কথাটা মনে থাকে যেন!'

তারপর সত্যি-সত্যিই কানেকশন কেটে দিল মিনি।

মিনির না বলা গোপন কথা জিশান বুঝতে পারল। এম-ভি-পি-র শূন্য পরদার দিকে তাকিয়ে জিশানের মনে হল, মিনি শেষ কথাটা যা বলল তার বদলে এ-কথাও বলতে পারত : '...সোমবার যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা না বলো তা হলে তোমার মরা মুখ দেখব।'

না, জিশান নিজের মরা মুখ মিনিকে দেখাতে চায় না। আর সেইজন্যই দরকার মনোযোগ—সূচিতীক্ষ্ণ মনোযোগ। যে-মনোযোগ থাকলে ওর সারভাইভাল ফ্যাক্টরটা ০.৫-এর বেশি হতে পারে।

এখন বসে-বসে সেই কথাই ভাবছিল জিশান।

মিনি। অর্কনিশান। জিশান। কনসেনট্রেশন। কনসেনট্রেশন।

এই পাঁচটা শব্দ জিশানকে মনের ভেতরে সাইক্লিক অর্ডারে ঘুরছিল। আর বারবার ভেবে মরছিল, ওই তিনজন খুনিকে ও কীভাবে বাইশ ঘণ্টা ধোঁকা দেবে।

সকাল ছ'টা থেকে আটটা—এই দু-ঘণ্টা—গেম সিটি থাকবে জিশানের একার দখলে। তারই মধ্যে জিশানের লড়াইয়ের ময়দানটা দেখেশুনে নিতে হবে।

শ্রীধর পাট্টা বলেছেন, গেম সিটির নানান জায়গায় দাঁড় করানো থাকবে অনেক গাড়ি আর মোটরবাইক। সেগুলোর ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভরতি থাকবে। ট্যাঙ্কের ঢাকনা সিল করা থাকবে। ইগনিশনে লাগানো থাকবে গাড়ির চাবি—সে-চাবি এমনই যে, কি-হোল থেকে কখনও বের করা যাবে না। সোজা কথায়, তেল না ফুরোনো পর্যন্ত ওই গাড়ি আর বাইকগুলো ওরা চারজন ব্যবহার করতে পারবে। চারজন মানে জিশান, আর তিনজন কিলার।

গেম সিটিতে যেসব মানুষ চব্বিশ ঘণ্টার 'সিটিজেন' হয়ে আসবে তারা থাকবে যার-যার নির্দিষ্ট বাড়িতে বা দোকানে। তাদের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো বারণ। যদি কেউ সে-নিয়ম না মানে তা হলে তার ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে সে-দায়িত্ব মোটেই সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের নয়। তবে যদি কখনও কোনও বাড়ি বা দোকানের ভেতরে জিশান এবং তার শত্রুদের কোনও মোকাবিলা হয় তা হলে সেটা হবে পুরোপুরি অস্ত্রহীন মোকাবিলা। এ-নিয়ম না মানলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও মারাত্মক।

শ্রীধর এইসব নিয়মের কথা বারবার করে চারজনকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে এও বলেছেন, 'মনে রাখবে, লক্ষ ক্যামেরা প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদের লক্ষ করছে। সেইসঙ্গে রয়েছে দেশবিদেশের কোটি-কোটি দর্শক।'

জিশান অপটিক্যাল ট্যাবলেটটা হাতে নিল। ওটা 'অন' করে গেম সিটির আনাচকানাচ ভীষণ মনোযোগে দেখতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখেই চলল। পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করার মতো গেম সিটির ভূগোল মুখস্থ করে চলল। কারণ, লড়াইয়ের সময় বারবার ট্যাবলেট দেখে ও দামি সময় নষ্ট করতে চায় না। তাই গেম সিটিকে ও মনের মধ্যে গেঁথে নিতে চায়।

গতকাল শ্রীধরকে জিগ্যেস করেছিল, 'ওই চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে জল আর খাবার কি সঙ্গে নিতে হবে?'

শ্রীধর হেসে বলেছেন, 'না। আমি কোয়ালিটি টাইম নষ্ট করতে চাই না। তোমাদের চারজনের জন্যে জল আর খাবারের ব্যবস্থা করেছি ভারী অভিনব কায়দায়, বুঝলে বাবু জিশান! একেবারে হাই-ফাই সুপার-ডুপার টেকনোলজি...।'

'তার মানে?' জিশান ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল। মনে-মনে ভাবল, এই পাগল স্যাডিস্ট লোকটা হয়তো গেমের ফান আর এক্সাইটমেন্ট ফ্যাক্টর বাড়ানোর জন্য জল আর খাবারের কোনও ব্যবস্থাই রাখেনি। গেম সিটির জঙ্গলের গাছের ফল, পাতা আর কচি ডালপালা হচ্ছে খাবার, আর জল খাওয়ার জন্য রয়েছে নদীর অগাধ জল।

কিন্তু জিশানকে ভুল প্রমাণ করে শ্রীধর পাত্রা অন্যরকম উত্তর দিলেন। অপটিক্যাল ট্যাবলেটের একটা লালরঙের চৌকো বোতাম দেখিয়ে বললেন, 'জিশান, এই বোতামটা হচ্ছে ফুড বাটন। এটা টিপলেই তুমি দেখতে পাবে ফুড ম্যাপ। গেম সিটির কোন-কোন পয়েন্টে তোমার ফুড আর ড্রিঙ্কের প্যাক রাখা আছে সেগুলো লাল ব্লিঙ্কিং ডট হিসেবে স্ক্রিনে ফুটে উঠবে। তুমি ইচ্ছে করলেই পিকচার জুম করে পয়েন্টগুলোর ডিটেইল্‌ড লোকেশান দেখে নিতে পারবে...।'

'কিন্তু কিলাররাও তো এই ম্যাপ দেখতে পাবে। তখন ওরা...।'

হাত তুলে জিশানকে থামতে ইশারা করলেন মার্শাল। হেসে বললেন, 'আমাকে তুমি বোকা ভাব কেন, জিশান? আমি থ্রিলিং ফাইট দেখতে চাই—খাবার চুরির কায়দা-কানুন দেখতে চাই না—' জিভটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েকবার বের করলেন, ঢোকালেন। সাপের মতো। তারপর ঃ 'তোমার ফুড ম্যাপ কিলাররা কেউ দেখতে পাবে না। আর ওদের ফুড ম্যাপ ওরা তিনজন দেখতে পেলেও তুমি দেখতে পাবে না—অলরাইট?'

জিশান স্তম্ভিত হয়ে শ্রীধর পাত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা একইসঙ্গে শয়তান এবং জিনিয়াস।

ফুড ম্যাপের ব্যাপারটা জিশানকে জলের মতো বুঝিয়ে দেওয়ার পর শয়তান এবং জিনিয়াসটা ওকে একটা ফাইল দেখিয়েছিল। সেটা আরমারি ইউনিটের হরেকরকম অস্ত্রশস্ত্রের চেক লিস্ট।

এক-একটা অস্ত্রের এক-একরকম কোড নম্বর। নম্বরের পাশে রয়েছে অস্ত্রের রঙিন ছবি আর বিবরণ। তাতে লেখা আছে কোন অস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার মাপ কত, ওজন কত, আর মারণ ক্ষমতাই বা কত।

সেই লিস্টের মধ্যে আরও রয়েছে নানান যন্ত্রপাতির খোঁজখবর। যেমন, অটোফোকাস ডায়মন্ড লেন্স, হাই পাওয়ার টেলিস্কোপ, সাউন্ড রিকগনিশন অডিয়োগ্রাফি সিস্টেম, বহু রকমের নাইট-ভিশন ইন্সট্রুমেন্ট, আরও কত কী!

এগুলোর সঙ্গে আগেই জিশানের পরিচয় ছিল। ওর ট্রেনিং-এর সময় যখন ওকে নানান ধরনের লড়াইয়ের কায়দাকানুন শেখানো হচ্ছিল তখন একটু-একটু করে আরমারি ইউনিটের যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে ওকে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন ওকে খুব হিসেব করে যন্ত্র আর অস্ত্র বেছে নিতে হবে। কারণ, এগুলোর সংখ্যা যত বাড়বে, ওজন তত বাড়বে। আর ওজন যত বাড়বে, জিশানের ছোটাছুটি করতে ততই অসুবিধে হবে।

শ্রীধরের কথা মতো আরমারি ইউনিটের চেক লিস্টটার সফ্‌ট কপি ট্যাবলেটের মেমোরিতে সেভ করে নিয়ে এসেছিল জিশান। আজ রাতে ও আরমারির চেক লিস্টে 'টিক' মারতে বসবে। তারপর সেই 'টিক' মারা লিস্টটা শ্রীধর পাট্টার কম্পিউটার সিস্টেমে পাঠিয়ে দেবে। তা হলে কাল ভোরে আরমারি ইউনিটে ওর অস্ত্র আর যন্ত্রপাতি বেছে নিতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। ইউনিটের অফিসাররা আগে থেকেই সব বাছাই করে রাখবেন।

শ্রীধরের চেম্বার থেকে চলে আসার সময় মার্শাল ওকে পিছু ডেকেছেন, 'জিশান—!'

জিশান পিছন ফিরে তাকিয়েছে ওঁর দিকে।

'তোমার স্যাটেলাইট ফোন কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকবে—আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে। শুধু আমি তোমাকে ফোন করতে পারব, আর তুমি আমাকে—আর কেউ নয়। ওকে?' হাসলেন ঃ 'আসলে কিল গেমের প্রতিটি মোমেন্টে তোমার আর আমার যোগাযোগ থাকা দরকার—তাই না?'

উত্তরে জিশান শুধু মাথা নেড়েছে। কোনও কথা না বলে চলে এসেছে।

সন্ধে ছ'টার সময় একটা মেডিকেল টিম জিশানের কোয়ার্টারে এল।

মোট চারজন লোক। প্রত্যেকের গায়ে সাদা ইউনিফর্ম। তার ওপরে বড়-বড় হরফে 'মেডিক' কথাটা লেখা।

ওদের প্রত্যেকের হাতে পোর্টেবল যন্ত্রপাতি। তার কয়েকটার মধ্যে মনিটর লাগানো রয়েছে।

ওদের একজন জিশানকে সামান্য তোতলা স্বরে বলল, 'গু-গুড ইভনিং, মিস্টার পাল চৌধুরী। মা-মার্শাল স্যারের ইনস্ট্রাকশনে আ-আমরা একটা ছো-ছোট্ট অপারেশান করতে এসেছি। আ-আপনার বডিতে একটা মা-মা—...।

'মাইক্রোইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার?' জিশান হেসে খেই ধরিয়ে দিল।

'হ্-হ্যাঁ। ছো-ছোট্ট অপারেশান। কিল গেমের জন্যে এ-এ-এসেনশিয়াল।'

জিশান জিগ্যেস করল, 'আমাকে কী করতে হবে?'

'আ-আপনি কাইন্ডলি বিছানায় শু-শুয়ে পড়ুন—।'

জিশান বিছানার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

তারপর ওরা চারজন মিলে ওর বাঁ-হাতের ওপরদিকটায় কী যে করল জিশান তার কিছুই টের পেল না, শুধু প্রথমে একটা আলতো পিন ফোটানোর ব্যাপার টের পেয়েছিল।

ঘড়ি ধরে ঠিক কুড়ি মিনিট। তারপরই প্রথম লোকটি জিশানকে বলল, 'অ-অ-পারেশান কমপ্লিট, মিস্টার পাল চৌধুরী। এবারে আপনি সোজা হয়ে বসতে পা-পারেন।'

জিশান বিছানায় উঠে বসল। অপারেশনের জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখল। নাঃ, কোনও ব্যথা-ট্যাথা নেই। তবে টিপলে একটু শক্ত লাগছে।

সেটা লক্ষ করে লোকটি বলল, 'স্টেট অফ দ্য আ-আর্ট টে-টেকনোলজি। কোনও ব্যথা পাবেন না।'

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিতে-নিতে লোকটি নীচু গলায় বলল, 'আ-আমাদের ক্ষ-ক্ষমা করবেন। মার্শাল স্যারের অর্ডার। আমাদের কিছু করার নেই—।'

জিশান শুধু বলল, 'থ্যাংক য়ু—।'

ওরা চলে যেতেই জিশান আবার 'পড়াশোনা' শুরু করল। এখনও ওর পড়া শেষ হয়নি। হাতে আর সময় বেশি নেই। সময় ক্রমশ কমছে।

অনেক রাতে জিশানের 'পরীক্ষার পড়া' শেষ হল।

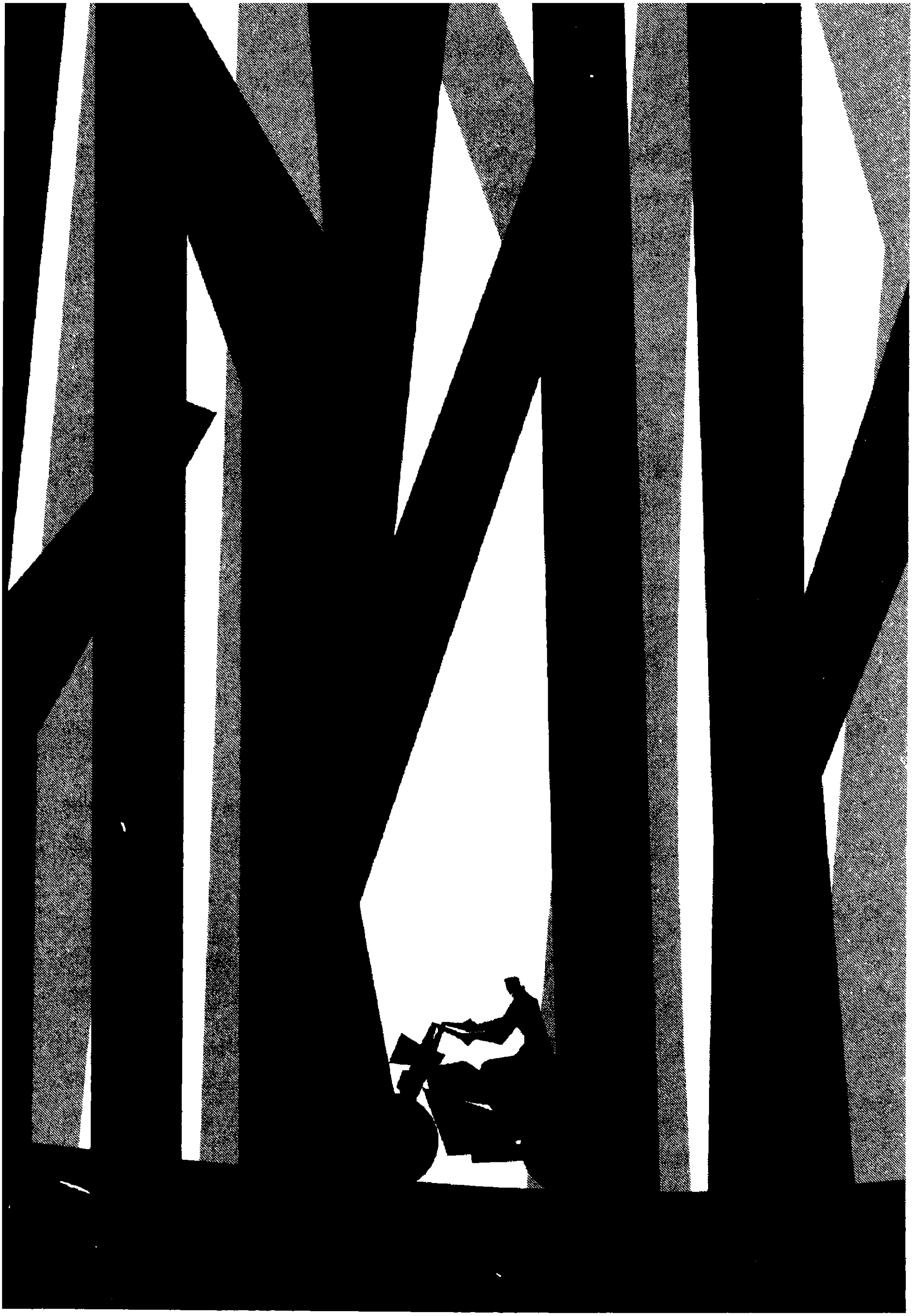
ঘড়ির দিকে তাকাল জিশান ঃ ঘড়ির অর্ধবৃত্তাকার কালো অংশে ছোট কাঁটাটা একের দাগে। রাত একটা বাজে।

জিশানের হাই উঠল। উইশ লিস্টের কথা মনে পড়ল ওর।

কাল রাতে সিকিওরিটি চিফের হাতে ও উইশ লিস্টটা তুলে দিয়েছে। 'লাস্ট স্টপ' চেম্বারে লিস্টের 'বন্ধুদের' দেখা পেলে ওর খুব ভালো লাগবে। কিল গেমে আরও, আরও, বেশি করে জিততে ইচ্ছে করবে।

জিশান আবার হাই তুলল। পায়ে-পায়ে খোলা জানলার কাছে গেল।

ওই তো আকাশে চাঁদ—দ্বাদশী অথবা ত্রয়োদশীর। কী অপরূপ লাগছে দেখতে! সকালের নীল আকাশের মতো চাঁদকে উপভোগ করতে লাগল জিশান। একইসঙ্গে মনে হল, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও যখন গোনা হয়ে গেছে তখন সেটাকেও



তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করা যাক।

জিশান বেশ ধীরে-ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে লাগল। শ্বাস টানা কিংবা ছাড়ার প্রক্রিয়ার দিকে তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিল। একইসঙ্গে ভাবতে লাগল, ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের কোটা যদি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে ওর আয়ু একধাপ-একধাপ করে কমছে।

জিশান মনে-মনে বেশ অবাক হল। শ্বাস টানা কিংবা ছাড়ার ব্যাপারটা নিয়ে ও আগে কখনও এমন করে ভাবেনি। কিন্তু ভাববেই বা কেন? ওর জীবনে আগে তো কখনও কিল গেম আসেনি।

জিশান বেশ বুঝতে পারছিল, বাকি যে-তিন ঘণ্টা সময় হাতে রয়েছে, সে-সময়টা ওর ঘুমোনো দরকার। কারণ, ভোর চারটে থেকে কিল গেমের তোড়জোড় শুরু। বলির পাঁঠাকে তখন তৈরি করে হাড়িকাঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে এই হাড়িকাঠটা হাড়িকাঠের মতো দেখতে নয়, আর এটার মাপ চারশো বর্গ কিলোমিটার। তফাত শুধু এইটুকুই।

কিন্তু ঘুম আসবে কি না তা নিয়ে জিশানের বেশ সংশয় ছিল। বাবার কাছে শুনেছিল, মৃত্যুদণ্ডের আসামি শাস্তি পাওয়ার আগের রাতটায় কখনও ঘুমোতে পারে না। ওর বেলাতেও ব্যাপারটা অনেকটা তাই।

সে-কথা ভাবতে-ভাবতে আরও একবার হাই তুলল জিশান।

●

আরমারি ইউনিটে এসে মনের মতো পোশাক বেছে নিল জিশান। তারপর নিজের পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পরে নিল। পায়ে পরে নিল কালো রঙের স্নিকার।

পোশাকটা অদ্ভুত ধরনের। ফুল স্লিভ টি-শার্ট আর প্যান্ট—কোমরে কাপড়ের বেল্ট। চকচকে কালো রঙের সিনথেটিক মেটিরিয়ালের তৈরি। খুব চাপা নয়, খুব ঢোলাও নয়। প্যান্টটায় ছ'টা নানান মাপের পকেট। আর টি-শার্টের চারটে—দুটো বুক পকেট, দুটো সাইড পকেট।

পোশাক পরে নেওয়ার পর বাছাই করা অস্ত্রশস্ত্র একটা বড়সড় রুকস্যাকে ভরে নিল। জামা-প্যান্টের পকেটও বাদ গেল না। অস্ত্রগুলো মারাত্মক হলেও ওজনে বেশ হালকা।

জামার বাঁ-পকেটে জিশান রাখল মিনি আর শানুর রঙিন ফটো। এই ছবিটা ও এম-ভি-পি-র মেমোরি থেকে নিয়ে ওর স্পেশাল কোয়ার্টারের কালার প্রিন্টারে প্রিন্ট করে নিয়েছিল। তাই মিনি আর শানু এখন থাকবে ওর হৃদয়ের কাছাকাছি।

অপটিক্যাল ট্যাবলেট কাম ট্র্যাকারটা জিশান হাতেই রাখল। গেম সিটিতে ঢোকামাত্রই ওটা কাজে লাগবে।

আরমারি ইউনিটের একজন কর্মী একটা বড় মাপের কালো রিস্টওয়াচ জিশানের বাঁ-হাতের কবজিতে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিল। কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচ। ও গেম সিটিতে ঢোকামাত্রই ওকে ঘড়ির একটা নীল বোতাম টিপতে হবে। তা হলেই চব্বিশঘণ্টা থেকে কাউন্টডাউন শুরু হবে। আর তার পাশাপাশি স্বাভাবিক ঘড়িও চলতে থাকবে। এই কাউন্টডাউন দেখে জিশান বুঝতে পারবে কিল গেম শেষ হতে আর কতক্ষণ বাকি।

তৈরি হয়ে নিজেকে আয়নায় দেখল জিশান। নিজেকে চিনতে পারল না। তবে ওর মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, এই লোকটার ওপরে বাজি ধরা যায়। কিল গেমে এই লোকটা সহজে হারবে না।

ও তৈরি হয়ে যখন 'লাস্ট স্টপ' চেম্বারে যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছে, তখন আরমারি ইউনিটের সাতজন কর্মী আর অফিসার ওকে উইশ করল। জিশান হেসে বলল, 'থ্যাংক য়ু—।'

পিস ফোর্সের চারজন গার্ড ওকে রোবটের ভঙ্গিতে নিয়ে গেল 'লাস্ট স্টপ' চেম্বারে। ওদের মুখে কোনও কথা নেই। কালো কাচের মেঝেতে পা ফেলে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল।

জিশান ব্যাপারটা বুঝতে পারল—তাই ওদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল না।

চুপচাপ হেঁটে ওরা একটা বিশাল দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

ঘষা কাচের তৈরি দরজার পাল্লায় সোনালি হাতল বসানো। একটা চওড়া এল-সি-ডি ডিসপ্লে প্যানেলে ইংরেজি হরফে লেখা ঃ লাস্ট স্টপ।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল জিশান। পিছনে তাকিয়ে দেখল, চারজন গার্ড নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। ওরা জিশানকে বিদায় জানাচ্ছে, নাকি শোকপ্রস্তাব জানিয়ে একমিনিট নীরবতা পালন করছে?

একা-একা কয়েক পা হাঁটতেই একটা কাচের ঘরে পৌঁছে গেল জিশান। ফ্লুওরেসেন্ট আলোয় ঘরটা ঝকঝক করছে। সেখানে টিপটপ ড্রেস পরে দুজন অফিসার দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখে একজন অফিসার বলল, 'আপনার সঙ্গে অনেকে দেখা করতে এসেছেন। ওঁরা একজন-একজন করে ওই কিউবিক্‌লে আসবেন। আপনি ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে আপনার কথা বলার টাইম লিমিট হচ্ছে একমিনিট...।'

কিউবিক্‌লটার দিকে তাকিয়ে দেখল জিশান।

ওর কাচের ঘরের লাগোয়া আর-একটা ছোট কাচের ঘর। দু-ঘরের মাঝের

দেওয়ালে একটা ছোট জানলা—বড়জোর আট ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি।

এসেছে? সবাই এসেছে? সিকিওরিটি চিফের হাতে যে-উইশ লিস্টটা ও গত পরশু তুলে দিয়েছে তারা সবাই এসেছে?

ঘড়ির দিকে তাকাল জিশান। সাড়ে পাঁচটা বাজে।

ঘরের ডানদিকের দেওয়ালে একটা টাচ স্ক্রিন প্যানেল ছিল। বেঁটে মতন আর-একজন অফিসার প্যানেলের একটা বোতামে আঙুল ছোঁয়ালেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা মিষ্টি ইলেকট্রনিক সুর বেজে উঠল। আর তার কয়েক সেকেন্ড পরেই ছোট কাচের ঘরটায় এসে দাঁড়াল প্যাসকো। ওর চোখে ঘুম লেগে আছে।

জিশানের চোখে তাকিয়ে প্যাসকো একগাল হাসল ঃ 'হাই, জিশান!'

'হাই!'

তারপর প্যাসকো অনেকক্ষণ জিশানের দিকে চেয়ে রইল। দুজনেই চুপচাপ।

একসময় ছোট জানলার ভেতর দিয়ে হাত বাড়াল প্যাসকো। জিশান ওর হাত ধরল। চাপ দিল। উষ্ণতার আদানপ্রদান হল।

প্যাসকো বলল, 'শালারা ঢোকার সময় এক্স-রে আর মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে হেভি ছানবিন করেছে। যাকগে, শোনো ব্রাদার, ছোট্ট একটা টিপ্‌স। কিল গেমের আসল অস্ত্র হচ্ছে মোটরবাইক। এটা ভুলো না। সবসময় ভাববে, বাইকটা কোনও ভেহিক্‌ল নয়—ওটা তোমার বডির একটা পার্ট —হাত-পায়ের মতো...।'

জিশান সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

'গেম সিটিতে ঢুকেই আগে একটা বাইক হাতিয়ে নেবে। তারপর ওই চারশো স্কোয়ার কিলোমিটার তোমার—একা তোমার...।'

জিশান আবার ঘাড় নাড়ল।

একজন অফিসার টাচ স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়ালেন। মিষ্টি সুর বেজে উঠল আবার।

'টাইম শেষ।' অন্য অফিসার বলে উঠলেন।

প্যাসকো বলল, 'গুড লাক।' তারপর 'থাম্‌স আপ'-এর ভঙ্গিতে ডানহাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে দেখাল।

জিশান 'বাই—' বলল বটে, তবে ওর ঠোঁট নড়ল শুধু—কোনও শব্দ শোনা গেল না।

প্যাসকো চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঢুকল সুধাসুন্দরী। জিশানের চোখে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

জিশান লক্ষ করল, ও ঠোঁট চেপে আছে। হয়তো কান্না চাপতে চেষ্টা করছে।

সুধা খোপ দিয়ে হাত বাড়ল। জিশানও। প্রায় পাঁচ-সাত সেকেন্ড ওরা

একে অপরের হাত ধরে রইল। তারপর সুধা মাথাটা ওপর-নীচে নাড়াল শুধু। জিশানের হাতটা ছেড়ে দিয়ে ও আবার জিশানের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। একসময় আচমকা মুখটা এক ঝটকায় ঘুরিয়ে নিয়ে কিউবিক্‌ল থেকে চট করে চলে গেল।

জিশান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরে ঢুকল গুনাজি।

ছেলেটা জিশানের হাত চেপে ধরে শুধু 'দাদা! দাদা!' বলে কাঁদতে লাগল।

গুনাজির পর পান্ডা এল কিউবিক্‌লে। ওর চোখ লাল। শরীরটা অল্প-অল্প টলছে।

ও জিশানের দিকে তাকিয়ে একটু জড়ানো গলায় বলল, 'জয় হো!'

তারপর একটা সেলাম ঠুকল।

পান্ডার পর মূর্তির পালা। মূর্তি মাথা নীচু করে কাঁদছিল। কোনও কথা বলতে পারল না। কিছুক্ষণ পর, চলে যাওয়ার সময়, জিশানকে বুক চিতিয়ে ভেজা চোখে স্যালুট করল।

মূর্তির পর 'লাস্ট স্টপ' চেম্বারে ঢুকল সেই নাম-না-জানা গার্ড—যার বাড়ি নাহাইতলা গ্রামে।

গার্ড ছোট খোপের ভেতর দিয়ে ওর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল।

জিশান হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে দেখল, গার্ডের হাতে একটা লাল টুকটুকে আপেল।

গার্ড বলল, 'নাও, তোমার জন্যে এনেছি—।'

জিশান আপেলটা নিল। তারপর ওপর হাতে হাত মেলাল।

গার্ড বলল, 'ভগবানের ভরসায় থেকো না। মনে রেখো, ভাই, তোমাকে ছেলের কাছে ফিরে যেতে হবে...।'

জিশান ওপর-নীচে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, ওর মনে থাকবে—গার্ডের দুটো কথাই।

জিশানের দিকে তাকিয়ে গার্ড চেষ্টা করে হাসল। বলল, 'যদি তুমি সুযোগ দাও তা হলে তোমাকে আমার দেশের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাব—।'

'যাব।' জিশান বলল।

একটু পরেই ইলেকট্রনিক ঘণ্টা বেজে উঠল। গার্ড কিউবিক্‌ল থেকে চলে গেল।

একজন অফিসার বললেন, 'আর কোনও ভিজিটর নেই। চলুন, এবার ফাইনাল মেডিকেল চেক আপ...।'

অফিসারের দেখানো করিডর ধরে জিশান এগিয়ে চলল।

একটা ছোট ঘরে ওর মেডিকেল চেক আপ হল। মাত্র সাত মিনিটেই

হাই-টেক চেক আপ শেষ। তারপর ওকে নিয়ে যাওয়া হল একটা দরজার সামনে। দরজাটা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। দেখেই বোঝা যায়, যথেষ্ট শক্তপোক্ত এবং ভারী।

একজন অফিসার একমনে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

হঠাৎই দরজার ওপরে লাগানো একটা প্লেট টিভি চালু হয়ে গেল। টিভি-টা যে ওখানে বসানো আছে সেটা জিশান আগে খেয়ালই করেনি।

টিভি থেকে শ্রীধর পাট্টা জিশানের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। তবে ওঁর চোয়ালের রেখাগুলো নিষ্ঠুর।

শ্রীধর বললেন, 'বেস্ট অফ লাক, জিশান...।'

সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় যেন একটা সুরেলা ঘণ্টি বেজে উঠল। আর স্টেইনলেস স্টিলের ভারী দরজাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যেতে লাগল।

সকাল থেকে এই প্রথম প্রকৃতির আলো দেখতে পেল জিশান।

শ্রীধর পাট্টা টিভি থেকে আবার বললেন, 'দ্য গেম সিটি ইজ ইয়োর্স—।'

খোলা দরজা পেরিয়ে জিশান গেম সিটিতে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচের নীল বোতাম টিপে দিল।

●

মাথার ওপরে ভোরের নরম আকাশ। আর সামনে মসৃণ পিচের রাস্তা। সেই রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে নীলচে মোলায়েম ভোরের আলো। কারণ সূর্য এখনও ওঠেনি।

রাস্তার ডানদিকে, বেশ খানিকটা দূরে, দেখা যাচ্ছে কয়েকটা সুন্দর-সুন্দর বাড়ি ঃ কোনওটা গোলাপি, কোনওটা হালকা বাদামি, কোনওটা হালকা নীল অথবা চোখ-ধাঁধানো রুপোলি।

আর বাঁ-দিকে বড়-বড় গাছের বাগান। সেই বাগান যতই ছড়িয়েছে ততই ঘন চেহারা নিয়েছে।

চোখের সামনে এই দৃশ্যটা দেখে জিশানের মনে হচ্ছিল যেন ফ্রেমে বাঁধানো একটা সুন্দর ছবি। যেন কোনও অলীকনগরীতে পা দিয়েছে ও। অথচ এখানেই মৃত্যু লেখা আছে।

জিশানের হাতে গার্ডের দেওয়া আপেলটা ছিল। একহাতে আপেল, অন্য হাতে অপটিক্যাল ট্যাবলেট। চারপাশের সুন্দরকে দেখতে-দেখতে ও আপেলটায় কামড় বসাল।

কী, মিষ্টি!

একইসঙ্গে ওর মনে হল,লড়াইয়ের জন্য জরুরি এক জীবনীশক্তি ওর শরীর আর মনে ঢুকে পড়ল। আপেলটা খেতে-খেতে ও রাস্তা ধরে পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল। ওর দু-চোখ একটা মোটরবাইক খুঁজছিল—কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছিল না।

আপেলটা খাওয়া শেষ হতেই জিশান ছুটতে শুরু করল। তখনই ঠিকঠাক টের পেল স্নিকারটা কত আরামে ওর পা-কে জড়িয়ে রেখেছে।

ছুটতে-ছুটতেই বাড়িগুলোর কাছাকাছি চলে এল জিশান। তখনও ও মোটরবাইকের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, তাই বাড়িগুলোর দিকে ততটা মনোযোগ দেয়নি।

একটা হইচই চিৎকার কানে যেতেই ও ওপরদিকে মুখ তুলল। কয়েকটা বাড়ির বারান্দা আর ছাদে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে—জিশানের নাম ধরে চেঁচাচ্ছে, হাত নাড়ছে। ওরা জানে, ভোর ছ'টাতেই কিল গেম শুরু হয়ে গেছে।

ছুটতে-ছুটতে পালটা হাত নাড়ল জিশান। তারপর একটা বাড়ির কাছে এগিয়ে গেল। ট্যাবলেটটা বগলে চেপে মুখের কাছে দু-হাতের তালুর চোঙা তৈরি করে চেঁচিয়ে বলল, 'মোটরবাইক! মোটরবাইক!'

সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটা হাত একটা দিক দেখাল। চিৎকার করে বলল, 'ওইদিকে—ওইদিকে!'

জিশান হাত নেড়ে ধন্যবাদ জানাল। এবং ছুটতে শুরু করল।

দশ-বারো সেকেন্ড পেরোতে না পেরোতেই ও মোটরাবইকগুলো দেখতে পেল। রাস্তার ধার ঘেঁষে সাত-আটটা রঙিন বাইক দাঁড় করানো রয়েছে। যেন সাত-আটটা রঙিন চিতাবাঘ। তারপাশে ছ'টা প্রাইভেট কার। মাপে ছোট, তবে নিশ্চয়ই হাই-টেক।

দৌড়ে গিয়ে একটা কালো চিতাবাঘের পিঠে চড়ে বসল জিশান, অপটিক্যাল ট্যাবলেটটা কেরিয়ারে রাখল। তারপর চিতাবাঘ গর্জন করে উঠল। ছুটতে শুরু করল।

এর মধ্যেই কখন যেন সূর্য উঠে গেছে। বাড়ির মাথায়, গাছের মাথায় রোদের ছোঁয়া লেগেছে।

জিশান পিচের রাস্তা ধরে বাইক চালাতে লাগল। দেখা যাক এই রাস্তাটা কোথায় গেছে!

বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বারান্দা কিংবা ছাদের দিকে তাকিয়ে উৎসাহী লোকজনকে দেখতে পাচ্ছিল। তারা হাত নাড়ছে। জিশানকে দেখার আশায় ভোর ছ'টা থেকেই অপেক্ষা করছে। টিভিতে লাইভ টেলিকাস্ট শুরু হয়ে গেলেও খালি চোখে সরাসরি দেখতে পাওয়ার আনন্দই আলাদা।

বাড়ির সারির ফাঁকে-ফাঁকে বেশ কয়েকটা টিভি ক্যামেরা জিশানের চোখে পড়ল। বাঁ-দিকে তাকিয়ে একইরকম দৃশ্য দেখতে পেল জিশান। গাছে-গাছে লাগানো টিভি ক্যামেরার চোখ। নাঃ, শ্রীধর পাট্রার প্ল্যানিং-এ কোনও গণ্ডগোল নেই!

প্রায় পনেরো মিনিট বাইক চালানোর পর গেম সিটির একটা বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে পৌঁছে গেল। কালো পাথরে তৈরি শক্তিশালী পাঁচিল। দেখামাত্রই জেলখানার কথা মনে পড়ে।

রাস্তাটা বাঁ-দিকে ঘুরে গেছে। জিশানও রাস্তা ধরে বাইক ঘোরাল। একপলক হাতঘড়ির দিকে তাকাল। ছ'টা পঁচিশ। জলতেষ্টা পাচ্ছে—তার সঙ্গে খিদেও।

একটু পরে রাস্তার ধারে বাইক দাঁড় করাল। কেরিয়ার থেকে অপটিক্যাল ট্যাবলেট বের করে লাল রঙের চৌকো বোতামটা টিপল। পরদায় কতকগুলো লাল ব্লিংকিং ডট ফুটে উঠল। জিশানের ফুড ম্যাপ। পটাপট বোতাম টিপে সবচেয়ে কাছাকাছি ফুড পয়েন্টটা কোথায় দেখে নিল জিশান। তারপর ট্যাবলেট কেরিয়ারে ঢুকিয়ে আবার বাইকে চড়ে দৌড়।

ট্যাবলেটের নিশানা বারবার চেক করে রাস্তা ছেড়ে গাছপালার মধ্যে ঢুকতে হল জিশানকে। আলোছায়ার কাটাকুটির মধ্যে সাপের মতো এঁকেবেঁকে বাইক চলছিল। চারিদিকে সবুজ আর বাদামি পাতার ছড়াছড়ি। বাইকের আওয়াজ পেয়ে গাছের পাখিরা ডেকে উঠল। এ-গাছ থেকে ও-গাছে ওড়াউড়ি করতে লাগল।

একটা ফুড পয়েন্টের কাছে পৌঁছে বাইক থামাল। নেমে পড়ল বাইক থেকে।

চারপাশে বড়-বড় গাছ। তাদের ঘিরে ছোট-বড় আগাছা। চোখে পড়ল, প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে।

ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে ফুড পয়েন্টটার ব্লিংকিং ডটে আঙুল ছোঁয়াল জিশান। সঙ্গে-সঙ্গে খুব কাছাকাছি কোনও লুকোনো জায়গা থেকে পিপ্-পিপ্ শব্দ শোনা গেল। চারপাশে তাকাল। কোথা থেকে আসছে শব্দটা?

ট্যাবলেট হাতে নিয়ে শব্দের উৎসের খোঁজ করতে লাগল। এবং একমিনিটের কম সময়েই খোঁজ পেয়ে গেল।

একটা বিশাল গাছের গোড়ার কাছ থেকে শব্দটা আসছে। পিপ্-পিপ্, পিপ-পিপ।

দৌড়ে সেখানে গেল জিশান। হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। পড়ে থাকা কয়েকটা পাতা সরাতেই চোখে পড়ল ঝুরো মাটি।

পকেট থেকে একটা অস্ত্র বের করল ঃ হান্টিং নাইফ। টেম্পার্ড স্টিলের

সাত ইঞ্চি লম্বা ব্লেড। একদিক ধারালো, অন্যদিকে কুমিরের পিঠের মতো খাঁজকাটা। ছুরিটা বাগিয়ে ধরল। তারপর মাটি খুঁড়তে শুরু করল।

একটু পরেই দেখা গেল একটা স্টিলের বড় বাক্স। তার গায়ে অদ্ভুত ধরনের সব ভাঁজ। সেটা টেনে বের করল। ঝুরো মাটি ঝেড়েঝুরে বাক্স খুলল।

ওর খাবার দেখতে পেল জিশান।

ছ'টা চিকেন স্যান্ডউইচ। চারটে ডিমের ওমলেট। আর দু-লিটার জলের একটা বোতল।

মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। চটপট খাওয়া শুরু করল।

খেতে-খেতেই জিশানের মাথায় একটা আইডিয়া এল। আচ্ছা, ফুড পয়েন্টগুলোকে আর্মস পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হয়!

কথাটা মাথায় আসামাত্রই জিশান দুরন্ত স্পিডে খাওয়া শেষ করল। বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেল। ছিপি টাইট করে এঁটে বোতলটা আবার রেখে দিল বাক্সের ভিতরে।

জিশান চারটে স্যান্ডউইচ খেয়েছিল। দুটো বাক্সে রেখে দিয়েছিল। কারণ, ওর মনে হয়েছিল, বাক্সের খাবার শেষ করে দিলে ফুড ম্যাপে এই নির্দিষ্ট ফুড পয়েন্টটা ব্লিংকিং ডট হিসেবে আর নাও দেখা যেতে পারে। শ্রীধর পাট্টার দুষ্টু বুদ্ধিকে বিশ্বাস নেই।

কিন্তু এই ব্লিংকিং ডটগুলো জিশানের কাছে এখন ভীষণ জরুরি। কারণ, ও ঠিক করেছে এই পয়েন্টগুলোতে ও রুকস্যাকে ভরা নানান আর্মস লুকিয়ে রাখবে। তা হলে ফুড ম্যাপের বোতাম টিপলেই ও একইসঙ্গে ফুড পয়েন্ট আর আর্মস পয়েন্ট দেখতে পাবে। অথচ ওর শত্রুরা এই লোকেশনগুলোর একটাও দেখতে পাবে না।

সুতরাং কাজ শুরু করল জিশান।

রুকস্যাক থেকে বের করে নিল লেজার পয়েন্টার লাগানো হাই-রেঞ্জ টুয়েন্টি শুটার অটোমেটিক পিস্তল। সেটাকে মাটির নীচে ফুড বক্সের পাশে শুইয়ে দিল। তারপর মাটি চাপা দিয়ে তার ওপরে শুকনো পাতা আর ডালপালা কুড়িয়ে আগের মতোই ছড়িয়ে দিল।

জিশানের হঠাৎই মনে পড়ল টিভি ক্যামেরার কথা। ক্যামেরার চোখগুলো নিশ্চয়ই ওর ওপরে সর্বক্ষণ নজর রাখছে। তা হলে কোটি-কোটি মানুষের কাছে জিশানের এই কাণ্ডকারখানা লাইভ টেলিকাস্টের মাধ্যমে এই মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছে!

সে যায় যাক! তা না হলে ইঁদুর আর বেড়ালের লুকোচুরি খেলা জমবে কেমন করে! তা ছাড়া ওর তিন শত্রু কখনওই জিশানের এই কৌশলের কথা জানতে পারবে না। কারণ, ওরা কোনওভাবেই টিভির লাইভ টেলিকাস্ট দেখতে

পাবে না। জিশানের হিসেব অন্তত তাই বলছে।

গেম সিটির 'নাগরিকরা' তখন কিল গেমের লাইভ টেলিকাস্ট দেখছিল। চলমান ছবির পাশাপাশি চলছিল উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার মশলা ঠাসা ধারাভাষ্য। ধারাভাষ্য যিনি দিচ্ছিলেন তিনি আবেগ মাখানো জোরালো গলায় জিশানের বুদ্ধির তারিফ করছিলেন। বলছিলেন, কিল গেম শুধু শারীরিক শক্তি আর দক্ষতার মোকাবিলা নয়, বুদ্ধির উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর ধারেরও লড়াই।

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল জিশান। চারপাশে তাকাল। গাছপালা, আলোছায়া। শোনা যাচ্ছে দু-তিনরকমের পাখির ডাক।

হঠাৎই অদ্ভুত একটা শব্দ জিশানের কানে এল। কেউ যেন মিহি গলায় কাশছে। অথবা হাসছে।

একটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে সতর্কভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। কই, কেউ তো কোথাও নেই!

শব্দটা আবার শোনার জন্য জিশান দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎই বাঁ-দিকের একটা নড়াচড়া ওর চোখের কোণে ধরা পড়ল। চকিতে চোখ ফেরাল জিশান। সঙ্গে-সঙ্গে আশঙ্কার ঠান্ডা ছোবল টের পেল বুকের ভেতরে।

একটু দূরে দুটো মোটা-মোটা গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে তিনটে হায়েনা ওর দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে।

বাদামির ওপরে কালো ছোপ-ছোপ দাগ। কুকুরের চেয়েও বড়সড় চেহারা। কানগুলো ভোঁতা। গলার বেশ কিছুটা জায়গায় কালচে রং।

এমনিতে হায়েনা যে মানুষকে আক্রমণ করে না সেটা জিশান জানে। কিন্তু এই তিনটে লোভাতুর প্রাণীকে দেখে ও তেমন একটা ভরসা পাচ্ছিল না।

গত কয়েক মাসে জিশান বহুবার গেম সিটি নিয়ে শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে আলোচনা করেছে। কিন্তু শ্রীধর একটিবারের জন্যও ওকে বলেননি যে, গেম সিটির জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী রয়েছে।

তা হলে কি হায়েনার চেয়ে বড়সড় প্রাণীও থাকতে পারে এই জঙ্গলে?

তা ছাড়া এই হায়েনাগুলো স্বাভাবিক হায়েনা কি না কে জানে! হয়তো শ্রীধরের পোষা বিজ্ঞানীরা এদের শরীরে নানান কেমিক্যাল ইনজেক্ট করে এদের আরও হিংস্র, আরও বেপরোয়া করে তুলেছে।

জিশান আড়চোখে দেখল, বাইকটা ওর যথেষ্ট কাছাকাছি রয়েছে। সুতরাং আর দেরি না করে ও দু-লাফে বাইকের কাছে পৌঁছে গেল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই বাইকে বসে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

আশ্চর্য! হায়েনা তিনটে লাফ মেরে বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে।



এবং রাস্তার নেড়ি কুকুরের মতো জিশানের বাইকটাকে তাড়া করতে শুরু করল। যদিও জিশানের বাইকের হাই মোটিভ পাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হায়েনাগুলোকে পিছনে ফেলে দিল।

জিশান ঠিক করল দু-ঘণ্টার মধ্যে যেটুকু সময় হাতে আর বাকি আছে তার মধ্যে ও যতগুলো ফুড পয়েন্ট পারবে কভার করবে।

গেম সিটির মধ্যে জিশানের বাইক ছুটে বেড়াতে লাগল। কখনও জঙ্গলে, কখনও রাস্তায়, কখনও বা নদীর ওপরে ফ্লাইওভারে। আবার কখনও পাহাড়ে।

যতই ঘুরে বেড়াচ্ছিল ততই অবাক হচ্ছিল জিশান। চারশো বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে কীভাবে একটা বিচিত্র শহর তৈরি করেছেন শ্রীধর! এখানে বাড়ি-ঘর আছে, নদী আছে, জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে—এমনকী বন্যপ্রাণীও ঘুরে বেড়াচ্ছে গাছের আড়ালে! এরকম নকল শহর সিনেমার শুটিং-এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিংবা অবসর বিনোদনের রিসর্ট হিসেবে। কিন্তু শ্রীধর পাট্রা এই শহরটা তৈরি করেছেন বধ্যভূমি হিসেবে। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকা রোজগারের জন্য বিনা ঝুঁকির বিনিয়োগ।

রাস্তা ধরে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল জিশান। পথ ঘেঁষে অনেকগুলো বাড়ি আর দোকান। একটু দূরেই সার বেঁধে দাঁড় করানো রয়েছে অনেকগুলো গাড়ি আর মোটরবাইক।

কয়েকটা বাড়ির দরজায় লোকের ভিড় চোখে পড়ল। ওরা বোধহয় টিভির লাইভ টেলিকাস্টে দেখতে পেয়েছে জিশান এই পথ দিয়েই আসছে।

জিশানকে দেখামাত্রই ওরা সবাই হইচই করে উঠল, হাত নাড়তে লাগল। হঠাৎই ভিড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা বাচ্চা ছেলে আর একটা ছোট মেয়ে। ছেলেটার বয়েস বোধহয় ছয় কি সাত, আর মেয়েটার ন'দশ। ওদের বাবা-মা আর অন্যান্য মানুষজন দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওদের ডাকছিল, 'রাস্তায় যাস না! চলে আয়! শিগগির ফিরে আয়!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছেলেটা আর মেয়েটা একেবারে জিশানের বাইকের পথ আটকে দাঁড়াল। 'জিশান! জিশান!' বলে চিৎকার করতে লাগল।

জিশান ঘড়ি দেখল। আটটা বাজতে এখনও কুড়ি মিনিট বাকি। এই কুড়ি মিনিট গেম সিটির পথঘাট নিরাপদ—কারণ, কিলাররা এখনও মাঠে নামেনি।

জিশান ইচ্ছে করলে ওদের পাশ কাটিয়ে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সেটা করল না। ও বাইক থামাল। কী বলতে চাইছে বাচ্চা দুটো? ছেলেটার মুখের সঙ্গে ছেলে শানুর মুখের মিল খুঁজে পেল। জামার বাঁ-পকেটের ওপরে হাত ছোঁয়াল। মিনি আর শানুর ফটো অনুভব করল।

জিশান বাইক থেকে নামল। বাচ্চা দুটো তীরবেগে ছুটে চলে এল ওর

কাছে। একসঙ্গে বলে উঠল, 'অটোগ্রাফ দাও, জিশানকাকু—অটোগ্রাফ।'

তখনই খেয়াল করল, দুজনের হাতেই একটা করে পাতলা খাতা, আর পেন।

জিশান ফুটফুটে বাচ্চা দুটোর মুখের দিকে তাকাল। তারপর পেন নিয়ে খাতা দুটোর পাতায় পরপর সই করল। তারপর বড় করে লিখে দিল, 'ভালোবাসা নাও—।'

বাড়িগুলোর দরজার কাছে আর দোকানের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন চিৎকার করতে লাগল, 'জি—শান! জি—শান!'

জিশান সেদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। তারপর বাচ্চা দুটোকে নাম জিগ্যেস করল।

মেয়েটার নাম টুকটুকি, আর ছেলেটার নাম কাঞ্চন।

কাঞ্চন বলল, 'জিশানকাকু, আমরা তোমার সঙ্গে ফটো তুলব—।'

এ কী আবদার! সময় যে বড় কম! আর-একটু পরেই কিলাররা গেম সিটিতে ঢুকে পড়বে!

টুকটুকি জিশানের হাত ধরে টানতে শুরু করল ঃ 'এসো না! এসো! ওইখানটায় দ্যাখো—টিভিতে তোমাকে দেখাচ্ছে। চলো, দেখবে চলো...।'

জিশান দোটানায় পড়ল। ওর মনে হল, শানু টুকটুকির মতো বড় হয়ে গেছে। ওর হাত ধরে টানছে।

জিশান যেন কোন এক জাদুমন্ত্রে অবশ হয়ে গেল। নাকি বলা ভালো, বশ হয়ে গেল। টুকটুকির ওপরে নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে ছেড়ে দিল। পায়ে-পায়ে এগোতে শুরু করল রাস্তার ধারের একটা ফাস্ট ফুডের দোকানের দিকে।

আশপাশের ভিড় করা জনতা হইহই করে উঠল। 'জিশান! জিশান!' বলে চিৎকার করতে লাগল। টুকটুকি আর কাঞ্চন জিশানের দু-হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। ক্যামেরার আলোর ঝলক দেখা গেল বারবার। ওদের ফটো উঠতে লাগল।

দোকানের কাছে যেতেই জিশানকে ঘিরে ভিড় জমে গেল। ওকে একবার ছোঁয়ার জন্য লোকজন পাগলামি শুরু করে দিল। টুকটুকি দোকান থেকে একটা কেক নিয়ে জিশানকে দিল ঃ 'কাকু, এটা খেয়ে নাও—প্লিজ!'

জিশান ছোট মেয়েটার চোখের দিকে তাকাল। ওর চোখে মায়ের মমতা।

জিশান 'না' বলতে পারল না। কেকটা খেতে লাগল। তখনই কে একজন একটা জলের বোতল বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে।

জিশান জল খেল। তখনই ওর প্লেট টিভির দিকে চোখ গেল। দোকানের একটা দেওয়ালে প্রকাণ্ড মাপের প্লেট টিভি। সেখানে জিশানকে দেখা যাচ্ছে। চারপাশে মানুষজনের ভিড়।

টিভির কমেন্টেটর তখন বলছেন, '...আপনারা দেখুন, একটা ছোট্ট মেয়ে ওর ''জিশানকাকু''-কে একটা কেক খাওয়াল। আমরা এই মেয়েটিকে তিরিশ হাজার টাকা রিওয়ার্ড দেব। যারাই আমাদের সুপারহিরো জিশানকে সাপোর্ট দেবে, হেল্‌প করবে, তাদের জন্যে রয়েছে নানা অ্যামাউন্টের প্রাইজ মানি। ওয়েল ফোক্‌স, আর-একটু পরেই শুরু হবে কিল গেমের অ্যাকশন...।'

নিজেকে টিভির পরদায় লাইভ টেলিকাস্টে দেখতে পেয়ে জিশানের বেশ মজা লাগছিল। ও ঝুঁকে পড়ে এক হ্যাঁচকায় কাঞ্চনকে কোলে তুলে নিল। সঙ্গে -সঙ্গে টিভির পরদায় সেই ছবি চলে এল। ছবির পাশাপাশি ধারাবিবরণী।

'দেখুন—আপনারা জিশানকে দেখুন! কী পারফেক্ট! কী সাংঘাতিক কুল!' এবার কমেন্টেটরকে দেখা গেল। চশমা চোখে পোড়খাওয়া একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক। কপালে ভাঁজ, মাথায় টাক। গলায় একটা সোনার চেন। তাঁর পাশেই বসে আছে অল্প পোশাকের একজন তরুণী। মুখে চড়া মেক-আপ।

কমেন্টেটর তখন বলছিলেন, 'আমার পাশেই বসে রয়েছেন কিল গেম আরকাইভের সিইও শবনম। ঠিক-ঠিক সময়ে শবনম আপনাদের পুরোনো কিল গেমের নানান ক্লিপিংস দেখাবেন, যাতে পুরোনো কিল গেমের সিচুয়েশানের সঙ্গে আপনারা নতুন কিল গেম—মানে, জিশানের কিল গেম কমপেয়ার করতে পারেন...।

'এখন তাকিয়ে দেখুন, জিশানের মুখে কী সুন্দর স্নেহ আর মমতা মাখানো। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ওর বছর দেড়েকের একটা ছেলে রয়েছে—ভালো নাম অর্কনিশান। আর ডাকনাম শানু। দেখুন, দেখুন, কোলে তুলে নেওয়া বাচ্চা ছেলেটিকে জিশান কীভাবে আদর করছে। অথচ....অথচ এই জিশান—জিশান পাল চৌধুরী—একটু পরেই হয়ে উঠবে নির্মম, নিষ্ঠুর। ঠান্ডা মাথায় ও তখন কিল গেমের তিন-তিনজন কিলারের সঙ্গে সশস্ত্র মোকাবিলা করবে।

'আটটা বাজতে এখন পাঁচমিনিট। আর পাঁচমিনিট পরেই খুনিরা পা রাখবে গেম সিটিতে। শুরু হবে ইঁদুর আর বেড়ালের লড়াইয়ের খেলা। কিন্তু কে ইঁদুর আর কে বেড়াল সেটাই প্রশ্ন। এখন নিচ্ছি একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি। চারমিনিট পরেই আবার ফিরে আসছি। টিভির সামনে থেকে কোথাও যাবেন না, প্লিজ...।'

শুরু হয়ে গেল বিজ্ঞাপন।

জিশান ঘড়ির দিকে তাকাল। আটটা বাজতে চার মিনিট।

না, আর দেরি করা যাবে না। কাঞ্চনকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। আকাশের দিকে তাকাল। ঝকঝকে নীল আকাশ। তবে তার পশ্চিমদিকে হালকা মেঘের চাদর। বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া। জিশানের শ্বাস নিতে ভালো লাগছিল।

ও চারপাশের ভিড়ের দিকে তাকাল। মানুষগুলোকে দেখেও ওর ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে ও জীবনের অনেক কাছাকাছি রয়েছে।

কিন্তু না। এখনই ওকে মোটরবাইকে চড়ে ছুট লাগতে হবে। আর এই মানুষগুলোও দৌড়ে চলে যাবে ওদের বাড়ি কিংবা দোকানের ভেতরে—ওদের নিরাপদ আশ্রয়ে।

ঝুঁকে পড়ে কাঞ্চন আর টুকটুকির মাথায় চুমু গেল জিশান। আর তারপরই দৌড়ল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ওর বাইকের দিকে।

ভিড় থেকে দু-তিনজন চিৎকার করে বলল, 'জিশান, আমরা তোমার পাশে আছি। আমরা তোমার ফ্যান!'

ততক্ষণে জিশানের বাইক ছুটতে শুরু করেছে।

কিন্তু কিছুটা পথ গিয়েই একটা ফাঁকা মাঠে পৌঁছে গেল। ধু-ধু প্রান্তর। ঢেউখেলানো উঁচু-নীচু মাঠ। আর কোথাও সবুজ ঘাস, কোথাও ধুলো আর মাটি। এ ছাড়া কয়েকটা বড়-বড় গাছ—এদিক-ওদিক ছড়িয়ে।

ঘড়ির কাঁটায় আটটা বেজে এক মিনিট।

বাইক থামাল জিশান। বাইকের আওয়াজ থেমে যাওয়ামাত্রই চারপাশে স্তব্ধতা নেমে এল। শুধু বহুদূর থেকে ভেসে আসা কয়েকটা পাখির ডাক।

বাইকের কেরিয়ার থেকে অপটিক্যাল ট্যাবলেট বের করল জিশান। তারপর ট্র্যাকার অন করল।

ওই তো দেখা যাচ্ছে তিনটে লাল ডট! যে-দরজা দিয়ে জিশান গেম সিটিতে ঢুকেছিল সেই দরজা দিয়েই তিনজন কিলার গেম সিটিতে ঢুকেছে। তবে তিনটে ডট এখনও খুব কাছাকাছি। তার মানে, ওরা হয়তো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে গেম প্ল্যান তৈরি করছে।

জিশান টাচ স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়াল। লাল ডট তিনটে যে-স্কোয়ার টাইলের মধ্যে ছিল সেটা বড় হয়ে ক্লোজ আপ ভিউ দেখাল।

জিশান ঠিকই ভেবেছে। গেম সিটিতে ঢুকে ওরা এখন পিচের রাস্তায় রয়েছে। ট্র্যাকারে জিশানের সবুজ ডটটা ওরা দেখতে পাচ্ছে। হয়তো ভাবছে, রাস্তায় পার্ক করা গাড়ি আর বাইকগুলোর মধ্যে কোনটা নেবে এবং ক'টা নেবে।

ইস, জিশানের সঙ্গে একটা প্লেট টিভি থাকলে ভালো হত! ও সরাসরি কিলারদের দেখতে পেত। ওরা কোন অস্ত্র ব্যবহার করতে চলেছে সেটাও জানতে পারত।

আপনমনেই মাথা নাড়ল জিশান। নাঃ, একটা প্লেট টিভি দরকার। কিন্তু কীভাবে সেটা পাওয়া যায়?

আচ্ছা, একটু আগেই যেসব মানুষজনের সঙ্গে ওর দেখা হল তাদের

কাছে চাওয়া যায় না? একটা ছোট টিভি চাইলে জিশানকে ওরা দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে।

জিশান বাইক ঘোরাল। এখন শুধু দরকার স্পিড...স্পিড।

●

ধু-ধু ফ্লাইওভারের ঠিক মাঝখানটিতে পৌঁছে মোটরবাইক থামাল জিশান।

বেলা বেড়েছে। রোদ অনেক চড়া হয়েছে। বাতাস বইছে। জিশানের লম্বা চুল উড়ছে।

ফ্লাইওভারের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। অনেক নীচে ঠান্ডা জলের নদী। কুলকুল করে বয়ে চলেছে। দেখলেই মনে হয়, এ জগতে সবকিছু শান্তি-কল্যাণ হয়ে আছে।

ফ্লাইওভার বরাবর দু-দিকে তাকাল। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ফ্লাইওভারের মাঝখানটা কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু হওয়ায় নজর চালানোর সুবিধে হয়েছে। বাইক নিয়ে গেম সিটির সর্বত্র দুরন্ত ছুটোছুটি না করে কোথাও-কোথাও বাইক দাঁড় করিয়ে চুপচাপ বিশ্রাম নেওয়াটা অনেক বেশি কাজের। তাতে হাঁপিয়ে যাওয়া শরীরে নতুন শক্তি ফিরে আসে। আর একইসঙ্গে কিল গেমের সময়টাকে ধীরে-ধীরে পার করে দেওয়া যায়। তবে মাঝে-মাঝেই ট্র্যাকারের দিকে লক্ষ রাখতে হচ্ছে—কিলারদের কাছ থেকে জিশানের দূরত্ব খুব বেশি কমে না যায়।

নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর চোখ মেলে দিল জিশান। কী নাম এই মিষ্টি নদীটার? কে জানে! যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধু গাছপালা। তারই মাঝে হঠাৎ করে মাথাচাড়া দিয়েছে দুটো পাথুরে পাহাড়। আবার ডানদিকে চোখ সরালেই চোখে পড়ছে ঘর-বাড়ি—যে-ঘর-বাড়িগুলো শুধু আজকের জন্য মানুষে-মানুষে জমজমাট। কাল সকালের পর আবার সব ফাঁকা! তখন এই গেম সিটিটা খাঁ-খাঁ করবে।

আকাশে কয়েকটা চিল উড়ছিল। ওরা বাঁশি বাজনোর শব্দ করে ডাকছিল। সেদিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল জিশান। হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তারপর বাইকের কেরিয়ার থেকে ট্র্যাকারটা বের করে নিল।

ওই তো তিনটে লাল ডট! একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

জিশান বুঝতে পারল, তিনজন কিলার কী করতে চাইছে। ওরা তিনদিক থেকে সবুজ ডটটাকে ঘিরে ফেলতে চাইছে। যাতে সবুজ ডটটা সবসময় তিনটে লাল ডট দিয়ে তৈরি ত্রিভুজের মধ্যে থাকে। তারপর তিনটে লাল ডট ক্রমশ ত্রিভুজটাকে মাপে ছোট করতে থাকবে। একসময় লাল ডটগুলো হিংস্রভাবে সবুজের ঘাড়ে এসে পড়বে।

ফ্লাইওভারের যা কো-অর্ডিনেট তাতে লাল ডটগুলো এদিকটায় সরে আসতে বেশ সময় নেবে। আর যদি আচমকা ওরা এসেও পড়ে তা হলে জিশান ফ্লাইওভারের উত্তর দিকের রাস্তা ধরে নেমে আসবে। ফ্লাইওভার শেষ হওয়ার পাঁচ-ছ' হাত পরেই একটা কাঁচা রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে বাঁ-দিকে। তারপর সোজা ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে। জিশান সেই কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়বে জঙ্গলে—গাছপালার আড়ালে গা-ঢাকা দেবে।

এবার টিভিটা একবার সুইচ অন করে দেখা যাক।

যে-প্লেট টিভিটা গেম সিটির 'সিটিজেন'রা জিশানকে হইহই করে গিফ্‌ট করেছে সেটার মাপ মাত্র আট ইঞ্চি। জিশান ইচ্ছে করেই সবচেয়ে ছোট মাপের টিভিটা চেয়েছে। ওটা দেখারও সুবিধে, ক্যারি করাও সুবিধে।

বাইকের কেরিয়ার থেকে আবার প্লেট টিভিটা বের করে নিল জিশান। তারপর সুইচ অন করল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রঙিন ছবি ফুটে উঠল টিভিতে। আর সেই ছবি দেখামাত্রই জিশান হতবাক হয়ে গেল।

কারণ, টিভির পরদায় তখন অপাশি কানোরিয়াকে দেখা যাচ্ছে। নিষ্পাপ, গোলগাল ফরসা মুখ। গাল আর থুতনিতে হালকা দাড়ি। এই খুনিকে জিশান টিভির পরদাতে আগেও দেখেছে। কিল গেমের তিনজন কিলারের পরিচয় নিয়ে যখন কম্পিটিশন চলছিল তখন।

সেই প্রতিযোগিতার শেষে দুজন কিলারের পরিচয় দর্শকদের জানানো হয়েছিল। আর তিন নম্বর কিলারের পরিচয় গোপন রাখা হয়েছিল—শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে। ফলে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়নি, আর পুরস্কারও মুলতবি রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিল গেমের সময়েই তিন নম্বর কিলারকে প্রথম দেখা যাবে, আর তখনই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিজেতাদের নাম টিভিতে ঘোষণা করা হবে। সারপ্রাইজ।

না, এসব ব্যাপারের জন্য জিশান অবাক হয়নি। কারণ, এসব তথ্য ওর আগে থেকেই জানা।

ও অবাক হয়েছে, কিলার অপাশি কানোরিয়ার হাতে একটা স্যাটেলাইট ফোন দেখে। যে-ফোনে অপাশি এখন কথা বলছে আর-একজন কিলার সুখারাম নস্করের সঙ্গে।

তিনজন খুনি যে নিজেদের মধ্যে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করবে এ-কথা শ্রীধর পাট্টা জিশানকে জানাননি। কারণ, সারপ্রাইজ!

জিশান বুঝতে পারল, স্যাটেলাইট ফোনের একটানা সাহায্য নিয়ে তিনটে লাল ডট অত্যন্ত সাবলীলভাবে সবুজ ডটের নিখুঁত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর জিশানের স্যাটেলাইট ফোনটা শুধুমাত্র শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে কথা বলার জন্য।

অনেকটা যেন শ্রীধর আর ওর মধ্যে ইন্টারকম ফোন।

কিলার অপাশি গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়ি চালাতে-চালাতেই ফোনে কথা বলছিল।

আর কিলার সুখারাম একটা চলন্ত বাইকের পিঠে বসে আছে। লাল আর কালো রঙের বাইক। বাঁ-হাতে একটা হাতল ধরে রয়েছে। ডানহাতে ফোন।

টিভিতে ধারাবিবরণী চলছিল।

পোড়খাওয়া মোটাসোটা কমেন্টেটর তখন বলছেন, 'কিলারদের কথাবার্তা আমরা ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না, তবে ওদের প্ল্যানটা মোটামুটি গেস করা যাচ্ছে। ওরা জিশানকে ট্রায়াঙ্গুলার ট্র্যাপে ফেলতে চায়। তাড়াহুড়োর কোনও ব্যাপার নেই...ওদের হাতে এখনও অনেক সময় আছে...।'

এবার টিভির ক্যামেরা অপাশি কানোরিয়ার সিটের ওপরে ফোকাস করল।

কানোরিয়ার পাশেই সিটের ওপরে রাখা আছে কয়েকটা অস্ত্র। তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের বন্দুক। রিভলভারের চেয়ে মাপে একটু বড়, তবে নলটা একটু বেশি মোটা আর লম্বা। ধারাভাষ্যকার অস্ত্রটার পরিচয় দিল ঃ মিসাইল গান। এ থেকে যে-বড় মাপের বুলেট বা শেল বেরোয় সেটা ইনফ্রারেড রশ্মির উৎস লক্ষ্য করে ছুটে যায়। জীবন্ত মানুষের শরীর হল তাপের উৎস। সেই উৎস থেকে অবলোহিত রশ্মি বেরোয়। ফলে আঁকাবাঁকা পথে ছুটে পালানো একজন মানুষকে এই মিসাইল গানের বুলেট আঁকাবাঁকা পথে তাড়া করে হিট করতে পারে।

মিসাইল গানের পাশেই রয়েছে নানান মাপের তিনটে চপার। কানোরিয়ার 'বাউন্ডারি' মারার 'ব্যাট'। কিন্তু আজ ওর সামনে বাউন্ডারি মারার সুযোগ নেই। আজ শুধু জিশান—মানে, একটা 'শর্ট রান'। কিন্তু এই শর্ট রান নিতে গেলে শত্রুর কাছে পৌঁছতে হবে। দুশমনটাকে পেতে হবে চপারের নাগালে।

কানোরিয়া সম্পর্কে টিভিতে অনেক কথাই শুনেছে জিশান। জেনেছেও অনেক কথা। কিন্তু সেইসব ভয়ংকর তথ্য জানার পরেও ওর কোনও হেলদোল হয়নি। কারণ, ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা জিশানের মধ্যে থেকে কয়েক মাস আগেই উধাও হয়ে গেছে।

কিলার অপাশির সঙ্গে কিলার সুখারামের ফোনে কথাবার্তা চলছিল। টিভি ক্যামেরা পালা করে একবার একে আর-একবার ওকে দেখাচ্ছিল—ঠিক সিনেমার মতন।

ছোটমাপের এই প্লেট টিভিটা হাতে না পেলে জিশান খুনিদের স্যাটেলাইট ফোনের ব্যাপারটা জানতেই পারত না। ভাগ্যিস একটা টিভি জোগাড় করার কথা ওর মনে হয়েছিল!

টিভির খোঁজ করতে কাঞ্চন আর টুকটুকিদের বাড়ির কাছেই আবার ফিরে গিয়েছিল জিশান। ওকে ফিরে আসতে দেখে জনতা হইহই করে উঠেছিল। ওর মোটরবাইক ঘিরে ধরেছিল চোখের পলকে।

দু-হাত তুলে ওদের হুল্লোড় আর উৎসাহ থামিয়ে একটা ছোট টিভির জন্য আবেদন করেছিল জিশান। ব্যস, তাতেই কাজ হল। এক মিনিটের মধ্যেই নানান মাপের ছ'-ছ'টা প্লেট টিভি এসে হাজির হল ওর সামনে। তার মধ্যে থেকে আট ইঞ্চি ডায়াগনালের ছোট প্লেট টিভিটা জিশান বেছে নিয়েছিল।

জিশান আর দেরি করল না। ট্র্যাকার আর টিভি গুছিয়ে রেখে বাইকে স্টার্ট দিল। ফ্লাইওভার পেরিয়ে বাঁ-দিকের ঢালু রাস্তা ধরে নেমে গেল।

একটু পরেই জঙ্গল শুরু হয়ে গেল। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে প্যাঁচালো সুঁড়িপথ। তার ওপর পথটা আবার ডাল, পাতা আর আগাছায় ঢাকা। তারই ওপর দিয়ে জিশানের বাইক কোনওরকমে এগিয়ে চলল।

বাইকের গর্জনে গাছে বসে থাকা পাখিরা চঞ্চল হয়ে ডাকতে লাগল, ডানা ঝাপটে এ-গাছ থেকে ও-গাছে ওড়াউড়ি করতে লাগল। ছোট চেহারার গোলাপি বানরের দল চি-চি শব্দ করে ডালে-ডালে ছোটাছুটি করতে লাগল। ছাইরঙের দুটো খরগোশ চমকে উঠে ছুটে পালাল।

জিশান বেশ বুঝতে পারছিল, বাইকের শব্দটা ওর শত্রু। এই নির্জন শহরে বহু দূর থেকে ওর বাইকের আওয়াজ শোনা যাবে। তা ছাড়া বাইকটা কোথাও রেখে ও যে কোনও একটা গোপন আস্তানায় লুকিয়ে পড়বে তারও উপায় নেই। ট্র্যাকারের সবুজ ডট ওর নিখুঁত কো-অর্ডিনেট শত্রুদের জানিয়ে তো দেবেই, উপরন্তু ওর ছেড়ে যাওয়া বাইকটা নিঃশব্দ চিৎকারে জানিয়ে দেবে যে, ও কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়ে আছে।

তা হলে শত্রুদের চোখে ধুলো দেওয়ার উপায় কী?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে জিশান বোধহয় একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই ও দূরে গাছের আড়ালে দুটো হরিণ দেখতে পেল। হরিণ দুটোর গায়ের রং সোনালি-বাদামি আর সাদা। পেটের কাছ বরাবর লম্বা গাঢ় বাদামি দাগ। মোটরবাইকের আওয়াজে ওরা চমকে তাকিয়েছে জিশানের দিকে। তারপরই জঙ্গলের মধ্যে ছুট লাগিয়েছে।

জিশান বাইক থামাল। আর কতক্ষণ ও এই বাইকটা নিয়ে ছুটবে? কারণ, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়তো এই মেশিনটার তেল ফুরিয়ে যাবে। তখন?

জিশানের বিভ্রান্ত লাগল। নানান চিন্তা ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

একটু পরেই ট্র্যাকারটা বের করে দেখল ও। একটা লাল ডট ওর সবুজ ডটের বেশ কাছে এসে গেছে। সেটা কে? অপাশি কানোরিয়া? না সুখারাম

নম্বর? নাকি তিন নম্বর কিলার?

আর ভাবার দরকার নেই। ট্র্যাকার উলটে অপটিক্যাল ট্যাবলেট দেখল। ওর মনে হল, ঘর-বাড়ির এলাকায় গেলেই ওর লড়াইয়ের কাজটা সহজ হবে। সুতরাং ও সেদিকে বাইক ছুটিয়ে দিল।

কিছুটা পথ চলার পরই জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল। জায়গাটা গাছের পাতায় ঢাকা। টাটকা আর শুকনো গাছের পাতা কেউ যেন সেখানে ঝেঁটিয়ে এনে জড়ো করেছে।

জিশান বাইক চালাতে-চালাতেই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময়েই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

ওর বাইক চলে এসেছিল গাছের পাতায় ঢাকা জায়গাটার ওপরে। আর সঙ্গে-সঙ্গে গাছের পাতাগুলো চোরাবালির মতো বাইকসমেত জিশানকে গিলে ফেলল।

জিশান নীচের দিকে পড়তে লাগল। গাছের পাতাগুলো বৃষ্টির মতো ওর শরীরের ওপরে ঝরে পড়ছিল। একটু পরেই নরম মাটিতে ও বাইকসমেত আছড়ে পড়ল। এবং বাইক থেকে ছিটকে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কোমরে ব্যথা। ডানহাতের কনুইয়েও সামান্য লেগেছে। গা থেকে কয়েকটা শুকনো পাতা ঝেড়ে ফেলল ও। বাইকটাকে সোজা করে দাঁড় করানোর আর চেষ্টা করল না। কারণ, বাইক নিয়ে এই গর্ত থেকে বেরোনোর কোনও গল্প নেই।

গর্তটা অনেকটা গন্ডার বা হাতি শিকারের ফাঁদের মতো। শুধু গর্তের নীচে শূলের মতো কাঠের গজাল পোঁতা নেই এই যা! কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এরকম ফাঁদের ব্যবস্থা কেন?

ঠিক সেই মুহূর্তে জিশানের স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল।

ফোন ধরল জিশান। শ্রীধর পাত্রা।

'এই গর্তটা সারপ্রাইজ, জিশান। গেম সিটিতে এরকম আরও অনেক সারপ্রাইজ তোমার জন্যে ওয়েট করছে...।'

জিশান বিরক্তভাবে 'থ্যাংক য়ু ভেরি মাচ' বলে ফোন কেটে দিল। এখন এই সাইকোপ্যাথটার সঙ্গে বাজে বকার সময় নেই। আগে এই গর্তটা থেকে বেরোনো দরকার। কে জানে, হয়তো কোনও কিলার এই মুহূর্তে ওকে খতম করতে গর্তটার দিকেই এগিয়ে আসছে। প্লেট টিভিটা একবার দেখা যাক। সেই সঙ্গে ট্র্যাকারটাও।

পড়ে থাকা বাইকের কেরিয়ারের দিকে হাত বাড়াল। যন্ত্র দুটো এখনও ঠিকঠাক আছে তো!

ট্র্যাকারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল জিশান। একটা লাল ডট সবুজ ডটের মারাত্মক কাছাকাছি। সঙ্গে-সঙ্গে ট্র্যাকার রেখে প্লেট টিভি অন করল।

পরদায় অপাশি কানোরিয়ার মুখ। কী যেন একটা করছে ও।

একটু পরেই দেখা গেল ও কী করছে। একটা বড়সড় জেরিক্যান থেকে জলের মতো কী যেন ঢালছে জঙ্গলের ঘাস-পাতার ওপরে। একটু দূরে একটা মোটরবাইক দাঁড় করানো রয়েছে।

কমেন্টেটর তখন বলছেন, 'ফোক্স, শিকার আর শিকারি এখন অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। পরিভাষায় যাকে বলে স্ট্রাইকিং ডিসট্যান্স। জিশানকে জঙ্গলের মধ্যে ট্র্যাক করার জন্যে কিলার অপাশি কানোরিয়া একটু আগেই গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মোটরবাইক নিয়েছে। এখন ও বাইক থেকে নেমে অভিনব অপারেশান শুরু করেছে। জেরিক্যান থেকে অপাশি কী একটা লিকুইড যেন ঢালছে...।'

তখনই পেট্রলের গন্ধ পেল জিশান। শুকনো গাছের পাতা ভেজাতে-ভেজাতে তরল জ্বালানি নেমে আসছে গর্তের ভেতরে। জিশানের মরণকূপে। এরপর শুধু দরকার একটা দেশলাই-কাঠি।

অপাশি তা হলে অস্ত্র হিসেবে পেট্রল ভরতি কয়েকটা জেরিক্যানও নিয়েছিল!

জিশান ক্ষিপ্রগতিতে ট্র্যাকার আর টিভি ঢুকিয়ে দিল ওর রুকস্যাকে। তারপর হাঁচড়পাঁচড় করে গর্ত বেয়ে উঠে আসতে চাইল। কিন্তু বারবার হাত-পা স্লিপ করতে লাগল। তবে চারবারের চেষ্টায় খানিকটা উঠতে পারল। আর তখনই পেট্রলের ভেজা পথ ধরে আগুনের লকলকে শিখা ছুটে এল গর্তের দিকে।

জিশান একটা গাছের শিকড় ধরে এক হ্যাঁচকায় শরীরটাকে টেনে তুলল ওপরে। তখনই দাউদাউ শিখা ডিঙিয়ে অপাশি কানোরিয়াকে দেখতে পেল। নির্বিকার শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে লম্বা একটা চপার। তার চকচকে ফলা থেকে কমলা রঙের আগুনের ছায়া ঠিকরে বেরোচ্ছে। অপাশির বেশ কিছুটা পিছনে দাঁড় করানো রয়েছে একটা মোটরবাইক।

আগুনের তাপ আর শিখায় ভয় পেয়ে গেল গাছের পাখিরা। ওরা গাছের আশ্রয় ছেড়ে ছিটকে গেল আকাশে। একটা খরগোশ আর একটা বনবেড়াল কোন আড়াল থেকে বেরিয়ে দিগভ্রান্তের মতো ছুট লাগাল।

জিশানও ঘাবড়ে গিয়ে ছুটতে শুরু করল। বিদ্যুৎঝলকের মতো ওর মনে পড়ল, অপাশি কানোরিয়ার ফেরোসিটি কোশেন্ট 9.4।

'জিশা—ন!' বলে মিহি গলায় ডেকে উঠল অপাশি। আর একইসঙ্গে আদিবাসী যোদ্ধাদের ক্ষিপ্রতায় ওর হাতের চপারটা জিশানকে লক্ষ্য করে ছুড়ে

দিল। ইস্পাতের অস্ত্রটা শূন্যে লাট খেয়ে তিরবেগে ছুটে এল জিশানের দিকে।

ছুটতে-ছুটতেই জিশান আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে। চপারটা ওর শরীরের ইঞ্চিছয়েক ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। গেঁথে গেল একটা গাছের গুঁড়িতে। থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আবার উঠল জিশান। আবার ছুট। গাছপালার আড়ালে-আড়ালে, এঁকেবেঁকে। নাকে আসছে গাছ-পাতা পোড়ার গন্ধ। সেইসঙ্গে শরীরে টের পাচ্ছে গরম বাতাসের ছোঁয়া।

ছুটতে-ছুটতেই পকেটে হাত ঢোকাল। টেনে বের করে নিল মিসাইল গান। থমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অপাশিকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। এক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে অপাশি সরে গেল একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে। ও যে শুধু সেজন্য বেঁচে গেল তা নয়। এখানে-সেখানে আগুন তখনও জ্বলছিল। ফলে মিসাইলের ইনফ্রারেড ট্র্যাকিং সিস্টেম বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। মিসাইলটা জলন্ত গাছ-পাতার আগুনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এ-অঞ্চলের বাড়ি-ঘরগুলো কোনদিকে আছে জিশানের সেটা ভালোই আন্দাজ ছিল। ও মোটামুটি সেদিক লক্ষ্য করেই দৌড়তে লাগল। এক্ষুনি আর-একটা মোটরবাইক ওর দরকার। এক্ষুনি।

পিছন থেকে অপাশির মোটরবাইক স্টার্ট করার শব্দ কানে এল। সঙ্গে-সঙ্গে জিশান দৌড়ের গতি আরও বাড়িয়ে দিল। ও এটুকু বুঝেছিল, গাছপালার গোলকধাঁধার মধ্যে অপাশি কখনই খুব জোরে বাইক ছোটাতে পারবে না।

একটু পরেই জিশান বেরিয়ে পড়ল ফাঁকা রাস্তায়।

বেলা প্রায় দশটা। কংক্রিটের রাস্তা রোদে ঝকঝক করছে। রাস্তার দুপাশে ফুলের বাগান। তাতে ছবির মতো ফুল। সেই ফুলের টানে বেশ কয়েকটা প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে।

রাস্তা ধরে একটু এগোতেই বেশ কিছু দোকানপাট আর অনেকগুলো বাড়ির ব্লক। বাড়িগুলোর সামনে সার বেঁধে গাড়ি আর বাইক পার্ক করা রয়েছে।

জিশান ছুটতে-ছুটতে একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কংক্রিটের রাস্তা ধরে অপাশির বাইক ছুটে আসছে।

শ্রীধরের কথা জিশানের মনে পড়ল ঃ কোনও বাড়ি কিংবা দোকানের ভেতরে যদি জিশান আর কিলারদের কোনও মোকাবিলা হয় তো সেটা হবে পুরোপুরি অস্ত্রহীন মোকাবিলা। অপাশির যা চেহারা জিশান দেখেছে তাতে খালি হাতের লড়াইয়ে ও জিশানের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। সেটাই এবার পরখ করে দেখা দরকার।

জিশান ঢুকে পড়ামাত্রই বাড়িটায় হইচই হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। এ-

ঘর সে-ঘর থেকে 'জিশান! জিশান!' রব উঠল। কেউ-কেউ আনন্দে সিটি বাজাল।

কিন্তু জিশানের কোনওদিকে নজর ছিল না। ও লোকজনকে ঠেলে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'অপাশি কানোরিয়া আমার পেছনে তাড়া করে আসছে। আমি ছাদে যাচ্ছি—।'

'চারতলায়! ছাদ চারতলায়!' ওপরদিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল দুজন 'সিটিজেন'।

গেম সিটিতে যেসব 'সিটিজেন'রা আজ হাজির রয়েছে তারা প্রত্যেকেই হাজিরা দেওয়ার জন্য পুরস্কার পাবে। এ ছাড়াও নানান অ্যাক্টিভিটির জন্য রয়েছে 'সারপ্রাইজ প্রাইজ মানি'। তাই এই মানুষজনের উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই।

জিশান তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। একবার ছাদে পৌঁছতে পারলে ও অনেকটা নিশ্চিন্ত। সেখানে ও অনেকটা খোলা জায়গা পাবে। তা ছাড়া মার্শালের নিয়ম অনুযায়ী সেখানে সশস্ত্র লড়াই করা যাবে না। সুতরাং ছাদে শেষ পর্যন্ত যেটা হবে সেটা অপাশির সঙ্গে ওর হাতাহাতি লড়াই। সে-লড়াইয়ে অপাশি নস্যি।

ছাদে এসে পৌঁছল জিশান। বিশাল বড় খোলা ছাদ। আকাশের দিকে মুখ করে বুক চিতিয়ে পড়ে আছে। মাথার ওপরে সূর্য ঠিক-ঠিকভাবে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। আলো আর উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে।

জিশান ছুটে গেল বাঁ-দিকের পাঁচিলের কাছে। ঝুঁকে পড়ে নীচের রাস্তার দিকে তাকাল। অপাশি এখন কোথায়?

প্রশ্নের উত্তর দিল মিসাইল গান। অপাশি মিসাইল গান হাতে তোলার সঙ্গে-সঙ্গেই বসে পড়েছিল জিশান। তাই ছাদের পাঁচিল বর্ম হয়ে ওকে বাঁচিয়ে দিল। কিন্তু বিকট শব্দ হল। পাঁচিলের একটা অংশ ভেঙে চৌচির হয়ে খসে পড়ল। জিশান ছুটে সরে এল ছাদের ঠিক মাঝখানে। এখান থেকে ছাদের দরজার দূরত্ব অনেকটাই। ফলে অপাশি ছাদে এলে ও তৈরি হওয়ার জন্য অনেকটা সময় পাবে।

তারপর হাতাহাতি লড়াই।

রুকস্যাকটা পিঠ থেকে নামাল জিশান। চটপট ট্র্যাকার আর টিভি বের করে দেখল।

ট্র্যাকারে একটা লাল ডট সবুজ ডটের খুব কাছাকাছি। ওটা বোধহয় অপাশি কানোরিয়া। বাকি দুটো ডট তার তুলনায় মোটামুটি দূরে।

এবার টিভি অন করল জিশান। অপাশি একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে—সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। কিন্তু ওর হাতে ওগুলো কী?

শ্রীধর পাট্টা তো নিয়ম করেছেন বাড়ির ভেতরে অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে

না! কারণ, তাতে গেম সিটির 'সিটিজেন'দের বিপদ হবে। তা হলে অপাশির দু-হাতে দুটো অস্ত্র কেন? বাঁ-হাতে একটা ধারালো চপার, আর ডানহাতে টুয়েন্টি এমএম টেন শটার নিউক্লিয়ার পিস্তল।

টিভি আর ট্র্যাকার চটপট রুকস্যাকে ঢুকিয়ে নিল জিশান। পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করল। স্পিড ডায়াল মোড়ে শ্রীধর পাট্রাকে ফোন করল।

ও-প্রান্তে একবার রিং বাজতেই শ্রীধর ফোন ধরলেন।

'বলো, জিশান—হাউ আর য়ু?'

'এসব কী হচ্ছে! বাড়ির মধ্যে আর্মস নিয়ে ঢুকেছে অপাশি। গেমের রুলে তো এটা বারণ ছিল!'

'সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ!' ও-প্রান্তে চিবিয়ে হাসলেন শ্রীধর ঃ 'তা ছাড়া কানোরিয়া বিল্ডিং-এ শুধু আর্মস নিয়ে ঢুকেছে—ইউজ তো করেনি। তাই অফিশিয়ালি ও এখনও ক্লিন। আর সেকেন্ড পয়েন্টটা হল, তোমাদের মোকাবিলা যদি হয় তো সেটা হবে ছাদে। সেটাও অফিশিয়ালি "বাড়ির ভেতরে" হল না।' শ্রীধর ছোট করে দুবার কাশলেন ঃ 'সুতরাং এসব ছোটখাটো ইস্যু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে লড়াই করো, জিশান। ফাইট। সারভাইভ।' আচমকা ফোন কেটে দিলেন শ্রীধর।

আর তখনই জিশান টিভিতে দেখতে পেল, অপাশি ছাদের দরজা ডিঙিয়ে ছাদে পা দিচ্ছে। টিভি থেকে চোখ সরিয়ে সামনে তাকিয়েও দেখতে পেল একই দৃশ্য।

সঙ্গে-সঙ্গে রুকস্যাকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিশান। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা মিনি গ্রেনেড বের করে নিল। তারপর শোওয়া অবস্থাতেই সেটার পিন দাঁতে টেনে অপাশিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল।

জিশানকে অবাক করে ওই মোটা শরীর নিয়েও অপাশি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় বাঁ-দিকে লাফিয়ে পড়ল। নিউক্লিয়ার পিস্তল ফায়ার করল জিশানকে তাক করে।

আপেক্ষিক গতিবেগের জটিলতায় স্বাভাবিক কারণেই অপাশির নিশানা তাকছুট হয়ে গেল। আর জিশানের মিনি গ্রেনেডও অপাশির গায়ে লাগেনি। তবে বিকট শব্দ, আগুন আর ধোঁয়া বাড়ির সবাইকে বিস্ফোরণের খবর পাঠিয়ে দিল।

অপাশি তখনও ছাদের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর জিশান সবে হাঁটুগেড়ে উঠে বসেছে। হঠাৎই ছাদের দরজা দিয়ে পাঁচ-ছ'জন 'সিটিজেন' ঢুকে পড়ল খোলা ছাদে। ওরা ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে অপাশির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওকে এলোপাতাড়ি কিল-চড়-ঘুসি মারতে লাগল।

ওদেরই মধ্যে দুজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'জিশান, পালাও! পালাও!'

জিশান রুকস্যাকটা তুলে নিয়ে ছুট লাগাল ছাদের দরজার দিকে।

সিঁড়ি নামতে-নামতে জিশান সদ্য-হওয়া অভিজ্ঞতাটার কথা ভাবছিল। এই আবেগমাখানো সমীকরণটার কথা নিশ্চয়ই শ্রীধর পাট্রা ভাবতে পারেননি। জিশানের পাবলিক ইমেজ আসল জিশানের চেয়ে বোধহয় অনেক বড়। নইলে এইরকম নিয়ম-ভাঙা ঘটনা কখনও ঘটে!

শ্রীধরকে ফোন করে জিশানের বলতে ইচ্ছে করল, 'সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ!'

দোতলা থেকে একতলার দিকে নামতে-নামতে টিভির ধারাবিরণী কানে এল ওর : 'আশ্চর্য! অবাক কাণ্ড! চমকে দেওয়া ঘটনা। গেম সিটির ছ'জন "সিটিজেন" কিলার অপাশির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে প্রবল পেটাচ্ছে। জিশানকে ওরা নিউক্লিয়ার পিস্তলের মুখ থেকে কান ঘেঁষে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আপনারা তো জানেন, বন্ধুগণ, কিল গেমের দিন গেম সিটিতে যেসব মক "সিটিজেন" হাজির থাকে তারা প্রত্যেকেই পুরস্কার হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা পায়। কিন্তু এই মুহূর্তে জিশানকে বাঁচানোর জন্যে ওরা প্রত্যেকে কুড়ি হাজার টাকা করে বোনাস পুরস্কার পাবে। কিল গেম জমে উঠেছে, বন্ধুগণ—দারুণ জমে উঠেছে...।'

বাড়িটা থেকে বেড়িয়ে এসেই আবার ছুট, ছুট, ছুট। একটা মোটরবাইক চাই। এক্ষুনি। ওই তো, দেখা যাচ্ছে!

রাস্তা পেরিয়ে জিশান ছুটে গিয়ে চড়ে বসল একটা মোটরবাইকে। পুশবাটন স্টার্ট দিতেই বাইকটা গর্জন করে উঠল। সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে অল্প ধোঁয়া বেরোল। তারপর 'হুউশ' করে ছুটে গেল সামনের দিকে।

নিউক্লিয়ার পিস্তল আর চপারের ভয় দেখিয়ে অপাশি 'সিটিজেন'দের জটলা থেকে কোনওরকমে বেরিয়ে এল।

রাগে ওর ভিতরটা গরগর করছিল। তিনতলার একটা ঘরের ভিতর থেকে টিভির আওয়াজ ছুটে আসছিল : 'অপাশি কানোরিয়া ব্যর্থ হয়েছে। দ্য সুপার কিলার হ্যাজ ফেইল্ড। এখন অপাশি সিঁড়ি দিয়ে নামছে...তাড়া করছে জিশানকে। কিন্তু মনে হয় না এ-দফায় ও কিছু করতে পারবে। কারণ, জিশান এখন বাইক নিয়ে ছুটছে...।'

কানোরিয়া ঢুকে পড়ল ঘরটার ভেতরে। সেখানে দুজন বয়স্ক পুরুষ প্লেট টিভির দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। হাতে ফ্লাফি কুকিজের প্যাকেট। ওদের হাত আর মুখ চলছিল।

একটা নোংরা গালাগাল দিল অপাশি। তারপর এক ঝটকায় টিভির কাছে গিয়ে যন্ত্রটার ওপরে চপারের কোপ বসিয়ে দিল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরোল টিভি থেকে। শর্ট সার্কিটের 'ফটফট' শব্দ হল। টিভির পরদা দপ করে আঁধার হয়ে গেল।

'সিটিজেন' দুজন ভয়ে চিৎকার করে উঠল। অপাশি সেটাকে আমল না দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল বাইরে। ওর পক্ষে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নামতে শুরু করল। জিশান—জিশানকে এখন ওর চাই। জিশানের রক্ত চাই।

জিশান বাইক ছুটিয়ে দিয়েছিল নদীর দিকে। সেখানে ফ্লাইওভার পেরিয়ে ও চলে যেতে চায় গেম সিটির পশ্চিমদিকে। সেখানে একটা বিশাল এলাকা জুড়ে ঘন জঙ্গল রয়েছে। দিনেরবেলাটা ও জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে সময়টা কাটিয়ে দিতে চায়। তারপর সন্ধে হলে, অন্ধকার নামলে, ওর লুকিয়ে থাকার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পথে বাইক দাঁড় করিয়ে ও একবার ট্র্যাকার দেখে নিয়েছে। তিনটে লাল ডটের অবস্থান এখন খানিকটা এলোমেলো। কারণ, জিশানের গতিবিধি ওদের হিসেবকে গুলিয়ে দিয়েছে। তাই ওরা চক্রব্যূহের মতো সবুজ ডটটাকে ঘিরে ধরতে পারেনি।

আরও কিছুক্ষণ বাইক ছোটানোর পর জিশানের টিভি দেখতে ইচ্ছে করল। তিনজন কিলার এখন কী করছে?

কৌতূহল মেটাতে বাইক দাঁড় করাল জিশান। টিভি বের করে অন করল।

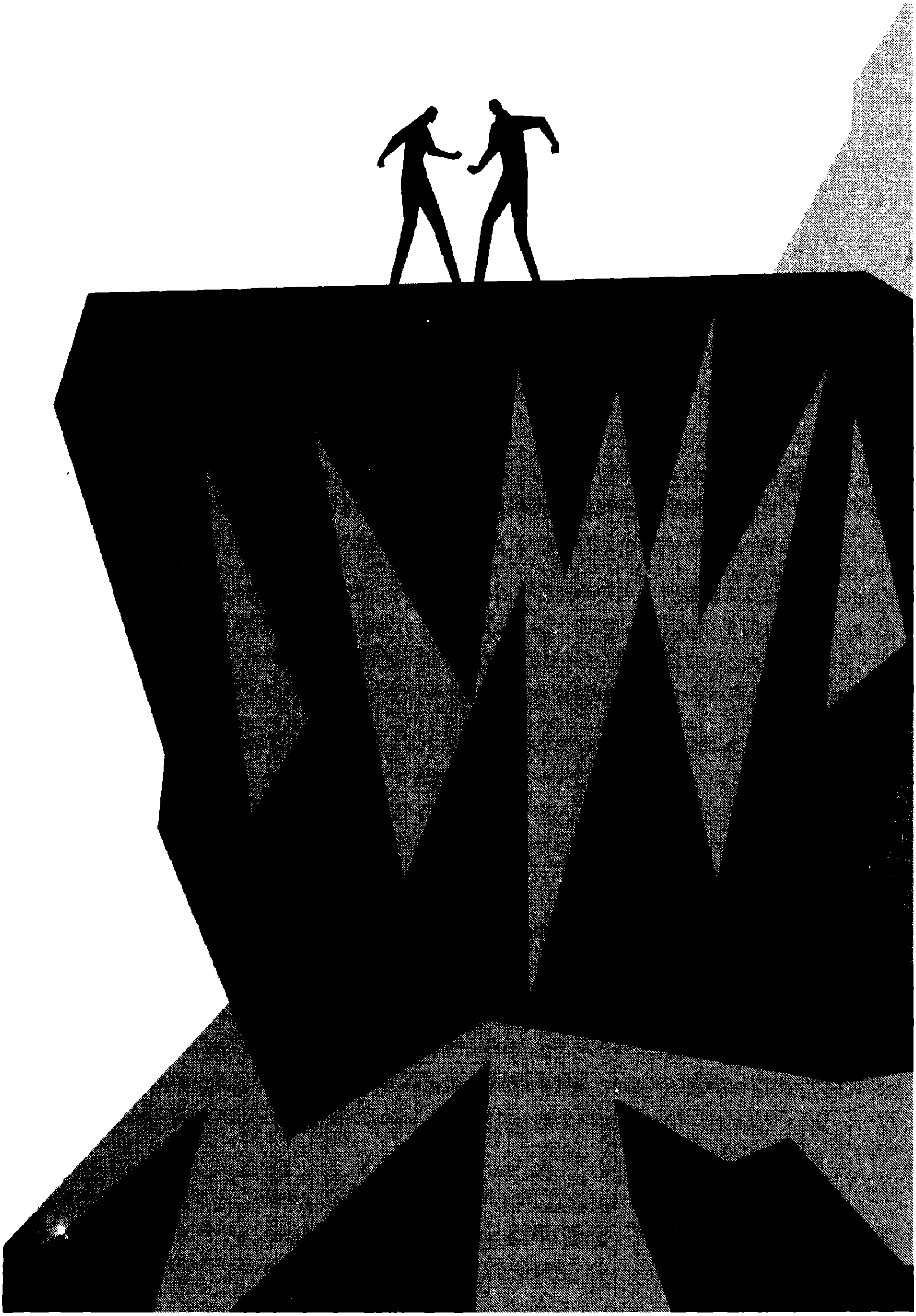
পরদায় ভেসে উঠল একটু অদ্ভুত মুখ। মুখ না বলে মুখোশ বলাটাই বোধহয় বেশি ভালো। মাথায় চুলের ধাঁচে তৈরি একটা চকচকে কালো টুপি। মাথায় এমনভাবে এঁটে বসেছে যে, সেটা আদতে টুপি নাও হতে পারে—হয়তো চুলের একটা অদ্ভুত স্টাইল। তবে দেখে মনে হচ্ছে, চুলটা প্লাস্টিক অথবা মেটালের তৈরি। কিংবা প্লাস্টিক আর মেটালের প্লাজ্মা মিক্সচার ব্যবহার করা হয়েছে।

চোখে কালো চশমা। চশমার কাচ অথবা পলিমার যেন ছোট-ছোট দুটো আয়তক্ষেত্র—চোখ দুটোকে রোদ কিংবা অন্যান্য ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। দু-কানে মেটালের মোটা রিং। ভাঙা চোয়াল। ফিনফিনে পাতলা ঠোঁট—ঠিক যেন মসৃণ চামড়াকে ব্লেড দিয়ে চিরে মুখের রেখা তৈরি করা হয়েছে।

লোকটির গায়ে পলিমারের তৈরি আঁটোসাঁটো চকচকে ফুলহাতা পোশাক—যেন দ্বিতীয় চামড়া, অনেকটা স্কুবা ডাইভারদের মতন। দু-হাতে কালো দস্তানা। পায়ে কালো স্নিকার। আর পিঠে একটা কালো রুকস্যাক।

ক্যামেরা একটু দূরে সরে যেতেই লোকটার পুরো চেহারাটা দেখা গেলঃ ছিপছিপে, লম্বা—চাবুকের মতো।

টিভির ভাষ্যকার তখন বলছে, 'বন্ধুগণ, আসুন—কিলার প্রোটনের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। প্রোটনের রক্ত ঠান্ডা, বরফের মতো। চোখের নজর দিনে শকুনের মতো, রাতে প্যাঁচার মতো, কারণ, ওর আই গিয়ারে



নাইটভিশান ইন্সট্রুমেন্ট ফিট করা আছে। ওর হাতের নখ চোখা এবং শক্ত। বাঘ এবং সাপের সঙ্গে এই নখের মিল রয়েছে, কারণ, ওই জোরালো এবং ধারালো নখের ডগায় বিষ মাখানো আছে। ওই নখের এক আঁচড়ে একটা জোয়ান মানুষ পলকে ছটফটিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

'কিলার প্রোটন এতক্ষণ ধরে জিশানের স্ট্র্যাটেজি ওয়াচ করছিল, আর নিজের স্ট্র্যাটেজি ক্যালকুলেট করছিল, তৈরি হচ্ছিল মনে-মনে। এবার কিলার প্রোটন অ্যাকশানে নেমেছে। সো কনটিনিউ ওয়াচিং দ্য কিল গেম, ফোক্‌স। খেলা ক্রমশ আরও এক্সাইটিং হয়ে উঠছে...।'

জিশান দশ-পনেরো সেকেন্ড ধরে কিলার প্রোটনকে দেখল। যে বারোজন সুপারকিলারের ছবি নিয়ে টিভিতে 'সুপারকিলার কনটেস্ট' শুরু হয়েছিল তাদের মুখগুলো জিশানের আবছাভাবে মনে আছে। কিন্তু এই মুখটা সেই বারোজনের মধ্যে ছিল বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য এই লোকটার পোশাক-আশাক মেকাপ এমন যে, আসল চেহারাটা ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

জিশানের বেশ মনে আছে, 'সুপারকিলার কনটেস্ট' প্রতিয়োগিতায় প্রথম পুরস্কার ছিল পঁচিশ লক্ষ টাকা। ওর আরও মনে আছে, কনটেস্টের বারোজন খুনির মধ্যে আটজন পুরুষ, আর চারজন মেয়ে ছিল। কিন্তু প্রোটনের সঙ্গে তাদের কোনও মিল...নাঃ, মাথা নাড়ল জিশান। টিভির সুইচ অফ করে দিল।

টিভি রুকস্যাকে রেখে আবার ট্র্যাকার দেখল জিশান। একটা লাল ডটের সঙ্গে ওর দূরত্ব বেশ কমে এসেছে। মনে হয় অপাশি মরিয়া হয়ে বাইক চালিয়ে ওকে নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছে।

ট্র্যাকার রেখে বাইক ছোটাল জিশান। রিয়ারভিউর কনভেক্স মিরারে ওর নজর বারবার ছিটকে যাচ্ছিল। নাঃ, এখনও কোনও গাড়ি বা বাইক দেখা যাচ্ছে না।

চড়া রোদে জিশান ঘামছিল। বাঁ-হাতের কবজিতে বাঁধা কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। এখনও অনেক সময় বাকি। আজ মনে হচ্ছে, সূর্য খুব ধীরে আকাশপথে হাঁটছে—সন্ধে হতে আজ অনেক দেরি হবে।

ফাঁকা রাস্তায় বাইকের গোঁ-গোঁ আওয়াজ ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল। কোথা থেকে শব্দগুলো ধাক্কা খেয়ে আবার কানে ফিরে আসছে কে জানে!

হঠাৎই রিয়ারভিউ মিরারে একটা বাইক দেখতে পেল। একটা কালো ফুটকি। ফুটকিটা ক্রমশ মাপে বড় হচ্ছিল।

জিশান অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। বাড়তি আওয়াজ তুলে ওর বাইক এক ঝটকায় আরও জোরে পিছলে গেল সামনের দিকে।

বাঁ-দিকে জঙ্গল, ডানদিকে কয়েকটা বাড়ি-ঘর। দ্রুত ছুটে যাচ্ছে পিছনে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দূরে ফ্লাইওভারটা দেখা গেল। উঁচু হয়ে

আকাশের দিকে উঠেছে।

জিশান ঠিক করল, ফ্লাইওভার পেরিয়ে ও বাঁ-দিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়বে। তারপর ট্র্যাকার দেখে ফুড পয়েন্ট বের করবে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। জল তেষ্টাও।

বাইক ফুলস্পিডে ছুটছিল। বাতাসের টুকরো দুরন্ত বেগে ছুটে এসে জিশানের মুখে গায়ে বিঁধছিল।

ফ্লাইওভারে পৌঁছে গেল জিশান। তখনই ও আকাশের দিক থেকে ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দ পেল। ওপরদিকে তাকাতেই একটা হেলিকপ্টার দেখতে পেল। অনেক উঁচুতে পাক খাচ্ছে।

তা হলে আকাশ থেকেও কিল গেমের দিকে নজর রাখার বন্দোবস্ত করেছেন শ্রীধর!

বাইক চালাতে-চালাতেই মুখ তুলে গোটা আকাশটায় চোখ বুলিয়ে নিল জিশান। উত্তরের আকাশে অনেক দূরে আর-একটা হেলিকপ্টার দেখতে পেল। এত দূরে যে, ওটার আওয়াজ ভালো করে ঠাহর হচ্ছে না। উড়ন্ত মেশিনটার আশেপাশে কয়েকটা চিল উড়ছে। অন্তত প্রক্ষিপ্ত দর্শনে আকাশের পটভূমিতে সেরকমই মনে হচ্ছে।

আকাশ থেকে চোখ সরিয়ে সামনে তাকাতেই জিশান ব্রেক কষতে বাধ্য হল। দূরে চোখে পড়ছে একটা নীল রঙের অটোমোবিল। পাগল করা গতিবেগে ফ্লাইওভারের দিকেই ধেয়ে আসছে।

কে আছে ওই গাড়িতে? কিলার সুখারাম? নাকি প্রোটন?

রিয়ারভিউ মিরারে তাকাল জিশান। ও ব্রেক কষার ফলে পিছনে ছুটে আসা ফুটকিটা এখন মাপে অনেক বড় দেখাচ্ছে। অপাশি কানোরিয়াকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। গোলগাল মোটাসোটা চেহারাটা উত্তল দর্পণে আরও মোটা আর বিকৃত দেখাচ্ছে।

ঝটিতি সিদ্ধান্ত নিল জিশান। সামনে থেকে ছুটে আসা অটোমোবিলটার সঙ্গে যদি ওর কলিশন হয় তা হলে মোটরবাইকটার আস্ত থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। তার সঙ্গে জিশানেরও।

তার চেয়ে বরং অপাশির মোটরবাইকের সঙ্গে কিছু একটা করার চেষ্টা করা অনেক ভালো।

সুখারাম নস্কর এর মধ্যেই বাইক পালটে গাড়ি নিয়েছে।

নীল গাড়িটার জানলা দিয়ে একটা আলট্রা হাই-পাওয়ার রাইফেলের নল বেরিয়ে এল। তারপর জিশানের বাইক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল কিলার সুখারাম। 'ক্র্যাক' এবং 'সাঁই' শব্দ হল। হেভিওয়েট বুলেট ছুটে গেল জিশানের দিকে।

ব্রেক কষলেও জিশান একটিবারের জন্যও বাইক থামায়নি। প্যাঁচালো পথে নকশা বুনে ফ্লাইওভারের ওপরে বাইকটাকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছিল। কারণ, 'সিটিং টারগেট'-এর চেয়ে 'মুভিং টারগেট' অনেক ভালো। ও বেশ বুঝতে পারল, একটা গরম বুলেট ওর বাইকের কাছ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। তারপরই ও রাইফেলের শব্দটা শুনতে পেল।

সঙ্গে-সঙ্গে অপাশিকে লক্ষ্য করে বাইক ছোটাল জিশান। ইঞ্জিনে 'গোঁ-ওঁ-ওঁ' শব্দ তুলে বাইকের স্পিড তুলে দিল চরমে। তারপর স্টিয়ারিঙের কায়দায় সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথে ছিটকে গেল অপাশির দিকে।

কিলার অপাশি মিসাইল গান ফায়ার করতে সাহস পাচ্ছিল না। কারণ, যদি ও টার্গেট মিস করেও তা হলে মিসাইলের ইনফ্রারেড ট্র্যাকার ওর বাইকের ইঞ্জিন লক্ষ্য করে ছুটে আসতে পারে।

সুতরাং ও চলন্ত অবস্থাতেই বাইকের কেরিয়ার থেকে মেশিন পিস্তল বের করে পরপর দুবার ফায়ার করল।

কিন্তু মিস করল। কারণ, জিশানের বাইক বলতে গেলে সার্কাসের কসরত দেখাতে-দেখাতে এদিক-ওদিক হেলে অপাশির দিকে ছুটে আসছিল।

মেশিন পিস্তল ফেলে একটা চপার তুলে নিল ও। ততক্ষণে লং রেঞ্জ পিস্তল তুলে নিয়ে অপাশিকে লক্ষ্য করে দুবার ফায়ার করেছে জিশান। কিন্তু দুটো ছুটন্ত মোটরবাইকের বিচিত্র আপেক্ষিক গতিবেগ জিশানকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল।

ততক্ষণে অপাশির ছুড়ে দেওয়া চপার বাতাসে লাট খেয়ে জিশানের দিকে ছুটে আসছে। জিশান নিমেষের মধ্যে ছুটন্ত বাইকটাকে কাত করে একটা চোখা বাঁক নিল। অপাশির চপার ওর পিছনের সিটে কেটে বসে গেল।

অপাশি দাঁত খিচিয়ে মিহি চিৎকার করে উঠল। আবার মেশিন পিস্তল তুলে নিল হাতে। শত্রুকে এত কাছে পাওয়া গেছে! এইবার খতম।

আর উত্তরে জিশান নিখুঁত লক্ষ্যে ওর বাইকের চাকা দিয়ে অপাশির বাইকের পিছনের চাকায় আড়াআড়ি ধাক্কা মারল।

দুরন্ত গতির সংঘর্ষ। ফলে যা হওয়ার তাই হল।

অপাশির বাইক লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেতে-খেতে শূন্যে উঠে পড়ল। সরাসরি গিয়ে ধাক্কা খেল ফ্লাইওভারের রেলিঙে। 'দড়াম' শব্দ হল। রেলিং আর বাইকের মাঝে পড়ে অপাশির মাথা থেঁতলে গেল। ওর হাতে তখনও মেশিন পিস্তল ধরা রয়েছে।

একটা মিহি আর্ত চিৎকার শোনা গেল। অপাশি এবং ওর বাইক ছিটকে গেল আকাশে। তারপর অদ্ভুত এক কক্ষপথে বাতাস কেটে পড়তে লাগল নদীর দিকে।

সংঘর্ষের পর জিশানের বাইকও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। অপাশির বাইকের সংঘর্ষের জায়গা থেকে প্রায় বারো-তেরো ফুট বাঁ-দিকে ওর বাইক ফ্লাইওভারের রেলিঙে ধাক্কা মারল। ঠিক তার আগের মুহূর্তে জিশান বাইক ছেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। বাইকটা রেলিঙের খানিকটা অংশ ধসিয়ে দিয়ে বোমার স্প্লিন্টারের মতো ছিটকে গেল বাতাসে। জিশান তখন ওর বাইক থেকে কয়েক হাত দূরে বাতাস কেটে নদীর দিকে পড়ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ওর কোনও ওজন নেই। আর সেই অদ্ভুত সময়ে প্যাসকোর কথা মনে পড়ে গেল ওর।

অপাশির বাইকটা নীচে পড়তে-পড়তে আচমকাই শূন্যে বোমার মতন ফেটে গেল। বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। বাইক আর অপাশির ছোট-বড় টুকরো ভয়ংকর গতিতে ঠিকরে গেল চারিদিকে। বিস্ফোরণের আগুনের তেজ আর ঝলক জিশানের চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

বাতাসে পোড়া গন্ধ, কালো ধোঁয়া। ও চোখ বুজে ফেলল। ভাসতে-ভাসতেই হাঁটু মুড়ে দু-হাতে হাঁটুজোড়া জাপটে ধরল। ওর শরীরটা শূন্যে কয়েকবার লাট খেল। তারপরই চোখ খুলল জিশান। দেখল, নদীর ঘোলাটে জল ওর দিকে ছুটে আসছে। সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষ ডাইভারদের মতো হাত দুটো সামনে টান-টান করে বাড়িয়ে ধরল। এবং শরীরটাকে সামান্য নিয়ন্ত্রণ করতেই ওর হাত দুটো বর্শার ফলার মতো নদীর জল চিরে ঢুকে গেল। তার পিছন পিছন ঢুকে পড়ল জিশানের শরীর।

একটা চাপ। একটা ঠান্ডা অনুভূতি। চোখের নজর ঘোলাটে। মুখে কিছুটা জল ঢুকে গেল। নদীর জলের ঘাত-প্রতিঘাতে জিশানের শরীরটা বেসামাল হয়ে গেল।

কিন্তু একটু পরেই জলের ওপরে 'ভু-উ-স' করে ভেসে উঠল জিশান। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে স্যাটেলাইট ফোনটা বের করল। বেশ কিছুটা ভিজে গেছে। অকেজো হয়ে গেল কি না কে জানে!

ফোনটাকে ডানহাতে শূন্যে তুলে ধরল। জল ঝরানোর জন্য ওটা কয়েকবার জোরে-জোরে ঝাঁকাল। তারপর চোখ তুলল ফ্লাইওভারের দিকে। সেখানে একটা মানুষের সিলুয়েট দেখতে পেল। ভাঙা রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে নদীর জলের দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে হয়, জিশানকে দেখছে কিলার সুখারাম।

মানুষটার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা নীল রঙের গাড়ি।

জিশান লক্ষ করল, আকাশের দুটো হেলিকপ্টার এখন মাথার ওপরে ব্যস্তভাবে চক্কর কাটছে। বোধহয় ওরা অপাশি আর জিশানের মোকাবিলাটা দেখতে পেয়েছে।

নদীর স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে জিশান সাঁতার কাটতে লাগল। একইসঙ্গে

ও নিজের বেখাপ্পা অবস্থাটার কথা ভাবতে লাগল।

ওর কাছে এখন অপটিক্যাল ট্যাবলেট নেই। ট্র্যাকার নেই। ফুড ম্যাপ নেই। মোটরবাইক নেই। অস্ত্র নেই—যা-ও বা আছে, জলে ভেজা। আর স্যাটেলাইট ফোনটার কী হাল কে জানে!

এখন ও খাবার খুঁজে পাবে কোথায়?

তবে ভালো খবর হল, এখন ওকে তিনজনের বদলে দুজন কিলারের সঙ্গে লড়তে হবে। লড়াই করে বাঁচতে হবে।

মিনি নিশ্চয়ই ওর লড়াই দেখেছে—দেখছে।

জিশান একটা হাত আর দুটো পা ব্যবহার করে কোনওরকমে সাঁতার কাটছিল। চেষ্টা করছিল, নদীর বাঁ-দিকের পাড়ের কাছে সরে যেতে। তখনই ও দেখতে পেল লম্বা ছিপের মতো অনেকগুলো মেটাল লিভার নদীর দিকে ঝুঁকে রয়েছে। সেগুলোর ডগায় ক্যামেরা বসানো। অর্থাৎ, জিশান সবসময় লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি দর্শকের চোখের সামনে রয়েছে।

একটু পরেই নদীর পাড়ে উঠে এল। হাতে-পায়ে কোথাও-কোথাও বোধহয় কেটে-ছড়ে গেছে, কারণ, জ্বালা করছে।

ধপ করে বসে পড়ল আগাছা আর বুনো ঘাসের ওপরে। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল। ভেজা রুকস্যাকটা পিঠ থেকে নামিয়ে রাখল পাশে। ওটা আয়তনে বড় হওয়ায় ওকে জলে ভেসে থাকতে সাহায্য করেছে।

এবার স্যাটেলাইট ফোনটা নিয়ে পড়ল। শ্রীধর পাট্টাকে এখুনি ফোন করা দরকার।

ফোনের বোতাম টিপতে লাগল জিশান।

●

ডায়াল করতেই একটা ঘড়ঘড় শব্দ জিশানকে অভ্যর্থনা জানাল। তার ওপরে সুপারইমপোজ্‌ড হয়ে রিং বাজতে লাগল।

এক হাতে ফোন কানে চেপে ধরে অন্য হাতে রুকস্যাকের কভার ফ্ল্যাপ খুলতে লাগল জিশান।

ফোনটা এখনও ঘড়ঘড় ফাটা আওয়াজে বাজছে। শ্রীধর ফোন ধরতে এত দেরি করছেন কেন?

ভেজা, সপসপে রুকস্যাক থেকে ট্যাবলেট বেরোল। ছোট টিভিটাও বেরোল। সব ইলেকট্রনিক পরদা অন্ধকার। কোনও আলোর চিহ্ন নেই সেখানে।

জিশানের বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চারিদিক যেন ইলেকট্রনিক পরদার মতোই অন্ধকার দেখাল। কী করে এখন ও লড়াই

চালাবে! কী করে কিলারদের লোকেশান ট্র্যাক করবে! কী করে খাবার খুঁজে পাবে?

ফোন কানে চেপে ধরে জিশান অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। মনে-মনে শ্রীধরকে বলছিল, 'শ্রীধর...ধর...ধর...।'

একটু পরেই শ্রীধর পাট্টার গলা পাওয়া গেল ঃ 'জি-জি-শ্-শান্!'

শ্রীধরের গলায় স্বর কেটে-কেটে যাচ্ছিল।

স্যাটেলাইট ফোনটা যে অল্পবিস্তর কাজ করছে সেই প্রমাণটুকু জিশানকে আশাভরসা দিল। ও ফোনের সনিক রিসিভারের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলল, 'আমাকে এখুনি একটা অপটিক্যাল ট্যাবলেট দিন, ট্র্যাকার দিন। আমার ট্যাবলেট, ট্র্যাকার, টিভি, সব জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে—।'

ও-প্রান্তে খলখল করে হাসলেন শ্রীধর। আওয়াজটা ফাটা ডায়াফ্রামের কাঁপুনির মতো শোনাল। তার ওপরে ফোনের কথা কেটে-কেটে যাওয়ায় শ্রীধরের হাসি শুনে মনে হচ্ছিল কোনও পিশাচের হাসি।

এরপর শ্রীধর কথা বলতে শুরু করলেন। বারবার ইলেকট্রনিক হোঁচট খেলেও কথাগুলো বুঝতে পারছিল জিশান।

'সরি, জিশান। কিল গেম ইজ আ ভেরি ফেয়ার গেম। নো এক্সট্রা সাপোর্ট। নো এক্সট্রা ব্যাক-আপ। নো এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ...। এই গেমটার নাম কিল গেম—কোনও ছেলেখেলা নয়।'

জিশান বুঝতে পারছিল হাতে সময় কম। কিলার প্রোটন আর কিলার সুখারাম হয়তো এই মুহূর্তে নির্ভুল লক্ষ্যে ওর দিকে কনভার্জ করছে, ওর সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনছে।

জিশানের প্রচণ্ড রাগ হল। শ্রীধর পাট্টাকে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। আচমকা খেপে গিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও।

'শ্রীধর....পাট্টা! এই মুহূর্তে কোটি-কোটি মানুষ টিভিতে আমাকে দেখছে। আমি জানি, ওরা আমার সঙ্গে আছে। আমার অপটিক্যাল ট্যাবলেট চাই, চাই, চাই! এটা আমাকে না দিলে কিল গেমের সারভাইভাল ফ্যাক্টর জিরো হয়ে যাবে। তাই আমি নিউ সিটির জনতার আদালতে বিচার চাইছি।' কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল জিশান। দু-হাত শূন্যে তুলে টিভিতে লাইভ টেলিকাস্ট দেখা দর্শকদের উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলল, 'আপনারা আমাকে ন্যায়বিচার দিন! আপনাদের কাছে আমি বিচার চাইছি! আপনারা মার্শালকে বলুন, যেন উনি এক্ষুনি আমাকে একটা অপটিক্যাল ট্যাবলেট দেন...এক্ষুনি...!'

ভেজা রুকস্যাকটা তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটল জিশান। এবার গা-

ঢাকা দেওয়া দরকার। টিভির দর্শকরা নিশ্চয়ই ওর আবেদন ঠিকঠাক শুনতে পেয়েছে, ওকে সরাসরি দেখতেও পেয়েছে। এখন দেখা যাক কী হয়।

●

সঙ্গে-সঙ্গে যেটা হল সেটা শ্রীধর পাট্টাকে একটা বিশাল ধাক্কা দিল।

সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের কিল গেম কন্ট্রোল রুমের হেল্‌পলাইনে একের পর এক ফোন আসতে লাগল। নিউ সিটির সিটিজেনরা সবাই যেন জিশানের জন্য পাগল হয়ে গেছে। ওরা শুধু ফোনের বোতাম টিপছে। কন্ট্রোল রুমে কেউ ফোন ধরামাত্রই শুনছে, 'এক্ষুনি জিশানকে অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর ট্র্যাকার দিন। ডোন্ট স্পয়েল দ্য গেম, য়ু ড্যাম ফুল!'

হুড়মুড়িয়ে ফোন আসতে লাগল আর ফোনের ভাষা ক্রমশ রুক্ষ আর নোংরা হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত, কয়েক মিনিটের মধ্যেই, ভাষাটা কাঁচা খিস্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেল।

শুধু যে ভয়েস কল তা নয়। তার সঙ্গে ঝাঁকে-ঝাঁকে ই-মেল আর ভিডিয়ো কল। কন্ট্রোল রুমের সব কর্মীর একবারে পাগল হওয়ার জোগাড়।

বেগতিক দেখে কন্ট্রোল রুমের চিফ অফিসার সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এ শ্রীধর পাট্টাকে ফোন করলেন।

সেখানে শ্রীধরের তখন প্রায় একই অবস্থা। ই-মেল আর ভিডিয়ো কলের সুনামিতে একেবারে খাবি খাচ্ছেন। সবাই একই দাবি জানাচ্ছে ঃ 'জিশানকে এক্ষুনি অপটিক্যাল ট্যাবলেট দিন। কিল গেমের থ্রিল আর স্ট্যান্ডার্ড নষ্ট করবেন না।' অসংখ্য ই-মেল আর কলের মধ্যে কেউ-কেউ শ্রীধরকে দু-চারটে বাজে কথাও বলেছে। কিন্তু এই চাপের সময়ে সেইসব নচ্ছার মানুষগুলোকে লোকেট করে শায়েস্তা করা অসম্ভব। তবে শ্রীধর অবাক হয়ে মানুষগুলোর মাথাচাড়া দেওয়া স্পর্ধার কথা ভাবছিলেন। জিশান ছেলেটা নিউ সিটির সিটিজেনদের স্পর্ধা উসকে দিয়েছে। জিশানের জনপ্রিয়তার যে এরকম মাশুল দিতে হবে সেটা শ্রীধর পাট্টা ভাবেননি।

শ্রীধরের একটা বড় গুণ হচ্ছে, পরিস্থিতি আঁচ করে তিনি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

এখনও তাই নিলেন। স্যাটেলাইট ফোন তুলে পরপর তিনজন কর্তাকে ফোন করলেন। চটপট কতকগুলো ইন্‌স্ট্রাকশন দিলেন। তারপর ফোন পকেটে রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অন্যান্য কিল গেমে কখনও এরকম ব্যাপার হয়নি। শ্রীধরের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। যাক, এখনকার মতো তো কেসটাকে সামলে নেওয়া গেছে।

জিশানের দাবি তিনি মেনে নিয়েছেন। জিশানের জন্য নতুন একটা স্যাটেলাইট ফোন আর অপটিক্যাল ট্যাবলেট কাম ট্র্যাকার নিয়ে একটা শুটার রওনা হচ্ছে। তাও আবার একটা ট্যাবলেট নয়—দু-দুটো ট্যাবলেট। কারণ, এই মুহূর্তে পাবলিক আনরেস্ট শুরু হয়ে গেলে কিল গেমের তেরোটা বেজে যাবে। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কোটি টাকার লোকসান হয়ে যাবে।

শ্রীধর হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তাঁর ডায়রেক্টিভ পাওয়ামাত্র সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে শুটার রওনা হয়ে গেছে। দুটো ফ্যালকন হেলিকপ্টার অনেকক্ষণ ধরেই গেম সিটির ওপরে কড়া নজরদারির কাজ চালাচ্ছে। ওদের সঙ্গে শুটারের সিকিওরিটি অফিসার ওয়াকিটকিতে কথা বলে নেবে। জিশানের এগজ্যাক্ট লোকেশন কো-অর্ডিনেট জেনে নেবে।

টেনশনে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিলেন। দু-হাত মুঠো করলেন, খুললেন। পরপর কয়েকবার। তারপর ভাবলেন, শুধু তো আজকের রাতটা! কাল সকালে জিশান থাকবে কি না ঠিক নেই। তারপর ধীরেসুস্থে পাবলিক আনরেস্ট প্রবলেমটার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবেন।

পকেট থেকে ফোন বের করলেন শ্রীধর। জিশানের নম্বর লাগালেন। খেয়াল করলেন, ওঁর আঙুলগুলো অল্প-অল্প কাঁপছে।

'জিশান!'

উত্তরে কয়েক সেকেন্ড ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পেলেন। সেই আওয়াজটা কমতেই প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'জিশান! তোমার অপটিক্যাল ট্যাবলেট শুটারে করে রওনা হয়ে গেছে। একটা নয় দুটো। তার সঙ্গে একটা নতুন স্যাটেলাইট ফোন। ডোন্ট উয়ারি...।'

ও-প্রান্তে জিশানের হাসির শব্দ শোনা গেল। হয়তো জিশানের হ্যান্ডসেটের সমস্যার জন্য শব্দটা খুব চাপা শোনাল। হাসির শেষে উনতিরিশ বছরের লড়াকু ছেলেটা যে-ভঙ্গিতে 'থ্যাংক...য়ু।' কথাটা উচ্চারণ করল তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, কথাটার ওপরে ব্যঙ্গের নুন-মরিচ বেশ ভালো করেই ছেটানো রয়েছে।

●

জিশানের বাঁ-হাতে লাগানো মাইক্রোইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটারের সিগন্যাল ট্র্যাক করে শুটারটা খুব সহজেই জিশানকে খুঁজে পেল। ওর বেশ কাছাকাছি একটা ছোট্ট মাপের ফাঁকা জায়গায় আকাশযানটা শিস দিয়ে ভারটিক্যালি ল্যান্ড করল। জিশান সেদিকে এগিয়ে গেল।

অফিসারটির সঙ্গে ওর কোনও কথা হল না—শুধু জিনিস বিনিময় হল।

ভেজা রুকস্যাক, বিকল অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর স্যাটেলাইট ফোন চলে গেল শুটারে। আর শুটার থেকে পাওয়া গেল নতুন রুকস্যাক—যার ভেতরে রয়েছে একজোড়া নতুন অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর স্যাটেলাইট ফোন।

শুটারটা শূন্যে উঠে পড়তেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ক্যামেরার লেন্সকে আড়াল করে সিকিওরিটি অফিসার জিশানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে মাথা নেড়ে চোখ মারল। যার অর্থ একটাই ঃ 'লড়ে যাও, ভাই।'

জিশানের শরীরে নতুন শক্তি ঝলসে উঠল। ও জঙ্গলের গভীরে ছুট লাগাল। ছুটতে-ছুটতেই অপটিক্যাল ট্যাবলেটের লাল চৌকো বোতামটা টিপল। ফুড ম্যাপ ফুটে উঠল পরদায়। খাবার চাই, খাবার। জিশানের পাগলের মতো খিদে পাচ্ছে।

একটুও সময় নষ্ট না করে নিয়ারেস্ট ফুড পয়েন্টের দিকে ছুটল। মাটি খুঁড়ে খাবারের বাক্স বের করে ফেলল চটপট।

খেতে-খেতে জিশানের মনে হল, খিদের শক্তি অন্যান্য অনেক শক্তির চেয়ে জোরালো।

একটু পরে খাওয়া প্রায় শেষ করে ট্র্যাকারে দুজন কিলারের পজিশন দেখল। মোটামুটি দূরে রয়েছে ওরা। তা ছাড়া ওরা সংখ্যায় একজন কমে যাওয়ায় 'ত্রিভুজ' ফাঁদে জিশানকে আর ফেলতে পারবে না। ওদের কাছ থেকে দূরত্ব বাড়ানোর জন্য জিশান জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকতে লাগল। তখনও ওর চোয়াল নড়ছে—খাওয়া তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি।

এদিকটা শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। সূর্যের আলো ভেতরে প্রায় ঢুকতেই পারছে না। শুধু গাছের পাতা থেকে ঠিকরে আসা অথবা ঈষদচ্ছ পাতা ভেদ করে আসা মোলায়েম এক আলো চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। কখনও-কখনও পশু-পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘুঘুর ডাকও শুনতে পেল জিশান। ডাকটার মধ্যে কেমন যেন দুপুর-দুপুর গন্ধ।

ঘড়ি দেখল। আর তিন কি চার ঘণ্টা। তারপরই আঁধারের ছায়া নামবে আকাশে।

ঠিক তখনই মোটরবাইকের শব্দ শুনতে পেল জিশান। শব্দটা ভয়ংকর রকমের কাছাকাছি।

অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি ট্র্যাকার দেখল। নাঃ, কিলার দুজন তো বেশ দূরে। তা ছাড়া ওরা রয়েছে একেবারে অন্যদিকে।

জিশান গাছের আড়ালে-আড়ালে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। ডানহাতে তুলে নিল মিসাইল গান। জলে ভিজে গেলেও অস্ত্রটা দিব্যি ঠিকঠাক আছে। কারণ, এর বুলেটগুলোর প্রোপাল্‌সিভ ফোর্স বারুদের বদলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার

থেকে তৈরি হয়।

খানিকটা পথ পেরোতেই গাছের ফাঁক দিয়ে মোটরবাইকটাকে দেখতে পেল জিশান। কালো আর হলদে রঙের গাড়িটার ওপরে সওয়ার হয়ে রয়েছে একজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক। মোটাসোটা। মাথায় টাক। গালে চাপদাড়ি। গায়ে হালকা নীল রঙের ফুল স্লিভ শার্ট আর গাঢ় নীল জিন্‌স। মোটরবাইক দাঁড় করিয়ে জঙ্গলের এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, উঁকিঝুঁকি মারছে।

আড়াল থেকে লোকটিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

কে এই লোকটা? কিলার অপাশির রিপ্লেসমেন্ট কিলার? শ্রীধরের নতুন সারপ্রাইজ?

নাঃ, সেরকম মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া লোকটির সঙ্গে কোনওরকম অস্ত্রশস্ত্র আছে বলে ঠাহর হচ্ছে না।

গাছের আড়াল থেকে প্রকাণ্ড এক লাফ দিল জিশান। মাটিতে একবার পাক খেয়ে বলের মতো গড়িয়ে লোকটির কাছে পৌঁছে গেল। বাঁধন ছেড়া গোটানো স্প্রিং-এর মতো ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং মিসাইল গানের লম্বা নলটা লোকটার মাথার পিছনে ঠেকাল। থেমে-থেমে বলল, 'ট্রিগার টেপামাত্রই তোমার কপাল ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে চলে যাবে...।'

লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'জিশান ভাইয়া, ম্যায় তেরেকো হেল্‌প করনেকো আয়া। তেরে লিয়ে টিভি লায়া...।'

কথাটা শোনামাত্রই জিশান ব্যাপারটা বুঝতে পারল। লোকটা লাইভ টেলিকাস্ট থেকে জানতে পেরেছে, জিশানের টিভি অকেজো হয়ে গেছে। তাই ওর জন্য টিভি নিয়ে এসেছে।

বাইকের কেরিয়ার থেকে একটা ছোট টিভি বের করল চাপদাড়ি লোকটা। জিশানকে দিল। জিশান ওটা তাড়াতাড়ি রুকস্যাকে ঢুকিয়ে নিল।

কিন্তু লোকটা জিশানকে খুঁজে পেল কী করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে লোকটা হিন্দিতে যা বলল, তার সারাংশ হল এই ঃ

লাইভ টেলিকাস্টে জিশানের টিভির সমস্যা জানার পর গেম সিটির 'মক' সিটিজেনরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন একটা বাড়িতে জড়ো হয়ে জিশানকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাইশ জন সিটিজেন বাইশটা মোটরবাইকে চড়ে বসে। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে টিভি। ওরা ঠিক করে যে, পুরো গেম সিটি চষে বেড়িয়ে যে করে হোক জিশানকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর বাইশজনের মধ্যে যে প্রথমে জিশানের দেখা পাবে, সে ওর হাতে কালার টিভিটা তুলে দেবে।

লোকটির নাম রউফ লালা। রউফ সবার আগে জিশানকে খুঁজে পেয়েছে বলে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছে। যে-বাইশজন জিশানের খোঁজে বাইক নিয়ে বিপজ্জনক অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই তাদের জন্য কুড়ি হাজার টাকা করে বোনাস পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আর রউফ যেহেতু জিশানের দেখা পেয়েছে, ওর হাতে টিভিটা দিতে পেরেছে, তাতে মনে হয় রউফের জন্য আরও উঁচুদরের বোনাস পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

রউফ লালা জিশানের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করল ঃ 'জিশান ভাইয়া, ম্যাঁয় বহত লাকি হুঁ। কিঁউ কে তেরে সাথ আচানক মেরা সব্‌সে পহেলে ভেট হো গিয়া...।'

এমন সময় গাছের পাতায় আওয়াজ তুলে একটা বড়সড় ইটের টুকরো অথবা পাথর ওদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে এসে পড়ল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। এবং কয়েকটা গাছে আগুন ধরে গেল। শুরু হল পাখপাখালি আর নানান প্রাণীর চিৎকার।

জিশানের মনে হল, এটা বোধহয় হাই-এনার্জি রকেট লঞ্চারের কীর্তি। ও রউফকে কিছু বলে ওঠার আগেই রউফ বলল, 'ডেঞ্জার, জিশান ভাইয়া! জলদি! তু মেরা বাইক লেকে জলদি নিকল যা। মেরা ফিকর মত কর...।'

পলকে তাই হল। জিশান রউফের বাইকে চড়ে এঁকেবেঁকে রওনা দিল। আর রউফ একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে জিশানের চলে যাওয়া দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে বিড়বিড় করে বলল, 'সরফরোশি কি তমন্না অব হামারে দিল মে হ্যায়/দেখনা হ্যায় জোর কিত্‌না বাজু-এ কাতিল মে হ্যায়...।'

আগুন এর মধ্যেই বড়সড় চেহারা নিয়েছে। রউফ সতর্কভাবে চারপাশে তাকাল। গাছের আড়ালে-আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ও ফেরার পথ খুঁজতে লাগল।

কয়েক পা যেতে না যেতেই কী একটা যেন আচমকা ছুটে এসে ওর বুকে ভীষণ জোরে ধাক্কা মারল। পিছনদিকে ছিটকে পড়ার সময় ও অবাক হয়ে দেখল, ওর বুকে হঠাৎ করে একটা প্রকাণ্ড গর্ত গজিয়ে উঠেছে। গর্তের ভেতরটা টকটকে লাল।

রউফ লালা মারা যাওয়ার আগে শেষবারের মতো ওর সবচেয়ে প্রিয় নামটা ধরে চিৎকার করে উঠল ঃ 'আ—ল্‌—লা—আ...আ...আ...!'

ওর মুখ দিয়ে শব্দ আর রক্ত একইসঙ্গে বেরিয়ে এল।

ঠিক তখনই দূরের একটা পিপুল গাছের আড়াল থেকে কিলার

প্রোটনের মুখটা দেখা গেল। চোখে আইগিয়ার থাকায় চোখ দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি নজরে পড়ছে।

●

জঙ্গল পেরিয়ে জিশান আবার রাস্তায় নেমে পড়ল। কিছুক্ষণ ধরেই ও বাতাসে পোড়া গন্ধ পাচ্ছিল। জঙ্গল পুড়ছে। এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা জঙ্গলকে না শেষ করে দেয়!

ও রউফ লালার কথা ভাবছিল। হাসতে-হাসতে ঝুঁকি নেওয়া এক আশ্চর্য মানুষ! জিশানকে একবার সামনাসামনি দেখতে পেয়েই যে-মানুষটা নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতে পারে। ওর 'তুই-তুই' সম্বোধনের মধ্যেও কোথায় যেন একটা ভালোবাসার, আন্তরিকতার, টান ছিল।

ওই ভাগ্যবান মানুষটা ভালো থাকুক। মনে-মনে বলল জিশান। তারপর রাস্তা ধরে বাইক ছোটাল।

খাঁ-খাঁ গেম সিটির সব জায়গা যেন একইরকম। ধুধু পথঘাট। কোথাও খোলা মাঠ, কোথাও গাছপালা জঙ্গল। আবার কোথাও থোকা-থোকা ফুলের মতো দশ-বিশটা বাড়ি। কখনও চোখে পড়ছে পাথুরে পাহাড়, কখনও-বা নদী।

শহরটায় সব আছে, শুধু প্রাণ নেই। নিউ সিটির অবস্থাটাও যেন অনেকটা তাই। শুধু অল্প কিছু মানুষের বুকের ভেতরে সত্যিকারের মানুষ রয়েছে।

জিশান ভীষণ জোরে বাইক চালাচ্ছিল। কখনও রাস্তায়, কখনও খোলা মাঠের ওপর দিয়ে, কখনও গেম সিটির সিটিজেনদের বাড়ির পাশ দিয়ে, কখনও টিলার ওপর দিয়ে, কখনও-বা ফ্লাই ওভারের ওপর দিয়ে। তবে পথ চলার ফাঁকে-ফাঁকে ও থামছিল। ফুড ম্যাপ দেখছিল, ট্র্যাকার দেখছিল, টিভি দেখছিল। আর খিদে পেলে খেয়ে নিচ্ছিল।

টিভিতে ভাষ্যকারদের গলায় স্বরে উত্তেজনার পারদ বেশ কয়েক ধাপ চড়ে গেছে। কিল গেমের ইঁদুর-বেড়াল খেলা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের নানান মতামত শোনানো হচ্ছে। তারই মাঝে-মাঝে ঢুকে পড়ছে পুরোনো সব কিল গেমের ক্লিপিংস। আর এসবের ফাঁকফোকরে রুটিনমাফিক বিজ্ঞাপনের ব্রেক তো আছেই!

মাথার ওপরে সূর্য অন্তত পনেরো ডিগ্রি হেলে গেছে পশ্চিম দিকে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা—তারপরই অন্ধকার। যেটা ভগবানের দেওয়া জিশানের কালো পোশাক। তখন ওকে সুখারাম আর প্রোটন দেখতে পাবে না। অবশ্য জিশানও ওদের দেখতে পাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জিশান মাথা তুলে সূর্যের দিকে তাকাল। সূর্যদেবকে তাড়াতাড়ি অস্ত যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

এক ঝাঁক বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে জিশানের বাইক ছুটে যাচ্ছিল।

সিটিজেনদের হইচই জিশানের কানে এল। ওদের অনেকেই এখন বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। কিল গেমের রোমাঞ্চ আরও ভালো করে অনুভব করছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের সাহসও বেড়েছে।

জিশানের বারবার মিনি আর শানুর কথা মনে পড়ছিল। কিন্তু ও জোর করে ওদের মন থেকে সরিয়ে রাখতে চাইছিল। ওদের নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবলেই জিশান দুর্বল হয়ে পড়বে। ও চায় না, টিভির লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি দর্শক ওর দুর্বলতা দেখে ফেলুক।

জিশান মনকে শক্ত করছিল। বলছিল, মনে-মনে, 'আর তো মাত্র পনেরো ঘণ্টা!' কিন্তু ওর ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। সেই ভোর ছ'টা থেকে ও ছুটছে, শুধু ছুটছে। মোটরবাইকের ইঞ্জিনের তাপ ওর শরীরের সমস্ত রস যেন ক্রমাগত শুষে নিচ্ছে। হয়তো সেইজন্যই ওর এত বেশি ক্লান্ত লাগছে, একটু-আধটু ঘুমও পাচ্ছে।

কিন্তু এখন ঘুম পেলে চলবে না। পনেরো ঘণ্টা পর ও ঘুমোবে।

বাইক চালাতে-চালাতে নকল পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেল। পাশাপাশি দুটো নকল পাহাড়—দেখতে হুবহু আসল পাহাড়ের মতো, তবে উচ্চতায় বড়জোর একশো মিটার। প্রথম পাহাড়টার পাকদণ্ডী বেয়ে জিশানের বাইক ওপরে উঠতে লাগল।

সরু এবড়োখেবড়ো পথ। তার একপাশে ঝোপঝাড় কাঁটাগাছ। আর অন্যদিকে নকল পাথরের দেওয়াল। সেই দেওয়ালের ফাটল থেকে ছোট-বড় গাছ গজিয়েছে। সেই গাছে ফুটে রয়েছে গোলাপি, সাদা আর কমলা রঙের অসংখ্য ছোট-ছোট ফুল।

জিশানের মনে হল, কতদিন পর একজন মানুষ ফুলগুলোকে দেখতে এল। তাও আবার ওল্ড সিটির দূরের শহর থেকে। ওর আরও মনে হল, ওকে দেখে ফুলগুলো যেন খুশিতে হাসছে, অল্প-অল্প দুলছে।

অপাশিরা কথাও মনে পড়ছিল জিশানের। অপাশিকে ও চেনে না, জানে না—কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে খুন করে বসল! যে-মানুষ দুটো পরস্পরের অচেনা, যাদের মধ্যে এককণাও ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা বিনিময় হয়নি, তারা একে অপরের প্রাণের জন্য পাগল!

নিজেকে ধিক্কার দিল জিশান। ওর সান্ত্বনা শুধু এটুকুই যে, অপাশি কানোরিয়ার জন্য সুনিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা করছিল। আর প্রোটন কিংবা সুখারামের ক্ষেত্রেও তাই।

পাহাড়ে অনেকটা উঠে আসার পর জিশান থামল। এই উচ্চতা থেকে শহরটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! রাস্তার পাশে বাইক থামিয়ে পাহাড়ের ছায়ায় ঘাস আর আগাছার ওপরে ও বসে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের জন্য কিল গেমের

কথা ভুলে গেল। ভুলে গেল, ওর নাম কী, ও কোথায়, কী করতে এই পাহাড়ে বসে আছে।

চোখের সামনে সাদা আর নীল মেশানো আকাশ। কয়েকটা কালো পাখি। চিড়িক-চিড়িক করে ডাকতে-ডাকতে জিশানের চোখ বরাবর উড়ে গেল। শব্দ করে বাতাস বইছে। জিশানের মনে হচ্ছিল, বাতাস ওর সঙ্গে কথা বলছে।

জিশান কেমন উদাসীন হয়ে গেল, আনমনা হয়ে গেল।

হঠাৎই একটা চিলের চিৎকারে ও বাস্তবে ফিরে এল। পোশাকের হাতা দিয়ে কপাল আর গালের ঘাম মুছল। বাঁ-হাতের অপারেশনের জায়গাটা অল্প-অল্প ব্যথা করছে। ট্র্যাকারের মাইক্রোট্রান্সমিটারটা এই জায়গায় মাংসের আড়ালে আস্তানা গেড়ে আছে।

উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত পায়ে রুকস্যাকের দিকে এগোল। হাত দুটো শূন্যে তুলে কয়েকবার ঘোরাল। পা টানটান করে কাল্পনিক শত্রুর দিকে কয়েকবার লাথি ছুড়ল। জড়তা কাটিয়ে চাঙ্গা হওয়া দরকার।

রুকস্যাক থেকে টিভি বের করল। অন করামাত্রই উত্তেজনাময় রানিং কমেন্ট্রি। আর ক্লোজ-আপ ছবিতে প্রোটন। পাথর খোদাই করা নিষ্প্রাণ মুখ।

'...ফোক্স, হাই অ্যাড্রিনালিন গেম এখন পিক-এ পৌঁছে গেছে। কারণ, সুপারহিরো জিশান এখন জোড়া পাহাড়ের হিল নাম্বার ওয়ান-এ, এইটি মিটার লেভেলে, আর কিলার প্রোটন হিল নাম্বার ওয়ানের বেস-এ পৌঁছে গেছে।

'হিল নাম্বার ওয়ান থেকে নামার পথ তিনটে। তার মধ্যে দুটো রাস্তা প্রোটন গাড়ি দিয়ে ব্লক করে দিয়েছে। আর অন্য রাস্তা ধরে ও এখন মোটরবাইক নিয়ে পাহাড়ে উঠবে। সো, হেড টু হেড এনকাউন্টার ইজ ইনএভিটেব্‌ল। মোকাবিলা হচ্ছেই...।'

কিন্তু গাড়ি দিয়ে প্রোটন দুটো রাস্তা ব্লক করল কেমন করে! ও একা দুটো গাড়ি আর একটা মোটরবাইক হিল নাম্বার ওয়ান পর্যন্ত নিয়ে এল কেমন করে! সুখারাম বা আরও কেউ কি ওকে হেল্‌প করেছে? এটাও কি শ্রীধর পাট্টার একটা সারপ্রাইজ?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে জিশান চটপট ট্র্যাকার বের করল। তারপর ট্র্যাকারের দিকে চোখ রেখেই হান্টিং নাইফ আর মিসাইল গান বের করে নিল রুকস্যাক থেকে।

ট্র্যাকারে সবচেয়ে কাছের লাল ডটটা ওর কাছ থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে রয়েছে। না, 'দূরে' রয়েছে না বলে 'কাছে' রয়েছে বলাটাই বোধহয় ভালো।

জিশান পাহাড়ের কিনারায় এসে খাদের দিকে তাকাল। পাহাড়ে ওঠার রাস্তাগুলোর শুরুর দিকটা দেখতে চাইল। কিন্তু না, দেখা যাচ্ছে না। গাছপালায় আড়াল হয়ে গেছে।

টিভিতে তখন জিশানের ছবি। পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সঙ্গে রানিং কমেন্ট্রি চলছে ঃ '...নিজের মোটরবাইকের সঙ্গে দুটো গাড়ি চেন দিয়ে বেঁধে প্রোটন টো করে হিল নাম্বার ওয়ান পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। তারপর রোড ব্লক করেছে। ঠিক যেন কোনও মানুষের মেইন আর্টারি ব্লক করে দেওয়া। সত্যি, বন্ধুগণ মানতেই হবে প্রোটনের ব্রেন সুপারকুল...।'

জিশানের ঠিক পিছনে পাহাড়ের পাথুরে দেওয়ালে সংঘর্ষের শব্দ শোনা গেল।

ওর কানে তালা লেগে গেল। পাথরের ছোট-বড় টুকরো স্‌প্লিন্টারের মতো ছিটকে গেল চারিদিকে। ও চট করে একটা বোল্ডারের আড়ালে চলে গেল। প্রোটনের অস্ত্রটা কী হতে পারে? লেসার টেলিশটার? নাকি হালকা, লং ডিসট্যান্স রাইফেল?

কয়েক সেকেন্ড পর গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে দেখতে চেষ্টা করল। সঙ্গে-সঙ্গে 'ক্র্যাক' আওয়াজ। জিশান এক ঝটকায় মাথা নামাল। ওর পিছনের পাথর থেকে আবার স্টোন চিপ্‌স উড়ে গেল নানান দিকে।

জিশানও পালটা জবাব দিল মিসাইল গান দিয়ে। নীচের দিকে আন্দাজ করে চকিতে পরপর তিনবার ট্রিগার টিপল। তারপর ছুটে চলে গেল টিভি সেটের কাছে। হ্যাঁ, ওর আর প্রোটনের অ্যাকশনের লাইভ টেলিকাস্ট চলছে। প্রোটনের কানে স্যাটেলাইট ফোন। বোধহয় সুখারামের সঙ্গে কথা বলছে। প্ল্যান আঁটছে।

এবার জিশানের ক্লোজ-আপ দেখা যাচ্ছে। সারা মুখে ঘাম। কোথাও-কোথাও রক্তের ছিটে। চুলে ধুলোর আস্তরণ।

কিন্তু সুখারাম এখন কোথায়? কতটা দূরে?

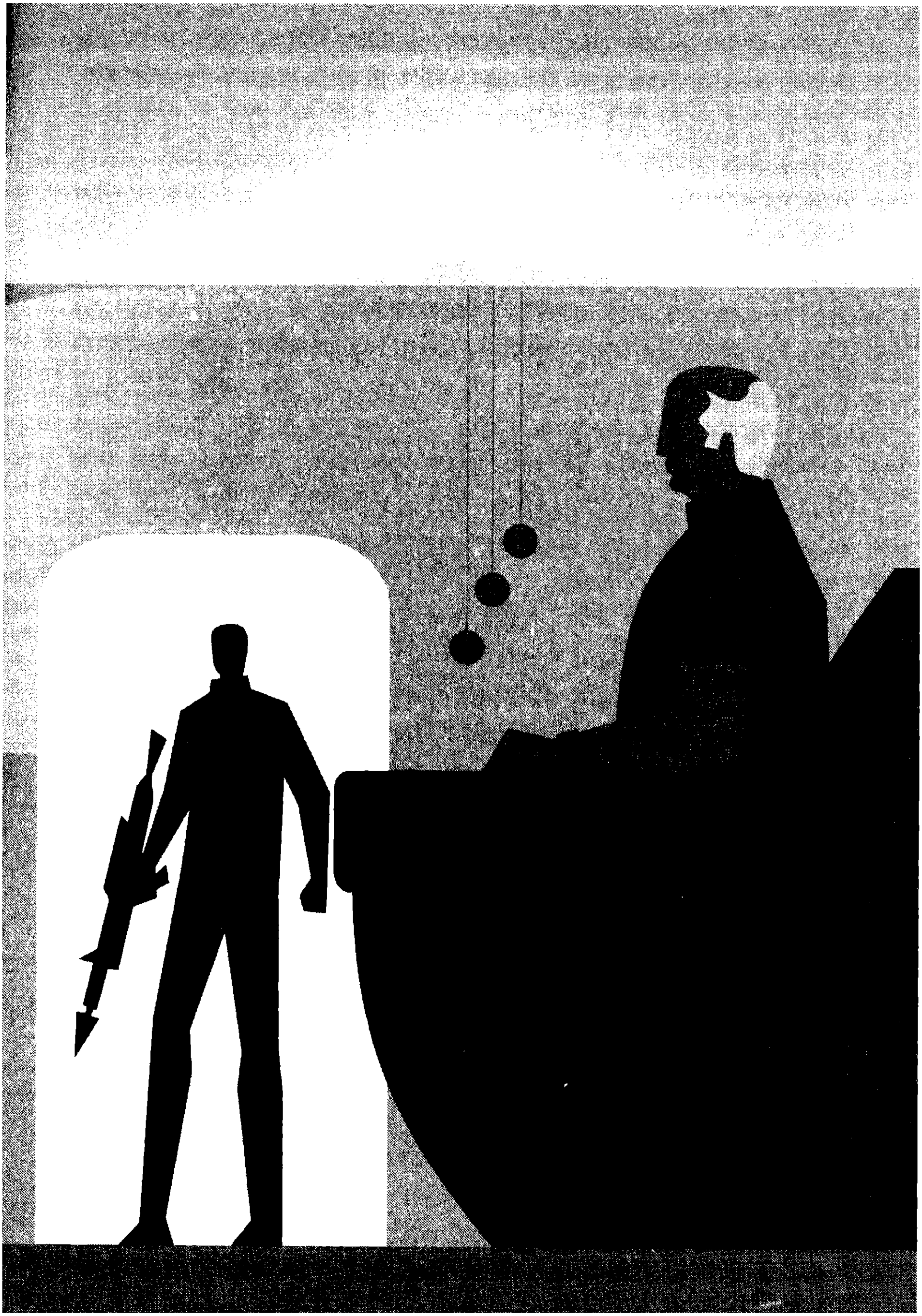
ট্র্যাকার দেখল। সুখারামের লাল ডটটা বেশ কিছুটা দূরে, কিন্তু এগিয়ে আসছে সবুজ ডটের দিকেই।

না, আর দেরি নয়। চটপট রুকস্যাকে ট্র্যাকার, টিভি সব গুছিয়ে নিল। হান্টিং নাইফ আর মিসাইল গান কোমরে গুঁজে নিল। তারপর রুকস্যাক পিঠে বেঁধে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে শুরু করল। ছোট-বড় বোল্ডারকে ডিঙিয়ে বা পাশ কাটিয়ে, গাছের ঝুঁটি ধরে নিজেকে সামলে জিশান নামতে লাগল। নামার সময় প্রোটনের পজিশন আন্দাজ করে নিজেকে পাথর কিংবা গাছের আড়ালে-আড়ালে রাখতে লাগল।

নামতে-নামতে ভাবছিল জিশান। পথ দিয়ে নয়, বিপথ দিয়েই ওকে পালাতে হবে, কিলার প্রোটনকে এড়াতে হবে। তারপর অন্ধকারের অপেক্ষা।

কিন্তু জিশান যেরকম ভাবল, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম হল না।

নামার সময় বেশ বিপজ্জনক ঢাল ওকে ম্যানেজ করতে হচ্ছিল। ওর



হঠাৎই মনে হল, যদি কোনওভাবে ওর পা স্লিপ করে তা হলে বিপদ তো হবেই, তার ওপর রুকস্যাকের টিভি, ট্র্যাকার, স্যাটেলাইট ফোন সবকিছুর বারোটা বাজবে। নতুন করে টিভি আর ট্র্যাকার জোগাড় করার ঝঞ্ঝাটের ব্যাপারটা মনে-মনে ভাবল। তারপর রুকস্যাকটা খুলে নামিয়ে দুটো বড় পাথরের খাঁজে লুকিয়ে ফেলল। জায়গাটা ভালো করে নোট করে মাথায় গেঁথে নিল। এবার মিসাইল গান আর হান্টিং নাইফ সম্বল করেই নামা যাক।

জিশান নামতে লাগল। পড়ে যেতে-যেতে টাল সামলাতে লাগল বারবার। আর দু-চোখ সরু করে প্রোটনকে খুঁজতে লাগল।

প্রোটনও জিশানকে খুঁজছিল। কিন্তু ও ভেবেছিল, জিশান তিনটে পাকদণ্ডীর একটা বেয়ে নামবে। ও যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার ঝুঁকি নেবে সেটা ভাবেনি। তাই জিশানকে প্রোটন ট্র্যাক করতে পারেনি। মিনিট কয়েক খোঁজাখুজির পর প্রোটন চুপ করে ভাবতে শুরু করল। জিশানের বুদ্ধির সঙ্গে নিজের বুদ্ধি খাপ খাওয়াতে লাগল। জিশানের স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে সেটা আঁচ করতে লাগল। আর চিবুক তুলে শকুনের চোখে পাহাড়ের ঢালের প্রতিটি কণা ছানবিন করতে লাগল।

প্রোটন ভাবতে লাগল, 'আমি জিশান হলে কোন এসকেপ রুট ব্যবহার করতাম?' এবং মনে-মনে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলল।

একটু পরেই প্রোটন যে-উত্তরটা খুঁজে পেল সেটা জিশানের সঙ্গে মিলে গেল। তাই পাহাড়ের গা বেয়ে প্রোটন উঠতে শুরু করল। পিঠে রুকস্যাক। স্যাটেলাইট ফোনটা রুকস্যাকে চালান করে দিয়েছে। লেসার টেলিশটার আড়াআড়িভাবে দাঁতে চেপে ধরা। চোয়ালের রেখা উঁচু হয়ে চেয়ে আছে। লম্বা-লম্বা হাত-পা ব্যবহার করে এমনভাবে ও পাহাড় বেয়ে উঠছে যেন একটা কালো রঙের মাউন্টেন লায়ন।

পাহাড়ের কালচে পাথরের মাঝে কালো পোশাক পরা প্রোটনকে খুঁজে পাচ্ছিল না জিশান। তাই ও সামান্যতম নড়াচড়া দেখতে পাওয়ার অপেক্ষায় রইল।

কিন্তু হঠাৎই একটা অঘটন ঘটল।

পাহাড়ের পাথরের খাঁজে বোধহয় একটা চিল বাসা বেঁধেছিল। জিশান আচমকা ওটার সামনে হাজির হয়ে পড়তেই মা-চিলটা ডানা ঝপটে তেড়ে এল ওর দিকে। এবং সাপের ছোবল মারার ক্ষিপ্রতায় জিশানের কপালে বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে দিল।

জিশানের কপাল কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। শক্ত ঠোঁটের আঘাতে কপালে বেশ ব্যথাও টের পেল। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক ক্ষতি হল অন্যভাবে।

জিশান ব্যালান্স হারিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পড়তে লাগল।

পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে নেমে আসা শরীরটাকে প্রোটন সহজেই দেখতে পেল। একটা পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে ও জিশানকে তাক করে লেসার টেলিশটার পরপর দুবার ফায়ার করল।

মুভিং টারগেট। তাই প্রোটন লক্ষভ্রষ্ট হল। আশপাশের পাথরের ছিলকা উড়ে গেল। এবং জিশানের গড়িয়ে পড়া শরীর একেবারে প্রোটনের ঘাড়ে এসে পড়ল।

দুটো শরীর জড়াজড়ি করে নীচে পড়ছিল, কিন্তু একটা পাথরের চাতাল ওদের বাঁচিয়ে দিল।

ওদের সংঘর্ষের জায়গা থেকে কয়েক মিটার নীচে একটা পাথরের চাতাল ছিল। তার শরীরে অনেক ছোট-বড় ফাটল, কিন্তু পাথরটা চেহারায় ঠিক যেন একটা বড় মাপের ডাইনিং টেবিল। তার গায়ের চারপাশে আর নানান ফাটলে শুধু আগাছা আর ঘাস।

জিশান আর প্রোটন সেখানে এসে পড়ল। একটা শাখামুটি সাপ চাতালটায় শুয়ে বোধহয় রোদ পোহাচ্ছিল, চমকে উঠে সড়সড় করে একটা ফাটলে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

নিজেকে সামলে নিতে জিশানের এক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি। আর প্রোটনের পেট লক্ষ্য করে লাথি চালাতে সময় লাগল বাড়তি আরও একটা সেকেন্ড।

প্রোটনের লেসার টেলিশটার ওর হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল। পাহাড়ের ঢালের পাথরে-পাথরে ঠোক্কর খেয়ে ওটা নীচে পড়ে গেছে। রুকস্যাকের দশাও তাই। স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে কখন যেন আশপাশে ছিটকে পড়েছে।

আর জিশানের হালও একইরকম। ওর কোমরে গোঁজা মিসাইল গান চিলের আচমকা আক্রমণে নীচে পড়ার সময় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। শুধু হান্টিং নাইফটা কোমরে তখনও ছিল। ওটার ফলার খোঁচা খেয়ে কোমরের বাঁ-দিকটায় কোথাও একটা চোট লেগেছে। জায়গাটা বেশ জ্বালা-জ্বালা করছে।

প্রোটনের ক্ষিপ্র প্রতিবর্তী ক্রিয়া জিশানকে অবাক করে দিল। বেজির তৎপরতায় ও জিশানের লাথির সংঘাতটা প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ এড়িয়ে গেল। সার্কাসের পেশাদার অ্যাক্রোব্যাটদের মতো দুবার সামারসল্ট খেয়ে পলকে চলে গেল জিশানের হাত-পায়ের নাগালের বাইরে।

এরপর যে-লড়াইটা হল সেটা কারাটে আর কিক বক্সিং-এর অদ্ভুত মিশেল। এই সব লড়াইয়ের আধুনিক নাম জিশান না জানলেও লড়াইটা জানে। আর প্রোটনও তার চেয়ে কিছু কম জানে না।

ওদের দুজনের হাত-পা চলতে লাগল বিদ্যুৎগতিতে। আর সংঘর্ষের

চোখাচোখা শব্দ হতে লাগল। ওর ছিপছিপে লম্বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে জিশান তার শক্তি যতটা হওয়া উচিত বলে আঁচ করেছিল, এখন বুঝতে পারছিল প্রোটনের শক্তি তার চেয়ে অনেকটা বেশি।

ঘুরন্ত চাকার মতো শরীরটাকে শূন্যে পাক খাইয়ে দিল প্রোটন। একইসঙ্গে ওর ডান-পা একটা বৃত্তচাপ এঁকে দিল বাতাসে। আর পায়ের গতিপথে জিশানের চোয়ালকে পেয়ে গেল।

জিশান একটা ঝটকা দিয়ে মাথাটা সরিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু সেটার টাইমিং যে ঠিক হয়নি সেটা চোয়ালের আঘাত ওকে জানিয়ে দিল। ও পিছনদিকে টাল খেয়ে পড়ে গেল পাথরের দেওয়ালে। কিন্তু এক সেকেন্ডের মধ্যেই নিজেকে আবার সামলে নিল।

প্রোটন ওর পোশাকের কোনও একটা পকেট থেকে একটা ইস্পাতের স্টার বের করে নিয়েছিল। সেটার প্রান্তগুলো ক্ষুরের মতো ধারালো। স্টারটা মাপে একটা বিস্কুটের মতো। সেটা ডানহাতের তর্জনী আর মধ্যমার মাঝে চেপে ধরল—যেন জিনিসটা একটা চ্যাপটা সিগারেট।

জিশান হান্টিং নাইফটা কোমর থেকে খামচে বের করে নিল। কিন্তু ততক্ষণে প্রোটন পা ভাঁজ করে সামান্য কুঁজো হয়ে ইস্পাতের ঝকঝকে তারাটা ফ্রিসবি ছোড়ার ভঙ্গিতে জিশানের ডানহাত লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল।

ছোট্ট অস্ত্রটা বাতাস চিরে ধেয়ে গেল জিশানের দিকে, ওর ছুরি ধরা হাতের পিঠে গিয়ে প্রথম আঘাত করল, কিন্তু সেখানেই থামল না। দুরন্ত গতিতে চাকার মতো গড়িয়ে হাত বেয়ে ছুটে গেল। তারপর ছুঁচোবাজির মতো এলোমেলো বাঁক নিয়ে জিশানের বুকের ওপরে আড়াআড়িভাবে ধারালো ফলার দাগ টেনে দিল।

জিশানের হাত, বুক, জ্বলে গেল। রক্তের রেখা ফুটে উঠল হাতে, বুকে। হান্টিং নাইফ হাত থেকে খসে পড়ে গেল।

আচমকা আঘাত আর যন্ত্রণায় জিশান হয়তো কয়েক সেকেন্ডের জন্য কাবু হয়েছিল, সেই ফাঁকে প্রোটন এক ঝাঁক ইস্পাতের পিন জিশানের চোখ-মুখ লক্ষ্য করে ছুড়ে দিয়েছে।

পিনগুলো মাপে ইঞ্চিচারেক। চকচকে। ডগাগুলো সূক্ষ্ম।

জিশান ঝটিতি বসে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও সবক'টা পিন এড়াতে পারল না। তিনটে ইস্পাতের পিন ছুটে এসে ওর কপালে আর গালে বিঁধে গেল।

সেই অবস্থাতেই জিশান একটা মাঝারি মাপের বোল্ডার তুলে নিয়ে শট পাটের ভঙ্গিতে ছুড়ে দিল। ওর শরীরটা চক্কর খেয়ে দেড়পাক ঘুরে গেল। এবং

ভারি পাথরটা প্রচণ্ড ভরবেগ নিয়ে প্রোটনের পেটে গিয়ে ধাক্কা মারল। সংঘর্ষের অভিঘাতে প্রোটন পিছনদিকে টাল খেয়ে গেল। ব্যালান্স রাখার জন্য ও দু-হাত চরকির মতো শূন্যে ঘোরাতে লাগল। এই পড়ো-পড়ো অবস্থায় তিন-চার সেকেন্ড বাতাসে চিত-সাঁতার কাটল। তারপর টলে পড়ে গেল পাথরের চাতাল থেকে।

জিশান এত সব কাণ্ড দেখার জন্য মোটেই অপেক্ষা করেনি। মসৃণ পাথরটা শত্রুকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ও বুঝতে পেরেছিল লক্ষ্যভেদ হবেই। নিউ সিটির সুদীর্ঘ ট্রেনিং ওর আত্মবিশ্বাসকে অকল্পনীয় ভিতের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাই ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের ঢালের দিকে। তারপর শুধু হাতে রক ক্লাইম্বিং শুরু করে দিয়েছে। মাকড়সার মতো তরতর করে বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

ও জানে, প্রোটনের হাতে এই মুহূর্তে কোনও লং ডিসট্যান্স অস্ত্র নেই। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে মোটরবাইকের কাছে পৌঁছতে হবে। জলদি! জলদি!

প্রোটন চাতাল থেকে প্রায় দশ-বারো ফুট নীচে পড়ে গিয়েছিল। ওর মাথা ঠুকে গিয়েছিল একটা বড় বোল্ডারে। ওর শরীরটা সেই বোল্ডারের খাঁজে আটকে গিয়ে ওর প্রাণ বাঁচাল বটে, কিন্তু ও অজ্ঞান হয়ে গেল। ওর চোখের আইগিয়ার আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে—তাতে এতটুকু চিড় ধরেনি। তাই চিত হয়ে পড়ে থাকা প্রোটনকে বিকেলের রোদে ভারি বিচিত্র দেখাচ্ছিল। ওর দুটো কালো 'চোখ' নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে।

জিশান পাগলের মতো ওর মোটরবাইকের কাছে পৌঁছতে চাইছিল। ওর এখন মোটরবাইকটা দরকার। ওটাই এখন ওর সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে-উঠতে জিশান সুখারাম নস্করের কথা ভাবছিল। সুখারাম এখনও অকুস্থলে এসে পৌঁছতে পারল না কেন? ওর তো এতক্ষণ দেরি হওয়ার কথা নয়! তা হলে কি ও ট্র্যাকার দেখে জিশানের কাছাকাছি কোথাও এসে গেছে, কিন্তু পাহাড়ের ঢালে সঠিক জায়গাটা খুঁজে পায়নি?

আর বেশি ভাবার দরকার নেই! হাঁপাতে-হাঁপাতে জিশান ওর পুরোনো জায়গাটায় বেয়ে উঠল। ওই তো ওর রুকস্যাক! ওই তো ওর মোটরবাইক!

বিকেলের আলোয় জিশানকে ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। ওর মুখে, গালে, চিবুকে ঘাম আর রক্ত। হাত আর বুকের ওপরে আঁকা হয়ে গেছে রক্তের রেখা। সারা শরীরে জ্বালা-পোড়া। তিনটে ইস্পাতের পিন লম্বভাবে বিঁধে রয়েছে কপালে আর বাঁ-গালে। এতক্ষণ পিনগুলো খোলার কথা মনে হয়নি।

এখন টান মেরে খুলে ফেলল। নতুন জ্বালার অনুভূতি হল ফোটাল তিনটে বিন্দুতে। ভাগ্যিস এগুলোর ডগায় বিষ মেশানো নেই! আর হাতাহাতি লড়াইয়ের সময় প্রোটনের নখের আঁচড় থেকে ও নিতান্ত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে।

রুকস্যাক পিঠে নিয়ে মোটরবাইক ছুটিয়ে দিল জিশান। তার আগে বাইকের কেরিয়ারে রাখা প্লেট টিভিটা অন করে দিল। ছবি দেখা না যাক, অন্তত রানিং কমেন্ট্রিটা শোনা যাক। তা থেকে যতটুকু খবর পাওয়া যায়।

'এইমাত্র আপনারা যা দেখলেন সেটা একটা অবিশ্বাস্য লড়াই। এইরকম থ্রিলিং টেব্‌ল-টপ ফাইট এর আগে কোনও কিল গেমে দেখা যায়নি। কিলার প্রোটন এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে। আশা করি আর কিছুক্ষণের মধ্যে ও জ্ঞান ফিরে পাবে। তারপর আবার নতুন এনার্জি নিয়ে লড়াইয়ে নামবে।

'বন্ধুগণ, আপনাদের জানিয়ে রাখি কিল গেমের নানানরকম ইভেন্ট নিয়ে যেসব ''ফোরসি দ্য আউটকাম''-এর সুইপস্টেক-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে এ পর্যন্ত বাজি ধরেছেন চোদ্দোশো তিরিশ মিলিয়ন দর্শক। এরকম বিশাল নাম্বারের পার্টিসিপেশান আগে কখনও কোনও কিল গেমে দেখা যায়নি। দিস ইজ অ্যান অল টাইম রেকর্ড, ফোক্‌স, অল টাইম সুপারডুপার হিট!

'ওই দেখুন, জিশান এখন পাহাড় থেকে নামছে। কিন্তু রাস্তার শেষে রোড ব্লক রয়েছে। একটা গাড়ি সেখানে আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে গেছে কিলার প্রোটন। দেখা যাক, আমাদের সুপারহিরো কী করে! আপনারা ভুলে যাবেন না, জিশান এখন উন্ডেড আর টায়ার্ড। সেটা ওকে দেখেই আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন।

'আর-একটা প্লাস পয়েন্ট ফর জিশান। কিলার প্রোটন এখন টেম্পোরারিলি ডি-অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জিশান ওর মোটরবাইকের কাছে এসে রুকস্যাক থেকে ওয়েপন নিয়ে আবার প্রোটনের কাছে ফিরে যায়নি। ওকে পারমানেন্টলি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেয়নি। সো, ফোক্‌স, থ্রি চিয়ার্স ফর জিশান, থ্রি চিয়ার্স ফর হিজ সফ্‌ট হার্ট—।'

জিশান এসব শুনতে পাচ্ছিল আর পাকদণ্ডী বেয়ে নামছিল। একইসঙ্গে ভাবছিল, কী করে ও রোডব্লকটা পেরোবে। ওর সামনে পশ্চিমে ঝুঁকে পড়া সূর্য। সরাসরি যেন তাকিয়ে আছে জিশানের দিকে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ও পাহাড়ের প্রায় নীচের দিকে চলে এল। আর তখনই ওর চোখে পড়ল, সরু রাস্তায় প্রায় আড়াআড়িভাবে একটা রুপোলি রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার দুপাশে এমন কোনও ফাঁক নেই যা দিয়ে একটা মোটরবাইক গলে যেতে পারে।

জিশান বাইকের গতি কমাতে বাধ্য হল। এবং থামল। রুপোলি গাড়ির 'পাঁচিল'টার দিকে তাকিয়ে রইল।

●

সুখারাম নস্করের ভালো লাগছিল না। ও জানে, ওর ফেরোসিটি কোশেন্ট 8.9। জানে, ও বেজির মতো ক্ষিপ্র, চন্দ্রবোড়ার মতো সতর্ক, তৎপর। আর ছুটতে পারে হরিণের মতো—সেটাও আবার একটানা, অনেকক্ষণ ধরে।

নিয়মিত শরীরচর্চা করাটা সেন্ট্রাল জেলের কয়েদিদের রুটিনের মধ্যে পড়ে। তা ছাড়া দৌড়ের অভ্যেসটা ও জেলের মধ্যেও বজায় রেখেছে। ফলে এখন ও বদনোয়ার গ্যাঙের তিন-চারজনের সঙ্গে খালি হাতে দিব্যি মহড়া নিতে পারে। তা সত্ত্বেও শ্রীধর পাট্টা ওর সারা শরীরে নানান মারণাস্ত্র সাজিয়ে দিয়েছেন। আর বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দিয়েছেন স্যাটেলাইট ফোন।

কারণ একটাই ঃ গেম সিটির সীমানার মধ্যে ওকে জিশানকে শিকার করতে হবে।

এইখানেই হয়েছে যত মুশকিল!

কিল গেমে নামার আগে জিশানের নানান গেমের ক্লিপিংস সুখারাম দেখেছে। দেখেছে ওর আরও অন্যান্য ক্লিপিংস। সেইসব দেখার পর থেকেই ওল্ড সিটির এই লড়াকু ছেলেটার প্রতি ওর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। বারবার মনে হয়েছে, জিশান ওর ভাই—ওরা একই শহরে মানুষ হয়েছে। এই নিউ সিটিতে আসার পর থেকে জিশান ওর শহরের হয়ে লড়াই করছে, ন্যায়ের হয়ে লড়াই করছে।

সুখারামের মনে পড়ল, মনোহর সিং-এর হয়ে জিশান রুখে দাঁড়িয়েছে, জাব্বাকে পিট ফাইটে নিকেশ করতে-করতেও ও ছেড়ে দিয়েছে, অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপস করেনি।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে সুখারামের মনের ভেতরে শ্রীধর পাট্টার মুখটা বদনোয়ার মতো হয়ে গেল, আর জিশানের মুখটা ওর মতো। সুখারামও তো ন্যায়ের জন্যই লড়াই করেছিল!

সুখারাম যদি জিশানকে খতম করতে পারে তা হলে তার বিনিময়ে ও কী পাবে? মৃত্যুদণ্ড রদ। সেইসঙ্গে মুক্তি। আর হয়তো অনেক টাকা পুরস্কার। কিন্তু সেগুলো নিয়ে ও করবে কী? কোথায় যাবে? মা নেই। চোলিও নিশ্চয়ই আর নেই। তা হলে ও যাবে কোথায়? অনিশ্চিত জীবনের পথে শুধু দৌড়বে, আর দৌড়বে!

বরাট স্যারের কথা মনে পড়ল। স্যারের খদ্দরের পাঞ্জাবি থেকে ঘামের

গন্ধ ভেসে এল ওর নাকে। স্যার প্রায়ই বলতেন, 'তুই একদিন বড় কিছু একটা করে দেখাবি....।' বদনোয়া আর ওর চারটে চুন্নুকে খতম করে ও পৃথিবী থেকে পাঁচ-পাঁচটা পাপীকে মুক্তি দিয়েছিল। একটা 'বড়' কাজ করে দেখিয়েছিল।

আজ আবার একটা সুযোগ এসেছে—একটা 'বড়' কিছু করে দেখানোর। তাই ও শ্রীধরের পোষা অন্ধ কুকুরের মতো জিশানকে তাড়া করে ছুটে বেড়াতে পারছিল না। ওর ভেতরে ভীষণ তীব্র একটা অনিচ্ছার ঝোঁক কাজ করছিল। তাই সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ওর আর জিশানের মধ্যে দূরত্বের ফারাক তেমন একটা কমছিল না।

এর জন্য বেশ কয়েকবার শ্রীধর ওকে ফোন করে ধমক দিয়েছেন : 'কী ব্যাপার, সুখারাম? তুমি কি ভুলে গেলে তোমার ফেরোসিটি কোশেন্ট ৪.9? তোমার অ্যাক্টিভিটি দেখে তো মনে হচ্ছে ওটা 2.5-এরও কম!'

শুধু শ্রীধর পাট্রা নয়, টিভির কমেন্টেটররাও ওকে ঘন-ঘন সমালোচনা করেছে। ও গেম সিটির কয়েকটা দোকানে দাঁড়িয়ে দোকানের টিভিতে নিজের কানে সেইসব সমালোচনা শুনেছে। কমেন্টেটররা কখনও ওকে 'সুখী সুখারাম' বলে সম্বোধন করেছে, আবার কখনও বা বলেছে, 'ওর নাম মনে হয় সুখারাম নস্কর নয়, সুখারাম গদাইলশকর!'

কিন্তু না—তাতেও সুখারামের ভেতরের ইচ্ছেটা, কিংবা অনিচ্ছাটা, পালটায়নি। কিল গেমটা ও জিশানের সঙ্গে লড়তে চায় না, শ্রীধরের সঙ্গে লড়তে চায়। ওর আবার একটা 'বড়' কাজ করে দেখাতে ইচ্ছে করছে। বরাট স্যার যেখানেই থাকুন, নিশ্চয়ই ওর এই কাজের কথা জানতে পারবেন।

ওর নাকে স্যারের ঘামের গন্ধটা আবার ভেসে এল।

জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল সুখারাম। হাতে ধরা হাই-ফাই ইলেকট্রনিক ট্র্যাকার। একটা সবুজ ডট, আর দুটো লাল ডট। সবুজ ডটটা নড়ছে বটে, কিন্তু লাল ডট দুটো স্থির।

অপাশি যে আর নেই সেটা সুখারাম জানে। সুতরাং দুটো লাল ডটের একটা ও নিজে, আর অন্যটা প্রোটন। সুখারাম চুপচাপ একজায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই ওর লাল ডট স্থির। কিন্তু প্রোটনও কি তা হলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু কেন?

প্রোটনকে ফোন করল সুখারাম। রিং বাজতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে বাজতেই থাকল—কেউ ধরল না। অবশ্য ধরলেও প্রোটন এত কম কথা বলে যে, সেগুলোকে 'কথা' না বলে 'হু-হাঁ' গোছের 'শব্দ' বলাই ভালো।

ফোন কেটে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে। সন্ধে নেমে আসতে আর খুব বেশি দেরি নেই—অন্তত আকাশ তাই বলছে। একটা হেলিকপ্টার আকাশ চিরে উড়ে গেল।

ওটার 'ভোমরার ডাক' হালকাভাবে ভেসে এল।

সুখারাম এবার নড়েচড়ে উঠল। ছল-ছুতোয় ও অনেক সময় 'নষ্ট' করেছে। আরও বেশিরকম গা ঢিলে দিলে শ্রীধর পাত্রা হয়তো তিতিবিরক্ত হয়ে শুটারে করে রিপ্লেসমেন্ট কিলার পাঠিয়ে দেবেন।

সুখারাম জঙ্গলের বাইরে পা চালাল। কাছেই পিচের রাস্তা। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সোনালি রঙের হাই-স্পিড অটোমোবিল। চ্যাপ্টা, ছ'চাকাওয়ালা। আগের নীল গাড়িটা সুখারাম বদলে নিয়েছে।

গাড়িতে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল সুখারাম নস্কর। শেষ পর্যন্ত যা-ই হোক না কেন, জিশানের সঙ্গে ওর দেখা হওয়াটা দরকার—ভীষণ দরকার।

●

জিশান বাইক থামাল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ও প্যাসকোর কথা ভাবল। ভাবল রুপোলি গাড়ির 'পাঁচিল' ডিঙোনোর একটা স্ট্র্যাটেজির কথা। তারপর বাইকে আবার স্টার্ট দিল। এবং ওই 'পাঁচিল' লক্ষ্য করেই গোঁ-গোঁ করে বাইক ছুটিয়ে দিল।

কিছুটা পথ গিয়েই বাইক তুলে দিল পাহাড়ের ঢালে। এবড়োখেবড়ো জমি, বড়-বড় ঘাস আর আগাছা, সঙ্গে ছোট-বড় পাথর—তার ওপর দিয়েই ওর বাইক কোলাব্যাঙের মতো লাফাতে-লাফাতে ছুটে চলল। পাহাড়ের ঢালে বাইকটা হেলে থাকলেও ওটার স্পিড মাধ্যাকর্ষণের টানের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। জিশানের বারবার মনে পড়ছিল প্যাসকোর কথা ঃ গেম সিটিতে মোটরবাইকটা একটা অস্ত্র। এখন জিশান সেই অস্ত্র ব্যবহার করছে।

গাড়িটার কাছে পৌঁছে জিশান মোটরবাইকের স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নেমে পড়ল গাড়ির বনেটের ওপরে। তারপর সেখান থেকে বাইকের চাকা লাফিয়ে-লাফিয়ে রাস্তায়। তারপর জিশানের বাইক স্বচ্ছন্দে ছুটে চলল।

একটু ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে বাইক থামল। বাঁ-দিকে অনেকটা ফাঁকা জমি। তার পরেই একটা বিশাল জলা। এদিক-ওদিক তাকালে চোখে পড়ে বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ।

বিকেলের ঢলে পড়া আলোয় জায়গাটা কী সুন্দর, শান্ত আর নির্জন!

রুকস্যাক থেকে ট্র্যাকার বের করে দেখল জিশান। দুটো লাল ডটই এখন নড়ছে। তার মানে, কিলার প্রোটন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

ইস, এই ট্র্যাকারটা যদি না থাকত।

তা হলে জিশান ওই জলার মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে লুকিয়ে থাকত। সুখারাম আর প্রোটনের চোখে ধুলো দিয়ে রাত কাবার করে দিত।

হঠাৎই ওর মাথায় একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল ঃ ওর বাঁ-হাতের যে-জায়গায় শ্রীধর পাট্টার মেডিকরা অপারেশন করে মাইক্রোট্রান্সমিটারটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, সে-জায়গার মাংস খুবলে ট্রান্সমিটারটাকে বের করে এখানকার জমিতে কোথাও পুঁতে দিলে হয় না! তা হলে দুই কিলারের ট্র্যাকারে দেখাবে জিশান এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে, অথচ জিশান তখন এখান থেকে অনেক দূরে কোনও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে।

সুতরাং বাইক থেকে নেমে পড়ল জিশান। রুকস্যাকে ট্র্যাকার রেখে দিয়ে বের করে নিল হান্টিং নাইফ। আর প্যান্টের পকেট থেকে বের করল স্পার্কার। এর বোতাম টিপলেই ছিটকে বেরোবে আগুনের নীল শিখা।

স্পার্কার অন করে হান্টিং নাইফের ইস্পাতের ফলাটা ও গরম করতে শুরু করল। শরীরে ঢোকানোর আগে ছুরির ফলাটাকে স্টেরিলাইজ করে নেওয়া দরকার।

জিশান চারপাশে একবার তাকাল। তারপর বাইকের পাশে রাস্তায় বসে পড়ল। ডানহাতে ছুরিটা বাগিয়ে ধরে বাঁ-হাতটা উঁচিয়ে ধরল চোখের সামনে। অপারেশন করে ট্রান্সমিটার ঢোকানোর জায়গাটা জিশানের স্পষ্ট মনে আছে। এই তো! এই জায়গাটায়! টি-শার্টের কালো চকচকে সিনথেটিক মেটিরিয়ালের ঠিক পিছনেই।

টিভির লাইভ টেলিকাস্টে জিশানকে কি এখন দেখা যাচ্ছে? কেউ কি বুঝতে পেরে গেছে ওর প্ল্যান?

এমন সময় জিশানের স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল।

ফোনের আওয়াজে জিশান চমকে উঠল। ওর ছুরি ধরা হাত থমকে গেল। বাঁ-হাত এগিয়ে গেল বাইকে রাখা রুকস্যাকের দিকে।

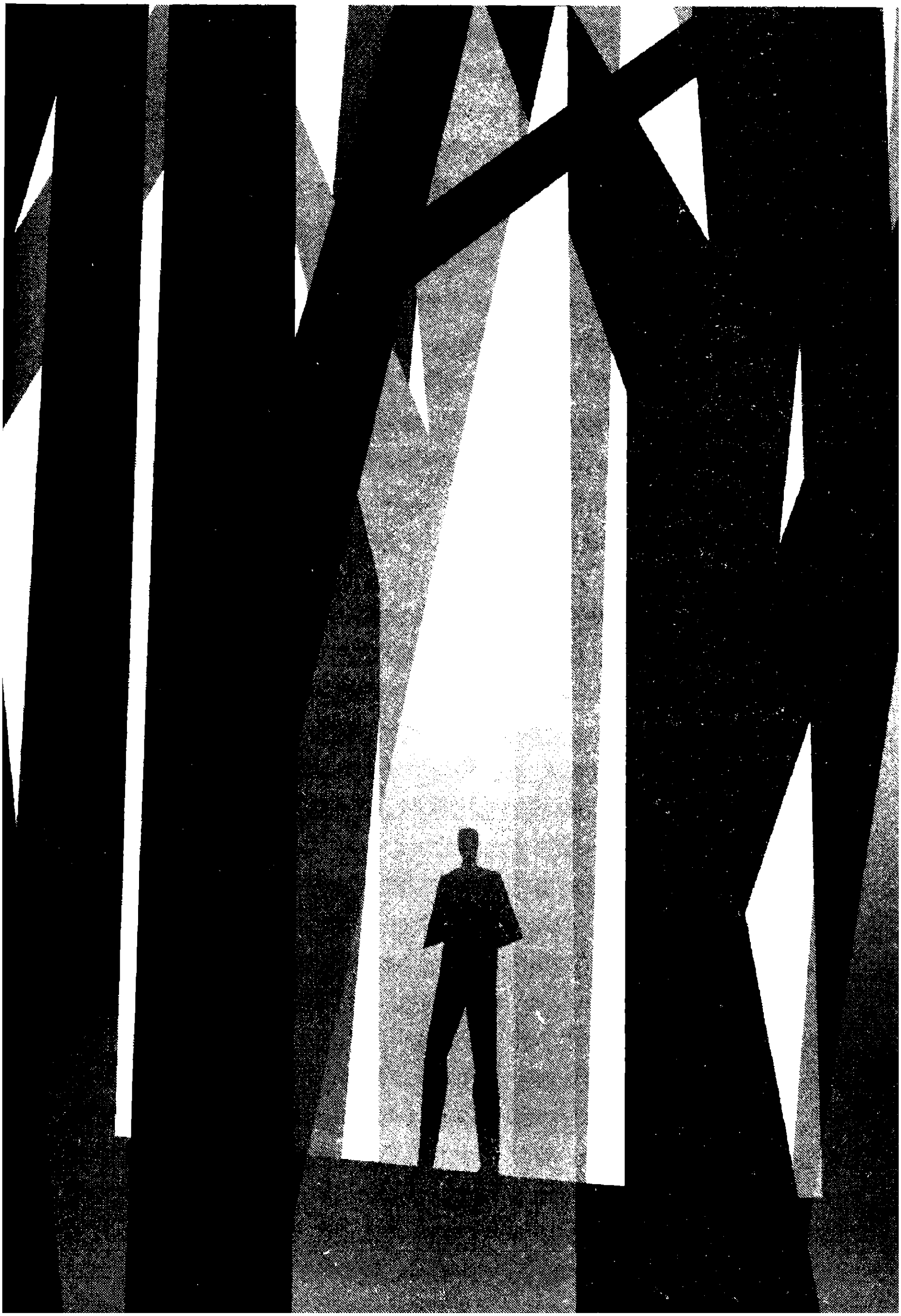
ফোন বের করে কলটা রিসিভ করতেই চেনা গলা শোনা গেল।

'বাবু জিশান, কোনও দুষ্টুমি কোরো না।' খুকখুক হাসি ঃ 'তা হলে আমাকেও দুষ্টুমি করতে হবে—।'

'আমি...মানে...।'

'হ্যাঁ, জানি। তুমি গরম হান্টিং নাইফ দিয়ে বগল চুলকোতে যাচ্ছিলে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ঃ 'আমি ওল্ড সিটিতে ফোর্স পাঠাচ্ছি—তোমার বউ আর ছেলেটাকে নিউ সিটিতে তুলে আনার জন্যে। ওরা হবে আমার সিকিওরিটি ডিপোজিট। তোমার কোনও দুষ্টুমি দেখলেই আমি ওদের নিয়ে অল্পস্বল্প দুষ্টুমি করব...।'

শ্রীধরের ঠান্ডা গলা শুনে জিশানের হাত থেকে হান্টিং নাইফ পড়ে গেল। ওর গলা চিরে একটা যন্ত্রণার চিৎকার বেরিয়ে এল, 'না! না! আমার ওয়াইফ আর ছেলেকে আপনি টাচ করবেন না। প্লিজ! প্লিজ...!'



ততক্ষণে শ্রীধর ফোনের লাইন কেটে দিয়েছেন।

জিশান কয়েক সেকেন্ড হাঁটুগেড়ে বসে রইল। ওর চোখে জল এসে গেল। শ্রীধর পাত্রা ওর সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছেন। শালা, বাস্টার্ড!

হঠাৎই জিশানের খেয়াল হল, লাইভ টেলিকাস্টে দর্শকরা ওর চোখের জল দেখতে পাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নিল। চটপটে ভঙ্গিতে হান্টিং নাইফ রুকস্যাকে ঢুকিয়ে বাইকে চড়ে বসল।

বাইক চালাতে-চালাতেই টের পেল, ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে ওর বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ শোনা যাচ্ছে। এইরকম একটা সময়ে মিনি আর শানুর কথা তুলে শ্রীধর পাত্রা সত্যি-সত্যি ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।

ঝকঝকে মসৃণ রাস্তায় বাইকের চাকা পিছলে যাচ্ছিল—লাল ডট দুটোর কাছ থেকে দূরে, আরও দূরে। রাস্তার দুপাশে গাছপালা আর উঁচু-নীচু প্রান্তর। জিশানের ক্লান্ত লাগছিল। শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় জ্বালা করছিল। মুখে, হাতে ধুলোর আস্তর—তার সঙ্গে ঘাম। ও বেশ বুঝতে পারছিল, এখন ওর একটু বিশ্রাম দরকার।

হঠাৎই ওর চোখে পড়ল, দূরে রাস্তার ধারে দুটো বাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুটো বাড়িই দোতলা। একটা হালকা ছাই রঙের, আর তার পাশেরটা আবছা নীল। বাড়ি দুটো তীব্র গতিতে ক্রমশ ওর কাছে এগিয়ে আসছে।

জিশান লক্ষ করল, বাড়ি দুটোর বারান্দা কিংবা জানলায় কোনও উৎসুক মানুষের ভিড় নেই। ব্যাপারটা ওকে একটু অবাক করল। গেম সিটির কোনও মক সিটিজেন কি এ-দুটো বাড়িতে নেই?

জিশানের বাইক বাড়ি দুটোর সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির একতলার দুটো দোকানঘর খাঁ-খাঁ করছে। জানলা আর বারান্দাও তাই।

জিশান বাইকটা একটা দোকানঘরে ঢুকিয়ে আড়ালে দাঁড় করাল। রুকস্যাক পিঠে নিল। বাইকের কেরিয়ার থেকে তুলে নিল ট্র্যাকার। তারপর মিসাইল গান হাতে বাগিয়ে ধরে খুব সাবধানে ধীরে-ধীরে পা ফেলে ঢুকে পড়ল একটা বাড়িতে।

বাড়িটার সবক'টা ঘর ঘুরে দেখল। আশ্চর্য! বাড়িতে কেউ নেই!

এই বাড়িটায় কোনও মক সিটিজেন নেই কেন? অপটিক্যাল ট্যাবলেট থেকে বাড়িটার লোকেশন দেখল। গেম সিটির পশ্চিম প্রান্তের দিকে। হয়তো মক সিটিজেনের তুলনায় বাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি। তাই পশ্চিমদিকের এই দুটো বাড়ি সুনসান—খাঁখাঁ।

ঠিক তখনই পাশের বাড়ি থেকে টিভির কথাবার্তা শুনতে পেল। দোতলার একটা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে পাশের বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে একটা ঘরের

ভেতরে নজর চালাল জিশান। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

তখন ও চটপট সিঁড়ি নেমে রওনা হল পাশের বাড়ির দিকে।

নতুন বাড়িটায় ঢুকে এ-ঘর ও-ঘর খোঁজ করে কাউকে না পেয়ে জিশান উঠে গেল দোতলায়। টিভির শব্দ লক্ষ্য করে পৌঁছে গেল একটা ঘরে।

ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল।

আশি কি নব্বই বছর বয়েসি একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ একটি আরাম-চেয়ারে বসে রঙিন টিভির পরদার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফরসা মানুষটার চোখে কোনও চশমা নেই। মাথায় অল্পবিস্তর টাক—বাকিটা শোনপাপড়ির আঁশের মতো লম্বা-লম্বা চুল। গালে আর থুতনিতে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গায়ের চামড়া গিলে করা। পরনে একটা সাদা কুর্তা আর ছাই রঙের পাজামা।

জিশান ঘরে ঢোকার সময় দরজায় শব্দ হয়েছিল। বৃদ্ধ টিভি থেকে চোখ সরিয়ে জিশানের দিকে তাকালেন। কাঁপা গলায় বললেন, 'এসো, জিশান...।'

জিশান ঘরের ভেতরে দু-পা ঢুকে জিগ্যেস করল, 'বাড়িতে আর কেউ নেই?'

'না, নেই। আমি একা—ভীষণ একা।' একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানুষটা ঃ 'তুমি হঠাৎ এলে। আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে...।' একটু চুপ করে থেকে ডানহাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'একটু বোসো ওখানে—।'

কী যে হল জিশানের—বৃদ্ধের অনুরোধ ফেলতে পারল না। হঠাৎ বাবার মুখটা ভেসে উঠল সামনে। ও চেয়ারটায় বসে পড়ল। মিসাইল গানটা পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

তারপর অবাক হয়ে বলল, 'ফাঁকা বাড়িতে আপনি একা-একা বসে টিভি দেখছেন!'

'দেখছি আর কোথায়! শুনছি—' করুণ হাসলেন ঃ 'আমি চোখে দেখতে পাই না। ছানি...ছানি...।'

জিশান বৃদ্ধকে দেখছিল। দুটো চোখের মণিই ঘোলাটে—যেন চোখের মণির ওপরে মাছের আঁশ বসানো। চোখের কোণে পিচুটি। ওপরের ঠোঁট বসে গেছে ভেতরে। বোধহয় ওপরের পাটির সামনের কয়েকটা দাঁত নেই। দুটো ঠোঁটই থরথর করে কাঁপছে। ঠোঁটের একপাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে।

লক্ষ করল, ওর চেয়ারের পাশে একটা ছোট টেবিলে অনেক ওষুধপত্র।

জিশান জিগ্যেস করল, 'আপনার এত বয়েস! চোখে দেখতে পান না! তা সত্ত্বেও গেম সিটিতে মক সিটিজেন হয়ে এসেছেন!' একটু থেমে

তারপর ঃ 'যদি আপনার কোনও বিপদ-আপদ হয়!'

হাসলেন বৃদ্ধ। কয়েকটা দাঁত দেখা গেল। কয়েকটা নেই। খসখসে কাঁপা গলায় বললেন, 'আমার তিন কুলে আর কেউ নেই। এই বয়েসে তাই আমার আর কোনও ভয় নেই। তা ছাড়া...তা ছাড়া...আমার ছেলে সংগ্রামজিৎ—আমার বৃদ্ধ বয়েসের ছেলে—এই কিল গেমে হেরে গিয়েছিল। শেষ সংগ্রামটায় আর জিততে পারেনি বেচারা...।' কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন। তারপর ঃ 'কিল গেমের আগে অনেকগুলো গেমের রাউন্ড জিতেছিল সঙ্গু—সঙ্গু ওর ডাকনাম।'

'আপনি...আপনি কি ওল্ড সিটিতে থাকতেন?'

'হ্যাঁ—' ধীরে-ধীরে ওপরে-নীচে মাথা নাড়লেন। কাশলেন দুবার। ঘোলাটে দু-চোখ মেলে জিশানের চোখে তাকালেন ঃ 'সংগ্রাম হেরে যেতেই ওর মা চোখ বুজল—ধাক্কাটা নিতে পারল না। ফলে সংসারে আমি একা হয়ে গেলাম। সে বহুদিন আগের কথা...।

'সংগ্রামের পাওয়া প্রাইজ-মানি নেহাত কম ছিল না। তাই একা আমি একটা ডিসিশান নিলাম—নিউ সিটির ইকনমিক ইনডেক্সের পাঁচিল ডিঙিয়ে গেছি বলে ওল্ড সিটি ছেড়ে এখানে চলে এলাম। তারপর থেকে প্রত্যেকটা কিল গেমে আমি মক সিটিজেন হয়ে পার্টিসিপেট করি। একটা নিরিবিলি ফাঁকা বাড়ি দেখে তাতে ঢুকে পড়ি। আর সঙ্গুর কথা ভাবি...' বৃদ্ধ কথা বলতে-বলতে হাঁপাচ্ছিলেন ঃ 'আমি...আমি এই...গেম সিটির সিনিয়ারমোস্ট সিটিজেন...।'

জিশান বৃদ্ধের কথা শুনছিল আর মাঝে-মাঝেই টিভির দিকে তাকাচ্ছিল। টিভিতে কমেন্টেটররা জিশানের লোকেশনের কথা বলছিল। আর এও বলছিল যে, দুজন কিলার ক্রমশ জিশানের কো-অর্ডিনেটের দিকে এগিয়ে আসছে।

সুতরাং হাতে আর খুব বেশি সময় নেই।

জিশান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সূক্ষ্ম শব্দ হলেও বৃদ্ধ সেটা টের পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে...তোমাকে তো আবার...ছুটতে হবে।'

চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জিশানের কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন, 'সঙ্গু খুব চেষ্টা করেছিল...কিন্তু পারেনি। আমার খুব আশা...কেউ না কেউ পারবে। এই বয়েসে মরার ভয় করি না। তাই...আশায়-আশায় আসি...।'

আন্দাজে ভর করে জিশানের গায়ে হাত দিলেন বৃদ্ধ। সেখান থেকে হাতড়ে-হাতড়ে ওর মুখে চলে গেলেন। তারপর ওর চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে কাঁপা গলায় বললেন, 'সঙ্গু, এবার তোকে জিততেই হবে! মনে থাকে যেন...।'

জিশান বৃদ্ধকে দেখছিল। ভাঁজে-ভাঁজে ঝুলে পড়া চামড়ায় তৈরি এক প্রাগৈতিহাসিক মূর্তি। সেই মূর্তির ছানি পড়া চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

জিশান আলতো গলায় বলল, 'চেষ্টা করব...খুব চেষ্টা করব...।' তারপর পকেট থেকে মিসাইল গান বের করে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আবার পথ চলা। তবে আশার কথা, সূর্য এখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। একটু পরেই নেমে আসবে অন্ধকার। প্রিয়তম অন্ধকার।

●

অন্ধকার যখন জিশানকে কালো চাদরে জড়িয়ে নিল তখন জিশান নতুন করে আবার অবাক হল। ওর গায়ের ফুল স্লিভ টি-শার্ট আর প্যান্টের কালো কাপড়ের ওপরে জ্বলজ্বল রঙিন রেখায় ফুটে উঠেছে নানান হিজিবিজি নকশা। এরকম লুকোনো ফ্লুওরেসেন্ট কালারের কথা জিশান কখনও শোনেনি। এটা শ্রীধর পাট্টার আরও একটা সারপ্রাইজ। অন্ধকারের মধ্যেও জিশানকে তাক করে গোলাগুলি ছুড়তে প্রোটন বা সুখারামের কোনও অসুবিধে হবে না। আর জিশান শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত যে, প্রোটন এবং সুখারামের পোশাকে এরকম কোনও হিড্‌ন ফ্লুওরেসেন্ট কালারের নকশা নেই।

অন্ধকার নেমে আসার পর আরও একটা ঘটনা ঘটল গেম সিটিতেঃ গেম সিটির নানান জায়গায় জোরালো আলোর বন্যা বয়ে গেল—রাস্তায়, মাঠে-ঘাটে, নদীর দু-পাড়ে, ফ্লাইওভারে, পাহাড়ে, এমনকী জঙ্গলেও।

তবুও তারই মধ্যে জিশান ছোটখাটো ছায়ার আড়াল খুঁজতে লাগল।

ও জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখল, দু-একটা জন্তু-জানোয়ার উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে পালাচ্ছে অন্ধকার অঞ্চলের দিকে।

জিশান একটা ছোট্ট আঁধারি অঞ্চল বেছে নিল। তারপর রুকস্যাক পিঠে ঝোলানো অবস্থায় একটা ঝুপসি গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল।

অনেকটা ওপরে ওঠার পর ও একটা শক্তপোক্ত 'ওয়াই'-এর মতো ডালের খাঁজ খুঁজে পেল। শরীরটাকে ভাঁজ-টাজ করে মানিয়ে সেই খাঁজে জুত করে বসল। রুকস্যাক থেকে বের করে নিল ট্র্যাকার আর প্লেট টিভি।

জঙ্গলের বুনো গন্ধ জিশানের নাকে ঝাপটা মারছিল। কানে আসছিল পাখির ডাক, অজানা পশুর ডাক। আর সব ছাপিয়ে ঝিঁঝির ডাক।

ট্র্যাকার দেখল জিশান। লাল ডট দুটো সবুজ ডটের কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নেই। কিন্তু জিশান কী করবে? এই ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরে আর কত দৌড়বে? সাংঘাতিক খিদে না পেলে ও কখনও ফুড পয়েন্টের খোঁজে যায়নি।

একটু আগেই ও ফুড পয়েন্ট থেকে খেয়ে নিয়েছে। তার সঙ্গে পেট ভরে জল খেয়েছে। ঘাড়ে মাথায় ভালো করে জল দিয়েছে। আশায়-আশায় বারবার ভেবেছে, রাত পোহালেই লড়াই শেষ। তখন ওর, মিনির আর শানুর জীবনে সত্যিকারের ভোর আসবে।

কিন্তু এই গাছে ও কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে? লাল ডটগুলো আরও কাছে এগিয়ে এলে ও তখন বরং গাছ পালটে নেবে। কিংবা ভেবে-টেবে যা হোক কিছু করবে।

ট্র্যাকার রেখে প্লেট টিভি অন করল জিশান। ভলিয়ুম খুব কমিয়ে দিল। দেখল, টিভিতে ও আর সংগ্রামজিতের বৃদ্ধ বাবা। তার সঙ্গে ধারাভাষ্য চলছে। আর মাঝে-মাঝে জাম্প কাট করে ঢুকে পড়ছে সংগ্রামজিতের কিল গেমের ক্লিপিংস।

একটু পরেই বৃদ্ধের মুখের ক্লোজ আপ দেখা গেল। জিশানের মনে হল, বৃদ্ধ যেন ঘোলাটে চোখ মেলে সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন।

●

টিভি অফ করে নিজের দিকে তাকাল জিশান।

ও লুকোবে কী! ওর সারা গায়ে রঙিন আলোর নকশা জ্বলজ্বল করছে। এরকম 'ব্রাইট টারগেট' একজন কালার ব্লাইন্ড শুটারও মিস করবে না। আর সুখারাম এবং প্রোটন তো সুপারকিলার!

হঠাৎ জিশানের মনে হল টি-শার্টটা খুলে ফেললে কেমন হয়! তা হলে অন্তত রঙের রোশনাইয়ের হাত থেকে বাঁচা যাবে। তারপর প্যান্টের পালা।

টি-শার্টের বুকপকেট থেকে মিনি আর শানুর ফটোটা বের করে নিল। অন্ধকারে ওদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই একটা লম্বা শ্বাস ফেলে প্যান্টের কোমরের পটি টেনে ঢিলে করে জাঙিয়ার ইলাস্টিকের পিছনে ফটোটা চালান করে দিল। এটাই এখন সবচেয়ে সেফ জায়গা।

তারপর রুকস্যাক থেকে হান্টিং নাইফ বের করে টি-শার্টের চার-পাঁচ জায়গায় লম্বা করে ছুরি টেনে দিল। হাতের কয়েক টানে টি-শার্টের খোসা চটপট ছাড়িয়ে ফেলল। কাপড়ের ছেঁড়া টুকরোগুলো ছুড়ে দিল অন্ধকারের দিকে।

কিন্তু একইসঙ্গে জিশান চমকে উঠল।

ফুল স্লিভ টি-শার্টের নীচে ওর আর কোনও পোশাক ছিল না। ও অবাক হয়ে দেখল, ওর গায়ে ঠিক জামাটার মতোই ফ্লুওরেসেন্ট রঙের জ্বলজ্বলে ডিজাইন আঁকা। টি-শার্টটা ও না ছিঁড়ে ফেললেই পারত। কিন্তু এই নকশা ওর গায়ে কে, কখন আঁকল? কেউ তো আঁকেনি!

শ্রীধর পাত্রা বোধহয় জিশানের দিকে লক্ষ রাখছিলেন, মজা দেখছিলেন। কারণ, তখনই জিশানের স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল।

ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে নিষ্ঠুরতার হিংস্র কারিগর বলে উঠলেন ঃ 'সারপ্রাইজ, জিশান—আবার সারপ্রাইজ...।'

জিশান চুপ করে রইল। ওর অবাক ভাবটা তখনও কাটেনি।

'শোনো, জিশান / এই রঙের ফান। এই রঙে আঁকা ড্রেস এক ঘণ্টা গায়ে দিয়ে থাকলেই তোমার বডি টেম্পারেচারে রঙের কেমিক্যালটা অদ্ভুত এক রিয়্যাকশন ইনিশিয়েট করে তোমার ড্রেসের ফ্যাব্রিক চুঁইয়ে তোমার গায়ে চলে যাবে। তোমার পোশাকের নকশার ফোটোকপি এঁকে দেবে তোমার চামড়ায়।' হাসলেন ঃ 'এক্সট্রিম্‌লি সুপার-সারপ্রাইজিং টেকনোলজি—তাই না?'

জিশান চুপচাপ ভাবছিল। তাই শ্রীধরের কথাবার্তার সময় একটুকরো জবাবও দিচ্ছিল না। এখন ওর সামনে আর কী-কী পথ খোলা রয়েছে সেটাই চিন্তা করছিল। আধো-আঁধারিতে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে রঙিন উলকি আঁকা আদিবাসী বলে মনে হচ্ছিল।

'থ্যাংক—ইউ—মার্শাল।' কাটা-কাটা সুরে বলল জিশান এবং ফোন রিসেট করে দিল।

জিশান বুঝতে পেরেছিল, খানিকক্ষণ পরপরই ওকে লুকোনোর জায়গা পালটাতে হবে। তবে ও জঙ্গলের মধ্যেই থাকতে চায়—খোলা জায়গায় যেতে চায় না। কারণ, খোলা জায়গায় গেলে ওর একটা বাহন দরকার—গাড়ি কিংবা মোটরবাইক। সেটা কীভাবে খুঁজে পাবে ও জানে না। গেম সিটিতে এখন কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার।

গাছ থেকে নেমে পড়ল জিশান। জঙ্গলের মধ্যে এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে আস্তানা পালটাতে লাগল। কখনও গাছের ওপরে, কখনও ঝোপঝাড়ের আড়ালে, কখনও বা এবড়োখেবড়ো পাথর কিংবা ঢিবির খাঁজে।

উড়ন্ত জোনাকির আলো ওর চোখে পড়ছিল। চোখে পড়ছিল জোড়া-জোড়া জ্বলন্ত সবুজ চোখ।

নানান জায়গায় আলো জ্বলে ওঠায় জঙ্গলটা ভারী অদ্ভুত লাগছিল। দুটো লাইটেড জোনের মাঝামাঝি জায়গাটা অনেক বেশি গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা বলে মনে হচ্ছিল।

জিশানের কবজিতে বাঁধা কাউন্টডাউন ওয়াচে সময় ক্রমেই জিরো আওয়ারের দিকে এগোচ্ছিল—সেটাই জিশানের একমাত্র আশা-ভরসা-আনন্দ। তবে ও বুঝতে পারছিল, এভাবে পালিয়ে-পালিয়ে লাল ডটজোড়ার হাত থেকেও বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবে না। কিছু একটা ওকে করতে হবে—এবং সেই 'করা'টা শ্রীধর পাত্রার পছন্দ হোক বা না হোক।

জঙ্গলের মধ্যে ছুটে-ছুটে নতুন একটা আস্তানা খুঁজে পেল। একটা বেঁটে মোটা গাছ। সার্চলাইটের আলো ছিটকে পড়েছে তার গুঁড়িতে, পাতায়। গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল। শরীরে আর কতটুকু শক্তি বাকি আছে কে জানে!

রুকস্যাক থেকে হান্টিং নাইফ বের করে নিল। পকেট থেকে স্পার্কার বের করে হান্টিং নাইফের ফলাটা গরম করতে শুরু করল। হ্যাঁ, মাইক্রোট্রান্সমিটারটা এবার শরীর থেকে ও বের করবেই। লাল ডটজোড়ার সঙ্গে সবুজ ডটটা আর লুকোচুরি খেলতে পারছে না।

জিশানের চোয়াল শক্ত হল। যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য তৈরি হল।

বাঁ-হাতের বিশেষ জায়গাটার দিকে তাকাল। ওর শরীরটা হাঁটুর পর থেকে নীচের দিকে পায়ের পাতা পর্যন্ত আলোয় আলো। ওপরদিকটা অন্ধকারে ঢাকা—তবে সে-অন্ধকার আলোর ছটায় কিছুটা ফিকে।

বিশেষ জায়গাটা অনুমান করতে জিশানের খুব একটা অসুবিধে হল না। কিন্তু হান্টিং নাইফের ফলা সেখানে বসাতে না বসাতেই ওর ফোন বাজতে শুরু করল।

শ্রীধর পাত্রার ফোন নিশ্চয়ই।

জিশান গাছের আড়ালে রাখা রুকস্যাকের দিকে তাকাল। কিন্তু স্যাটেলাইট ফোনটা বের করার জন্য একটুও ব্যস্ত হল না। বরং ওর ডানহাত কসাইয়ের কাজ করে চলল।

ওঃ! আঃ! মিনি! শানু!

মিনি আর শানুর কথা ভেবে জিশান যন্ত্রণাটাকে মনে-মনে কমাতে চেষ্টা করল। একইসঙ্গে মাইক্রোট্রান্সমিটারের খোঁজে বাঁ-হাতের মাংস খুঁড়তে লাগল।

একটু পরেই ছুরির খোঁচায় চটচটে আঠালো লাল রঙের তরল মাখা ট্রান্সমিটারটা বেরিয়ে খসে পড়ল মাটিতে। হাতড়ে-হাতড়ে সেটাকে তুলে নিল জিশান। ওটাকে গাছের গুঁড়ির গায়ে চেপে ধরে হান্টিং নাইফের ধারালো ফলার পোচে দু-টুকরো করে দিল।

এখন ওই খুদে যন্ত্রটা কাউকে আর কোনওরকম সিগন্যাল পাঠাতে পারবে না। সুখারাম আর প্রোটনের ট্র্যাকার থেকে সবুজ ডটটা নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে নিভে গেছে।

আ—আ—ঃ!

যন্ত্রণার মধ্যেও জিশানের বুকে ঠেলে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ও রুকস্যাক খুলে একটা 'ফার্স্ট এইড' প্যাক বের করে নিল। প্যাকের বোতাম খুলে চটপট বের করে নিল একটা কেমিক্যালের গুঁড়ো—'ব্লাড কোয়াগুলেটর'। সেটা একখাবলা তুলে নিয়ে চেপে ধরল বাঁ-হাতের ক্ষতস্থানে। সঙ্গে-সঙ্গে টের

পেল, যন্ত্রণা কমতে শুরু করেছে। একটু পরে রক্ত পড়াও বন্ধ হয়ে যাবে।

রুকস্যাকের ভেতরে স্যাটেলাইট ফোন তখনও একঘেয়েভাবে বেজে যাচ্ছিল। শ্রীধর পাট্রা সহজে ক্ষান্ত হওয়ার পাত্র নন।

জিশান যখন ফোন ধরল ততক্ষণে প্রায় দশমিনিট কেটে গেছে। এবং ফোন ধরামাত্রই শোনা গেল শ্রীধর পাট্রার হিংস্র হুঙ্কার।

'জিশান, য়ু বাস্টার্ড! সন অফ আ বিচ! হাউ ডেয়ার য়ু...!'

জিশান উত্তরে শব্দ করে হাসল : 'এ ছাড়া আমার আর কোনও পথ নেই রে, শুয়োরের বাচ্চা!'

'তুই তোর বউ আর ছেলের কথা কি ভুলে গেছিস?' একটা খিদে পাওয়া বাঘ যেন গর্জন করে প্রশ্নটা করল।

'না, ভুলিনি—।'

'ঠিক আছে। তুই যেভাবে খেলতে চাস সেভাবেই খেলব। আমি তোর বউ আর ছেলেকে ওল্ড সিটি থেকে এখুনি তুলে নিয়ে আসছি। তারপর দেখি...তোর পাগলামো বন্ধ করা যায় কি না!'

শ্রীধর হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জিশান ততক্ষণে ফোন কেটে দিয়েছে।

ও রুকস্যাক গুছিয়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আবার পথ চলতে শুরু করল। অন্ধকার এলাকা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ও একেঁবেঁকে ছুটতে লাগল। এখন ওর 'হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'। কারণ, খুনিদের ট্র্যাকারে আর কোনও সবুজ ডট নেই। আর টিভির কমেন্টেটররা কখনও ওর পজিশন কো-অর্ডিনেট কমেন্ট্রিতে বলবে না। সেটাই নিয়ম। তবুও শ্রীধর যদি ওদের নিয়ম ভাঙতে বলেন, তা হলে আর-এক মুশকিল। কারণ, লক্ষ-হাজার ক্যামেরার নম্বর আর লোকেশন চেক করে, সেখান থেকে জিশানের পজিশন কো-অর্ডিনেট ব্লক কম্পিউট করে, রানিং কমেন্ট্রিতে বলতে-বলতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যাবে—ততক্ষণে জিশান হয়তো অন্য কোথাও ছিটকে যাবে। তা ছাড়া কমেন্টেটররা এত টেকনিক্যাল কারিকুরিতে অভ্যস্ত নয়। ফলে ওরা খুনিদের সাহায্য করার বদলে বিভ্রান্ত করবে, এই সম্ভাবনাটাই বেশি।

সুতরাং, হাতে বেশ যন্ত্রণা হলেও জিশানের নিজেকে এখন 'স্বাধীন' মনে হচ্ছিল।

একটা ঘন গাছগাছালির অন্ধকারে আস্তানা গেড়ে প্রথমে ট্র্যাকার খুলল জিশান। শুধুমাত্র দুটো লাল ডট ট্র্যাকারের মানচিত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে ওরা যে ঠিক কোথায় সেটা বোঝা গেল না। আর সবুজ ডট থেকে ওদের দূরত্বই বা কত কে জানে!

এই অসুবিধেটার কথা জিশান ভাবেনি।

একটু পরেই টিভি খুলল।

'...স্টানিং নিউজ, ফোক্‌স। কিলারদের ট্র্যাকার থেকে জিশান পালচৌধুরী হারিয়ে গেছে। ওই দেখুন—প্রোটনের ট্র্যাকার! স্ক্রিনে কোনও গ্রিন ডট নেই! এবার দেখুন কিলার সুখারামের ট্র্যাকার—নো গ্রিন ডট। তা হলে তো কিলার দুজন এখন অন্ধ! ওরা জিশানকে কী করে ট্র্যাক করবে কে জানে!

'নিশ্চয়ই জিশান মাইক্রোইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটারটা কোনও না কোনওভাবে অকেজো করে দিয়েছে। তখন জিশান নিশ্চয়ই আমাদের ক্যামেরা নেটওয়ার্কের "ব্লাইন্ড স্পট"-এ ছিল। তাই টিভিতে ব্যাপারটা আপনাদের আমরা দেখাতে পারিনি। তবে আমাদের মাননীয় মার্শালের কন্ট্রোল রুমে অনেক হাই পাওয়ার ক্যামেরা নেটওয়ার্কের কানেকশান রয়েছে। ফলে জিশানের কীর্তি মাননীয় মার্শালের চোখ এড়ানোর কথা নয়। মার্শালের কন্ট্রোল রুম থেকে ফিডব্যাক পেলেই আমরা সেই পোরশানের—মানে, যে-পোরশানটা আমরা দেখাতে পারিনি—সেটার ভিডিয়ো ফুটেজ আপনাদের দেখিয়ে দেব। জানিয়ে দেব, জিশান কীভাবে কিলারদের ট্র্যাকারকে ফাঁকি দিয়েছে...।'

একটু পরেই জিশান সেই ফুটেজ দেখতে পেল। এবং আরও দেখতে পেল, অগ্নিশর্মা শ্রীধর পাট্টা হিংস্রভাবে পিস ফোর্সের কমান্ডারদের নির্দেশ দিচ্ছেন। বলছেন, এই মুহূর্তে ওল্ড সিটিতে ফৌজ পাঠাতে। সেই ফৌজ জিশানের বউ আর ছেলেকে অ্যারেস্ট করে শুটারে উড়িয়ে দশ মিনিটের মধ্যে নিউ সিটিতে নিয়ে আসবে—শ্রীধর পাট্টার কাছে।

টিভিতে শ্রীধরের পাগল করা চিৎকার শোনা গেল ঃ 'গো! গো! গো!...গো-ও-ও-ও!'

তারপরই পরদায় ভেসে উঠল ওল্ড সিটির ছবি। ভাঙাচোরা নোংরা পথঘাটের নানান জায়গায় মানুষের ভিড় আর জটলা। সবাই প্লেট টিভিতে কিল গেম দেখছে। এত রাতেও ওল্ড সিটির সব দোকানপাট খোলা—বিশেষ করে খাবারের দোকান। ফুটপাথের এখানে-সেখানে তেলেভাজা, ঝালমুড়ি, শোনপাপড়ি, মালাই বরফ নিয়ে বসে আছে বহু হকার। মাঝে-মাঝেই শোনা যাচ্ছে জনতার উত্তেজনা আর উল্লাসের চিৎকার।

দৃশ্য বদলে গেল।

রাতের আকাশে ছিটকে লাফিয়ে উঠল আটটা শুটার। দুরন্ত গতিতে শুটারবাহিনী ছুট লাগাল ওল্ড সিটির আকাশের দিকে।

জিশানের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। রক্তের অণুতে-অণুতে ঘটে গেল আণবিক বিস্ফোরণ।

ও এরপর যা করল শ্রীধর পাট্টা সেটা ভাবতে পেরেছিলেন কি না কে জানে!

রুকস্যাকে সব গুছিয়ে নিল—হাতে রইল শুধু প্লেট টিভি। তারপর ও ছুট লাগাল।

আলো আর অন্ধকার দাবার ছকের মতো চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা পছন্দসই জায়গা খুঁজতে লাগল জিশান। এমন একটা জায়গা যেখানে আলো কটকট করছে—আলোয়-আলোয় জায়গাটা প্রায় দিনের মতো।

দু-তিন মিনিটের মধ্যেই সেরকম একটা জায়গা খুঁজে পেল। তখন লাইটেড জোনের কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে দাঁড়াল। কারণ, ও জানে, এখানে অনেক ক্যামেরা লাগানো আছে। টিভির লাইভ টেলিকাস্ট কোটি-কোটি দর্শক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

সুতরাং এইবার!

জিশানের খালি গা। আলোর তেজে শরীরের ফ্লুওরেসেন্ট রঙের ডিজাইন বেশ ফিকে দেখাচ্ছে। ওর বুকে, হাতে, এখানে-সেখানে রক্তের দাগ। গায়ে ঘামের পরত। তাতে শুকনো পাতার টুকরো-টাকরা লেগে আছে। আর বাঁ-হাতের বাহু গড়িয়ে রক্তের ধারা নামছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছের গায়ে লাগানো বেশ কয়েকটা ক্যামেরা নজরে পড়ল। সুতরাং...।

এইটাই ঠিক জায়গা, এইটাই ঠিক সময়।

প্লেট টিভিটা একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেখে শূন্যে দু-হাত ছুড়ে দিল জিশান। ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে চিৎকার করে কথা বলতে শুরু করল।

'আমার ওল্ড সিটি আর আর নিউ সিটির ভাই-বোনেরা! কিল গেমের খেলার নিয়মে কোথাও লেখা নেই যে, হাতের মাংস কেটে মাইক্রোইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার খুলে ফেলে দেওয়া যাবে না! নিয়মে এ-কথা বলা নেই যে, কিল গেমে কোনও পার্টিসিপ্যান্ট যদি এই ট্রান্সমিটার খুলে ফেলে খুনিদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে তা হলে নিউ সিটির মার্শাল শ্রীধর পাট্টা সেই খেলোয়াড়ের বউ আর ছোট্ট ছেলেকে ওল্ড সিটি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে আসবেন। তারপর তাদের টরচার করার ভয় দেখিয়ে কিল গেমের সেই প্লেয়ারকে ব্ল্যাকমেল করে খতম করার চেষ্টা করবেন।

'আমার নিউ সিটি আর ওল্ড সিটির বন্ধুরা, আমিই সেই হতভাগ্য প্লেয়ার। ওই দেখুন, আটটা শুটার রওনা হয়ে যাচ্ছে ওল্ড সিটির দিকে—আমার বউ মিনি, আর ছোট্ট ছেলে শানুকে তুলে নিয়ে আসার জন্যে।

'এতদিন ধরে টিভিতে, রোলার সাইন আর মুভি-বোর্ডে, মার্শাল প্রচার করে এসেছেন যে, কিল গেম ভীষণ ফেয়ার গেম। এই সেই ফেয়ারনেসের

নমুনা! এই ফেয়ারনেসের মুখে আমি পেচ্ছাপ করে দিই!'

টিভি সেন্টার তখন দারুণ তৎপরতায় আটটা শুটারকে দেখিয়ে চলেছে। যেন আটটা হানাদার বাজপাখি। শুটারগুলো ওল্ড সিটির আকাশে পৌঁছে গেছে। ওরা একসঙ্গে শিস দিয়ে ধেয়ে চলেছে নীচের দিকে। ওরা নামছে।

সেই ছবিতে জাম্প কাট করে ঢুকে পড়ছে জিশানের চলচ্চিত্র এবং মার্শালের মুখ—শক্ত চোয়াল, কপালে ভাঁজ। আর তার ফাঁকে-ফাঁকে মিনি আর শানুর সুন্দর মিষ্টি ছবি।

'আমার ওল্ড সিটির বন্ধুরা, আমার নিউ সিটির ভাই-বোনেরা! আপনারা আমাকে ন্যায়বিচার দিন। অবিচারের এগেইন্স্টে আপনারা রুখে দাঁড়ান! আপনাদের ঘরেও তো মা, বাবা, বোন, ভাই, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। আপনারা এই নোংরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান! আপনাদের কাছে আমি...আমি...আমার বউ আর ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইছি। ওদেরকে বাঁচান! আমাকে...আমাকে...সৎভাবে লড়তে দিন! প্লিজ! ওদের বাঁচান! আর কিছু আমি চাই না...কিচ্ছু চাই না...।'

কথা বলতে-বলতে জিশান প্যান্টের কোমরের আড়াল থেকে মিনি আর শানুর ফটোটা শূন্যে তুলে ধরল। কান্না ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল, 'ওদের আপনারা বাঁচতে দিন! সৎ আর সুন্দরভাবে বাঁচতে দিন! পৃথিবী এখনও আমাদের সবার কাছে সুন্দর। প্লিজ, ওদের...ওদের বাঁচতে দিন...!

জিশান কান্না চাপতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। মিনি আর শানু যে ওর সবচেয়ে বড় দুর্বল জায়গা!

কিন্তু একইসঙ্গে ও চোয়াল শক্ত করে রেখেছিল। চোয়ালের রেখা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কিল গেমে ও মোটেই হারতে চায় না।

●

জিশানের মরিয়া আবেদন লক্ষ-লক্ষ টিভি দর্শকের কাছে পৌঁছে গেল। গেল শুধু নয়, তাদের অনেকেরই বুকে গিয়ে বিঁধল। তারা ওল্ড সিটির মানুষ। তারা নিউ সিটির মানুষ।

নিউ সিটিতে যে-ঘটনা ঘটল সেটা এককথায় অভিনব। যেসব মানুষ ভাবত তাদের মধ্যে আবেগ ব্যাপারটা দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়েছে, হঠাৎই তারা আবেগের একটা ঢেউ টের পেল। সেই ঢেউটা যেমন বিশাল, তেমনই শক্তিশালী।

আর যেসব মানুষ ভাবত তাদের মধ্যে আবেগ-টাবেগ খুব একটা বেশি-টেশি নেই-টেই...নিউ সিটিতে থাকতে-থাকতে সেই ব্যাপারটা বলতে গেলে শুকিয়ে-টুকিয়ে গেছে, তারাও হঠাৎ টের পেল তাদের শরীরে, মনে কিংবা

মাথায় একটা হিমশীতল পোকা কী এক অলৌকিক ম্যাজিকে আচমকা যেন নড়ে উঠল।

নিউ সিটির মানুষদের অনেকেই ফোন তুলে নিয়ে তাদের চেনা বৃত্তের মানুষজনকে ফোন করতে শুরু করল। কিল গেম খেলায় এই অবিচার কিংবা ব্যভিচার তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। শ্রীধর পাট্টা যতই ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্ট আর পিস ফোর্সের মার্শাল হোন না কেন এই অন্যায় তিনি করতে পারেন না।

নিউ সিটির মানুষদের মধ্যে শুধু কথার দেওয়া-নেওয়া চলতে লাগল। অন্ধকার রাতের সাইবারস্পেসে মানুষের ক্ষোভ আর অসন্তোষের ঝাঁজ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুপারগেম্স কর্পোরেশনের কন্ট্রোল রুমের হেলপ্লাইনে ফোনের সুনামি ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পাশাপাশি ই-মেল আর ভিডিয়ো কলের বন্যা। আগের বারের তুলনায় এবারের ক্ষোভ-বিক্ষোভ বোধহয় কম করেও একশো গুণ বেশি।

সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এ শ্রীধর পাট্টা রাগে দাউদাউ করে জ্বলছিলেন। দুটো আর্ক কম্পিউটার মাথায় ওপরে তুলে সপাটে আছড়ে মারলেন মার্বেল মোড়া মেঝেতে। ওঁর শরীর রাগে থরথর করে কাঁপছিল।

নিউ সিটির সব হতচ্ছাড়া মানুষগুলো হঠাৎই যেন যক্ষ্মা-পাগল হয়ে গেছে। ওদের টেলিফোন, ই-মেল আর ভিডিয়ো কলের ভাষা এতটাই নোংরা হয়ে গেছে যে, শ্রীধরের মাথার শিরা দপদপ করছিল—সেইসঙ্গে বুকে আর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। এই বুঝি হার্টফেল হয়ে যাবে!

আকাশ থেকে নিউ সিটির দিকে তাকালে তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য শ্রীধর দেখতে পেতেন। রাতের রাস্তায় ক্রমশ গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, অসংখ্য নেংটি ইঁদুর মুখে মিনি টর্চ কামড়ে ধরে ছুটে চলেছে।

কিন্তু ওরা ছুটে চলেছে কোনদিকে?

কিছু গাড়ি ছুটে যাচ্ছে গেম সিটির দিকে, কিছু গাড়ি ছুটে চলেছে সুপারগেম্স কর্পোরেশনের বিল্ডিং-এর দিকে, আর বাকি গাড়ির ঝাঁক ছুটে যাচ্ছে সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর দিকে।

নিউ সিটির বেশ কয়েকটা রাস্তায় গাড়ির ঢলের এই অস্বাভাবিক দৃশ্য পিস ফোর্সের নাইটগার্ডদের নজর এড়ায়নি। তারা খবরটা ফোন করে হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দিচ্ছিল। সেখান থেকে খবর পৌঁছে যাচ্ছিল ওপরের স্তরে, তারপর আরও ওপরের স্তরে, এবং আরও ওপরে...।

শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্তরে—অর্থাৎ, শ্রীধর পাট্টার কানে—খবরটা পৌঁছে গেল। কানে শুধু নয়—চোখেও পৌঁছল। কারণ, ওঁর ঘরের তিনটে টিভিতে

তখন এই বিচিত্র 'কার র‍্যালি'-র ফুটেজ দেখানো হচ্ছিল।

ব্যাপারটা কী? একটা মানুষের আবেদনে এত মানুষের চঞ্চল হয়ে ওঠার ঘটনা নিউ সিটির ইতিহাসে কখনও ঘটেনি।

এটাকে কি 'বিপ্লব' বলা যেতে পারে? কীভাবে কন্ট্রোল করা যায় এই চঞ্চলতা?

●

ওল্ড সিটিতে সেই সময়ে যা ঘটছিল, ওল্ড সিটির ইতিহাসে কখনও সেরকম ঘটেনি।

ওল্ড সিটির হাজার-হাজার মানুষ পাগলের মতো চিৎকার করছে, 'শ্রীধর পাট্রা, মুর্দাবাদ! জিশান, জিশান, জিন্দাবাদ! শ্রীধর পাট্রা, মুর্দাবাদ!...।' আর অন্ধকার খানাখন্দে ভরা রাস্তা ধরে তারা হইহই করে ছুটে চলেছে জিশানের বস্তির দিকে। তাদের কারও-কারও হাতে জ্বলন্ত মশাল। মাঝে-মাঝে তাদের কেউ-কেউ আকাশের দিকে চোখ তুলে শুটারবাহিনীর দিকে দেখছে। দেখছে ওদের লেজ থেকে বেরোনো আগুনের হলকা। শুনছে ওদের তীক্ষ্ণ শিস।

জিশানের বস্তির এলাকা তখন ছায়া-ছায়া কালো-কালো মানুষে-মানুষে ছয়লাপ। তাদের সমবেত স্বরে জিশানের জয়ধ্বনি, আর শ্রীধরের নৃশংসতার প্রতিবাদ।

'শ্রীধর পাট্রা, নিপাত যাক!'

'আমার ভাই, তোমার ভাই / জিশানকে ফেরত চাই!'

'নিউ সিটি, মুর্দাবাদ!'

'ওল্ড সিটি, জিন্দাবাদ!'

'কিল গেম / শেম-শেম!'

'কিল গেম, নিপাত যাক! শ্রীধর পাট্রা নিপাত যাক!'

ফেটে পড়া আওয়াজে স্লোগান চলতেই লাগল। রাতের ওল্ড সিটি জনতার রাগী চিৎকারে ফেটে চৌচির হয়ে যেতে লাগল।

শুটারগুলো যখন জিশানের বস্তির কাছাকাছি ল্যান্ড করতে চাইল, তখন ওরা কোনও জায়গা খুঁজে পেল না। রাস্তার ওপরে শুধু মানুষের মাথা আর মানুষের মাথা! আর তারই মাঝে-মাঝে মশালের আলোর এলোমেলো যতিচিহ্ন।

শিস দিয়ে কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি করল ওরা। স্যাটেলাইট ফোনে ঘন-ঘন খবর পাঠাতে লাগল ওপরওয়ালাকে।

'এখন কী করব, স্যার?'

'শুট ডাউন দ্য ব্লাডি ক্রাউড, য়ু মোরন! শুট রাইট নাও! ওদের ছড়িয়ে ছিটকে ছত্রখান করে দাও! চুরচুর করে দাও! যেভাবে হোক জিশানের ওয়াইফ আর সানকে আমাদের চাই-ই চাই! আমাদের মার্শালের স্পেশাল অর্ডার। গো অ্যাহেড...রাইট নাও!'

একটা শুটারের একজন গার্ড জনতার দম আটকানো ভিড় লক্ষ্য করে ওর অটো-পিস্তল ফায়ার করল।

কয়েক ঝলক আলো। কয়েকটা 'ফট-ফট' শব্দ।

জনতার ভিড়ে কারও গায়ে গুলি লাগল কিনা না বোঝা গেল না। তবে দশ-বিশজন মানুষ চিৎকার করে ভয়ে ছুটে পালাল। বাকি কয়েক হাজার মানুষ কিন্তু নড়ল না। দু-চারজন চেঁচিয়ে উঠল, 'শুয়োরের বাচ্চাদের কাছে কত গুলি আছে? একশো? দু-শো? আর আমরা হাজার-হাজার। মিনি আর শানুকে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না!'

'ছাড়ব না, ছাড়ব না!' জনসমুদ্রগর্জনে সেই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

আর একইসঙ্গে জনতার ঝাঁক থেকে বেশ কয়েক ডজন গুলি ছুটে গেল শুটারবাহিনী তাক করে। দুজন গার্ডের হাতে আর কোমরে গুলি লাগল। বাকি গুলিগুলো ছিটকে গেল আকাশে। আর কয়েকটা শুটারের মেটাল বডিতে ধাক্কা খেয়ে 'ঠং' শব্দ তুলে দিগভ্রান্তের মতো ঠিকরে গেল।

বেশ বোঝা গেল, ওল্ড সিটির জনগণ মোটেই নিরস্ত্র নয়।

এটা ঠিকই যে, ওল্ড সিটির রিভলভারের মডেলগুলো বেশ পুরোনো, কিন্তু তা থেকে এখনও ঠিকঠাক গুলি বেরোয়, আর সে-গুলি কারও গায়ে লাগলে সে আহত কিংবা নিহত হতে পারে।

সুতরাং, আটটা শুটার মুখ ঘোরাল। উড়ে গেল জিশানের বস্তি থেকে অনেকটা দূরে। ওরা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে ফোনে কথা বলেই যাচ্ছিল।

মিনি বাড়ির কাছেই একটা সরু গলিতে দাঁড়িয়ে প্লেট টিভিতে জিশানের কিল গেম দেখছিল। মরণ খেলাটা শেষ হতে আর দু-ঘণ্টা মতন বাকি। একটু পরেই হয়তো ভোরের আলোর আভা ফুটে উঠবে। তাই বারবার মুখ তুলে আকাশের দিকে দেখছিল ও।

ওঃ ভগবান! আর একটু! আর একটু!

অর্কনিশান বাড়িতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বস্তিরই একটি কিশোরী মেয়ে ওকে পাহারা দিচ্ছে। মেয়েটি জানে যে, মিনিবউদির আজ সারারাত টিভি দেখা দরকার। তাই ও মিনির হয়ে প্রক্সি দিচ্ছে।

হঠাৎই জনতার গর্জনের বিস্ফোরণে বস্তির সবাই চমকে উঠল। মিনিও।

ও এতক্ষণ ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল, কাঁপছিল। শুটারের শিসের শব্দ শোনার জন্য কান পেতে ছিল। কিন্তু সেই শব্দটা শুনতে-না-শুনতেই ভেসে এল ক্ষিপ্ত জনতার ভয়ংকর গর্জন।

তারপর খুব দ্রুত কীসব যে ঘটে গেল!

ফিসফাস। কানাকানি। কথা চালাচালি।

তারপরই মিনিকে আর শানুকে পিস ফোর্সের হাত থেকে বাঁচাতে অসংখ্য জেহাদি নারী-পুরুষ মিনির ঘর আর মিনিকে ঘিরে বস্তির সব অলিগলিতে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা যে যেমন পেরেছে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ওদের ঠোঁটে উত্তেজনা আর প্রতিরোধের জিগির। দূর থেকে কানে আসা জনতার গর্জনের সঙ্গে ওদের গর্জন মিলে গেল। যেন দু-দুটো সমুদ্রের দুরন্ত ঢেউ হাতে হাত মিলিয়ে কোলাকুলি করল। ওদের স্লোগান শুনতে-শুনতে মিনির চোখে জল এসে গেল।

জিশানকে এত মানুষ ভালোবাসে!

ওরা বলছে, 'জান দেব, তবু জিশানকে দেব না! জিশান জিন্দাবাদ! জিশান আমাদের ছিল, আমাদের থাকবে!...।'

ওল্ড সিটির বড়-বড় রাস্তাগুলোয় তখন এক অভাবনীয় দৃশ্য ঃ কাতারে-কাতারে মানুষ ছুটে চলেছে মাস্টার ব্রিজের দিকে—যে-ব্রিজ নিউ সিটি আর ওল্ড সিটিকে আলাদা করে রেখেছে। জিশান-পাগল মানুষের দল এখন আর পিস ফোর্সের গার্ডদের গুলির পরোয়া করে না। ওরা পরিখার পরোয়া করে না। পরোয়া করে না পিরান্‌হা মাছ কিংবা বিষধর সাপের। ওরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছে যে, আজ ওরা মাস্টার ব্রিজের প্রতিরোধ ভাঙবেই।

আজ ওরা জনসমুদ্রের জোয়ারে রাতের নিউ সিটি ভাসিয়ে দেবে। দেবেই।

নিউ সিটি আর ওল্ড সিটিতে দু-রকমের দুটো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে গেল। বেরিয়ে এল দু-রকমের দুটো লাভাস্রোত।

কিন্তু সেই লাভাস্রোত দুটো ধীরে-ধীরে মিশে যাচ্ছিল পরস্পরের সঙ্গে।

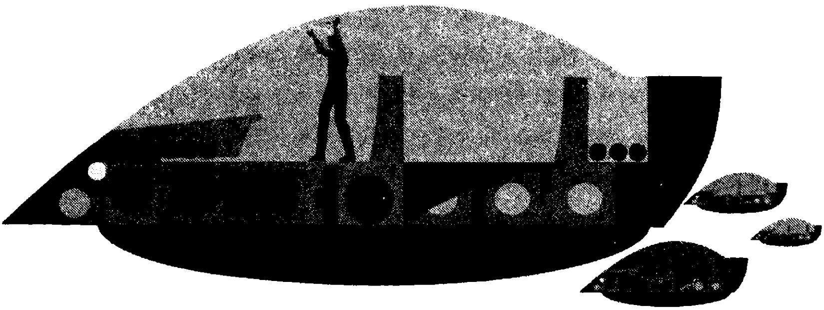
একটু পরেই দুটো স্রোতকে আর আলাদা করে চেনা গেল না।

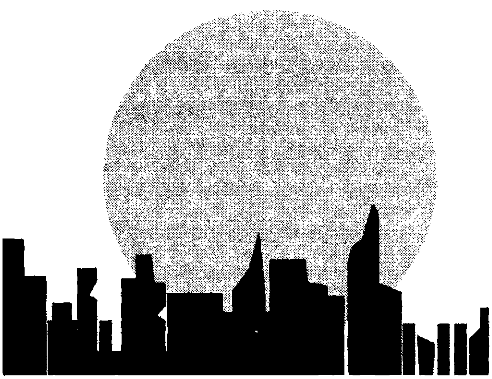
●

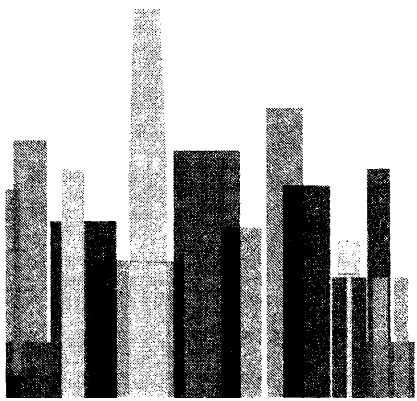
জিশানের পাগল-পাগল লাগছিল।

এরপর কী? এরপর কী?

বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল ও। কালো আকাশটাতে খুব সামান্য







হলেও ধূসরের ছোঁয়া লেগেছে না? হে ভগবান! আর কিছুটা সময় আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। মিনি আর শানুকে আমি একবার দেখতে চাই। একবার—মাত্র একবার...।

যন্ত্রণা আর ক্লান্তির সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করছিল আর এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল। তখনই জিশান দেখতে পেল, গেম সিটির ভেতরে একটা ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। অনেক মোটরবাইক আর গাড়ি নানান দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কিছু চিৎকার চেঁচামেচি।

বাইকের কয়েকজন মানুষকে লক্ষ করল জিশান। ওদের গায়ে কোনও স্পেশাল ইউনিফর্ম নেই। ওরা বোধহয় সিভিলিয়ান—গেম সিটির মক সিটিজেন।

কিন্তু ওরা এভাবে গেম সিটির রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কেন?

একটু পরেই প্লেট টিভির পরদায় এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল। গেম সিটির সিটিজেনরা জিশানকে খুঁজে বের করে আগলে রাখতে চাইছে। ওরা চাইছে জিশানের গায়ে আর যেন আঁচড়টিও না লাগে। তাই ওরা নিয়ম ভেঙে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পথে নেমে পড়েছে।

রউফ লালার কথা মনে পড়ে গেল জিশানের। কিন্তু ওর বেলায় তবু একটা প্রাইজ-টাইজের ব্যাপার জড়িয়ে ছিল! এখানে তো তা নেই—বরং কুটিল শাস্তিই হয়তো ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু তা হলে এই মানুষগুলো এরকম পাগলামো করছে কেন? ওদের ভয়ডর নেই!

জঙ্গলের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছিল জিশান। কখনও গাছের আড়ালে, বা কখনও গাছের ওপরে বেয়ে উঠে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শরীরের যা অবস্থা তাতে গাছ বেয়ে ওঠার কাজটা মারাত্মকরকম কঠিন হয়ে পড়ছে।

ঘাম আর রক্ত মিশে গিয়ে জিশানের কাটা জায়গাগুলো জ্বলছিল। ও বারবার সেগুলোর ওপরে হাত বোলাচ্ছিল। আলো আর অন্ধকারের জাফরির মধ্যে দিয়ে এদিক-ওদিক নজর চালাচ্ছিল।

হঠাৎই ও দেখতে পেল দুটো হলদেটে সবুজ চোখ। তাদের ঘিরে গাঢ় কালো ছায়া।

জিশান একটুও দেরি না করে হাঁটুর কাছে লাগানো হোলস্টার থেকে লেজার ব্লাস্টার বের করে নিল। এবং ফায়ার করল।

কালো ছায়াটা শূন্যে লাফ দিয়েছিল। একইসঙ্গে চাপা গর্জন করে উঠেছিল। সেটা এখন 'উড়ে' এসে জিশানের কাছাকাছি আছড়ে পড়ল। ওটার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে হিংস্র গজরানি।

প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ। আক্রোশে লেজ আছড়াচ্ছে। পাগলের মতো

থাবা ছুড়ছে শূন্যে। ফুঁসছে।

কালো বাঘ যে এত বড় মাপের হয় জিশান জানত না। আর ও এও জানত না, এরা এত জানদার।

তবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাঘটা বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

জিশান বাঘটাকে লক্ষ্য করে আবার ফায়ার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই একটা গরম কিছু ওর বাঁ-কাঁধ ছুয়ে বেরিয়ে গেল। আর সেই 'ছোঁয়ার' অভিঘাতটা এতই মারাত্মক হল যে, জিশানের দেহটা পলকে দুটো পাক খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। ওর বাঁ-কাঁধটা আগুনের আঁচে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল।

তখনই প্রোটনকে জিশান দেখতে পেল। ওর কাছ থেকে প্রায় সাত-আট হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সরু ছিপছিপে একটা ইস্পাতের চাবুক। চোখের ওপরে ঢাকা কালো কাচ থেকে জঙ্গলের আলোর ঢেউ ঠিকরে পড়ছে। ওর দু-হাতে দু-দুটো অস্ত্র।

জিশানের মনে হল, এইমাত্র প্রোটন দুটো অস্ত্রই ব্যবহার করেছে ঃ একটা জিশানের ওপরে, আর-একটা কালো পশুটার ওপরে।

এবার তা হলে সব শেষ। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, এত লড়াই—সব শেষ! জিশানের শরীরের এখন যা অবস্থা তাতে ও কী পালটা কিছু করে প্রোটনকে ঘায়েল করতে পারবে? ওর হাত আর কাঁধের যন্ত্রণাটা এখন এত বেড়ে গেছে যে মনে হচ্ছে, কেউ যেন মাংসের ভেতরে তুরপুন গেঁথে নিষ্ঠুরভাবে মোচর দিচ্ছে।

কিন্তু প্রোটন কী করে ওকে খুঁজে পেল? ট্র্যাকারে তো ওর পজিশন প্রোটন দেখতে পায়নি!

সেটা দেখতে না পেলেও প্রোটন হাল ছাড়েনি। বুদ্ধি খাটিয়েছে, পরিশ্রম করেছে, আর ওর আই গিয়ারে লাগানো নাইটভিশান ইন্সট্রুমেন্টের সাপোর্ট নিয়েছে। তার ওপরে ভাগ্যও ওকে সাহায্য করেছে।

প্রোটনের জায়গায় জিশান থাকলেও ঠিক একইরকম মরিয়া চেষ্টা করত।

আর সুখারাম? ও-ও কি জিশানকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে না? ও কি জিশানদের ফায়ারিং-এর শব্দ শুনতে পায়নি?

জিশানের নজর মাঝে-মাঝেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ও জোর করে নিজেকে আবার সজাগ করে তুলেছিল। মিনি, শানু...আর সবার জন্য ওকে যে লড়তে হবে! যে করে হোক, লড়তে হবে।

মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় শরীরটাকে কয়েক ডিগ্রি ঘোরাল জিশান। ডানহাতের আঙুলগুলো গুটিগুটি ব্লাস্টারের হাতলের দিকে এগোতে লাগল।

প্রোটন চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিশানকে দেখছিল। ওর ঠোঁটের রেখাটা সামান্য

চওড়া হল। তারপর ডানহাতে ধরা লং রেঞ্জ মালটিশুটার পিস্তলটা জিশানের মাথা লক্ষ্য করে তাক করল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আহত কালো বাঘটা সবাইকে চমকে দিয়ে বিদ্যুতের মতো প্রোটনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রোটন ফায়ার করল বটে, কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হল না। কারণ, বাঘটা মারা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রোটনকেও ছিঁড়ে-খুঁড়ে রেখে দিয়ে গেল।

গাছপালার গন্ধের সঙ্গে বারুদের গন্ধ মিশে গেল। ফায়ারিং-এর শব্দে অন্ধকারের পশুপাখিরা চঞ্চল হয়ে ডাকাডাকি শুরু করল। কয়েকটা জন্তুজানোয়ারের ছুটোছুটির শব্দও পাওয়া গেল যেন।

জিশান অতি কষ্টে উঠে বসল। তারপর একটা গাছের গুঁড়িতে কোনওরকমে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বাঘটার দিকে একবার তাকাল। একেবারে নিথর, স্পন্দনহীন।

তারপর জিশান তাকাল প্রোটনের দিকে। পায়ে-পায়ে সেদিকে এগোল।

প্রোটন চিত হয়ে পড়ে আছে। তবে ওর মাথাটা একপাশে ঘুরে গেছে। দু-হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়েছে। পোশাক ছিঁড়ে গেছে বেশ কয়েক জায়গায়। কোমরের কাছ থেকে বাঁ-পাটা খানিকটা যেন খুলে বেরিয়ে এসেছে। মুখটা অল্প খোলা—বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছে। গায়ে নানা জায়গায় রক্ত লেগে রয়েছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি। যেন রাতের জঙ্গলের রূপ দেখে হতবাক হয়ে গেছে।

হঠাৎই জিশান খেয়াল করল, প্রোটনের বাঁ-পায়ের একটা জায়গায় চামড়া উঠে গেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে চকচকে ধাতু—হয়তো স্টেইনলেস স্টিল কিংবা অন্য কিছু।

ঠিক একইরকম ব্যাপার দেখা গেল ডান কাঁধে আর গালে। তা ছাড়া জিশান লক্ষ করল, প্রোটনের ঘাড়ের পাশে দুটো ছোট লাল বাতি দপদপ করছে।

জিশানের সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল। চামড়া, রক্ত, মাংস, মেটাল, লালবাতি...এসবের মানে কী?

যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠা গলায় প্রোটন প্রায় ফিসফিস করে বলল,' জিশান... তুমি জিতে গেলে। আমি...আমি...।'

প্রোটনের কথা ভালো করে শোনার জন্য জিশান ওর মাথার কাছে উবু হয়ে বসে পড়ল। ব্লাস্টারটা শক্ত মুঠোয় ধরা রইল।

'আমি...আমি...শেষ। বোনাস লাইফ নিয়ে অনেকদিন টিকে ছিলাম। আর...আর এটাই স্যাটিস্‌ফ্যাকশন যে...যে মানুষের হাতে আমাকে মরতে হল না...।'

সব জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে জিশান প্রোটনের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

প্রোটনের গলা একেবারে মেয়েদের মতো। চোখ-মুখের আদলটাও সেরকমটাই লাগছে না কি?

এই মেয়েটাই একজন সুপারকিলার! যার আসল পরিচয় মিডিয়া শেষ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছে!

'তুমি...তুমি...মেয়ে?' জিশান জিগ্যেস করল। বাঁ-হাতের গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছে নিল।

'হ্যাঁ, শুরুতে তো তাই ছিলাম। খেলাধুলো ভীষণ ভালোবাসতাম...।'

প্রোটনের স্যাটেলাইট ফোন বাজতে শুরু করল। বাজতেই থাকল। প্রোটন ফোন ধরার মতো অবস্থায় নেই। ও মলিন চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে ছিল, আর আস্তে-আস্তে কথা বলছিল।

জিশান শুনতে লাগল প্রোটনের কথা।

ছোটবেলা থেকেই অ্যাথলেটিক্সে টান ছিল। প্রাইজও পেয়েছে অনেক। খানিকটা ডানপিটে গোছের হওয়ায় বেশিরভাগ সময় ছেলেদের দঙ্গলে ভিড়ে থাকত। তা ছাড়া, ছিপছিপে চেহারা, বয়কাট চুল এসব দেখে অনেকে ওকে ছেলে বলেও ভুল করত।

বয়েস বাড়তে লাগল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রোটন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে-ধীরে ছোটখাটো ক্রাইমে জড়িয়ে পড়তে লাগল। আঠেরো বছর পেরোতে না পেরোতেই ও প্রথম খুন করে বসল। কিন্তু পুলিশ ঠিকমতো কেস সাজাতে পারেনি বলে ও তিন বছর জেল খেটে রেহাই পায়।

এরপর ও একটা মারাত্মক গ্যাং ওয়ারে জড়িয়ে পড়ে। পাহাড়ি এলাকার সেই গ্যাং ওয়ারে প্রচুর গোলাগুলি চলে। সেখান থেকে পালানোর সময় প্রোটনদের জিপ একটা বাঁকের মুখে রাস্তা ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে যায় শূন্যে।

জিপের সবাই মারা গিয়েছিল—একমাত্র প্রোটন ছাড়া।

তবে ওর অবস্থা যা হয়েছিল তাতে ওকে বাঁচানো যাবে বলে কেউ ভাবেনি। ওর গোটা শরীরটা দুমড়েমুচড়ে গিয়েছিল। চোখ ঢুকে গিয়েছিল গর্তে, মাথার খুলির খানিকটা অংশ কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

সেই সময় নিউ সিটির বারোজন বিজ্ঞানী একটা কোর রিসার্চ গ্রুপ তৈরি করে রোবোটিক্স আর অ্যানড্রয়েড টেকনোলজি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁদের নানান পরীক্ষার জন্য 'সাবজেক্ট' দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই প্রোটনকে তাঁরা 'সাবজেক্ট' হিসেবে চেয়ে বসেন। নিউ সিটির সিন্ডিকেট সেই অনুরোধে সায় দেয়।

তারপর বছরের পর বছর চিকিৎসা আর গবেষণা চলতে থাকে। রোবোটিক্স, আরটিফিশিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স আর বায়োটেকনোলজি হাত ধরাধরি

করে প্রোটনের ওপরে কাজ করতে থাকে। রক্ত, মাংস, হাড়ের সঙ্গে মিশে যায় স্টিলের প্লেট, ব্যাটারি, তার, সুইচ, অপটিক্যাল সেন্সর, এল. ই. ডি. বাতি আর অসংখ্য মাইক্রোচিপ।

শেষ পর্যন্ত তিন বছরের চেষ্টায় তৈরি হয় সুপারকিলার প্রোটন। শ্রীধর পাত্রা ওকে 'সুপারহিউম্যান কিলিং মেশিন' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু...।

প্রোটনের কথা শুনতে-শুনতে খানিকটা আনমনা হয়ে পড়েছিল জিশান। তবে ওর চোখ আর কান সাজাগ ছিল। ও শুনতে পেল বেশ কয়েকটা চপারের শব্দ। তার সঙ্গে শুটারের শিস।

কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল জিশান। আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট! গত কয়েকটা ঘণ্টা কী করে এত তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেল কে জানে! জিশান অবাক হয়ে ভাবল, সত্যি-সত্যি কি কিল গেমের চব্বিশ ঘণ্টা শেষ হতে চলেছে? না কি ও স্বপ্ন দেখছে?

একবার প্রোটনের দিকে তাকাল। এখন ওর বুকের কোনও ওঠা-নামা নেই—কালো বাঘটার মতোই স্থির।

কিন্তু জিশান এখন কী করবে? জঙ্গলের মধ্যেই এলোমেলো ছুটে বেড়াবে? না কি খোলা রাস্তায় বেরিয়ে মক সিটিজেনদের আস্তানায় গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করবে? ওদের কাছে আশ্রয় চাইবে?

জিশানের মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না। কিলার সুখারাম এখন কোথায় আছে? কতদূরে?

আন্দাজে জিশানের মনে হল, বেশি দূরে নয়। সুখারামের ট্র্যাকারে জিশানের সবুজ ডট দেখা যাচ্ছে না বটে তবে প্রোটনের লাল ডটটা নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, এই অবস্থায় সেরা স্ট্র্যাটেজি হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুজন কিলারের একজোট হয়ে যাওয়া। তার মানে, সুখারাম নিশ্চয়ই প্রোটনের লাল ডট লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

প্রোটনের ফোন আবার বেজে উঠল। বাজতেই থাকল।

জিশানের মনে হল, সুখারাম ফোন করে প্রোটনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, আর কথা বলতে না পেরে মরিয়া হয়ে ধেয়ে আসছে প্রোটনের খোঁজে—জিশানের খোঁজে।

রুকস্যাকে সব গুছিয়ে নিয়ে টলতে-টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। শুধু ডানহাতের মুঠোয় ধরা রইল ব্লাস্টার গান। ওর শরীরের যা অবস্থা তাতে সুখারামের মুখোমুখি হলে কতটা মোকাবিলা করতে পারবে সেটাই প্রশ্ন।

পথ চলতে শুরু করল জিশান। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে খিদে আর ঘুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও কিছুক্ষণ অন্তত ওকে শরীরটাকে সচল রাখতে হবে।

রুকস্যাক থেকে অপটিক্যাল ট্যাবলেট বের করে ফুড ম্যাপ দেখল। তারপর সবচেয়ে কাছের ফুড পয়েন্টে গিয়ে চটপট কিছুটা খিদে-তেষ্টা মিটিয়ে নিল। মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিল।

অপটিক্যাল ট্যাবলেট দেখে নিজের অবস্থানটা বুঝতে চাইল জিশান। তারপর পুবদিক লক্ষ্য করে হাঁটা দিল। ও জানে, কিছুটা পথ গেলেই মেটাল রোড পাওয়া যাবে। সেখান থেকে একটা গাড়ি কিংবা মোটরবাইক নিয়ে নেবে। তারপর আবার দৌড়...দৌড়...দৌড়...।

মেটাল রোডের কাছাকাছি আসতেই অনেক আলো দেখতে পেল। সেইসঙ্গে চপারের ইঞ্জিনের শব্দ, শুটারের শিস, আর মানুষজনের হইচই।

হঠাৎই পিছন থেকে ফিসফিস করে কে যেন ডেকে উঠল ঃ 'জিশানদা!'

জিশান চমকে উঠল। এক ঝটকায় পিছন দিকে ঘুরে গেল। লেজার ব্লাস্টার তাক করল অন্ধকারের দিকে। দেখল, সেই অন্ধকারের গায়ে সার্চলাইটের টুকরো-টুকরো আলো জোনাকির মতো বিচিত্র নকশা কেটে দিয়েছে।

সেই নকশা গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে একজন ছ'ফুটের বেশি লম্বা মানুষ—যে দৌড়ে হরিণকে হার মানাতে পারে। যে অনায়াসে পাঁচ-পাঁচটা খারাপ মানুষকে খতম করতে পারে।

'সুখারাম নস্কর....।' প্রায় ফিসফিস করে উচ্চারণ করল জিশান।

'হ্যাঁ—সুখারাম, জিশানদা।' জিশানের আরও কাছে এগিয়ে এল ও ঃ 'আমি তোমাকে কিছুতেই মারতে পারব না। কেন না ভালো মানুষদের আমি মারতে পারি না। তাতে মার্শালের হাতে আমাকে মরতে হয় মরব—।'

জিশান কী বলবে, কী করবে, বুঝে উঠতে পারছিল না। তবে এটুকু বুঝতে পারছিল, সুখারাম নস্কর কেন এতক্ষণ ধরে ওকে 'খুঁজে' পায়নি।

সুখারাম জিশানের হাত চেপে ধরল ঃ 'এসো, জিশানদা। জলদি। আর সময় নেই।'

ওরা ঘুরপথে মেটাল রোডের দিকে এগোল। সুখারাম খুব নীচু গলায় কথা বলছিল। ও জিশানের ওপরে অনেকক্ষণ ধরেই নজর রাখছে, যাতে জিশানের কোনও বিপদ না হয়। জিশানকে বাঁচানোর জন্য খেলার সব নিয়মকানুন ভেঙে প্রোটনকেও ও শেষ করে দিত। কিন্তু তার আগেই কালো বাঘ সেজে নিয়তি হাতে লাগাম তুলে নিয়েছে।

দুটো আগুনের তির কোথা থেকে যেন ছুটে এল। ওদের কাছাকাছি গাছপালার ওপরে ঠিকরে পড়ে কানফাটানো বিস্ফোরণ ঘটাল। কালো ধোঁয়া, পোড়া গন্ধ।

শ্রীধর পাত্রা নিশ্চয়ই এয়ার অ্যাটাকের নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু হঠাৎ এ-নির্দেশ কেন?

জিশান আর সুখারাম দৌড়তে শুরু করল।

একটু পরেই ওরা গাছপালা পেরিয়ে মেটাল রোডে পৌঁছে গেল। রাস্তার পাশে দাঁড় করানো একটা গাড়িতে উঠে বসল। তারপর সুখারামের হাতে গাড়ি চলতে শুরু করল।

ওদের ছুটন্ত গাড়ি লক্ষ্য করে মিসাইল ছুটে আসছিল বারবার। চোখে পড়ছিল আগুনের রেখা আর শব্দ। কিন্তু সুখারাম কুশলী হাতে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছিল, অ্যাক্সিলারেটরের কন্ট্রোল সুইচ অপারেট করছিল।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই ওদের থামতে হল।

কারণ, সামনের রাস্তা জুড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

জায়গাটা আলোয় আলো। চওড়া রাস্তার মাঝে চারটে শুটার দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার ঠিক মাঝখানে একটা চপার—তার ইঞ্জিন চলছে। চপারটার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীধর পাত্রা। আর কোনও উপায় না দেখে নিজেই গেম সিটিতে চলে এসেছেন।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, রাস্তার দুপাশে বহু মানুষের ভিড়। মনে হচ্ছিল যেন গেম সিটির সব মক সিটিজেন শ্রীধর পাত্রাকে ঘিরে জড়ো হয়ে গেছে। ওরা হইচই করছে, জিশানের নাম ধরে চিৎকার করছে।

সব চিৎকার হইচই ছাপিয়ে হঠাৎই শ্রীধরের গলা শোনা গেল। একটা মেগাফোন ব্যবহার করে তিনি কথা বলছেন।

'সব খেলা শেষ, জিশান! আর পালানোর পথ নেই। তুমি কিল গেমের নিয়ম ভেঙেছ—তাই সব খতম। এক্ষুনি নেমে পড়ো গাড়ি থেকে। নইলে আমি শুট করার অর্ডার দেব...।'

ভিড় করে থাকা জনতা প্রতিবাদের চিৎকার করে উঠল।

জিশান গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। একটা হাত ওপরে তুলে বলল, 'এটা অন্যায়। এ-অন্যায় আপনি করতে পারেন না, মার্শাল—।'

নিজস্ব ঢঙে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন শ্রীধর ঃ 'জিশান, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, নিউ সিটিতে আমিই শেষ কথা।'

'মোটেই না!' চিৎকার করে বলল জিশান, 'সবসময় জনগণই শেষ কথা বলবে। সবাই জানে, আমি কোনও দোষ করিনি...।'

জনতা আবার চেঁচিয়ে উঠল। ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকটা বাক্স, কৌটো আর ইট-পাটকেল ছিটকে গেল শ্রীধরের শুটার-বাহিনীর দিকে।

দুজন গার্ড শূন্যে ফায়ার করে জনতাকে 'ধমক' দিল।

জিশান বলল, 'মার্শাল, ভুলে যাবেন না, লাইভ টেলিকাস্ট এখনও চলছে। সবাই আপনার এই অন্যায় দেখছে...।'

হাসলেন শ্রীধর। মাটির দিকে থুতু ছেটালেন। তারপর মুখ খিঁচিয়ে বললেন, '...ইয়োর লাইভ টেলিকাস্ট! সবাই এবার ডেড টেলিকাস্ট দেখবে।' ডাইনে-বাঁয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন মার্শাল। তারপর ঃ 'নাউ, কাম অন। হাত মাথার ওপরে রেখে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসো আমাদের কাছে। আমি দশ পর্যন্ত গুনব। ওয়ান...টু...থ্রি...।'

হঠাৎই জিশানকে অবাক করে দিয়ে সুখারাম এক হ্যাঁচকায় গাড়ি ছুটিয়ে দিল। এবং জিশান বা অন্যান্য কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর গাড়ি মিসাইলের মতো ধেয়ে গেল শ্রীধর পাট্রার দিকে।

জনতা চিৎকার করে উঠল। গার্ডরা সুখারামকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার ফায়ার করল বটে, কিন্তু তাতে কাজ হল না।

সুখারামের গাড়ি বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে শ্রীধরের চপারে সরাসরি ধাক্কা মারল।

সংঘর্ষ, বিস্ফোরণ, আগুন, ধোঁয়া।

শ্রীধর পাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। আর একইসঙ্গে জনগণ গার্ডদের ওপরে জলপ্রপাতের মতো লাফিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ। প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে ফায়ারিং-এর শব্দও শোনা গেল।

তখনই লাইভ টেলিকাস্টে জানা গেল, জনস্রোতের বন্যা সব প্রতিরোধ ভেঙে গেম সিটিতে ঢুকে পড়েছে।

জিশান বুঝতে পারছিল, জনতার রোষে পড়লে শ্রীধর পাট্রা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবেন—ওঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর সেই মৃত্যুটা জিশানের চোখে মোটেই ন্যায়বিচার নয়।

সুতরাং, ও শ্রীধরকে লক্ষ্য করে দৌড়ল। ওঁকে আপাতত আগলে রাখা দরকার। পরে ওঁর অন্যায়ের বিচার করা যাবে।

শ্রীধর পাট্রা গায়ের সাদা কোট খুলে ফেলেছিলেন, যাতে কেউ ওঁকে সহজে চিনে ফেলতে না পারে। কিন্তু জিশান ওঁকে চিনতে পারল। রাস্তার পাশের একটা গাছের আড়ালে বসে থরথর করে কাঁপছেন।

একটা শুটারকে কোনওরকমে দখল করল জিশান। ক্ষিপ্ত জনগণ শুটারটাকে ঘিরে ছিল। কিন্তু জিশানকে দেখে ওরা পথ ছেড়ে দিল।

সেই শুটারটায় শ্রীধরকে টেনে তুলল জিশান। সঙ্গে উঠল আরও দুজন মানুষ। তা ছাড়া শুটারের পাইলট তো আছেই!

শ্রীধর কাঁপা-কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'আমাকে...আমাকে কো-কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, জিশান?'

শুটারে উঠতে-উঠতে জিশান বলল, 'এখানে থাকলে আপনি খতম হয়ে যাবেন...।'

শুটার শিস দিয়ে আকাশে উঠল। আদিগন্ত নতুন ভোরের আলো। কিল গেমের চব্বিশ ঘণ্টা শেষ।

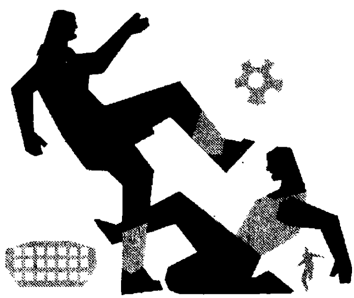
শ্রীধর তখনও থরথর করে কাঁপছিলেন। অর্থহীন শব্দ করে গুঙিয়ে উঠছিলেন। ওঁকে দেখিয়ে একজন যাত্রী জিগ্যেস করল, 'জিশান, এই...এই জানোয়ারটাকে আপনি...আপনি ছেড়ে দেবেন?'

জিশান তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ছেড়ে দেব—মানুষের মধ্যে ছেড়ে দেব। যাতে মানুষের মধ্যে থেকে, মানুষের সঙ্গে মিশে, এই জানোয়ারটা আবার মানুষ হওয়ার চেষ্টা শুরু করতে পারে।'

নীচ থেকে আবছাভাবে জনতার স্লোগান শোনা যাচ্ছিল, 'নিউ সিটি জিন্দাবাদ! ওল্ড সিটি জিন্দাবাদ!'

সামনের ভোরের দিকে চোখ মেলে দিয়ে জিশান আপনমনেই বলল, 'আর নিউ সিটি, ওল্ড সিটি নয়—দুটো শহর মিলেমিশে এখন থেকে একটাই নাম হবে ও আওয়ার সিটি—আমাদের শহর।'

জিশান চোখ মেলে নতুন সূর্য ওঠা দেখতে লাগল।





জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৫১, কলকাতায়। স্কুলের পড়াশোনা ঃ হিন্দু স্কুল। সাম্মানিক পদার্থবিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বি. টেক., এম.টেক. ও পিএইচ.ডি.। পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক।

কর্মজীবনে ১৯৮৩ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার। ১৯৯০ থেকে ওই বিভাগেই রিডার, আর ১৯৯৮ থেকে প্রফেসার।

লেখালেখির শুরু ১৯৬৮-তে, অধুনালুপ্ত 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'য়। পত্র ভারতী প্রকাশিত বই **তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট, ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা, দেখা যায় না শোনা যায়, বারোটি রহস্য উপন্যাস, পাঁচটি রহস্য উপন্যাস, ভয়পাতাল, অন্তরে পাপ ছিল, কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র, বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূতের গল্প, ভৌতিক অলৌকিক, আমি পিশাচ, মার্ডার ডট কম, সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র, বিজ্ঞানের হরেকরকম, সহজ কথায় ইন্টারনেট, কেমন করে কাজ করে যন্ত্র, রোমাঞ্চকর ধূমকেতু** ইত্যাদি।

পুরস্কার ঃ প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৮) ও ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯)।

সম্পাদনা করেছেন অল্পকালজীবী কয়েকটি মাসিক পত্রিকা ও বিমল করের 'গল্পপত্র' পত্রিকার বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা।

প্রচ্ছদ **সুদীপ্ত দত্ত**

ষাট মিনিটে তেইশ ঘণ্টা

অনীশ দেব

পত্র ভারতী

নায়ক জিশান।
রিয়্যালিটি শো। কিল গেম!
মৃত্যু ঝুলছে সূক্ষ্ম সুতোয়!...

অসহ্য টেনশন আর রুদ্ধশ্বাস রহস্যের মিশেলে বাংলাসাহিত্যের দীর্ঘতম ফিউচারিস্টিক থ্রিলার।

'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট' উপন্যাসের দ্বিতীয় এবং শেষ পর্ব।

9 788183 742658
www.bookspatrabharati.com